মাওলানা আবুল ফাতাহ্ মুহাঃ ইয়াহ্ইয়া

বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক ফযীলত জামাতের 'তাহরীকে দেওবন্দ' বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অনুমোদিত।

দেওবন্দ আন্দোলন ঃ ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান

আবুল ফাতাহ্ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া
সিনিয়র মুহাদ্দিস
জামিয়া শার্ইয়্যাহ্ মালিবাগ, ঢাকা।
সহ-সম্পাদক
বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড
পরিচালক
আল-আমীন রিসার্চ একাডেমী বাংলাদেশ
ও
মাকতাবাতুল ফাতাহ্

প্রকাশনায় ঃ
আল- আমীন রিসার্চ একাডেমী বাংলাদেশ
পরিবেশনায় ঃ
মাকতাবাতুল ফাতাহ্
সাহারা কুড়িল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, কুড়িল চৌরাস্তা, ঢাকা-১২২৯

দেওবন্দ আন্দোলন : ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান
আবুল ফাতাহ্ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া

প্রকাশনায় ঃ
আল- আমীন রিসার্চ একাডেমী বাংলাদেশ

পরিবেশনায় ঃ মাকতাবাতুল ফাতাহ্
সাহারা কুড়িল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, কুড়িল চৌরাস্তা, ঢাকা-১২২৯

প্রকাশ কাল

প্রথম প্রকাশ	ঃ	৩০ মার্চ, ১৯৯৮ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ	ঃ	৩১ মে, ২০০২ ঈসায়ী
তৃতীয় প্রকাশ	ঃ	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ ঈসায়ী
চতুর্থ প্রকাশ	ঃ	৩১ জুলাই, ২০০৯ ঈসায়ী
পূণঃ সংস্করণ	ঃ	৩১ শে আগস্ট, ২০১১ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ মুহা. তাহের

কম্পোজ ও মুদ্রণ ঃ
জননী আর্ট প্রেস
১১৪, বাসাবো, সবুজবাগ,
ঢাকা-১২১৪।

মূল্য ঃ ১৮০.০০ টাকা মাত্র

Deoband undolon : Etihash Oitizzo Obodan by Moulana Abul Fatah Muhammad Yahya. Published By Al-Ameen Research Academy. Distribut By Maktabatul Fatah, Shahara Kuril, 1229, Dhaka.Bangladesh. Price: Taka 180.00 Only & US$ 7.00

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের খিদমাতে নিরত থাকার তাওফীক দিয়েছেন। সালাত ও সালাম আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি যাঁর উম্মত হতে পেরে আমরা গর্বিত।

ভারতবর্ষের আলেম উলামাদের কর্মতৎপরতার উপর উর্দু ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণীত হলেও বাংলাভাষায় এ বিষয়ের উপর উল্লেখযোগ্য তেমন কোন গ্রন্থ নেই বললেই চলে। নতুন প্রজন্ম অতীতের অনেক সংগ্রামী মনীষীর নাম জানলেও তাঁদের ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামী ধারা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা রাখেনা। তাঁদের কর্মতৎপরতার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে কোন ইতিহাস গ্রন্থ এ যাবৎ রচনা করারও তেমন কোন উদ্যোগ বাংলা ভাষায় নেওয়া হয়নি। প্রচলিত যে ইতিহাস গ্রন্থ রয়েছে সেগুলো যেহেতু ইসলাম বিদ্বেষী পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের দেয়া তথ্য আহরণ করে রচিত, তাই সে সব গ্রন্থে আলেম উলামাদের কর্মতৎপরতার ইতিহাস স্থান পায়নি। অথচ আলেম উলামাগণ এদেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করেছেন। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন পরাধীনতার অক্টোপাসে আবদ্ধ মৃতপ্রায় এদেশের মানুষকে। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে তাদের রয়েছে অক্লান্ত সাধনা ও শ্রম। ইসলামী আদর্শকে বাতিলের নগ্ন থাবা থেকে রক্ষা করার জন্য জীবন বাজী রেখে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন, ছুটে ফিরেছেন মাঠে ময়দানে। তাঁদের আত্মত্যাগের ফলেই হিন্দু অধ্যুষিত এই দেশ মুসলমানদের আবাসভূমিতে পরিণত হয়েছে, ইসলামী আদর্শ সজিবতা পেয়েছে এই ভূখণ্ডে, ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক পরিবেশ গড়ে উঠেছে উপমহাদেশ জুড়ে। কিন্তু দুঃখনীয় হলেও সত্য যে, ইতিহাসের এই নিরব নির্মাতাদের ইতিহাস কেউ রচনা করেনি। তরুণ প্রতিভাদীপ্ত আলেম, লেখক ও গবেষক মাওলানা আবুল ফাতাহ সাহেব 'দেওবন্দ আন্দোলন ঃ ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান' শীর্ষক এ গ্রন্থে সেই না লেখা ইতিহাসকে তুলে ধরে প্রচলিত ইতিহাসের পাশাপাশি একটি ভিন্ন ধারার ইতিহাস রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। এ বইটি দেওবন্দী উলামায়ে কিরামের ঐতিহ্যগত ধারা, দ্বীনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের চাঞ্চল্যকর কর্মতৎপরতা এবং তাঁদের অবদানের উপর একটি তথ্যবহুল গবেষণামূলক গ্রন্থ। বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড 'বেফাকুল মাদারিস' বইটিকে ফযীলত জামাতের 'তাহরীকে দেওবন্দ' সাবজেক্টের জন্য পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অনুমোদন দিয়েছে।

আল্-আমীন রিসার্চ একাডেমী এই গবেষণামূলক বইটি উপহার দিতে পেরে গৌরব বোধ করছে। আশা করি আমাদের সাধারণ শিক্ষিতরা বইটি পাঠ করে ইতিহাসের একটি ভিন্ন ধারা সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারবেন। এই সঙ্গে এ দেশ ও জাতির সেবায় ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণে দেওবন্দী উলামায়ে কিরামের অবদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন। এ বইটি আমাদের নতুন প্রজন্মকে যদি ভুলে যাওয়া ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যও অনুপ্রাণিত করে তাহলেই আমাদের সকল শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। মহান প্রতিপালকের নিকট এর বিনিময়ে আশা করি উত্তম প্রতিদান।

মুহা. নজরুল ইসলাম

প্রকাশনা পরিচালক, আল-আমীন রিসার্চ একাডেমী

স্বনামধন্য শায়খুল হাদীস, উস্তাযুল আসাতিযা, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও সুসাহিত্যিক হযরত মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ মুদ্দাযিল্লুহুর

অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পৃথিবীতে হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যা, আলো ও অন্ধকারের দ্বন্দ্ব-সংঘাত চিরন্তন ও আপোষহীন। সত্যের আলো ফুটে উঠা মাত্রই মিথ্যার আঁধার তাকে গ্রাস করে ফেলতে উদ্যত হয়, কিন্তু সত্য- সূর্যের প্রখর আলোর তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে মিথ্যা ও পাপাচার গুহার আঁধারে মুখ লুকাতে বাধ্য হয়। মানবেতিহাস সাক্ষ্য দেয়, অন্যায় অসত্যের প্রবল আক্রমণের মুখে সত্য ও ন্যায় কখনও পরাজয় স্বীকার করেনি, যত বাধা- প্রতিবন্ধকতা এসেছে, সত্যের সৈনিকেরা তত দৃঢ়তার সাথে দুর্বার গতিতে সম্মুখ পানে এগিয়ে গেছেন। দ্বীনে ইসলাম-আল-কুরআনুল কারীমের ভাষায় যা হোল বিশ্বপ্রকৃতির ধর্ম, চিরন্তন সত্য, চির সুন্দর- মানুষের ইহকালীন জীবন ও পরকালের চিরস্থায়ী নাজাত ও মুক্তি, কল্যাণ ও সফলতার দিক- নির্দেশনা প্রদান করেছে। সেই ইসলামের আত্মপ্রকাশের সাথে সাথেই শুরু হয়ে যায় হক ও বাতিলের চিরন্তন সেই সংঘাত। কিন্তু সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি, বিরোধিতা ও আক্রমণের ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে ইসলাম ধীরে ধীরে সফলতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করেছে। আল- কুরআনের ভাষায় পরিপুর্ণতা লাভ করেছে। জীবনসায়াহ্নে জনাব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিয়ে গেছেন, তোমাদের মাঝে দুটি আলোক প্রদীপ রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা এই আলোর রশ্মিতে তোমাদের জীবনকে আলোকিত রাখবে, ততদিন কোন বিপর্যয় বিভ্রান্তি তোমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না। সেই দু'টি আলোক প্রদীপ হোল আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত। রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ঘোষণা দিয়ে গেছেন, আমার উম্মাতের একদল সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় সর্বদাই এই মহাসত্যের উপর অটল অবিচল থাকবে, বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণে কখনও তারা সত্যের পথ হতে বিচ্যুত হবে না।

কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের জীবনকে এই আলোকে পূর্ণভাবে আলোকিত করেছিলেন এবং কোন বিপথগামীতা তাঁদের যুগে মাথা তুলতে সাহস করেনি। পরবর্তীতে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, ফুকাহায়ে কিরাম, মুহাদ্দিছীন, মুতাকাল্লিমীন ও সুফিয়ায়ে কিরাম সকল প্রকার শিরক-বিদ'আত, বিজাতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বীরত্বের সংগে সংগ্রাম করে কুরআন-সুন্নার শিক্ষা ও আদর্শকে সমুন্নত রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এভাবে দ্বীনে ইসলামের ১৪ শত বছরের ইতিহাসে উলামায়ে উম্মাত সত্যের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের ফলে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জাতি আফ্রোশিয়ার

বিস্তীর্ণ ভুখণ্ডে অবস্থিত মুসলিম জাহানে উপনিবেশ গড়ে তোলে। জড়বাদ ও ভোগবাদী দর্শনের চাকচিক্য ও আপাতঃ মধুর শ্লোগানে মুসলিম যুব-মানসকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলার কুটকৌশল চালাতে থাকে। ইসলামী জগতের অবিস্মরণীয় চিন্তানায়ক ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. তাঁর অর্ন্তদৃষ্টি ও অতুলনীয় প্রজ্ঞার দ্বারা এই জড়বাদী জীবন-দর্শনকে মহাবিপর্যয় রূপে ঘোষণা দিয়ে এর বিষক্রিয়া হতে বেঁচে থাকার বিপ্লবী কর্মসূচী পেশ করেন। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. এর সুযোগ্য উত্তরসূরীগণ তাঁর এই বিভিন্নমুখী কর্মসূচী নিয়ে পাশ্চাত্যের জড়বাদী দর্শনের মুকাবেলায় আপোষহীন ও বিরামহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন।

দারুল উলূম দেওবন্দ ও দেওবন্দী চিন্তাধারা শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. এর বিপ্লবী কর্মসূচীর সার্থক ও বাস্তব ফসল রূপে আত্মপ্রকাশ করে। দারুল উলূম দেওবন্দ-এর বীর মুজাহিদ সন্তানেরা শুধু উপমহাদেশেই এই জড়বাদী দর্শনের মুকাবেলা করে ক্ষান্ত হননি; বরং সমগ্র মুসলিম জাহানে পাশ্চাত্যের এই নাস্তিকতা ও জড়বাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে মুসলিম জাহানের দ্বীন-ঈমান, আমল-আখলাক রক্ষার মুজাদ্দেদী দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আজকে বিশ্ব মুসলিমের মাঝে কুরআন-সুন্নার প্রতি যতটুকু আস্থা ও বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয় তা নিঃসন্দেহে দেওবন্দী চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ অবদান। তাই, দারুল উলূম দেওবন্দ ও দেওবন্দী চিন্তাধারা জনাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎ সুসংবাদ বাণীর সার্থক ধারক ও বাহক। দারুল উলূমের সন্তানেরা কুরআন-সুন্নাহর সঠিক পতাকাবাহী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঠিক ওয়ারিছ ও উত্তরাধিকারী।

মালিবাগ জামিয়ার সুযোগ্য মুহাদ্দিস স্নেহভাজন মাওলানা আবুল ফাতাহ্ মুহা. ইয়াহ্ইয়া সাহেব আলোচ্য গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে দারুল উলূম দেওবন্দ ও দেওবন্দী চিন্তাধারার বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনা করে এই সত্যকে সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। দেওবন্দী চিন্তাধারা তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য জরুরী। বিশেষ করে গ্রন্থটি বেফাকুল মাদারিস বাংলাদেশের নিসাব বা পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তির দাবী রাখে। গ্রন্থখানির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে সকলের সার্বিক সহযোগিতা অবশ্য কাম্য। আল্লাহ তা'আলা লেখককে উভয় জাহানে তাঁর অনুগ্রহ ও রহমতের বারিধারায় স্নাত করুন এই দু'আ করে ইতি করছি।

আরজ গুজার

কা,মু, বিল্লাহ

(কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ)

মুহতামিম, মালিবাগ জামিয়া

ঢাকা-১২১৭

তারিখ ঃ ১১-১১-১৪১৮ হিঃ

১১.৩.১৯৯৮ ইং

বেফাকুল মাদারিস-এর মহাসচিব হযরত মাওলানা আব্দুল জব্বার সাহেবের অভিমত

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি তাঁর দ্বীনের খিদমাতে লেগে থাকার তাওফিক দিয়েছেন। আর দরুদ ও সালাম আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যার পরে আর কোন নবী রাসূলের আগমন ঘটবে না এবং আর কোন কিতাবও অবতীর্ণ হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ব মানুষের জন্য এ দ্বীনকেই আল্লাহ তা'আলা আদর্শ হিসাবে মনোনীত করে দিয়েছেন। তাই এ দ্বীনি আমানত ধারণ, বহন ও সংরক্ষণের নিমিত্তে বিশ্ব নবী (সা.) উলামায়ে কিরামকে তাঁর উত্তরসূরি মনোনীত করে গেছেন।

এ উত্তরসূরিরাই কিয়ামত পর্যন্ত নবী কর্তৃক অর্পিত মানছাবী দায়িত্ব পালন করবেন। সর্বযুগেই উলামায়ে কিরাম এ দায়িত্ব পালনে তৎপর ছিলেন। দ্বীনের যেকোন প্রয়োজনে তারা সর্বোচ্চ কুরবানী স্বীকার করেছেন। এ উপমহাদেশের উলামায়ে কিরামও এ ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ ছিলেন না। বরং বিশ্বে যত বড় বড় সংস্কারমূলক আন্দোলন হয়েছে তন্মধ্যে উপমহাদেশের মুজাদ্দেদী আন্দোলন, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. এর আন্দোলন, দেওবন্দ আন্দোলন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য আন্দোলন। উপমহাদেশের এ তিনটি আন্দোলন মূলতঃ একই সূত্রে গ্রথিত; বরং একই আন্দোলনের যুগপ্রেক্ষিতে তিনটি ভিন্ন রূপ মাত্র।

দেওবন্দ আন্দোলন, যার পরিব্যাপ্তি শুধু উপমহাদেশের মধ্যেই সীমিত ছিল না বরং এর পরিব্যাপ্তি ছিল বিশ্বব্যাপী। এ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশের স্বাধীনতাসহ অন্যান্য মুসলিম দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। দেওবন্দ আন্দোলনের ফলে খ্রীষ্টানদের বহু ষড়যন্ত্রের হাত থেকে উপমহাদেশের ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ রক্ষা পায়। ঈমান-আমল ও দ্বীনের সহীহ তা'লীম রক্ষা পায় এবং বহু ফিতনা থেকে এদেশের মানুষের ঈমান রক্ষা পায়। ঐসব ফিতনার মধ্যে শিয়াদের ফিতনা, ইনকারে হাদীসের ফিত্না, হিন্দু আর্য সমাজীদের ফিত্না, কাদিয়ানী ফিত্না, খ্রীষ্টান পাদ্রীদের ফিত্না, আলীগড়ী ফিতনা, বেরলভী ফিতনা ও মওদুদী ফিত্না খুবই মারাত্মক ফিত্না ছিল। উলামায়ে দেওবন্দ এ সব ফিতনার মুকাবেলা করতঃ ইসলামের সহীহ আকীদাহ ও বিশুদ্ধ তা'লীম জারী রেখেছেন এবং বৃটিশ খেদাও আন্দোলন করে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আনয়ন করেছেন। বাংলাদেশে সেই চেতনা ও আদর্শের অনুসরণে পাঁচ সহস্রাধিক কওমী মাদ্রাসা বিদ্যমান রয়েছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের কওমী মাদরাসাসমূহ বর্তমানে নিজেদের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে খুব একটা সুস্পষ্ট ধারণা রাখে না। আজকের শিক্ষার্থীরা জানেনা কোন প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দারুল উলূম দেওবন্দ, কেন উলামায়ে

কিরাম হয়ে উঠেছিলেন আন্দোলন মুখর? কেন তারা বরণ করে নিয়েছিলেন জেল, জুলুম, হত্যা, নির্যাতন; কালাপানি ও মাল্টার নির্বাসিত জীবন। নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতার এ অবস্থা লক্ষ্য করে এ দুর্বলতা দূর করার লক্ষ্যে বেফাক থেকে দেওবন্দ আন্দোলনের ইতিহাস পাঠ্যসুচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এর কেন্দ্রীয় পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে মতে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন পাঠ্য পুস্তক না থাকায় আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই এ বিষয়ে একটি পাঠ্য বই ও সহায়ক বই তৈরী করার প্রয়োজন ছিল। শেষ পর্যন্ত স্নেহভাজন আলেম, গবেষক ও লেখক মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া এ দায়িত্বভার গ্রহণ করে বহু ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে বক্ষ্যমান পুস্তকটি জাতিকে উপহার দিয়েছেন। বর্তমানে এ পুস্তকটিকে ফযীলত জামাতের 'তাহরীকে দেওবন্দ' সাবজেক্টের পাঠ্য পুস্তক হিসেবে অনুমোদন দেয়া হল। আমি বইটি মোটামুটি দেখেছি। আশা করি বইটি এ বিষয়ে আমাদের চাহিদা পুরণ করতে সক্ষম হবে। আমি মাওলানার ও তাঁর সহযোগীদের ত্যাগ ও কুরবানীর জন্য জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। বইটি মাদরাসার ছাত্র শিক্ষক ও জ্ঞান পিপাসুদের নিকট সমাদৃত হোক মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে পেশ করছি এ মুনাজাত। আমীন।

আহ্‌কার আব্দুল জব্বার
মহাসচিব
বেফাকুল মাদারিস আল-আরাবিয়্যাহ বাংলাদেশ

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি মানুষকে অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার শক্তি দিয়েছেন। সালাত ও সালাম আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর উপর, যিনি ওয়াহীয়ে ইলাহী তথা ইলমে নবুয়্যতের আলোকে বিশ্ব মানুষকে প্রদর্শন করেছেন সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথ।

বস্তুতঃ ইলমে ওয়াহী ও উলূমে নবুয়্যতই ইলম হিসাবে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য। এই ইলমই পারে তমাসাচ্ছন্ন অন্ধকারঘেরা মানব সমাজকে আলোকোজ্জ্বল মুক্তির রাজপথে উঠিয়ে দিতে, সভ্যতার আলোঝলমল নগরীতে পৌঁছে দিতে। এই ইলম এবং তদনুযায়ী আমলই মানুষকে পরিণত করে প্রকৃত মানুষে। মানুষের মাঝে জাগিয়ে তুলে মানবতাবোধ। মানুষের মাঝকার হায়ওয়ানিয়্যাত ও পশু প্রবৃত্তিকে খতম করে তাকে করে তুলে ফেরেশতাবৎ পূতঃপবিত্র চরিত্রের অধিকারী। স্রষ্টাপ্রেম ও তাঁর সান্নিধ্যচেতনায় মানবাত্মাকে করে তুলে উন্মুখ পরা। জাগতিক মোহমায়ার অক্টোপাশ ছিন্ন করে মানুষ তখন ছুটে চলে জান্নাত প্রাপ্তির অনাবিল প্রত্যাশা নিয়ে। সেই চেতনা সমৃদ্ধ মানুষই ইহজগতে রচনা করতে পারে অনাবিল এক জান্নাতী পরিবেশ।

তাই সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকেই এই ইলমকে ধারণ, বহন, এর প্রচার, প্রসারের প্রাণান্তকর প্রয়াস চলে আসছে। উলামায়ে উম্মত, ফুকাহা, মুজাদ্দেদীন, মুহাদ্দেসীন ও সুলাহায়ে উম্মত অত্যন্ত বিশ্বস্ততা, বিচক্ষণতা, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নিরলস সাধনার মাধ্যমে এই ইলমের যথাযথ হিফাজত ও ইশা'আতের কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। বাতিলের রক্তচক্ষু, শয়তানিয়্যাতের উদ্ধত অহংকার, ক্ষমতাসীনদের নির্যাতন, কুচক্রীদের প্রলোভন, জাগতিক ভোগ-বিলাসের মোহ কোন কিছুই তাঁদেরকে আপন কর্তব্য থেকে সামান্যতম বিচ্যুতও করতে পারেনি।

ভারতবর্ষে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে সাহাবায়ে কিরামের যুগেই। তখন থেকেই ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের খণ্ড খণ্ড প্রয়াসও চলে আসছিল। কালে ভারতবর্ষে ইসলামী শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। মুসলিম শাসনের দীর্ঘ ৭০০ বৎসরে মুসলমানরা তাদের শিক্ষাদীক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এতটাই অগ্রসর হয়ে যায় যে, কোন নগর বন্দর এমন ছিল না যেখানে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। এমনকি গ্রামগঞ্জে পর্যন্ত এ শিক্ষার বিস্তার ঘটে। এ শিক্ষাধারার অনুসারীরাই ভারতবর্ষে ইসলামী আদর্শ বিস্তারে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।

তৎকালীন পৃথিবীর সমৃদ্ধ জনপদ হিসাবে বিদেশীরা আসত ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। বাণিজ্যের এ পথ ধরেই বৃটেনিয়ান ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে এসে একদিন ছলে-বলে-কৌশলে এদেশের রাজ্যক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। ক্ষমতার আসনকে পাকাপোক্ত করার জন্য তারা সর্বব্যাপী আগ্রাসী তৎপরতা শুরু করে। অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে পঙ্গু করে দেওয়া হয় এদেশের মানুষকে। রাজনৈতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে স্তব্ধ করে দেওয়া হয় রাজনৈতিকভাবে পুনরুত্থানের সম্ভাবনাকে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে পরিবর্তন করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এদেশের মানুষের মন-মস্তিষ্ককে। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অচল করে দিয়ে আদর্শিক চেতনার ভিত্তিতে গজিয়ে উঠা সম্ভাব্য বিপ্লবের পথকে রুদ্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

তাদের এই সর্বব্যাপী তৎপরতা ও ক্ষমতার দাপট দেখে অধিকাংশ মানুষ পরাধীনতার জীবনকেই গ্রহণ করে নিয়েছিল। কিন্তু সত্যের অতন্দ্র প্রহরী, চিরস্বাধীন উলামায়ে কিরাম এ পরাধীনতাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। তারা স্বাধীনতার পক্ষে অনুপ্রেরণা যোগাতে থাকেন নিরবে নিরবচ্ছিন্নভাবে। বিরোধিতা, বিদ্রোহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের উপর্যুপরি কর্মসূচী দিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলেন ক্ষমতাসীন ইংরেজ বেনিয়াদেরকে। উলামায়ে কিরামের উপর নেমে আসে নির্যাতনের ষ্টীম রোলার, সহায় সম্পদ হয় বাজেয়াপ্ত, জেল-জুলুম, হত্যা-নির্যাতন, দেশান্তর, দ্বীপান্তর কোন কিছুই বাদ যায়নি। কিন্তু কোন কিছুই তাদেরকে অবদমিত করতে পারেনি। তাদের ছড়ানো সেই চেতনা ক্রমান্বয়ে আন্দোলিত হতে থাকে সারাদেশে। এক পর্যায়ে ইংরেজরা বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অচল করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করতঃ সকল সরকারী জায়গীর ও অনুদান বন্ধ করে দেয় এবং ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে সরকারি চাকুরী-বাকুরীর সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু চিরসংগ্রামী আলেম সমাজ এতে দমবার পাত্র নয়। তারা গণ-চাঁদার নতুন পন্থা উদ্ভাবন করে বেসরকারী উদ্যোগে গড়ে তুললেন দারুল উলূম দেওবন্দ। ক্রমান্বয়ে সারাদেশে একই ধারা ও প্রক্রিয়ার উপর গড়ে উঠে হাজার হাজার ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার পাশাপাশি আযাদীর দীক্ষা দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে দেওয়া হত এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। তাদের মাধ্যমে সারাদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে স্বাধীনতার চেতনা। দারুল উলূম দেওবন্দ ও তার অনুসারী এই সব ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরবে চেতনা বিলায় স্বাধীনতার। ফলে সারাদেশে এই সব ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে দানা বেধে উঠে এক নিরব আন্দোলন। ইংরেজদের শ্যেন দৃষ্টি এড়ানোর জন্য সহায় সম্বলহীন এক অবস্থার মাঝে অগ্রসর হতে থাকে এই শিক্ষা

ব্যবস্থা। ধর্মীয় শিক্ষার কাজে নিরত এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট উলামায়ে কিরাম নেপথ্যে থেকে সারাদেশে স্বাধীনতার গণজোয়ার সৃষ্টির সুমহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। তাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব স্বাধীনতার গণজোয়ারকে তরান্বিত করে। সর্বব্যাপিয়া অসহযোগ ও অসহযোগিতা গর্জে উঠে। রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্ব গড়ে উঠে। এদেশের মানুষ আবার বুঝতে শিখে, স্বাধীনতা তাদের হারানো অধিকার, তা অবশ্যই ছিনিয়ে আনতে হবে। সর্বজনীন প্রচেষ্টায় একদিন স্বাধীনতার মুক্ত পতাকা নীল আকাশে পত পত করে উড়ে বিশ্বের দরবারে এদেশের স্বাধীনতার পয়গাম ঘোষণা করে। বলতে গেলে দারুল উলূম দেওবন্দ ও তার আদর্শ অনুসারীরাই পরাধীনতার নিকষকালো অন্ধকারাচ্ছন্ন অমানিশায় স্বাধীনতার চেরাগ জ্বালিয়েছিল। জাগিয়ে তুলেছিল এদেশের মৃতপ্রায় মানুষের মাঝে স্বাধীনতার প্রদীপ্ত চেতনা। এই শিক্ষা ধারার প্রভাবে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ময়দানেও হয়েছিল এক নবদিগন্তের অভ্যুদয়। জ্ঞান চর্চার ময়দানেও এ ধারার উলামায়ে কিরাম সৃষ্টি করেছেন এক চাঞ্চল্যকর অধ্যায়। দ্বীনের দাওয়াত ও প্রচার প্রসারে তাদের অবদান সর্বস্বীকৃত, বাতিল ও কুসংস্কার প্রতিরোধে তাদের রয়েছে একক অনবদ্য অবদান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের আধুনিক শিক্ষিতরা তো সে ইতিহাস সম্পর্কে জানেনই না, এমন কি আলেম উলামারাও সে ইতিহাস ভুলতে শুরু করেছেন। নতুন প্রজন্মের কাছে সেই ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে বেফাকুল মাদারিস আল-আরাবিয়্যাহ ইতিমধ্যেই 'তাহরীকে দেওবন্দ' নামে একটি সাবজেক্ট চালু করেছে। এ সাবজেক্টের জন্য একটি পুস্তক প্রণয়নের ব্যাপারে আমাকে হুকুম করা হয়েছিল। আমি পুস্তকটির পরিকল্পনা তৈরি করে কাজ শুরুও করে দিয়েছিলাম। কিন্তু যেহেতু ইতিহাস সম্পর্কে লিখতে হলে প্রচুর লেখাপড়ার প্রয়োজন, বিশেষ করে যারা ইতিহাসের ছাত্র নয় তাদের বেলায় জটিলতা একটু বেশী হয় বৈকি। তাছাড়া এটি ছিল প্রচলিত ইতিহাসের নেপথ্যে থেকে যাওয়া ইতিহাসের একটি ভিন্ন ধারা তুলে ধরার প্রয়াস, সেজন্য কাজটি ছিল খুবই দুরূহ। ইতিমধ্যেই আমার একান্ত সুহৃদ মাওলানা মুস্তাক আহমদ তাহরীকে দেওবন্দ নাম দিয়ে এ বিষয়ের উপর একটি পুস্তক প্রকাশ করে ফেলেন। ফলে আমার কর্ম উদ্যমে কিছুটা ভাটা পড়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার খাতা দেখতে গিয়ে উপলব্ধি করলাম যে, সেই বইটি যেহেতু অতি বিশ্লেষণধর্মী তাই তদ্দারা ছাত্ররা তেমন উপকৃত হতে পারছেনা। তাছাড়া বেফাকের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির একজন নগণ্য সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যখন তাহরীকের প্রশ্ন সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব করলাম তখন এ সমস্যাটি প্রকটরূপে ধরা পড়ে। প্রশ্ন বাড়াতে হলে তার উত্তরপত্রও প্রস্তুত করে দেওয়ার দাবী উঠে বিভিন্ন মহল থেকে। পরীক্ষার মান

বাড়ানোর জন্য প্রশ্ন বৃদ্ধির প্রস্তাবটি মেনে নিলে আমি উত্তরপত্র তৈরি করে দেওয়ার ওয়াদা করি। মালিবাগ জামিয়ায় এ বিষয়টি পড়ানোর দায়িত্ব তখন আমার উপর ছিল। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে যে আলোচনা করতাম, ছাত্ররা তা লিপিবদ্ধ করে ফেলত। তাদের এই লেখাগুলোই সামান্য পরিমার্জন করে বেফাকের অফিসে সরবরাহ করি। বিভিন্ন স্থানে এগুলোর ফটোকপি সরবরাহ করা হয়। ফলে বিভিন্ন মহল থেকে এগুলোকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য আব্দার জানিয়ে চিঠি-পত্র আসতে শুরু করে। বেফাকের মহাসচিব সাহেবও এ বিষয়ে একটি পুস্তক তৈরি করার জন্য আমাকে বিভিন্নভাবে তাড়া করছিলেন। অবশেষে এগুলোকে একটি পুস্তকাকারে পরিবেশন করার সংকল্প নিয়ে সেই পুরানো লেখাগুলো সামনে রেখে নতুন করে পুস্তকটি তৈরি করার চিন্তা করি। বিস্তর পরিমার্জন ও পরিশোধন করার এবং অনেকগুলো বিষয় নতুন করে সংযোজন করার প্রয়োজনও অনুভব করি। ফলে দীর্ঘ এক বৎসর যাবৎ শিক্ষকতার গুরু দায়িত্বের পাশাপাশি লেখার কাজ চালিয়ে যাই। এভাবে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হয়। আমার বিশ্বাস বইটি প্রচলিত ইতিহাসের বিপরীতে ইতিহাসের একটি নতুন ধারা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে এবং সাধারণ পাঠকদের কাছে আলেম উলামাদের অবদানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে। যদিও উর্দু ভাষায় এ ধরনের ইতিহাস সম্বলিত পৃথক পৃথক অনেক বই-পুস্তক রয়েছে; কিন্তু উলামায়ে কিরামের কর্মতৎপরতার উপর ধারাবাহিক কোন ইতিহাস বাংলা ভাষায় তো নেইই, উর্দু ভাষায় আছে বলেও আমার জানা নেই। যদিও আমি ইতিহাস লিখেছি বলে দাবী করছিনা, কারণ সেটা ঐতিহাসিকদেরই কাজ। তবে ইতিহাসের একটি নতুন ধারার সংক্ষিপ্ত চিত্রায়ন করার চেষ্টা করেছি এই পুস্তকে। পরবর্তীতে যদি কেউ এ বিষয়ে বিস্তারিত ইতিহাস রচনা করতে চায় তাদের জন্য এই বইটি গাইডলাইন হিসাবে কাজ করবে নিঃসন্দেহে। যেহেতু ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক হিসাবে এই বইটি তৈরি করেছি এজন্য কোনরূপ পর্যালোচনায় না গিয়ে অতি সংক্ষেপে মূল বক্তব্যের উপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছি। বলা যায় যে এটি সিন্ধুকে বিন্দুতে আবদ্ধ করার দুঃসাধ্য প্রয়াস। কেননা এর এক একটি বাক্য দ্বারা ইতিহাসের এক একটি অধ্যায়ের প্রতি ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে মাত্র। যেহেতু এর প্রত্যেকটি লেখা পৃথক পৃথকভাবে তৈরি করা হয়েছে এজন্য কোথাও কোথাও একই বিষয়ের দ্বিরুক্তি রয়ে গেছে। ছাত্রদের সুবিধার কথা চিন্তা করেই এই দ্বিরুক্তিগুলো রেখে দেওয়া হয়েছে।

বইটির পান্ডুলিপি তৈরি করে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, ইসলামী চিন্তাবিদ, দেওবন্দী চিন্তাধারার অন্যতম তরজমান, আমার প্রাণ-প্রিয় উস্তাদ, আশেকে মদনী হযরত মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ মুদ্দাজিল্লুহুর খিদমতে পেশ করি। তিনি

পান্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে বিভিন্ন স্থানে সংশোধনী প্রদানসহ কতিপয় বিষয় সংযোজনের পরামর্শ দেন। সে আলোকে পান্ডুলিপিটি পুনঃ সংশোধন করে আবার তাঁর খিদমতে পেশ করি। তিনি কষ্ট স্বীকার করে আবার পান্ডুলিপিটি পাঠ করে তাঁর মুল্যবান সময় ব্যয় করে একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁর এই অবদানের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ভাষা আমার নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর খিদমাতকে দু'জাহানে কবুল করুন। আমার এক কালের ছাত্রবন্ধু বর্তমানের সহকর্মী প্রতিভাদ্বীপ্ত তরুণ আলেম মাওলানা আব্দুল গাফফার বইটির প্রুফ দেখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমার ছোট ভাই মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম পান্ডুলিপি তৈরি করার ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। পান্ডুলিপির কোন কোন অংশ আমার নির্দেশনা অনুসারে সে তৈরিও করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে এবং যে সকল ছাত্ররা আমার বক্তৃতাগুলো সংকলন করে এই পুস্তক তৈরীর মূল প্রেরণা যোগানোর কাজ করেছে তাদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। ছাপার কাজে মিজানুর রহমান দৌড়াদৌড়ি না করলে হয়ত বইটি প্রকাশে আরো বিলম্ব হত। আমার বড় মেয়ে বুশরা সুলতানা সারার তাড়া খেয়ে লেখার কাজ নিয়ে বসতে হয়েছে। প্রুফ দেখার ব্যাপারেও আমাকে সে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। তাকেও আল্লাহ তা'আলা উত্তম জাযা দান করুন। বর্তমান এডিশনটি এ বইয়ের পঞ্চম সংস্করণ। এই সংস্করণে বইটিকে নতুন করে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বানান ও তথ্যগত ভুল সংশোধন করা হয়েছে। ছাত্রদের সুবিধার কথা চিন্তা করে শেষে (৩০১-৩০৮ পৃষ্ঠায়) একটি প্রশ্নমালা সংযোজন করে দেয়া হয়েছে। চেষ্টা সত্ত্যেও ভুল-ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নয়। সুহৃদ পাঠক ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করলে কৃতজ্ঞতার সাথে আগামী এডিশনে তা সংশোধন করে দেওয়ার ইচ্ছা রইল। আমাদের এই প্রচেষ্টা দ্বারা যদি কেউ সামান্যতম উপকৃত হয় তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। আল্লাহ আমাদের এই খিদমতকে কবুল করুন। আমীন।

আবুল ফাতাহ্

তারিখ ঃ ২০/০৩/৯৮

সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়
উলামায়ে দেওবন্দের অবদান

দেওবন্দ আন্দোলন ঃ ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান

ভূমিকা

হক ও বাতিলের লীলাক্ষেত্র এই পৃথিবী। আবহমান কাল থেকেই হক ও বাতিলের সংঘাত চলে আসছে এখানে। পরিণামে হক ও সত্যকেই সব সময় বিজয়ী ও সমুন্নত রেখেছেন আল্লাহ পাক। দ্বন্দ্বমুখর এই পৃথিবীতে হককে হক হিসাবে এবং বাতিলকে বাতিল হিসাবে চিহ্নিত করে দেওয়ার জন্য হযরত আম্বিয়া-ই-কিরামের মাধ্যমে যুগে যুগে তিনি পাঠিয়েছেন ওয়াহী-এ-ইলাহীর সুমহান এক ধারা। দিয়েছেন তাঁদের আসমানী কিতাব ও সহীফা। বস্তুত তাঁরা ছিলেন স্ব স্ব যুগের হক ও হক্কানিয়্যাতের মুর্ত প্রতীক এবং ওয়াহী-এ-ইলাহীর বাস্তব নমুনা। এই ধারার সর্বশেষ কিতাব ও পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা রূপে নাযিল হয়েছিল আল্-কুরআন। আখেরী রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শ ছিল এরই বাস্তব নমুনা। তাঁর জীবন ধারায় হয়েছিল এর যথার্থ রূপায়ণ। সুতরাং তাঁর দেওয়া ব্যাখ্যা এবং তদীয় পবিত্র সীরাত ও জীবনাদর্শের আলোকেই বুঝতে হবে আল-কুরআন। সে আলোকেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন সাহাবা-ই-কিরামের সুমহান জামা'আতকে। আর কিয়ামত পর্যন্ত আগত গোটা বিশ্বের জ্বীন ও মানব সম্প্রদায়ের জন্য তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়ে গিয়েছেন যে, হক ও হক্কানিয়্যাতের অনুসারী, সত্যপন্থী ও নাজাত প্রাপ্ত জামা'আত হবে তারাই– যারা ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিক ও সামাজিক, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রে 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' (আমি ও আমার সাহাবীরা যে পথে চলেছি)- এর আঙ্গিকে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করেছে এবং সে পথকেই সর্বোতভাবে গ্রহণ করেছে। ইসলামে এরাই পরিচিতি লাভ করেছে "আহল-ই-সুন্নাত ওয়াল জামা'আত" নামে।

হযরত সাহাবা-ই-কিরামের পবিত্র যুগ থেকে অদ্যাবধি এক জামা'আত কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে 'মা আনা 'আলাইহি ওয়া আসহাবীর' পথকে অনুসরণ করে আসছেন। এই মহান ধারার উত্তরাধিকারী আইম্মা, মুজাদ্দিদীন, ফুকাহা, মুহাদ্দিসীন ও সুলাহায়ে উম্মত অত্যন্ত বিশ্বস্ততা, বিচক্ষণতা, ঐকান্তিকতা, নিরলস সাধনা, সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে এই দ্বীনের বাস্তবায়ন, হিফাজত, ইশা'আত ও প্রচার করে গিয়েছেন। শয়তানিয়্যাতের খলচাতুরী, ফেরাউনিয়্যাতের ঔদ্ধ্যত অহংকার, নমরুদিয়্যাতের রক্তচক্ষু, কারুনিয়্যাতের মোহনীয় লোভ ও প্রলোভন কোন কিছুই তাঁদেরকে হক ও হক্কানিয়্যাত প্রতিষ্ঠার পথ থেকে সামান্যতম বিচ্যুত করতে পারেনি কোন দিন। বরং সমূহ শংকা ও প্রতিকূলতার মুখেও হক ও হক্কানিয়্যাতের পতাকাকে সমুন্নত রাখার জন্য এবং বাতিলের মূলোৎপাটনের জন্য তাঁরা জীবন বাজি রেখে আমরণ সংগ্রাম করে গিয়েছেন। অতীতের সোনালী ইতিহাস এর নিরব সাক্ষী হয়ে আছে।

প্রথম খলিফা হযরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর যুগে বাতিল যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল ঈমানী ও আমলী ইরতিদাদ তথা ধর্ম বর্জনের ব্যাপক সায়লাবী রূপ নিয়ে, তখন তিনি এগিয়ে এলেন, 'আ-ইয়ান কুছুদ দ্বীন ওয়া আনা হাই' (আমি জীবিত থাকব আর আখেরী নবী সা. নিজের দানদান শহীদ করে, পবিত্র রক্ত ঝরায়ে যে দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে গেছেন তাতে কোন রূপ ক্রুটি আসবে, ভাঙ্গন সৃষ্টি হবে- একিছুতেই হতে পারে না)- এর চেতনায় উদ্বুদ্ধ ঈমানী দৃঢ়তা নিয়ে। সকল প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাতিলের বিরুদ্ধে বজ্র কঠিন দৃঢ়তা নিয়ে।

হযরত আলী রা. এর যুগে বাতিল যখন ষড়যন্ত্রমূলক ইয়াহুদী চিন্তা ধারার ফসল রূপে রাফেজী- খারেজী নামে নতুন চেহারা নিয়ে জাহির হল এবং 'আল্লাহ ছাড়া কারো আইন মানিনা'- এই আপাতঃ মোহনীয় শ্লোগান উঠিয়ে বিভ্রান্ত করতে চাইল মুসলিম উম্মাহকে; তখন তিনি নববী আদর্শের আলোকে অর্জিত তাঁর বিজ্ঞ চেতনা ও সমৃদ্ধ প্রজ্ঞা দিয়ে করে দিলেন তাদের মুখোশ উম্মোচন এবং'কথা সত্য হলেও মতলব খারাপ' এই বস্তুনিষ্ঠ উক্তি ছুড়ে মারলেন তাদের মুখের উপর।

কাতিবে ওয়াহী হযরত মু'আবিয়া রা. এর যুগে বাতিল যখন আরব জাত্যাভিমানের রূপ পরিগ্রহ করল তখন খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. উমরী হিম্মৎ নিয়ে ইসলামী খিলাফতকে আবার গড়ে তুললেন মিনহাজ আলান নবুওয়াতের আঙ্গিকে। পরবর্তীতে একই ধারার পথ-যাত্রী হিসাবে আব্বাসীয়দের যিন্দান খানায় বিষ প্রয়োগে শহীদ করা হয় ইমাম আযম আবু হানিফা রাহ. কে। মদীনার পথে পথে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হতে হয় ইমামু দারিল হিজরাত হযরত মালিক ইবনে আনাস রাহ. কে। স্বীয় আবাস ভূমি হতে বহিস্কৃত হতে হয় ইমাম শাফেয়ী রাহ. কে।

এমনিভাবে গ্রীক দর্শনের ধ্বজা তুলে বাতিল যখন নয়া রঙে প্রতিভাত হল এবং মুক্ত বুদ্ধির শ্লোগান দিয়ে বিনষ্ট করে দিতে চাইল সর্বজন স্বীকৃত শ্বাশত ইসলামী মূল্যবোধসমূহকে, এমনকি আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করে কুরআনে কারীমকেও মাখলুক বা সৃষ্ট বলে চালিয়ে দিতে চাইল মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা তখন সমুজ্জল ঈমানী আভায় উদ্ভাসিত পাহাড়সম দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে এলেন হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.। এভাবে প্রতিযুগেই উলামায়ে কিরাম বাতিল ও অন্যায়ের প্রতিরোধে পাহাড়সম ঈমানী দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন।

ভারত বর্ষে আকবরের যুগে তার মূর্খতার সুযোগ নিয়ে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যখন ক্ষমতালোভী সম্রাটের ছত্রছায়ায় নিজেদের কুটিল চানক্য মূর্তিকে আড়াল করে হিন্দুয়ানী দর্শন-উপাদানে গঠিত দ্বীনে ইলাহীর নামে নিঃশেষ করে দিতে চাইল ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলাম ও মুসলিম উম্মাকে; তখন সেই ধারারই উত্তরাধিকারী এক মর্দে মুমিন আল্লাহর উপর পরম ভরসা নিয়ে বলিষ্ঠ ঈমানী

চেতনায় এগিয়ে এলেন, এবং ছিন্ন করে দিলেন তাদের সব ষড়যন্ত্রের জাল। ইতিহাস যাকে মুজাদ্দিদে আলফে সানী হিসাবে চিনে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভোগবাদী বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের উপর ভিত্তিকরে বাতিল যখন নিজেকে দাঁড় করাতে চাইল তখন এর মোকাবেলায় হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. নববী সুন্নার আলোকে ইসলামের সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক দিকসহ সকল বিধি-বিধানকে বিশ্লেষণ করে পেশ করলেন ইসলামী জীবন ধারা ও আন্দোলনের এক নতুন রূপরেখা এবং নব্য বাতিলকে রুখার কার্যকরী এক কর্মসূচী।

সেই চেতনায় সমৃদ্ধ 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' (আমি ও আমার সাহাবীরা যে পথে প্রতিষ্ঠিত)- এর আলোয় গড়া আহল-ই-সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সেই সংগ্রামী ধারার উত্তরাধিকার বহন করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঐতিহাসিক দারুল উলূম দেওবন্দ। ভারতীয় মুসলমানদের এক নাজুক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম অবক্ষয়ের এক ঘনায়মান অমানিশা এই ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামী প্রাতিষ্ঠানিক ধারাটির সূচনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল।

শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট ইউরোপের পুঁজিবাদী বুর্জুয়া গোষ্ঠী কাঁচামাল আহরণ ও নয়া বাজারের তালাশে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং যে কোন মূল্যে সাম্রাজ্য বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনে আদাজল খেয়ে লেগে যায়। ভাস্কো-দা-গামার নেতৃত্বে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ ভারত উপমহাদেশের রাস্তা আবিষ্কারের পর সাম্রাজ্যবাদী বুর্জুয়াদের সামনে এক নয়া দিগন্ত খুলে যায়। দলে দলে তারা এ উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে এসে ভীড় জমাতে থাকে এবং গণ বিচ্ছিন্ন ও অপরিণামদর্শী তৎকালীন রাজন্যবর্গের খেয়ালী বদান্যতায় বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন করতে থাকে। ইংরেজ বেনিয়া গোষ্ঠীও এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। শেষে একদিন ছলে, বলে, কৌশলে এবং বিশ্বাসঘাতকতার যোগ সাজশে তারা এই উপমহাদেশকে গ্রাস করে নেয়। এর ফলে এ উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুন ও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে যে কি মারাত্মক ধ্বংস নেমে আসে সে ইতিহাস সবারই জানা। উপমহাদেশের সূর্য-সন্তান বিপ্লবী চিন্তা নায়ক শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. আগত বস্তবাদী দর্শনের বিধ্বংসী সায়লাবের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই অনুমান করতে পেরে 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী'-এর আদর্শিক দিককে অক্ষুন্ন ও সমুন্নত রাখার তাকিদে কুরআন, সুন্নাহ ও আকাবিরীনে উম্মার জীবনাদর্শের নিত্তিতে যাচাই করে এক নতুন আঙ্গিকে পেশ করেছিলেন ইসলামী জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার এক অভিনব দর্শন ও অবকাঠামো এবং সর্বত্র দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য মুসলিম উম্মাহকে উপহার দিয়েছিলেন একটি বেগবান ও কার্যকরী কর্মসূচী। দিল্লীতে তখন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র ওয়ালী উল্লাহী

দর্শন ও কর্মসূচীর কেন্দ্রীয় নায়ক হযরত শাহ আব্দুল আযীয রাহ. পিতৃ প্রদত্ত কর্মসূচীর আলোকে নয়া বিপ্লবের জন্য লোক গড়ে চলছেন। তিনি যখন দেখলেন দেশ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের করতলগত, তারা দিল্লীর গণ-বিচ্ছিন্ন, অসহায়, নামে মাত্র ক্ষমতাসীন সম্রাট থেকে এই মর্মে ফরমান আদায় করে নিয়েছে যে, 'এখন থেকে বাদশাহ সালামতের রাজ্যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীরই হুকুম চলবে'। সেই দিন তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ফতওয়া ঘোষণা করলেন, 'ভারত এখন দারুল হরব (শত্রু কবলিত এলাকা) সুতরাং প্রতিটি ভারতবাসীর কর্তব্য হল একে স্বাধীন করা।' দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল এই ফত্ওয়ার ঘোষণা। শাহ ইসমাঈল শহীদ ও সৈয়দ আহমদ শহীদ রাহ. এর নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী দলে দলে জমায়েত হতে লাগল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাহাড়ের পাদদেশে। ইংরেজদের হীন চক্রান্তে, জগৎশেঠ ও রায়দুর্লভদের প্রেতাত্মাদের বিশ্বাসঘাতকতায় ঐতিহাসিক বালাকোট প্রান্তরে রক্ত আখরে লিখা হল মুক্তিপাগল স্বাধীনতাকামী মুজাহিদীনদের নাম। কিন্তু আন্দোলন চলতেই থাকে এবং ১৮৫৭ সালে এসে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতাকামী আলিমদের নেতৃত্বে তা সিপাহী বিপ্লবের রূপ পরিগ্রহ করে। এক পর্যায়ে উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জিলার থানাভবনকে কেন্দ্র করে একটি স্বাধীন এলাকা সৃষ্টি হয়। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. এর ভাবশিষ্য হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহ. কে আমীরুল মুমিনীন, কাসেম নানুতবী রাহ. কে প্রধান সেনাপতি ও হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহ. কে এর প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করে একটি স্বাধীন ইসলামী সরকারের অবকাঠামো ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কিছু সংখ্যক পদলেহী দেশীয় রাজন্যবর্গের বিশ্বাসঘাতকতায় ১৮৫৭ সালের মহান স্বাধীনতা আন্দোলন আপাতঃ ব্যর্থ হয়। সাথে সাথে স্বাধীন থানাভবন সরকারেরও পতন ঘটে। হাফেজ যামেন রাহ. শহীদ হন। অপরাপর নেতৃবৃন্দ আত্মগোপন করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে লোমহর্ষক নির্যাতনের শিকার হয় এই উপমহাদেশবাসী। লাখ লাখ আলেমকে প্রকাশ্যে জবাই করে শহীদ করা হয়। সন্ত্রাস ও ভীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং স্বাধীনতাকামী মুক্তিপাগল দেশবাসীর মনোবলকে ভেঙ্গে দেওয়ার মানসে দিনের পর দিন শহীদানদের লাশ গাছে লটকিয়ে রাখা হয়। শেরশাহী গ্রান্ড ট্রাংক রোডের কোন একটি বৃক্ষ বাকী ছিলনা যেখানে শহীদদের লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়নি। আলিম কাউকে দেখলেই তাকে নির্বিচারে হত্যা করা হত। যেখানে এই অবস্থা ছিল যে, কোন মুসলিম ঘর আলিম ছাড়া ছিল না, সেখানে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, গ্রামকে গ্রাম খুঁজেও একজন আলিম পাওয়া যেতনা। এমন কি দাফন কাফন করার মত লোক পাওয়াও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হতাশার ঘন অমানিশা ছেয়ে ফেলল এই উপমহাদেশকে।

অপর দিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা স্বাধীনতাকামী মানুষের উপর নির্যাতন চালানোর সাথে সাথে একদল পদলেহী খোশামুদে গোষ্ঠী তৈরীরও প্রয়াস পেল-

যারা সাম্রাজ্যবাদী শাসনকেই দেশবাসীর জন্য কল্যাণকর বলে প্রচারণা চালাতে থাকল। স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দানকারী আলিমদের থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তারা একদল ভণ্ড নবী ও ভাড়াটে মওলবীও খরিদ করে নেয় এবং তাদের মাধ্যমে সংগ্রামী আলিম সমাজের বিরুদ্ধে নানাহ অপপ্রচার ও কুৎসা রটনার প্রয়াসে মেতে উঠে। তাদেরকে রাসূল বিদ্বেষী, ওয়াহাবী ও কাফির বলে ফত্ওয়া খরিদ করে তা সাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। এর সাথে সাথে দেশবাসীকে আত্মকলহে জড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের গণজোয়ারকে অন্যখাতে প্রবাহিত করে ক্ষমতার টলটলায়মান আসনকে টিকিয়ে রাখার অপকৌশলে মেতে উঠে এবং বিভেদ সৃষ্টির কুটিল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। উপমহাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ সচেতন দুটো সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার আগুন উস্কে দেয়– যে আগুনে আজও পুড়ছে এদেশের শান্তিকামী নিরীহ মানুষ। এছাড়াও তারা খ্রীষ্টান মিশনারীদের মাধ্যমে দেশবাসীকে ধর্মান্তরিত করার এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী স্বামী দয়ানন্দজীর শুদ্ধি আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। ওয়াক্ফ সম্পত্তিগুলো বাজেয়াপ্ত করণের মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র তথা মাদ্রাসাগুলোকে কার্যতঃ অচল করে দেয়। ভূমিনীতিতে পাঁচশালা ও দশশালা বন্দোবস্ত নীতি প্রবর্তন করে এবং জমিদারী ক্রয়ে হিন্দুদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করে স্বাধীনতা সংগ্রামের বলিষ্ঠ শক্তি মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক দিক থেকে দেওলিয়া করে ফেলার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অবশ্য বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠী নবাব, নাইট, রায় বাহাদুর, খাঁন বাহাদুর, রায় সাহেব, খাঁন সাহেব ইত্যাদি উপাধীতে পুরস্কৃত হয়। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল যে, এদেশের স্বাধীনতা বুঝি ফিরে আসবে না আর কোন দিন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম সব যাবে ধ্বংস হয়ে। উপমহাদেশের জন্য সে ছিল এক চরম দুর্যোগের দিন।

এদিকে স্বাধীন থানাভবন সরকারের পতনের পর আন্দোলনের অন্যতম সিপাহ সালার হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. কোনক্রমে আত্মগোপন করে মক্কা শরীফে হিজরত করে যেতে সক্ষম হন। সেখান থেকে তিনি তাঁর অনুসারীদের পুনরায় সংগঠিত করার প্রয়াস নেন। কিছুদিন পর সাধারণ ক্ষমার সুবাদে হযরত কাসিম নানুতবী ও হযরত রশীদ আহম্মদ গাঙ্গুহী রহ.-এরও মুক্তভাবে কর্মক্ষেত্রে নেমে আসার সুযোগ হয়। আবার নতুন করে পরামর্শ চলে– কোন পথে আসবে এদেশের নিরীহ নির্যাতিত মানুষের কাংখিত স্বাধীনতা; মুক্তি হবে সহজতর?

অন্যদিকে স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর থাকার ফলে এবং সংগ্রাম ও যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত থাকার কারণে দীর্ঘদিন শিক্ষা দীক্ষার প্রতি ফিরে তাকানোর সুযোগ হয়নি মুসলমানদের। তদুপরি ইংরেজদের কুটিল ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে মুসলমানদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক। তদস্থলে চাপিয়ে দেয়া

বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে বিভ্রান্ত হতে শুরু করে মুসলিম যুবমানস। ফলে ভবিষ্যত বংশধরেরা বিভ্রান্ত হয়ে হারাতে থাকে হিদায়াতের পথ। বিজাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি দখল করে নিতে পারে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্থান, তাহলে যে বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যত হয়ে পড়বে আরও সঙ্গীন। অপর দিকে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতেন যারা, স্বাধীনতার সঞ্জীবনী চেতনা বিলাতেন যে আলেম সমাজ, ইংরেজদের নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়ে তাদের অনেকেই শাহাদত বরণ করেছেন। ফলে নেতৃত্বের জন্য আত্মসচেতন বলিষ্ঠ প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বের অভাব অনুভূত হয় তীব্রভাবে। এমতাবস্থায় দীর্ঘ চিন্তাভাবনা ও পরামর্শের পর আপাদতঃ স্বশস্ত্র সংগ্রামের কর্মপন্থা স্থগিত রেখে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদী বিরোধী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বলিষ্ঠ চেতনায় উজ্জীবিত এবং দ্বীনি চেতনায় উদ্দীপ্ত একদল আত্মত্যাগী সিপাহ সালার তৈরির মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে দ্বীনি ইলম ও ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুনকে সংরক্ষণ ও তার প্রচার প্রসারের সুমহান উদ্দেশ্যে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর ইঙ্গিতে, কাসেম নানুতবী রহ. এর নেতৃত্বে এবং আযাদী আন্দোলনের অগ্রসেনানী যুগশ্রেষ্ঠ বুজুর্গানেদীনদের হাতে উত্তর প্রদেশের সাহারপুর জেলার দেওবন্দ নামক ক্ষুদ্র একটি বস্তির ঐতিহাসিক ছাত্তা মসজিদের প্রাঙ্গনস্থ একটি ডালিম গাছের ছায়ায় বর্তমান বিশ্বের ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত ঐতিহাসিক দারুল উলূম দেওবন্দ-এর গোড়া পত্তন করা হয়।

মহান প্রতিষ্ঠাতারা বুঝে ছিলেন যে, আদর্শ সচেতন একদল কর্মী তৈরী করে তাদের মাধ্যমে আন্দোলনের স্রোতকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া সহজ হবে নিঃসন্দেহে। তাই চরম দৈন্যদশার মাঝেও কোনরূপ সরকারী সহযোগিতা ছাড়াই সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে এবং মুসলিম জনসাধারণের স্বতঃস্ফুর্ত দানের উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে তাঁরা গড়ে তুললেন এ প্রতিষ্ঠানটিকে। সে দিন থেকে শুরু হল আযাদী আন্দোলনের আরেক নয়া অধ্যায়। পাঠদানের পাশাপাশি আযাদীর দীক্ষাও চলতে থাকল। একটি সর্বজনীন ঐক্যের প্রক্রিয়াকে সামনে রেখে তৈরি করা হল এর তা'লীম ও তরবিয়্যতের অবকাঠামো। ফলে অল্প দিনেই এ প্রতিষ্ঠানের সুনাম-সুখ্যাতি ও সর্বজনীন আবেদন ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিক। অল্প দিনেই তৈরি হয়ে গেল এক নতুন জেহাদী কাফেলা। সুসংগঠিত হয়ে আবার তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন নয়া জেহাদে। দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে এদেশের মজলুম মানুষ ফিরে পেল তাদের বহুদিনের কাঙ্খিত স্বাধীনতা। ইসলামী শিক্ষার ময়দানে হল এক নতুন দিগন্তের অভ্যূদয়। যার ফলশ্রুতিতে আজ উপমহাদেশসহ পৃথিবীর আনাচে কানাচে গড়ে উঠেছে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- যেখান থেকে প্রতিনিয়ত বিলানো হচ্ছে ইলমে দীনের শারাবান তাহুরা। বস্তুতঃ দারুল উলূম দেওবন্দ হল একটি ইলহামী দরস্গাহ। এর প্রতিষ্ঠা, শিক্ষাধারা ও কারিকুলাম, সিলেবাস, পরিচালনা পদ্ধতি সবকিছুই

ইলহামী ছিল বলে মনে করা হয়। এমনকি এর স্থান নির্বাচন ও ইমারত নির্মাণের বিষয়গুলোও স্বপ্নযোগে নির্দেশিত।

দারুল উলূম দেওবন্দ ও তার অনুসারীরা মূলতঃ মা'আনা আলাইহি ওয়া আসহাবীর পতাকাবাহী এক কাফেলা। কেননা নবী ও সাহাবীরা যে পথে চলেছেন তার অনুসারীদেরকেই বলা হয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত। আকাবিরে দেওবন্দ সেই মত ও পথ থেকে জীবনের কোন অধ্যায়ে এক চুল পরিমাণও বিচ্যুত হননি। তারা কুরআন সুন্নাহকে গ্রহণ করেছেন রিজালুল্লাহ. তথা পূর্ব যুগীয় মনীষীগণের ব্যাখ্যার আলোকে, আবার রিজালকে গ্রহণ করেছেন কুরআন ও সুন্নার মাপকাঠিতে যাচাই করে। কুরআন সুন্নাহকে বাদ দিয়ে তারা যেমন রিজাল পুরস্তী বা ব্যক্তি পূঁজায় ডুবে যাননি। অনুরূপভাবে রিজালকে বাদ দিয়ে কুরআন সুন্নার মনগড়া ব্যাখ্যা, তা'বীল ও তাহরীফের চোরা পথেও পা বাড়ান নি। তারা বিশ্বাস করেন যে, রিজালুল্লাহ তথা পূর্বসূরি উলামা ও সুলাহায়ে উম্মতের স্বীকৃত ব্যাখ্যার আলোকে কুরআন সুন্নার অনুধাবনই হল হক্কানিয়্যাতের ভিত্তি। আর কুরআন সুন্নাহ বিরোধী জ্ঞান অথবা নিজের মনগড়া ব্যাখ্যার আলোকে কুরআন সুন্নার সমঝই হল বাতিল।

মূলতঃ দেওবন্দী মাদ্রাসাসমূহ হচ্ছে 'উম্মাতাও ওয়াসাতান' বা প্রান্তিকতা বিবর্জিত মধ্যমপন্থী উম্মত গড়ার বলিষ্ঠ কেন্দ্র। তাই এধারার অনুসারীরা যেমন আবেগ ও ইশক বিবর্জিত নজদীদের মত আবেগ ভক্তিহীন নয় অনুরূপভাবে আকল ও যুক্তি বিবর্জিত আবেগপ্রবণ ইশক্ পূঁজারী বা ওয়াজদীও নয়।

উলুম ও ফুনুনের এক সমন্বিত শিক্ষা কেন্দ্র হল এই দেওবন্দী মাদ্রাসাসমূহ। ঈমান ও আকায়েদ, নৈতিকতা ও আখলাক, দরস ও তাদরীস, তরবিয়্যত ও প্রশিক্ষণ, তাসনীফ ও তালীফ, দাওয়াত ও তাবলীগ, তাযকিয়্যাহ ও ইহসান, সংগ্রাম ও জিহাদ, রাজনীত ও অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এমনকি মানবকল্যাণের ও উসওয়ায়ে নববীর এমন কোন ক্ষেত্র নেই যা উলামায়ে দেওবন্দের নেতৃত্ব সুলভ সরব পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠেনি।

এই দেওবন্দী মাদ্রাসাসমূহ আধ্যাত্মিক রাহনুমায়ীর প্রাণকেন্দ্রও বটে। আকাবিরে দেওবন্দ হযরত কাসেম নানুতবী, ফকীহুল উম্মাহ হযরত মাওঃ রাশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওঃ আশরাফ আলী থানভী, শায়খুল আরব্ ওয়াল আযম হযরত মাওঃ হুসাইন আহমদ মদনী, মাওঃ সাঈদ আহমদ সন্দ্বীপী, মাওঃ শামসুল হক ফরিদপুরী, মাওঃ আতহার আলী, মুফতী ফয়জুল্লাহ, মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী, হযরত মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর, হযরত শায়খে বাগা হযরত শায়খে কৌড়িয়া প্রমুখ মনীষীগণসহ অসংখ্য আধ্যাত্মিক রাহবার এধারায় আবির্ভূত হয়েছেন। তাদের মেহনতের বদৌলতে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, আফ্রিকা, আমরিকা ও লন্ডনসহ পৃথিবীর বহুদেশে লক্ষ লক্ষ

আল্লাহ প্রেমিক আল্লাহর প্রেমে মত্ত হয়ে আল্লাহ আল্লাহ রবে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলছে। পান করছে ঐশী প্রেমের শারাবান তাহুরা।

বলতে গেলে দ্বীন রক্ষার এক বলিষ্ঠ দুর্গ হল এই দেওবন্দী ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ। হিফাযতে দ্বীনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে আসলাফ ও আকাবিরে দেওবন্দের সরব উপস্থিতি বিদ্যমান নেই। ইসলাম ও মুসলমানদের উপর যেখানেই আক্রমণ হয়েছে সেখানেই তারা ব্যাঘ্রের ন্যায় বজ্র কঠিন হুংকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ইসলামের দুশমনদের সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে বাতিলের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন সুস্পষ্টভাবে। বৃটিশ বেনিয়াদের কূট ষড়যন্ত্র, শিখদের চক্রান্ত, হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চানক্য চাল, শিয়া, কাদিয়ানী, বিদ'আতী বাহাঈদের ফিতনা, আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিতদের বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার ফিতনাসহ সকল ফিতনার মুকাবিলায় উলামায়ে দেওবন্দ সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। হককে হক ও বাতিলকে বাতিল হিসাবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন সুস্পষ্টভাবে। উপমহাদেশীয় মুসলিম উম্মাহর উপর উলামায়ে দেওবন্দের অবদান অপরিসীম।

সেই অবদানের ইতিহাস এক সুদীর্ঘ না লেখা ইতিহাস। আমাদের নতুন প্রজন্মতো বটেই অনেক পুরানো ঐতিহাসিকও এই শিক্ষা ব্যবস্থার ঐতিহ্যগত ধারা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও অবদানের খতিয়ান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখেন না। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের যাতাকলে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে ইতিহাসের না লেখা এই বিরাট অধ্যায়। কিন্তু দুঃখনীয় হলেও সত্য যে, ইতিহাসের ধারা পাল্টাতে যে বীর মুজাহিদরা কাজ করেছিল অতিসঙ্গোপনে আপন ভুবনে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের তল্পীবাহকদের ষড়যন্ত্রের ফলে আজ তারাই চরম ঐতিহাসিক নির্যাতনের শিকার।

যেহেতু ইতিহাসের স্বাভাবিক ধারা বেয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঐতিহাসিক দারুল উলূম দেওবন্দ, তাই আমরা ভারত বর্ষে মুসলমানদের আগমন ও মুসলিম শাসনের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করে নেওয়া প্রয়োজন মনে করছি।

প্রথম অধ্যায়

ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন ও রাজ্য বিস্তার

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীনদের যুগে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন ও ধর্ম প্রচার ঃ ভারতবর্ষের মাটিতে মানুষের আদিবাস কবে থেকে শুরু হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও সুমেটিক আর্যরা ইরান থেকে এসে এ-এলাকায় বসতি গড়ে তোললে ক্রমান্বয়ে আর্যসভ্যতাই যে এদেশের অধিবাসীদের সভ্যতায় রূপান্তরিত হয় –একথা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। আর্য হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল তখন অত্র অঞ্চলে। কিন্তু যে আদর্শবাদীতার উপর হিন্দু ধর্মের গোড়াপত্তন হয়েছিল তা ক্রমান্বয়ে অবলুপ্ত হলে এবং শ্রেণী বৈষম্যের নির্মম যাতাকলে পিষ্ঠ হয়ে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে বৌদ্ধের সাম্যের বাণী জনগণকে আকৃষ্ট করেছিল। ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধরাই এদেশের রাজ্যক্ষমতা দখল করে নেয়। ফলে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মাঝে দীর্ঘ সাম্প্রদায়িক বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কিন্তু কৃচ্ছতার যে মহৎ শিক্ষা এক কালে হিন্দুদেরকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল, কালে তার আদর্শানুসারীরা স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়। ফলে বৌদ্ধ ধর্ম তার আবেদন হারিয়ে ফেলে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এ সময় নেতিয়ে পড়া হিন্দু ধর্মের সংস্কার করে ব্রক্ষ্মণ্যবাদের গোড়াপত্তন করে। এক সময় তারা বৌদ্ধদের থেকে হৃতক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু ব্রক্ষ্মণ্যবাদের আদর্শবাদীতা বিলুপ্ত হয়ে যখন ব্রাক্ষ্মণদের ধর্মীয় শোষণের যাতাকলে পিষ্ট হল সাধারণ মানুষ, ধর্মকে পুঁজি করে যখন ব্রাক্ষ্মণরা মানুষের উপর জুলুম ও নির্যাতনে বেপরোয়া হয়ে উঠল এবং তাদের কাজে প্রতিবাদ করলে অভিশাপ দিয়ে স্ববংশে নির্মূল করার ভয় দেখিয়ে মানুষের সর্বস্ব লুটে নিয়ে সর্বশান্ত করতে শুরু করল, তখন কৃচ্ছতাসাধনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করে সুখময় সমাজ গড়ে তোলার শ্রুতিমধুর শ্লোগান নিয়ে আসল যোগীবাদ। আত্মপীড়ন ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ছিল যার মূল দীক্ষা। নারী স্পর্শ মহাপাপ বলে নারীদের থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখল এ আদর্শের অনুসারীরা নিজেদেরকে। কিন্তু প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলে এই কৃচ্ছতা বেশি দিন টিকল না। ফিৎরাতের তাড়নায় কৃচ্ছতা ভঙ্গ করতে বাধ্য হল তারা। এভাবে যুগীবাদও হারালো তার আপাত মোহনীয় শ্লোগানের আবেদন। অপরদিকে হিন্দু, বৌদ্ধ, ব্রাক্ষ্মণ ও যোগীবাদের অনুসারীদের পরস্পর বিরোধিতার ফলে গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল শ্রেণীবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক আত্মকলহ। ফলে ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। উপমহাদেশের মানুষের আদর্শিক জীবনে তখন নেমে এসেছিল এক চরম হতাশা ও অস্থিরতা। ঠিক এহেন বৈষম্য ও বর্ণভেদ পীড়িত সামাজিক পটভূমিতে সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের পয়গাম নিয়ে তাওহিদী আদর্শের কেতন উড়িয়ে ইসলাম এসেছিল এই ভূখণ্ডে। টি, এইচ, অর্নাল্ডের মতে ইসলাম

এদেশে এসেছিল যুগ যুগ ধরে লাঞ্ছিত ভাগ্যাহত মূক, মূঢ় জনগণের মুক্তির প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

আয়তনে প্রায় ইউরোপ মহাদেশের সমান, নানাদিক থেকে আকর্ষণীয়, বিচিত্র এই ভারত উপমহাদেশ। স্মরণাতীত কাল থেকে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, সিন্দু ও গঙ্গা বিধৌত অববাহিকা, পলি গঠিত উর্বর ভূমি, অসংখ্য পর্বত, ভূ-প্রকৃতির বিচিত্র গঠন, অসংখ্য মূল্যবান খনিজ ও ধাতব পদার্থ, নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য ও বহু ধরনের কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন ক্ষেত্র হিসাবে এদেশের প্রতি বিদেশীদের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হত। সুপ্রাচীন কাল থেকেই আরবদের সাথে এদেশের ব্যবসায়িক যোগাযোগ ছিল। বিভিন্ন ধরনের মসল্লা, উৎকৃষ্টমানের বস্ত্র, সুগন্ধি ও কাঁচামালের জন্য তারা এদেশে আনাগোনা করতে অহরহ।

সম্ভবত বাণিজ্যের এপথ ধরেই সর্বপ্রথম মুসলিম ধর্ম প্রচারক ও সুফী সাধকরা এদেশের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক সূত্রে যতটুকু প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে হযরত উমর রা. কর্তৃক পারস্য বিজয়ের পর উপমহাদেশীয় অঞ্চলের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি প্রসারিত হয় এবং তখন থেকেই মুসলমানরা ভারত অভিযানের চিন্তা ভাবনা শুরু করে।

অবশ্য শাসক রূপে মুসলমানদের ভারতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগ থেকেই সুফী সাধক ও ধর্ম প্রচারকদের বদৌলতে এ উপমহাদেশের মানুষের সাথে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম ইসলামের পরিচয় ঘটে। ইসলাম প্রচারক, মানব কল্যাণে উৎস্বর্গীত প্রাণ, খোদাভীরু, আওলিয়া ও দরবেশগণের সুমহান চরিত্র মাধুরী ও মানবতাবাদী কর্মকান্ডে বিমুগ্ধ হয়ে এদেশের আপামর জনসাধারণ, বিশেষ করে হিন্দুবর্ণবাদী শ্রেণী এবং বৈষম্যের যাতাকলে নিষ্পেষিত মানুষেরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ঠ হয়ে পড়েছিল এবং ইসলামের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুপম সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সন্ধান পেয়ে যথা নিয়মে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ না করলেও তাদের মানসিক সমর্থন ঝুঁকে পড়েছিল ইসলামের দিকেই।

এ কারণেই দেখা যায় যে, ধর্ম প্রচারকগণ শাসন ক্ষমতার অধিকারী না হয়েও একেক এলাকায় নিজেদের আদর্শিক প্রভাব বিস্তার করতঃ ক্রমান্বয়ে তারা মানুষকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশেষ করে উপমহাদেশের দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় তাঁদের আগমন ঘটে সর্বাগ্রে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, ঢাকার উপকূলীয় অঞ্চল, রংপুর এবং ভারতের দক্ষিণাত্যের এলাকাসমূহে, মুলতান, আহমদাবাদ, পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে এবং সিন্ধুর নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে যথা দেবল, মানসুরাহ্ খোজ্জদার একালায় তাদের বসতি গড়ে উঠেছিল ব্যাপকহারে। এ সকল এলাকায় ধর্মপ্রচার, মসজিদ ও খানকাহ্ নির্মাণ এবং ইসলামী শিক্ষাদীক্ষা বিস্তারে তাঁরা ব্যাপকহারে মনোনিবেশ করেন। তাদের খোদাভীরুতা, সৎ ও মার্জিত জীবনবোধ এবং

ন্যায়পরায়ণতায় বিমুগ্ধ হয়ে তাদের হাতে ব্যাপকহারে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। নবদীক্ষিত মুসলমানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁরা স্থায়ীভাবে এসব এলাকায় বসবাস করতে শুরু করেন।

হযরত উমর রা. কর্তৃক নিযুক্ত বাহরাইন ও ওমানের শাসনকর্তা প্রখ্যাত সাহাবী হযরত উসমান বিন আবুল আস-আস-সাকাফী রা. স্বীয় ভ্রাতা আল-হাকামকে সিন্ধুর বরুচ অঞ্চলে এবং অপর ভ্রাতা মুগীরাহ বিন আবুল আসকে দেবল অভিযানে প্রেরণ করলে তারা তথাস্থ ক্ষমতাসীনদেরকে পরাস্ত করে ভারতের সীমানায় প্রথম ইসলামের বিজয় কেতন উড্ডীন করেছিলেন। এ সময়ে আগত সাহাবীদের মাঝে যাদের নাম জানা যায় তারা হলেন– আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ ওতবান, আশইয়াম বিন্ আমর তামিমী, সোহার বিন আল্ আবদী সুহাইল বিন আদী প্রমূখ।

হযরত উসমান রা. এর শাসনামলে তৎকর্তৃক নিযুক্ত মাকরানের শাসনকর্তা উবায়দুল্লাহ বিন্ মা'মার তামিমী সিন্ধুনদ পর্যন্ত ভূ-ভাগ স্বীয় শাসনাধীন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের আবহাওয়া সৈন্য বাহিনীর অনুকূল হচ্ছেনা জানতে পেরে খলীফা সৈন্যদেরকে সম্মুখে অগ্রসর হতে নিষেধ করেন। এসময় আগত সাহাবীদের মাঝে হযরত আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ রা. এর নাম ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ৩১ হিজরী সনে সিজিস্তানের শাসক রূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সিন্ধু অঞ্চলের বহু এলাকা নিজের অধিকারে আনতে সক্ষম হন।

হযরত আলী রা. এর খিলাফত কালে ঊনচল্লিশ হিজরীর প্রথম দিকে তাঁর অনুমতি ক্রমে হারিস বিন মুররাহ আবদী নামে একজন বীর মুজাহিদ একদল স্বেচ্ছাসেবী সৈন্য নিয়ে ভারত আক্রমণ করেন এবং সিন্ধুর উত্তর পশ্চিম অঞ্চল উসমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু ৪২ হিজরীতে তিনি সিন্ধু'র কিকান নামক স্থানে প্রতিপক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সদলবলে নিহত হন।

হযরত মু'আবিয়া রা. এর যুগে প্রথমে আব্দুল্লাহ বিন সাওয়ার আবদী অতঃপর সিনান বিন্ সালামাহ হুযাইলী ভারত সীমান্তে আক্রমণ করেন। পরে ৪৪ হিজরীতে প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মদ বিন্ আবু সুফরাহ্ ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে পাঞ্জাবের লাহোর ও বান্না এলাকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ছিলেন।

হযরত মুআবিয়া রা. এর পরবর্তীকালে মুসলমানদের ঘরোয়া সমস্যার কারণে ভারতবর্ষের প্রতি খুব একটা মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু উমাইয়া বংশের আল-ওয়ালীদ সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই ইসলামের ইতিহাসে আবার একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ওয়ালীদের শাসনামলে তার প্রখ্যাত সেনাপতি মুসা বিন্ নুসাইর সমগ্র উত্তর আফ্রিকা অধিকার করে নেয়। অন্যতম সেনাধিপতি তারিক স্পেন জয় করে সেখানে ইসলামের বিজয় কেতন উড্ডীন করেন।

প্রাচ্যের দেশসমূহে কুতাইবা ইসলামের বিজয় পতাকা মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বহন করে নিয়ে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত ভারতেও মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ ভারতে মুসলমানদের ধর্ম প্রচার ও ইসলামী জ্ঞানচর্চার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে চতুর্থ হিজরী শতকে আগত প্রখ্যাত পর্যটক ইবনে হাওকাল উল্লেখ করেন যে, সাধারণতঃ মসজিদে ও খানকাহগুলোতে আলেম উলামা ও ফিকাহ সম্পর্কে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা অবস্থান করতেন, তাদের থেকে জ্ঞান আহরণকারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। যেকোন মসজিদে গেলেই দলে দলে লোকজনের আনাগোনার দৃশ্য পরিলক্ষিত হত।

পূর্ব ভারত তথা বাংলাদেশীয় অঞ্চলে মুসলমানদের শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় কুতবুদ্দীন আইবেকের সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে। অবশ্য এর বহু পূর্বেই এদেশে মুসলমানদের তৎপরতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমনকি চট্টগ্রাম অঞ্চলে তারা একটি ক্ষুদ্র শাসন ব্যবস্থাও গড়ে তুলেছিল। পরে রোসাঙ্গরাজ সুলতৈং চন্দয়-এর অভিযানে সেটি ভেঙ্গে পড়ে। এ থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলমানদের তৎপরতা কত প্রবল ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। মুসলিম ভৌগলিক ও পর্যটকরা উল্লেখ করেছেন যে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের এদিকে চট্টগ্রাম বন্দর আরব উপনিবেশে পরিণত হয় এবং আরাকান থেকে মেঘনার পূর্ববর্তী এলাকাসমূহে আরব বণিকদের কর্মতৎপরতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। রংপুরে হিজরী ২০০ সালের এদিকে মুসলিম সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। রাজশাহীতে ৭৮৬-৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি মুসলিম আমলের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, তাছাড়া বহুপ্রাচীন আউলিয়ায়ে কিরামের খানকাহ ও মাজারের নিদর্শনাবলি সেকালে এদেশে মুসলিম তৎপরতার বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করে দেয়। সে সময় মুসলমানরা সুদূর সিংহলেও তাদের কর্মতৎপরতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং একই নিয়মে তারা সেখানেও বসতি গড়ে তোলে।

বলতে গেলে মুসলিম শাসকদের আগমনের পূর্বেই সুফি সাধক ও ধর্ম প্রচারকদের তৎপরতায় এদেশে মুসলিম শাসনের অনুকূল ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছিল।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের ভারত অভিযান ঃ

উমাইয়া খলীফা প্রথম ওয়ালীদের শাসনামলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন। হাজ্জাজের শাসনাধীন এলাকার কতিপয় বিদ্রোহী আরব সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের সিন্ধু অঞ্চলে প্রবেশ করলে তথাকার শাসনকর্তা রাজা দাহির তাদেরকে আশ্রয় দেয়। হাজ্জাজ বিদ্রোহী পলাতকদের প্রত্যার্পনের দাবী জানিয়ে রাজা দাহিরের নিকট পত্র পাঠালে সে তা প্রত্যাখ্যান করে। অপর দিকে সিংহলে বাণিজ্যরত যেসব আরব বণিক সিংহলে মারা যায়, তাদের পরিবার পরিজনকে স্বদেশে পাঠানোর জন্য সিংহল রাজ ব্যবস্থা করেন এবং পূর্বাঞ্চলীয় গভর্ণর হাজ্জাজের জন্য বহু মূল্যবান উপঢৌকনসহ আটটি

জাহাজ প্রেরণ করেন। সিন্ধুর সামুদ্রিক বন্দরের নিকট তথাস্থ জলদস্যুদের দ্বারা মুসলমানদের সে আটটি জাহাজ লুণ্ঠিত হয় এবং যাত্রীদের উপর চরম নির্যাতন করতঃ তাদেরকে বন্দী করে রাখা হয়। বন্দীদের মুক্তি ও তৎসহ লুণ্ঠিত সকল সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং জলদস্যুদের শায়েস্তা করার জন্য হাজ্জাজ রাজা দাহিরের নিকট অনুরোধ জানিয়ে পত্র পাঠান। কিন্তু রাজা দাহির এতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে হাজ্জাজ রাজা দাহিরের ধৃষ্টতার সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য উবায়দুল্লাহ ও বুদাইলের নেতৃত্বে পর পর দুটি অভিযান প্রেরণ করেন। স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সপ্তদশ বর্ষীয় তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে তৃতীয় অভিযান প্রেরণ করেন।

ছয় হাজার অশ্বারোহী ও সমপরিমাণ উষ্ট্র বাহিনী সঙ্গে নিয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিম ভারত অভিমুখে রওয়ানা করেন। পথে মাকরানের অধিপতির পক্ষ থেকে আরও একদল সৈন্য তিনি সাহায্য হিসাবে পেয়ে যান। তাছাড়া হিন্দু শাসকদের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ ও বিক্ষুব্ধ জাঠ ও মেডদেরকেও তিনি তার সহযোগী হিসাবে পেয়ে যান। ৭১১-১২ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময় ইসলামী আদর্শে স্নাত এই বিশাল বাহিনী দুবাইল বন্দরে এসে পৌঁছে। ব্রাহ্মণ ও রাজপুতদের দ্বারা পরিবেষ্টিত এই নগরে হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে তুমুল লড়াই হয়। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয়ের গৌরব দান করেন। অতপর মুহাম্মদ বিন কাসিম ক্রমান্বয়ে বর্তমান হায়দারাবাদের নিকটস্থ নিরুন নগরী, সিওয়ান ও সিসাম এলাকাসমূহ দখল করে নেন। হিন্দুরা প্রাণপণে লড়াই করলেও অবশেষে তারা মুসলিম বাহিনীর হাতে পরাস্ত হয়। যুদ্ধে রাজা দাহির নিহত হয়, তার স্ত্রী ও পুত্ররা রাওয়ার নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্ধি হওয়ার গ্লানি থেকে আত্মরক্ষার জন্য সহচরীবৃন্দ সমেত আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম ব্রাহ্মণাবাদ, আলোর ও মুলতান অভিমুখেও অভিযান পরিচালনা করেন এবং বিজয়ের গৌরব নিয়ে ফিরতে সক্ষম হন। এভাবে রাজা দাহিরের সমগ্র রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয়। আল্লাহর প্রতি মুসলমানদের ঈমান ও আস্থা, উন্নত নৈতিকতা, সুষ্ঠু পরিচালনা, আক্রমণ কৌশল, রণদক্ষতা এবং ক্ষমতাসীনদের জুলুম ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ ও ইসলামের সুমহান আদর্শে বিমুগ্ধ জনতার সহযোগিতাই মুসলমানদের বিজয়ের পথকে সুগম করেছিল নিঃসন্দেহে। মুলতান বিজয়ের পর মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন কনৌজ দখলের জন্য সেনাপতি আবু হাকীমের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী প্রেরণের আয়োজন করেছিলেন, ঠিক তখনই দামেস্কের শাসনক্ষমতায় রদবদল হয়। নবনির্বাচিত উমাইয়্যা খলীফা সুলায়মান ক্ষমতায় বসেই গৌত্রিক প্রতিহিংসা বসতঃ মুহাম্মদ বিন কাসিমকে দামেস্কে তলব করে নিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পর খলীফা সুলায়মান ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবকে সিন্ধু অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ক্ষমতার রদবদলের কারণে মুহাম্মদ বিন

কাসিম কর্তৃক বিজিত অনেক এলাকাই মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়ে যায়। এদিকে ইয়াজীদ বিন মুহাল্লাব অল্প কালের মাঝে মৃত্যু বরণ করলে তাঁর ভ্রাতা হাবীব শাসনভার প্রাপ্ত হন। খলীফা হিশামের রাজত্বকালে আল-হাবীবের স্থলে জুনায়েদ (৭২৪ খ্রীঃ) শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বীরদর্পী শাসক। তাই তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজিত এলাকা পুনরুদ্ধার ও তাঁর আরাধ্য কার্য সুসম্পন্ন করার জন্য রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করেন এবং ৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝে বিপুল জনসমর্থন লাভের মধ্য দিয়ে ভারতের অনেক এলাকা জয় করেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার দুর্বল উত্তরাধীকারীদের সময় সিন্ধু অঞ্চলে মুসলমানদের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। এমনকি আল জুনায়েদের পর আরব শাসনকর্তা তামিনের রাজত্বকালে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের এদিকে মুলতান ব্যতীত ভারতের সমগ্র এলাকাই মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়ে যায়।

এসময় বিজিত এলাকাসমূহকে তৎকালের খোরাসান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হত। হিজরী দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সিন্ধুর এই অঞ্চল নিয়মিতভাবে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন থাকে। পরে এই অঞ্চল কেন্দ্রীয় শাসনমুক্ত হয়ে অনেকগুলো ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হিজরী তৃতীয় শতকের এদিকে পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজন্যবর্গের উপর্যুপরি চাপের মুখে এসকল ক্ষুদ্র রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ক্রমান্বয়ে সেখানে শিয়া মতালম্বী বাতেনিয়্যাহ সম্প্রদায়ের লোকদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে দীর্ঘদিনের জন্য ভারতীয় অঞ্চলের সাথে মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

হিজরী পঞ্চম শতকের প্রথম দিকে সুলতান মাহমুদ গজনভী কর্তৃক ভারত আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থা এভাবেই চলতে থাকে। পারস্পরিক গমনাগমনের মাধ্যমে এদেশের নওমুসলিমরা আরবীয় অঞ্চলে গিয়ে দ্বীন শিক্ষায় নিরত হয় এবং আরবীয় অঞ্চলের লোকেরা এদেশে অবস্থান করে স্বধর্মের প্রচার, ইসলামী তাহজীব তামাদ্দুন ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যায়। তাদের হাতে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এবং ইসলাম এদেশের মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসন লাভ করতে থাকে। এ সময় বহু তাবেয়ীন এদেশে এসেছিলেন আবার বহু ভারতীয় লোক সাহাবীদের সান্নিধ্য লাভ করে তাবেয়ী হওয়ার সুযোগ লাভ করে ছিলেন। যদিও প্রথম দিককার এসকল অভিযান রাজনৈতিকভাবে কোন দীর্ঘস্থায়ী সুফল বয়ে আনতে সক্ষম হয়নি, তথাপি একথা সত্য যে, এসকল অভিযান উপলক্ষে বহু সাহাবী ও তাবেয়ী এদেশে আগমন করেছিলেন। তাদের অনেকেই এদেশে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করতঃ ইসলাম ও ইলমে দ্বীনের ইশা'আতে নিরত হন। তাদের হাতে নবদীক্ষিত মুসলমানদের অনেকেই আরবীয় অঞ্চল তথা মক্কা মদীনায় গমন করে সেখান থেকে ইলমে দ্বীন অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করে কেউবা সেখানেই

থেকে গেছেন; আবার অনেকেই স্বদেশে ফিরে এসে ইসলামের প্রচার ও দ্বীনি ইলমের ইশা'আতের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাই তাবেই-তাবেঈনদের তালিকায় অনেক ভারতীয় মনীষীরও নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসাবে আবু মা'শার নজীহ সিন্ধীর নাম উল্লেখ করা যায়– যিনি সিন্ধুর অধিবাসী ছিলেন, আরবীয় অঞ্চলে গমন করে ইলমে দ্বীন তথা ইলমে হাদীস অর্জন করেন এবং আরবেই (বাগদাদে) জীবন অতিবাহিত করেন।

আব্বাসীয় খলীফাদের আমলে মুসলমানদের ভারত শাসন ঃ

৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে উমাইয়্যা খিলাফতের পতন ঘটলে আব্বাসীয়রা খিলাফত লাভ করে। আব্বাসীয় খলীফাগণ ৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দ হতে ৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সিন্ধু দেশে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন। খলীফা মানসুরের শাসনামল হতে শুরু করে খলীফা মামুনের শাসনামল পর্যন্ত কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এদেশে শাসনকর্তা নিয়োগ লাভ করতে থাকে। ৮১৩ থেকে ৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের কোন এক সময় এদেশীয় শাসনকর্তা বসর বিন দাউদ খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ব্যর্থ হলে তদস্থলে ইয়াহইয়া বিন খালিদ বার্মাকী শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইয়াহ্ইয়া তদীয় পুত্র আরমানকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে শাসনকর্তার পদকে বংশানুক্রমিক করে যান। আরমানের পর আরব্য আধিপত্যের সুস্পষ্ট কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। ৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে মুসলমানগণ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং মুলতান ও মনসুরায় পৃথক পৃথক দু'টি রাষ্ট্র গড়ে উঠে। এতে করে হিন্দুগণও শাসন কার্যে অনুপ্রবেশ করে। ফলে অনেক এলাকা পুনরায় হিন্দু শাসকদের হাতে চলে যায় এবং খন্ড খন্ড স্বাধীন রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে।

গজনী বংশের ভারত শাসন ঃ

প্রাথমিক পর্যায়ে আব্বাসীয় খলীফাগণ দাপটশালী থাকলেও পরবর্তীতে তারা খানিকটা আরামপ্রিয় হয়ে উঠেন। ফলে তাদের তুর্কী দেহরক্ষীগণ ক্রমেই তাদের উপর প্রবল হয়ে উঠে এবং খলীফাগণ তাদের নিকট খেলার বস্তুতে পরিণত হয়। শাসনকার্যে তাদের দুর্বলতার সুযোগ বুঝে দূর প্রদেশের শাসকবর্গ আপন আপন প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ফলে খিলাফতের শক্তি ক্রমেই পঙ্গু হয়ে যায়। সে সময় খোরাসান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সাসানিদগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সাসানিদ বংশের পঞ্চম রাজা আব্দুল মালিকের 'আলপতগীন' নামক একজন কৃতদাস ছিল। আলপতগীন তার প্রভূর আনুগত্যের মাধ্যমে খোরাসানের শাসনকর্তার পদে উন্নীত হন। তার প্রভূর মৃত্যুর পর সে গজনীতে উপস্থিত হয় এবং সেখানকার শাসনকর্তা আবু বকর লাইককে পরাজিত করে ৯৬২ খ্রীঃ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। সে সময় থেকেই গজনী বংশের শাসনকালের সুচনা হয়। আলপতগীন ১৪ বছর রাজত্ব করার পর তদ্বীয় সন্তান আবু ইসহাকের হাতে শাসন ভার অর্পণ করে ইন্তেকাল করেন। আবু ইসহাক অল্প কিছু দিন শাসন

কার্যের দায়িত্ব পালন করেন। ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পীরাই সিংহাসনে সমাসীন হন। কিন্তু পীরাইয়ের শাসন কার্য জনগণের নিকট মনপুত না হওয়ায় তারা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আলপতগীনের কৃতদাস 'সবুক্তগীন'কে ক্ষমতায় বসায়। সবুক্তগীন যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম এলাকায় হিন্দু রাজা জয়পাল রাজত্ব করত। সবুক্তগীন শক্তিশালী এক বাহিনী নিয়ে রাজা জয়পালের এলাকা অধিকার করার মানসে ৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ঘুজাত নামক স্থানে জয় পালের বাহিনীর মুখোমুখী হন। এতে রাজা জয়পাল পরাজিত হয়। পরে সে মুসলমানদের অগ্রগতি রোধ করার উদ্দেশ্যে আশেপাশের হিন্দু রাজাদের সহযোগিতা নিয়ে এক সম্মিলিত বাহিনী গঠন করেন। ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে এ সম্মিলিত বাহিনী সবুক্তগীনের নিকট পরাজিত হলে লামঘান ও পেশোয়ারের মধ্যবর্তী স্থানের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোও গজনী সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে। বলতে গেলে গজনী বংশের এটাই সর্বপ্রথম ভারত অধিকার। পরবর্তীতে সবুক্তগীনের কনিষ্ঠতম পুত্র সূলতান মাহমুদ গজনবী ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নিয়ে ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝে ভারতবর্ষে সর্বমোট ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন। সুলতান মাহমুদের বারংবার ভারত অভিযানে অনেকগুলো খন্ড রাজ্য গজনী সাম্রাজ্যের করতল গত হলেও একমাত্র পাঞ্জাব ব্যতীত অন্য সব এলাকাই পুনরায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং সেসব এলাকায় হিন্দু শাসকরা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠে ছিল। মাহমুদের পর দীর্ঘ একশত পঞ্চাশ বছর ধরে তার উত্তরাধীকারীগণ গজনীতে রাজত্ব করলেও তাদের মাঝে কেউই উল্লেখযোগ্য ছিল না। তারা ক্ষমতা নিয়ে নিজেদের মাঝে কলহে লিপ্ত হয়। ফলে তাদের ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে।

ঘুর বংশের ভারত শাসন ঃ

গজনীর সম্রাটদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে ঘুর বংশের সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী গজনী বংশের শেষ সুলতান খসরু মালিককে পরাজিত করে ১১৭৩ খ্রীঃ গজনীর ক্ষমতা দখল করেন। এতে করে গজনী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। মুহাম্মদ ঘুরী গজনী অধিকার করেই ভারত অভিযানে আত্মনিয়োগ করেন। সে সময়ে দিল্লী ও আজমীরে চৌহান বংশ, সিন্ধুতে সুমরা গোত্র, কনৌজে গহঢ়বাল বা রাঠোর বংশ, গুজরাটে চালূক্য বংশ, বিহার ও বাংলায় পাল ও সেন বংশ রাজত্ব করত। মুহাম্মদ ঘুরী একে একে এসব এলাকাই অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে অধিকার করে নেন। তবে বলতে গেলে ভারত অভিযানের ক্ষেত্রে তাঁর ক্রীতদাস ও সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আইবেকের সাহসিকতাই অনেকটা মূখ্য ভূমিকা রেখে ছিল। তবে এ বিজয়ের সুফল তিনি বেশি দিন ভোগ করতে পারেননি। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে খোখার বংশীয় জনৈক ব্যক্তির হাতে তিনি অত্যন্ত নির্মমভাবে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই ভ্রাতুস্পুত্র গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবর্তীতে মাহমুদের উত্তরাধীকারীগণ ক্ষমতা নিয়ে গোলযোগ সৃষ্টি করলে খাওয়ারিজমের শাহ ঘুররাজ্যে আক্রমণ করে তা অধিকার করে নেন এবং ঘুর বংশের শাসনের পতন ঘটে।

দাস বংশের ভারত শাসন ঃ

মুহাম্মদ ঘুরী যে বছর মৃত্যুবরণ করেন সেঁ বছরই তার সেনাপতি কুতুবুদ্দীন **আইবেক** দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐতিহাসিকদের ধারণায় তিনিই **হলেন** দিল্লীর প্রথম সুলতান। কুতুবুদ্দীন আইবেক প্রতিষ্ঠিত রাজ বংশ ১২৯০ **খ্রীষ্টাব্দ** পর্যন্ত দিল্লীতে রাজত্ব করেন। কুতুবুউদ্দীন আইবেক যেহেতু সুলতান **মুহাম্মদ** ঘুরীর ক্রীতদাস রূপে জীবন শুরু করে ছিলেন তাই তার প্রতিষ্ঠিত রাজ বংশকে কোন কোন ঐতিহাসিক 'দাস বংশ' নামেও আখ্যা দিয়েছেন। কুতুবুদ্দীন চার বছর দিল্লীর শাসনকার্য পরিচালনা করে ১২১০সালে নভেম্বর মাসে চৌগান বা পলো খেলতে গিয়ে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করেন। কুতুবুদ্দীনের মৃত্যুর পর আরাম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অল্প কালের মাঝেই তিনি জনগণের নিকট অপ্রিয় হয়ে উঠেন। এ সুযোগে কুতুব উদ্দীন আইবেকের জামাতা ও বাদায়ুনের শাসনকর্তা ইলতুৎমিশ ১২১১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর নিকটে এক যুদ্ধে আরাম শাহকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। সুলতান ইলতুৎমিশ ছিলেন দিল্লীর মসনদে তুর্কী বংশের দীর্ঘস্থায়ী সম্রাট। তিনি প্রায় ২৫ বছর পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনের অধিপতি ছিলেন। তিনি তার এ দীর্ঘ শাসন কালে অনেক এলাকা অধিকার করেন। তিনি ন্যায় পরায়ণতা ও উদারতার মাধ্যমে জনমনে সৎ শাসক হিসাবে স্থান করে নিয়ে ছিলেন। ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এ মহান শাসক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তার কন্যা সুলতানা রাজিয়াকে পরবর্তী সম্রাট ঘোষণা করে ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিন্তু সম্রাটের এ মনোনয়ন আমীর উমারাদের নিকট মনপুতঃ না হওয়ায় তারা সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বাদায়ূনের শাসনকর্তা রুকুন উদ্দীন ফিরোজকে বলপূর্বক দিল্লীর মসনদে বসান। কিন্তু সুলতানের অদক্ষতার সুযোগে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এবং রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাজিয়া এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিজের পক্ষে জনমত তৈরি করে এবং রুকুন উদ্দীন ফিরোজের অনুপস্থিতিতে দিল্লীর মসনদ দখল করে নেয়। পরবর্তীতে ফিরোজ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়। পিতার মৃত্যুর সাত আট মাস পর অর্থাৎ ১২৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজিয়া ক্ষমতা পুনঃদখল করে। সে ক্ষমতা লাভ করে রাজ্যে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার প্রতি মনোনিবেশ করে। নারী হয়েও সে তার বুদ্ধিমত্তা ও দুরদর্শিতার মাধ্যমে ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করে। অতঃপর ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে সুলতানা রাজিয়া ও তার স্বামী ইখতিয়ার উদ্দিন আলতুনিয়া এক হিন্দু আততায়ী কর্তৃক নিহত হয়। রাজিয়ার মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা বাহরাম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মাত্র দু'বছর শাসন কার্য পরিচালনা করেন। নিজের অযোগ্যতার দরুন সংঘবদ্ধ আমীর

দল কর্তৃক– যারা 'বান্দেগান-ই-চেহেলগান' বা চল্লিশ অভিজাত নামে পরিচিত ছিল– দিল্লীর 'শ্বেত দুর্গে' অবরুদ্ধ হয়ে নিহত হন। তার মৃত্যুর পর ১২৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিশের পৌত্র মাসুদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাসুদ দুঃশাসন ও ব্যক্তিগত দুর্বলতার কারণে সম্রাট হিসাবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হন। ফলে রাজ্যের অভিজাতগণ ১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার পিতৃব্য সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদকে সিংহাসনে বসান। সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ ছিলেন দরবেশ বা খোদাভীরু ও ন্যায় পরায়ণ শাসক। তিনি প্রায় কুড়ি বছর শাসন কার্য পরিচালনা করে ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার প্রধানমন্ত্রী ও শ্বশুর গিয়াসুদ্দীন বলবনকে তার উত্তরাধীকারী মনোনীত করে যান। ৬০ বছর বয়সে গিয়াসুদ্দীন বলবন সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজান। অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন ও বহির্শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করে তিনি রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তুর্কী সালতানাতে সুলতান ইলতুৎমিশের পর তিনি ছিলেন অপেক্ষাকৃত সফল রাষ্ট্রনায়ক। তার শাসনামলে শরীয়তের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি ও পাপাচার নিবারণ এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার এক নজীর বিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল। এ মহান রাষ্ট্রনায়ক অত্যন্ত সফলতার সাথে দীর্ঘ ২২ বছর রাজত্ব করেন। সুলতান বলবনের দুই পুত্র ছিল। শাহজাদা মুহাম্মদ ও বুগরা খান। মুহাম্মদ তার জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করায় দ্বিতীয় পুত্র বুগরা খানকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে ১২৮৭ খ্রীঃ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বুগরা খান তখন ছিলেন বঙ্গদেশের শাসনকর্তা। সালতানাতের এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে তিনি তার কর্মস্থল বঙ্গদেশে ফিরে আসেন। কাজেই বলবনের মৃত্যুর পর অভিজাতগণ বুগরা খানের ১৮ বছরের সন্তান কায়কোবাদকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু এই অল্প বয়স্ক সুলতান ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই সাম্রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দরবারীদের মাঝে তুর্কী অভিজাত সম্প্রদায় ও খিলজী আমীরগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং খিলজীগণ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠে। এদিকে বিভিন্ন অনিয়ম ও অনাচারের ফলে কায়কোবাদ পঙ্গু হয়ে পড়েন। এহেন পরিস্থিতিতে তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য তুর্কীগণ ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কায়কোবাদের তিন বছর বয়স্ক সন্তান কাইমুর্সকে সিংহাসনে বসান। এতে করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোলাটে হয়ে যায়। এই বিশৃংখলার সুযোগে খিলজী সম্প্রদায়ের নেতা ফিরোজ খিলজী রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করে অল্প বয়স্ক সুলতানকে অবরোধ করে ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে জালাল উদ্দীন ফিরোজ শাহ উপাধি গ্রহণ করে দিল্লীর সুলতান হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খিলজী বংশের ভারত শাসন ঃ

সুলতান জালাল উদ্দীন ফিরোজ শাহ ক্ষমতা গ্রহণ করায় দিল্লীর সালতানাতে তুর্কী শাসনের অবসান ঘটে এবং খিলজী সম্প্রদায়ের শাসনের সূচনা হয়। সুলতান জালাল উদ্দীন ফিরোজ শাহ প্রায় ছয় বছর শাসন কার্য পরিচালনা করেন। ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্তা স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য দাক্ষিণাত্যের কারামানিক পুরে পৌঁছলে আলাউদ্দীনের চক্রান্তে তিনি নিহত হন। জালাল উদ্দিনকে হত্যা করার পর আলাউদ্দিন খিলজী নিজেকে দিল্লীর সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেন। আলাউদ্দীন খিলজী ক্ষমতায় আরোহণ করেই মোঙ্গলদের দমন ও অর্থনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি রাজ্য সম্প্রসারণের প্রতিও মনোনিবেশ করেন। তিনি তার শাসনামলে উত্তর ভারতের গুজরাটসহ অনেক এলাকা এবং দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি, বরঙ্গল, মেবারসহ অনেক অঞ্চল দিল্লী সাম্রাজ্যের আওতাভুক্ত করেন। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী দীর্ঘ বিশ বছর অত্যন্ত দাপটের সাথে রাজ্য পরিচালনা করে ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এদিকে আলাউদ্দীনের অন্তিমকালে তাঁর মন্ত্রী মালিক কাফুর ক্ষমতা দখলের হীন লালসায় সুলতানকে তাঁর দুই সন্তান খিজির খান ও সাহদি খানকে ষড়যন্ত্রের অপরাধে কারাগারে বন্দী করতে এবং শিশু সন্তান শিহাব উদ্দীনকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করতে বাধ্য করেন। অতঃপর সুলতানের মৃত্যু হলে তার স্ত্রীকে জোর পূর্বক বিবাহ করে নিজেই শাসন কার্য চালাতে থাকেন। কিন্তু তিনি বেশী দিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারেননি। প্রাসাদের জনৈক দেহরক্ষীই তাকে হত্যা করে ফেলে। কাফুরের মৃত্যুর পর শিহাব উদ্দীনের বড় ভাই মুবারক খান তার প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিন পর মুবারক খান তার ছোট ভাই শিহাব উদ্দীনের চোখ উপড়ে ফেলে তাকে সিংহাসনচ্যুত করে ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুবারক খান সিংহাসন লাভের পর আমোদপ্রমোদে গা ভাসিয়ে দেন। এতে করে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা খসরু খান ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মুবারক খানকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু খসরু খানও অল্পকালের মাঝেই ক্ষমতার অপব্যবহার করতে শুরু করেন। ফলে অভিজাত সম্প্রদায় ক্রমেই তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। এ সুযোগে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গাজী মালিক ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে এক বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে দিল্লী আক্রমণ করেন এবং খসরু খানের শিরোচ্ছেদ করে দিল্লীর কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অধিপতি হন।

তুঘলক বংশীয় শাসন ঃ

গাজী মালিক ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই খিলজী বংশের পতন হয়। গাজী মালিক সিংহাসনে আরোহণ করে 'গিয়াস উদ্দীন তুঘলক' উপাধি গ্রহণ করেন। সুলতান গিয়াস উদ্দীন তুঘলক ৫ বছর শাসন কার্য পরিচালনা করেন। এ ৫ বছরে তিনি অনেক এলাকা দিল্লীর শাসনভুক্ত করেন। সে বিজয়ের সূত্র ধরেই বঙ্গদেশ জয় করলে তার সন্তান জুনা খান উরফে উলুঘ খান পিতার সম্বর্ধনার জন্য এক

বিরাট কাষ্ঠ গৃহ নির্মাণ করেন। ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন তুঘলক দেশে ফিরলে উক্ত গৃহের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর উলুঘ খান মুহাম্মদ বিন তুঘলক নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দীর্ঘ ২৬ বছর পর্যন্ত শাসন কার্য পরিচালনা করেন।

মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ও অসাধারণ প্রতিভাবান সুলতান। তার শাসনামলের শেষটায় কিছুটা বিদ্রোহ দেখা যায়। ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটে বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি সেখানকার বিদ্রোহ দমনের জন্য তথায় পৌঁছেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক মৃত্যুকালে কোন উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে যাননি এবং তার কোন পুত্র সন্তানও ছিল না। তাই তার মৃত্যুর পর বিশেষজ্ঞ মহলের অনুরোধে তার চাচাত ভাই ফিরুজ শাহ তুঘলক সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফিরুজ শাহ তুঘলক ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ সুলতান। তিনি তার শাসনামলে বিচার বিভাগকে ইসলামী শরীয়তের ছাঁচে গড়ে তুলে ছিলেন। তিনি প্রায় ৩৭ বছর শাসন কার্য পরিচালনা করে ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুর পর তার পৌত্র তুঘলক শাহ দ্বিতীয় গিয়াস উদ্দীন উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বসত তিনিও অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আমীর উমারাদের ষড়যন্ত্রের ফলে সিংহাসনচ্যুত হন। এ সুযোগে সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলকের কনিষ্ঠ পুত্র যুবরাজ 'মুহাম্মদ' নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ নাম ধারণ করে ১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ মাত্র চার বছর শাসন কার্য পরিচালনা করে ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মৃত্যুর পর তার পুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি কয়েক মাসের মাঝেই মৃত্যু বরণ করলে মুহাম্মদের সর্ব কনিষ্ঠপুত্র 'মাহমুদ' নাসিরুদ্দীন মাহমুদ তুঘলক' নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদের শাসনামলে রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হয় এবং দূর প্রদেশের শাসনকর্তাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ফিরুজ শাহের বংশধরদের গৃহযুদ্ধের সুযোগে তুর্কী চাঘতাই বংশের তুরঘাই এর পুত্র তৈমুর লং ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে ভারত আক্রমণ করে দিল্লী দখল করে নেয়। মাহমুদ দিল্লী হতে বিতাড়িত হন।

কিন্তু তৈমুর লং ভারত বিজয় করে মাত্র ২৫ দিন দিল্লীতে অবস্থান করার পর অসংখ্য দাসদাসী ও লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে দিল্লী ত্যাগ করেন। প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি খিজির খান কে মুলতান, লাহোর ও আশেপাশের এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে যান। কিন্তু তৈমুর লং ভারত ত্যাগ করলে নাসীর উদ্দীন পুনরায় দিল্লীতে ফিরে আসেন এবং হৃত সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। অতঃপর তিনি ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে আমীর উমারাগণ তার মন্ত্রী দৌলত খান লোদীকে সিংহাসনে বসান। মাত্র দু'বছর পর ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুর লং এর প্রতিনিধি ও মুলতানের শাসনকর্তা খিজির খান তাকে পরাজিত করে দিল্লীর মসনদ দখল করে স্ববংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

সৈয়দ বংশীয় শাসন ঃ

খিজির খান ছিলেন আরব বংশোদ্ভুত। ফলে সে নিজেকে সৈয়দ বংশীয় বলে দাবী করত। তাই তার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে সৈয়দ বংশ বলা হত। খিজির খানের ক্ষমতা দখল করাতে তুঘলক বংশীয় শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। খিজির খানের শাসনামলে অনেক অঞ্চল পুনরায় দিল্লীর শাসনভুক্ত হয়। তিনি প্রায় ৮ বছর সালতানাতের দায়িত্ব পালন করে ১৪২১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুবারক শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক ব্যক্তির হাতে নিহত হলে তার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এগার বছর শাসন কার্য পরিচালনা করার পর ১৪৪৪ খ্রীঃ নিহত হন। মুহম্মদের পর তার পুত্র আলাউদ্দিন আলম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন সৈয়দ বংশের অপেক্ষাকৃত দুর্বল সুলতান। শাসনকার্যে তার যথেষ্ট পারদর্শীতা না থাকায় ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বেচ্ছায় বাহলুল লোদীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

লোদী বংশের শাসন ঃ

ফলে দিল্লী সালতানাতে সৈয়দ বংশের শাসনের অবসান ও লোদী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাহলুল লোদী ছিলেন একজন বিচক্ষণ সুলতান। তিনি প্রায় ৩৭ বছর শাসন কার্য পরিচালনা করে ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু মুখে পতিত হন। বাহলুল লোদীর মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয় পুত্র 'নিজাম খান' সিকান্দর লোদী' নাম ধারণ করে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। সিকান্দর লোদী প্রায় ২৮ বছর শাসন কার্য পরিচালনা করে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। সিকান্দর লোদীর মৃত্যুর পর তার সন্তান ইবরাহীম লোদী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করার পর পরই রাজ্যের মাঝে ভাঙন সৃষ্টি করার জন্য দরবারীদের একটি দল তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার ছোট ভাই জালাল খান লোদীকে সিংহাসনে বসাতে চেষ্টা চালায়। ইবরাহীম লোদী এ সংবাদ অবগত হয়ে তার ভ্রাতা জালাল খানকে হত্যা করেন এবং দরবারীদের সাথে রুক্ষ ব্যবহার করতে থাকেন। ফলে দরবারীগণ ক্রমেই তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। বিশেষ করে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁন সুলতানের কঠোর রীতিনীতিতে অতিষ্ঠ হয়ে কাবুলের আমীর মোঘল বংশোদ্ভুত বাবরকে ভারত আক্রমণ করে ইবরাহীম লোদীকে উচ্ছেদ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। বাবর পূর্ব থেকেই দিল্লীর সালতানাতের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি প্রসারিত করে ওঁৎপেতে ছিল। সে এ আমন্ত্রণকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে ২১ শে এপ্রিল ভারত আক্রমণ করে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইবরাহীম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লী অধিকার করে। এতে করে দীর্ঘ তিনশত বছরেরও অধিককাল ধরে চলে আসা সুলতানী শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং দিল্লীর মসনদে মোঘলরা অধিষ্ঠিত হয়।

মোঘল শাসন ঃ

বাবরের ক্ষমতা দখলের মাঝ দিয়ে মোঘল শাসনের সূচনা হয়। বাবর মৃত্যুকালে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ূনকে দিল্লীর সিংহাসনে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। বাবরের ক্ষমতা দখলের পর ১৩ জন মোগল সম্রাট প্রায় ২৭৯ বৎসর (১৫২৬-১৮০৩) পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থেকে ভারত শাসন করে গেছেন। তাদের শাসনকালের সংক্ষিপ্ত ডাটা নিম্নে প্রদত্ত হল।

১।	বাবর	শাসনকাল	১৫২৬ ইং -	১৫৩০ ইং
২।	হুমায়ুন	”	১৫৩০ ইং	১৫৫৬ ইং
৩।	আকবর	”	১৫৫৬ ইং	১৬০৬ ইং
৪।	জাহাঙ্গীর	”	১৬০৬ ইং	১৬২৭ ইং
৫।	শাহজাহান	”	১৬২৭ ইং	১৬৫৮ ইং
৬।	আওরঙ্গঁজেব	”	১৬৫৮ ইং	১৭০৬ ইং
৭।	বাহাদুর শাহ (প্রকৃত নাম শাহ আলম) (তাকে মুয়াজ্জম শাহ বলে ও ডাকা হত)		১৭০৬ইং	১৭১২ইং
৮।	জাহান্দর শাহ	”	১৭১২ ইং	১৭১৩ ইং
৯।	ফররুখ সিয়ার	”	১৭১৩ ইং	১৭১৯ইং
১০।	মুহাম্মদ শাহ (ইনি বাহাদুর শাহের পুত্র)		১৭১৯ ইং	১৭৪৮ ইং
১১।	আহমদ শাহ	”	১৭৪৮ ইং	.... ইং
১২।	দ্বিতীয় আলমগীর	”	....	....
১৩।	শাহ আলম (দ্বিতীয়)		....	১৮০৩ ইং

শাহ আলম (দ্বিতীয়) থেকেই ইংরেজরা দিল্লীর শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। অবশ্য দিল্লী কর্তৃক শাসিত অঞ্চলের বাইরেও বেশ কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল।

উপমহাদেশে মুসলিম শাসকদের মাঝে বাদশাহ আকবরই ইসলামের ক্ষতি করেছে সবচেয়ে বেশী। ক্ষমতা লোভী এই সম্রাট সভাসদদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ‘দ্বীনে ইলাহী’ নামে একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে ইসলামের অস্তিত্ব ও আদর্শকে বিপন্ন করে ছিল মারাত্মকভাবে। তার এহেন পদক্ষেপ ভারতবর্ষে ইসলাম ও মুসলিম উম্মার অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তৃতীয় মোঘল সম্রাট আকবর ও দ্বীনে ইলাহী

১৫৫৬ ইং থেকে ১৬০৬ ইং পর্যন্ত

ভূমিকা ঃ হিমালয়ান উপমহাদেশে মধ্যযুগের ইতিহাসে মোঘল শাসনামল অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ উপমহাদেশে মোঘল সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থ্যান বলতে গেলে এক নবযুগের সূচনা করে। প্রাক মোঘল যুগে মুসলিম নৃপতিগণ সুলতানরূপে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু মোঘলদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নিজেদের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। মোঘল সম্রাটদের মাঝে বাদশাহ আকবরই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও বিতর্কিত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞশাসক, সাহসী বীর, অনন্য সাধারণ সামরিক প্রতিভা সম্পন্ন সেনাপতি ও সামরিক সংস্কারক এবং বাহ্যিক দিক বিবেচনায় শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক। তার রাজত্বকাল ছিল পঞ্চাশ বছর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ)। তবে দ্বীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন করে তিনি ইসলামের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়ের সূচনা করেন এবং মুসলিম উম্মার কাছে চির ধিকৃত হয়ে আছেন।

জন্ম ও পরিচয় ঃ ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ শতাব্দীতে আকবরের পিতা হুমায়ূন শের শাহের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ভারতবর্ষ হতে স্ত্রী হামিদা বানুসহ সিন্ধুর অমরকোর্টের হিন্দু রাজা রানা প্রসাদের রাজ্যে পলায়ন করেন। সেখানে নির্বাসিত জীবন যাপন কালে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে নভেম্বর আবুল ফাতাহ জালালুদ্দীন মুহাম্মদ আকবরের জন্ম হয়। কথিত আছে যে, আকবরের জন্মের সংবাদ পেয়ে হুমায়ূন একটি মৃগনাভী বিতরণ করে উপস্থিত আমীরদের নিকট আশা ব্যক্ত করেন যে, তার পুত্রের যশ ও সুখ্যাতি সুগন্ধি মৃগনাভীর মত যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রাথমিক জীবন ঃ পিতা হুমায়ুনের মৃত্যুকালে আকবর তার অভিভাবক বৈরাম খানের সাথে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার একটি শহরে ছিলেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর বৈরাম খানের তত্ত্বাবধানে মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে (১৪ইং ফেব্রুয়ারি ১৫৫৬) তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার পিতার অতি বিশ্বস্ত সহচর ও বন্ধু বৈরাম খান নাবালক সম্রাটের অভিভাবক নিযুক্ত হন।

অভিভাবকত্বের প্রতি আকবরের অনীহা ঃ কিশোর আকবর সিংহাসনে আরোহণ করলেও মূলতঃ সে সময়ে তার বিচক্ষণ ও দূরদর্শী অভিভাবক বৈরাম খানই সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বৈরাম খান শিয়া সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তিনি স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, পক্ষপাতিত্ব, স্বেচ্ছারিতা, জনগণের সাথে রূঢ় আচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করেন। এ সমস্ত কারণে আকবর তার অভিভাবকত্বের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন।

মূলতঃ বৈরাম খানের সহযোগিতায়ই আকবর সিংহাসন লাভ করতে সক্ষম হন। কিন্তু উপরোল্লেখিত অসুবিধাগুলির কারণে আকবর তাকে পদচ্যুত করেন। তবে ঐতিহাসিক বাদায়ূনী ও আরও অনেকের মতে মোঘল সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষায় বৈরামের অবদান অনস্বীকার্য। বাদায়ূনী বলেনঃ তাঁর জ্ঞান, উদারতা, আন্তরিকতাবোধ, মধুর ব্যবহার, আনুগত্য এবং নম্র স্বভাবের জন্য তিনি সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ একারণে আমীর-উমারাগণ ঈর্ষান্বিত হয়ে তার বিরুদ্ধে আকবরকে উস্কে দেয় এবং স্বহস্তে ক্ষমতা ভার গ্রহণের জন্য তাকে অনুপ্রাণিত করে।

আকবরের শাসন ব্যবস্থা ঃ

১. কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ঃ সম্রাট আকবর নিজে শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন। তার সময় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রতিভাবান ব্যক্তিমাত্রই রাজকার্যে উচ্চপদে স্থান পেতেন। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ তাকে 'প্রজা মঙ্গলকারী স্বৈরাচারী শাসক' বলে অভিহিত করেন। কেন্দ্রের অধীনস্থ বিভিন্ন মন্ত্রীদের দায়িত্বে নানা বিভাগ ছিল। যেমনঃ (ক) অর্থনৈতিক বিভাগ (খ) সমর, বেতন ও হিসাব বিভাগ (গ) বিচার বিভাগ (ঘ) গণচরিত্র পর্যবেক্ষণ বিভাগ (ঙ) অস্ত্র বিভাগ (চ) গুপ্তচর বিভাগ (ছ) ডাক বিভাগ ইত্যাদি।

২. প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা ঃ শাসন ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল করার জন্য আকবর তার সুবিশাল সাম্রাজ্যকে ১৫টি প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। যিনি প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন তাকে নাযিম বলা হত। আর বিচার বিভাগের জন্য প্রধান কাযী তিনি নিজে নিযুক্ত করতেন। আর অন্যান্য কাযীগণ প্রধান কাযী কর্তৃক নিযুক্ত হতেন।

রাজস্বনীতি ঃ রাজস্ব বিভাগের সংস্কারে শের শাহের অবদান অনস্বীকার্য। পরবর্তীকালে শের শাহের রাজস্ব ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে আকবর যে অর্থনৈতিক সফলতা অর্জন করেন, তা তার অসামান্য প্রতিভা ও মেধারই পরিচায়ক। তার রাজস্ব ব্যবস্থায় ভূমিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা (১) পোলাহ (যা সব সময় আবাদ হত) (২) পরৌতি (যা বৎসরের কিছু সময় পতিত রাখা হত) (৩) তেহার (যা তিন চার বৎসর পতিত থাকত) (৪) বনযার (যা বৎসরের অধিক সময় পতিত থাকত)।

রাজপূতনীতি ঃ আকবর তাঁর সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্ব ও উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে যে সব নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন; তার মাঝে রাজপুতনীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতাপশালী রাজপুতদের সমর্থন লাভের জন্য তিনি তাদের সাথে মিলনাত্মক নীতি গ্রহণ করেন এবং রাজপূতদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলেন। তাছাড়া সামরিক ও বেসামরিক উভয় বিভাগের উচ্চ পদে তাদেরকে নিয়োগ দান করেন।

একজন মুসলিম বাদশা হিসেবে কোন পথে তাকে চলতে হবে আর কোন পথ পরিহার করতে হবে এ যেন তিনি অন্ধের মতই বুঝতে সক্ষম হননি। আকবর ভাবলেন ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক অমুসলিম। বিশেষত শৌর্য বীর্যের প্রতীক রাজপুত জনগোষ্ঠীর সাহায্য ও সহযোগিতা তাঁর একান্ত প্রয়োজন। কেননা তারা মোঘল রাজবংশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। তাই শক্তিশালী রাজন্যবর্গ ও জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ এবং তাদের মেধা শ্রম রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও গঠনমূলক কাজে নিয়োগ করার জন্য রাজপুতদের সাথে তিনি যে উদারনীতি এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাই রাজপুতনীতি বলে খ্যাত।

বৈবাহিক সম্পর্ক ঃ ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর অম্বরের রাজা বিহারী মলের কন্যা যোধবাঈ এবং ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিকানীরের রাজা কল্যাণ মল এবং জয়সল মীরের রাজার কন্যাদ্বয়কেও বিবাহ করেন। তার পুত্র সেলিমকে ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুরের ভগবান দাসের কন্যার সাথে বিবাহ দেয়া হয়। এভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আকবর শক্তিশালী রাজপুত বীরদের সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা ও সম্প্রীতি লাভ করেন।

মনসবদারী প্রথা প্রবর্তন ঃ সম্রাট আকবর প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রেই আমূল সংস্কার সাধন করেন। বিশেষ করে তিনি সেনাবাহিনীকে অধিকতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গড়ে তুলেন। তিনি সেবাহিনীতে মনসবদারী প্রথা প্রবর্তন করেন। তাঁর সামরিক সংস্কারের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মনসবদারী প্রথার প্রবর্তন এবং সেনাবাহিনীর পূণর্গঠন। একথা অনস্বীকার্য যে, তিনি সামরিক কৃতিত্বের মাধ্যমে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজেতাদের অন্যতম হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন।

সাম্রাজ্য বিস্তার ও বিদ্রোহ দমন ঃ আকবর রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করে বিভিন্ন রাজ্য জয় করেন যেমন ঃ গন্ডোয়ানা, রাজপুতনা, গুজরাট, বাংলা ও সিন্ধু ইত্যাদি।

তাঁর আমলে যেসব বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে সেগুলিকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। তার মাঝে উজবেক বিদ্রোহ, বাংলা বিদ্রোহ ও মির্জা হাকিমের বিদ্রোহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আকবরের প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাস ঃ প্রথমে আকবর একজন সাদাসিধা সরল বিশ্বাসী মুসলমান ছিলেন। তিনি আলিম সমাজ, পীর বুযুর্গগণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। ইলম ও ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়াদি জানতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করতেন এবং এজন্য তিনি সপ্তাহে সাতদিনের জন্য সাতজন ইমাম নিয়োগ করে ছিলেন। হজ্জ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানদির ব্যাপারেও অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন।

আকবরের ধর্মনীতির পরিবর্তন ঃ আকবরের ধর্মনীতির পরিবর্তনের ব্যাপারে যে বিষয়টি বেশী প্রভাব বিস্তার করে তা হল ক্ষমতার অন্ধমোহ এবং ইসলাম সম্পর্কে

অজ্ঞতা। ক্ষমতার প্রতি অন্ধমোহ মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানহীন করে ফেলে।

বহুজাতিক দেশ ছিল এই ভারতবর্ষ। বিভিন্ন ধর্মমত এদেশে বিদ্যমান ছিল। ধর্মে ধর্মে বৈরিতা ও বিদ্বেষ রাজক্ষমতায় যেকোন সময় বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে এই আশংকায় আকবর শংকিত ছিলেন। আর এই আশংকা দূরীকরণের উপায় ছিল ধর্মসমূহের পারস্পরিক ব্যবধান উঠিয়ে সর্ববাদী একটি ধর্মের প্রবর্তন করা।

উল্লেখ্য এদেশে ধর্মীয় বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট বিবাদমান পরিস্থিতিকে সুশান্ত করণের আবেদন নিয়ে বহু নেতা ও নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল ইতিপূর্বেই। ভাববাদী মতাদর্শ নামের একটি দল বহু পূর্বে থেকেই এ দেশে ধর্মের ভেদাভেদ উঠিয়ে দিয়ে সব ধর্মের ভাবাদর্শের সমন্বয় ঘটিয়ে একটি সর্বজনীন ধর্মাদর্শ গড়ে তুলে সব মানুষকে একই সূত্রে গেঁথে ফেলার কাল্পনিক স্বপ্ন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিল। আকবরের সভাকবি আবুল ফযলের বাবা শেখ মুবারক ছিল ভাববাদী দর্শনের একজন বলিষ্ঠ প্রচারক। আবুল ফযলও সেই চিন্তা চেতনা নিয়েই গড়ে উঠেছিল। ভাববাদী মতাদর্শের চেতনার পক্ষে আকবরকে কাজে লাগানোর মানসে তারা অক্ষরজ্ঞানহীন সম্রাটকে একটি সর্ববাদী ধর্মের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এবং নিজেকে সকল ধর্মানুসারীদের পৌরহিত্যের আসনে অধিষ্ঠিত করে ক্ষমতার মসনদকে নিষ্কণ্টক করে তোলার জন্য এটি একটি মুক্ষম পন্থা বলে তারা তাকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সম্ভবত এই উভয়বিধ ক্ষমতা লিপ্সাই অক্ষরজ্ঞানহীন আকবরকে একটি নতুন ধর্ম সৃষ্টি করতে উৎসাহ যুগিয়েছিল। সকল ধর্মের সারবস্তু কি তা অনুধাবন করার জন্যই আকবর তাঁর দরবারে বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতদেরকে আহ্বান জানাতেন এবং তাদের থেকে প্রত্যেক ধর্মের সারবস্তু অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন। ধর্মগুরুরা আকবরের এহেন উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে না পেরে এটাকে পরধর্মের প্রতি আকবরের উদারনীতি মনে করে প্রত্যেকেই নিজ ধর্মের সারবত্তা বর্ণনা করেন মুক্ত মনে। আর এভাবেই আকবর তাঁর নিজের জ্ঞানানুসারে যে ধর্মের যে বিষয়কে ধর্মের সারবস্তু মনে করেছেন সেগুলোকে সমন্বয় করে দ্বীনে-ইলাহীর নকশা তৈরি করেন। অবশ্য অন্যান্য বিষয়ও এ ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক কারণ হিসাবে কাজ করেছে। যেমন-

১। **ভক্তি ও মাহদী আন্দোলনের প্রভাব ঃ** এ আন্দোলনের প্রচারকার্য লক্ষ্য করে ক্ষমতার পাগল আকবরের মনে এক নতুন অভিলাষ সৃষ্টি হয় যে, তিনিও একজন ধর্ম প্রবর্তক হবেন।

২। **হিন্দুদের প্রভাব ঃ** হিন্দু রাজপুতদের সাথে অবাধ উঠাবসার কারণে তিনি হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন।

আকবর নিজে ধর্মগুরু হয়ে বিভিন্ন ধর্ম থেকে কিছু কিছু নিয়মনীতি আহরণ করতঃ সেগুলোকে মিশ্রিত করে এমন একটি ধর্মমত দাঁড় করিয়েছিলেন যাতে সব

ধর্মেরই কিছু কিছু প্রথা বিদ্যমান থাকে। এতে একেশ্বরবাদী ইসলামকে বহুশ্বরবাদী ধর্মসমূহের সাথে মিশ্রিত করে এমন একটা রূপ দান করা হয়েছিল যাতে ইসলামের আকীদাহ-বিশ্বাস ও বিধি-বিধান মারাত্মকভাবে লংঘিত হয়েছিল।

দ্বীনে-ইলাহীর রীতিনীতি ঃ

দ্বীনে-ইলাহীর কতগুলো নির্ধারিত রীতিনীতি ছিল। যথাঃ

(১) এ ধর্মের কলেমা ছিল "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবারু খলীফাতুল্লাহ।"

(২) জন্মবার্ষিকী পালন এবং বিভিন্ন উৎসবে স্বধর্মীদের ভোজের আমন্ত্রণ করতে হত।

(৩) তার অনুসারীরা পরস্পর সাক্ষাৎকালে নতুন প্রথায় সম্ভাষণ করত। প্রথম ব্যক্তি বলত, "আল্লাহু আকবার" দ্বিতীয় ব্যক্তি "জাল্লা-জালালুহু" বলে প্রতি উত্তর দিত।

(৪) মদ, জুয়া, ও সুদ এ ধর্মে বৈধ ছিল।

(৫) সম্রাট আকবরকে সিজদা করা ও দাঁড়ি মুণ্ডনকে বৈধ মনে করা হত।

(৬) পর্দা প্রথাকে রহিত করা হয়েছিল এবং কেউ মুসলমান হতে পারবে না এমর্মে নির্দেশ জারী করা হয়েছিল।

(৭) কসাই, জেলে প্রভৃতি নিম্নজাতের লোকদের সাথে মেলামেশা পরিহার করার নির্দেশ ছিল।

(৮) অগ্নিকে পবিত্র মনে করা হত এবং সব ধর্মকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার বিধান ছিল।

(৯) ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ যাকাতের বিধান রহিত করা হয়েছিল।

(১০) শুকর এবং কুকুর নাপাক হওয়ার হুকুম রহিত করা হয়েছিল।

(১১) ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হজ্জব্রত পালন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

(১২) হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।

এক কথায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রথা অনুসরণ করা হত। এগুলো ছাড়াও দ্বীনে ইলাহীর অনুসারীদের জন্য আরো অনেক আচার অনুষ্ঠান রীতিনীতি পালন করতে হত। যারা এধর্মের অনুসারী ছিল তাদেরকে চারটি জিনিস যথা- ধন, জীবন, সম্মান ও ধর্ম সম্রাটের জন্য উৎসর্গ করতে হত।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বাদশাহ্ আকবরের প্রচারিত "দ্বীনে ইলাহী" -এর কারণে উপমহাদেশ থেকে সত্যিকার দ্বীন ইসলাম চিরতরে বিদায় নিতে যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর চিরন্তন নিয়মের আওতায় বাতিলের বিরুদ্ধে হক্কের পাতাকা সমুন্নত রাখার জন্য কাউকে না কাউকে পাঠিয়ে থাকেন। যেখানে ফেরাউন ছিল, সেখানে হাতে লাঠি দিয়ে পাঠিয়েছেন মুসা আ. কে, আবু জেহেল, উতবা ও শায়বার বিরুদ্ধে হিদায়াতের যাদুকরী বাণী দিয়ে পাঠালেন সরওয়ারে দু আলম সা. কে। ঠিক তেমনি আকবরের ভ্রান্ত আকীদা ও ধর্মমতকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়ার জন্য পাঠালেন হযরত শায়েখ আহমাদ সেরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহ. কে।

মুজাদ্দিদে আলফে সানীর আন্দোলন ঃ পবিত্র ইসলাম ধর্মকে রক্ষা করা ও আকবরের ভ্রান্ত ধর্মনীতি দ্বীন-ই-ইলাহীকে সমূলে উৎখাত করার জন্য শায়েখ আহমাদ সেরহিন্দ রহ. সমস্ত ভয়-ভীতি ও সমূহ বিপদকে গ্রাহ্য না করে স্বীয় অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য ইস্পাত কঠিন ঈমানী শক্তি ও মনোবল নিয়ে প্রাণপণে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি এই মরণপণ সংগ্রামে কামিয়াব হন। তাঁরই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে তদানিন্তন মুসলমানদের জীবনে ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণেই তাঁকে মুজাদ্দিদে আলফে সানী বলা হয়।

দ্বীনে ইলাহীর অসারতা ঃ

নিছক রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করার উদ্দেশ্যে হিন্দুদের অন্তর জয় করার জন্য সম্রাট আকবর সকল সীমা অতিক্রম করেছিলেন। তিনি শরীয়ত বিরোধী ও সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানী নিয়ম-প্রথা চালু করেন। এই সকল কর্মকাণ্ডকে যদিও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বলে ব্যাখ্যা করা হয়, তবুও এটা অস্বীকার করার জো নেই যে, উপমহাদেশে আকবরের এহেন কর্মকাণ্ডের পরিণতি ইসলাম ও মুসলিম উম্মার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়েছে। রাজদরবারের এহেন পদক্ষেপের ফলে সমগ্র দেশব্যাপী অস্থিরতা বিরাজ করা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। ফলে মুহাম্মদ যায়দী ফাতওয়া দেন যে, সম্রাট প্রথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন, তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব। এদিকে হিন্দু রাজা বীরবলসহ সর্বমোট আঠার জন আকবরের ধর্মমত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সম্রাটের প্রিয়পুত্র ও সেনাপতি মান-সিংহ প্রকাশ্য দরবারে এ ধর্ম অসারতা প্রমাণ করেছিলেন।

মৃত্যু ঃ ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাসের বিতর্কিত সম্রাট আকবর ইন্তেকাল করেন।

উপসংহার ঃ আকবর শাসক হিসেবে অন্যতম ছিলেন। তিনি একজন মুসলিম সম্রাট হয়েও ঐতিহ্যবাহী ইসলাম ত্যাগ করে 'দ্বীনে ইলাহী' নামে একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন। যদিও ইতিহাসে তার এ কর্মকাণ্ডকে "রাজনৈতিক দূরদর্শিতা" বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মূলত ঃ একাজের জন্যই তিনি ইতিহাসের কাল অধ্যায়ে নিক্ষেপিত হয়েছেন এবং মারাত্মক ভাবে সমালোচিত হয়েছেন।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী ও তাঁর সংস্কার আন্দোলন

১৫৬৩ ইং- ১৬২৪ ইং

বাদশাহ আকবর হতে - জাহাঙ্গীরের শাসন আমল

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহ. ১৫৬৩ খ্রীঃ মুতাবিক ৯৭১ হিঃ ১৪ই শাওয়াল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে ভারতের অঙ্গরাজ্য পাঞ্জাবের সেরহিন্দ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মূল নাম আহমদ। পিতার নাম শায়েখ আব্দুল আহাদ। পৈত্রিক দিক থেকে তিনি ফারুকী বংশের সাথে সংশ্লিষ্ট। আমীরুল মু'মেনীন হযরত ওমর ফারুক রা. ছিলেন তাঁর ২৮তম মতান্তরে ৩১ তম পূর্বপুরুষ। ধর্মীয় পরিবেশে লালিত পালিত হওয়ার ফলে বাল্যকাল থেকেই তাঁর মাঝে বিভিন্ন ধরণের আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

শিক্ষা জীবন ঃ প্রচলিত নিয়মানুযায়ী হিফজুল কুরআনের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। প্রাথমিক শিক্ষা পিতার নিকট সমাপ্ত করার পর তিনি শিয়ালকোটে গমন করেন এবং মাওলানা শাহ কামাল কাশ্মিরী রাহ. থেকে দর্শন, তর্কশাস্ত্র, কালাম শাস্ত্র ও উসূলে ফিকহের উপর গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। শায়েখ ইয়াকুব কাশ্মিরী থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন এবং মাও ঃ বাহলুল বদখ্শানী থেকে তাফসীর ও ফিকাহ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে তিনি দ্বীনের সকল বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

আধ্যাত্মিক সাধনা ঃ জাহেরী ইলমের পাশাপাশি তিনি ইলমে বাতেনী তথা আত্মশুদ্ধির দিকেও মনোনিবেশ করেন। প্রথমে তিনি স্বীয় পিতার নিকট চিশতিয়া ও কাদরিয়া তরীকায় আধ্যাত্মিক সাধনা তথা তাসাউফের চর্চা করেন। এই দুই তরিকায় পূর্ণ কামালিয়্যাত অর্জন করে যথাক্রমে শাহ সিকান্দার ও শাহ কামাল থেকে খিলাফত লাভ করেন।

১০০৭ হিজরীতে পিতার মৃত্যুর পর যখন হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে দিল্লীতে পৌছেন; তখন তৎকালীন নকশবন্দীয়া তরীকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক খাজা বাকী বিল্লাহ রহ. এর সাক্ষাত লাভ করেন। এই মহান বুজুর্গের নিকট নকশবন্দীয়া তরীকায় কঠোর সাধনা করার পর এক পর্যায়ে খেলাফত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। এভাবে মুজাদ্দিদে আলফে সানী তাসাউফের প্রতিটি অলিতে গলিতে ঘুরে তার প্রতিটি শাখায় পূর্ণ কামালিয়্যাত অর্জন করেন। তাঁর প্রখর মেধা, বুদ্ধিমত্তা, ইখলাস, নিষ্ঠা ও তেজদ্দীপ্ত চেতনার পরিচয় পেয়ে হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ রাহ. এতটাই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তার সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করে এক বন্ধুকে লেখা চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে সেরহিন্দের

এক যুবক আমার দরবারে রয়েছে, তাঁর তেজদ্বীপ্ত প্রতিভা ও গুণে আমি মুগ্ধ। হয়তোবা আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে ভারতবাসীর ভাগ্যে পরিবর্তনের সূচনা করবেন।

মুজাদ্দিদ রাহ. এর জন্ম লগ্নে ভারতের অবস্থা ঃ

ভারতীয় উপমহাদেশের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী খেয়ালী শাসক বাদশাহ আকবরের শাসনামলেই (১৫৫৬ খ্রীঃ - ১৬০৫ খ্রীঃ) শতাব্দীর এই মহান সংস্কারক (জন্ম ১৫৬৩ খ্রীঃ- মৃত্যু ঃ ১৬২৪ খ্রীঃ) ঘন অমানিশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভারতে হক ও হক্কানিয়্যাতের প্রদীপ্ত মশাল নিয়ে আবির্ভূত হন। উপমহাদেশে ইসলাম ও মুসলিম উম্মার চরম দুর্দিনে এক সংকটময় মুহূর্তেই তাঁর জন্ম। বহু ধর্মের অনুসারীদের আবাসভূমি এই ভারতে ক্ষমতার সিংহাসনকে নিষ্কণ্টক করে তোলার জন্য প্রচলিত সকল ধর্ম- উপাদান মিশ্রিত করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ধর্মের উপাদানকে প্রাধান্য দিয়ে বাদশাহ আকবর তৈরি করলেন দ্বীনে ইলাহী। যার প্রভাবে ইসলামের আক্বীদা-বিশ্বাস, বিধি-বিধান, নিয়ম-নীতি, আচার-আচরণ নিক্ষেপিত হল স্বার্থের আস্তাকুঁড়ে। ইসলামী মূল্যবোধকে বলি দেয়া হল ক্ষমতা লিপ্সার যুপকাষ্ঠে। ইরানী শিয়াদের প্রভাবে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক শিক্ষাধারা রূপান্তরিত হল গ্রিক-দর্শন ভিত্তিক শিক্ষাধারায়। স্বার্থান্বেষী দরবারী আলেমরা যখন খেয়ালী সম্রাটদের তোষামোদ ও মনোরঞ্জনে লিপ্ত, সম্রাটরা যখন ভোগ ও বিলাস ব্যসনে মত্ত, সাধারণ নাগরিকরা যখন ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত, প্রাচ্যের বাতিল মতাদর্শ ও হিন্দায়ানী দর্শনের মিশ্রণে ইসলামের আধ্যাত্মিক ধারা যখন এক অভিনব স্রোতে প্রবাহিত, বিদ'আত ও কুসংস্কারের দাপটে সুন্নাতে নববী যখন প্রায় বিলুপ্ত, হাজার বছরের ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থার প্রভাবে মুসলিম মিল্লাতের জাতীয় চেতনা ও জিহাদী অনুপ্রেরণা যখন মৃতপ্রায়, গাফলত ও গোমরাহীর আবর্তে গোটা জাতি যখন গা ভাসিয়ে দিয়েছে, গাঢ় অমানিশার অন্ধকার ও বিভীষিকায় জাতি যখন পথহারা, রাজদণ্ডের ভয়ে মানুষের উন্নত শির যখন রাজ পদতলে সিজদায় নত; এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষণে ভারতের আকাশে সত্যের সূর্য হয়ে উদিত হয়েছিলেন মুজাদ্দিদে আলফেসানী রাহ.। পিতা তাঁর জন্মের পূর্বেই স্বপ্নে দেখেছিলেন, গোটা দুনিয়া গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। হিংস্র প্রাণীরা ছিড়েঁ খুড়ে ধ্বংস করছে আশরাফুল মাখলুকাত বনী আদমকে। এহেন মুহূর্তে তাঁর বক্ষ থেকে বিচ্ছুরিত হল উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় এক আলো, তা থেকে বেরিয়ে এলো একটি কারুকার্য মণ্ডিত আসন। এক সুঠামদেহী যুবক তাতে হেলান দিয়ে বসে আছে। আর তারই নির্দেশে হত্যা করা হচ্ছে সকল জালিম, বিধর্মী ও ধর্মাদ্রোহীদের। আর কে একজন ঘোষণা করছে, 'সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত, আর মিথ্যার পতন হবেই।' যুগ শ্রেষ্ঠ কামিল শাহ কামাল কাশ্মিরী রাহ. স্বপ্নের তা'বীর করেছিলেন যে, তোমার ঔরসে এমন এক সন্তান জন্মাবে; যার হাতে সব

ধরনের ধর্মদ্রোহিতা ও অপসংস্কারের বিলুপ্তি ঘটবে। কালে তার ঔরসে সেই কাঙ্খিত সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, যাকে ইতিহাস মুজাদ্দিদে আলফে সানী নামে স্মরণ করে থাকে। বহু সত্যের সাধক, আলেম উলামা ও পীর মাশায়েখের সান্নিধ্যে এসেছিলেন আহমদ সেরহিন্দী। ফলে ইসলামের প্রকৃত রূপ সুষমা ও নববী জীবনাদর্শ অনুধাবনের সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। জ্ঞান ও আধ্যাত্ম সাধনার ধাপগুলো অতিক্রম করতঃ বাহ্যিক ও আত্মিক পূর্ণতা লাভের পর তিনি যখন ভারতীয় মুসলমানদের চলমান জীবন ধারার প্রতি চোখ খুলে তাকালেন; তখনই তাঁর দৃষ্টিতে গোমরাহীর দিকগুলো সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। উম্মতের কল্যাণ চিন্তা ও সঠিক ইসলামী মূল্যবোধের পূনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উমরী শুনিত ধারার উত্তরাধিকারী এই মহান সাধকের অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠল। অন্তরে জেগে উঠল এক বলিষ্ঠ প্রত্যয়ী চেতনা। শুরু হল জীবনের নতুন পথে তাঁর যাত্রা।

কর্ম জীবনের শুরু ঃ আগ্রায় প্রথম শিক্ষকতার দায়িত্ব নিয়ে শুরু হয় তাঁর প্রথম কর্মজীবন। এখানে অবস্থান কালে তিনি রাজকীয় অনাচারের বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং জীবনের গতিপথ নির্ধারণের জন্য তিনি একটি সূত্রও পেয়ে যান যে, রাজা ও রাজার অমাত্যবর্গের সংশোধন ছাড়া সাধারণ মানুষের এই ব্যাপক বিকৃতির সংশোধন করা খুব সহজ হবে না। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান যে, রাজা ও প্রজার সম্পর্ক হল আত্মা আর দেহের ন্যায়। সুতরাং রাজরূপী আত্মার সংশোধন হলে প্রজারূপী দেহ এমনিই সুস্থ হয়ে উঠবে।

আগ্রার শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে ফিরে যান স্বদেশ সেরহিন্দে। সেখানেও শিক্ষকতার দায়িত্ব নিতে হয়। কিন্তু শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি শুরু করেন সাধারণ মানুষের মাঝে তাঁর সংস্কারমূলক কার্যক্রম। তাঁর সময়ে যে বিষয়গুলো ইসলামী চিন্তাধারা ও মূল্যবোধকে ব্যাহত বরং কার্যতঃ স্থবির ও বিকৃত করছিল সেগুলোকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

১. আকবরের দ্বীনে ইলাহীর প্রভাবে সৃষ্ট আকীদা ও বিশ্বাসের বিকৃতি, ইসলামের বিধি-বিধান ও আইন-কানুনের পরিবর্তন, সাধারণ মানুষের মাঝে আমলী ইনহিতাত ও অধঃপতন এবং ব্যাপক নৈতিক অবক্ষয়।

২. স্বার্থান্বেষী আলেম নামধারী ব্যক্তিদের সৃষ্ট নানা ধরনের ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার। বিদ'আতে হাসানার নামে ইসলামের গণ্ডিভূত নয় এমন বহু কর্মকাণ্ডকে ইসলামের নামে চালিয়ে দেওয়ার প্রবণতা। আর সেই সব অপসংস্কারের পিছনে পড়ে সাধারণ মানুষের ক্রমান্বয়ে নববী সুন্নতের সুমহান কর্মধারা থেকে বিচ্যুতি।

৩. আধ্যাত্মবাদী সুফিদের জ্ঞান-দ্বীনতার কারণে ইসলামের নির্মল আধ্যত্মদর্শন প্রাচ্যদেশীয় বিভিন্ন ধর্মের ভ্রান্ত দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। এসকল

ভ্রান্ত দর্শন শোষণ করে ইসলামের নির্মল আত্মশুদ্ধির ধারা হারিয়ে ফেলে ছিল আপন স্বাচ্ছন্দময় গতি। আধ্যাত্মবাদ বিকৃত হয়ে সৃষ্টি হল এক নতুন ধাঁচের সুফিবাদ। ক্রমান্বয়ে এই ভ্রান্তির রন্দ্রপথে আমদানী করা হল মুহীউদ্দিন ইবনুল্ আবারীর 'ওয়াহদাতুল উজুদ" বা সর্বেশ্বরবাদী ভ্রান্ত ধারণা। (যার সার কথা ছিল সকল সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টা সন্নিহিত, স্রষ্টার পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই।) এর ফলে ইসলামের চিরন্তন আকীদা বিশ্বাসে সূচিত হল অনেক নতুন নতুন বিভ্রান্তি।

৪. ভাববাদী দর্শনের নামে আত্মপ্রকাশ করল ধর্মের ক্ষেত্রে আরেক নতুন ফিতনা। যারা মানুষকে বুঝাতে শুরু করল যে, সকল ধর্মের সারকথা একই। সুতরাং ধর্মে ধর্মে ব্যবধান উঠিয়ে দিয়ে সকলে এক ধর্মাবলম্বী হয়ে আমরা ভারত মাতার কোলে আশ্রয় নেব। তাদের মূল শ্লোগান ছিল হিন্দুদের রাম ও মুসলমানদের রহীমের মাঝে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। আকবরের ছত্রছায়ায় এ দল যথেষ্ট তৎপর হয়ে উঠে। বরং ঐতিহাসিকদের ধারণা, এরাই মূর্খ আকবরকে বিভ্রান্ত করে দ্বীনে ইলাহী প্রবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এ ফিতনা যে কি ভয়াবহ ছিল তা বলাই বাহুল্য। কারণ বহুশ্বরবাদী হিন্দুধর্ম ও একেশ্বরবাদী ইসলামকে মিশ্রিত করে কৌশলে ইসলাম ও মুসলমানদের মাঝে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটানোর এ ছিল এক চাণক্য চাল। কিন্তু তাদের বাহ্যিক শ্লোগান ছিল ধর্মে ধর্মে ব্যবধান ও বিদ্বেষ উঠিয়ে দিয়ে শান্তিময় এক সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। এই সুললিত শ্লোগানে বিভ্রান্ত হয়ে সাধারণ মানুষ সরে যাচ্ছিল সনাতন চেতনা ও বিশ্বাস থেকে। এ যে মুসলমানদের জন্য কি দুর্দিন ছিল তা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। আলেম যারা ছিলেন তাদের মধ্যে কেউ হয়ত ছিলেন স্বার্থপরতার শিকার, কেউ বা শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠার সুকৌশলী শ্লোগানের সম্মুখে কিংকর্তব্য বিমূঢ়। কেননা কিছু বলতে গেলেই তারা চিহ্নিত হয়ে যেতেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, ফিতনাবাজ হিসেবে। জুলুমাত ও অন্ধকারের চেপে বসা এ জগদ্দল পাথরকে সরিয়ে বিভ্রান্ত মানুষের জন্য ন্যায় ও সত্যের পথ তৈরি করতে এগিয়ে এলেন মুজাদ্দিদে আলফে সানী।

দ্বীনে ইলাহীর প্রভাবে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে তাঁর পদক্ষেপ ঃ

ইসলামের স্বকীয় চিন্তা ধারার আলোকে তিনি ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন ইসলামের শাশ্বত জীবন ধারাকে। তিনি উম্মতের সামনে টেনে দিলেন হক্ব ও বাতিলের পার্থক্য রেখা। চোখে আঙ্গুল দিয়ে মানুষকে দেখিয়ে দিলেন সমাজে চলমান ভ্রান্ত চিন্তা বিশ্বাসগুলো এবং বলে দিলেন, কোনটি সুন্নত, কোনটি বিদ'আত। বুঝিয়ে দিলেন সুন্নতের অনুসরণের উপকারিতা ও বিদ'আতের ভয়াবহ পরিণতি ও গোমরাহীর কথা। তিনি মানুষকে বুঝালেন, বনী আদমের উন্নতশির একমাত্র আল্লাহর সম্মুখেই নত করা যেতে পারে। অন্য কোন শক্তি বা শক্তিধরের সম্মুখে নয়। সিজদা কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য, কোন সম্রাটের বা রাজাধিরাজের নয়

(যা আকবরের শাসনামল থেকে মোঘল দরবারে প্রচলিত ছিল।) বক্তৃতা ছাড়াও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, আলেম উলামা এবং আমীর উমরাদের কাছে তিনি ব্যাপক হারে চিঠি পত্র লিখতে শুরু করেন। এসব চিঠিতে সঠিক ইসলামের ব্যাখ্যা এবং তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাওয়াতসহ বিভিন্ন ধরনের হিদায়াত, আদেশ নিষেধ ও উপদেশ থাকত। যা পরে 'মাকতুবাত শরীফ' নামে ছাপা হয়। ক্রমান্বয়ে সত্যান্বেষী মানুষের কাফেলা তাঁর পাশে এসে সমবেত হতে শুরু করে। তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও চিন্তা চেতনায় মুগ্ধ হতে থাকল সত্যসন্ধানী আলোর প্রত্যাশী মানুষ। ক্রমান্বয়ে ছড়াতে থাকল তাঁর এই চিন্তাধারার কথা, চর্চিত হল সত্যের সঠিক চেতনায় উজ্জীবিত তেজদ্দীপ্ত এই মনীষীর সুনাম সুখ্যাতি। এই মর্দে মুমিনকে কেন্দ্র করে হক্ব ও হক্বানিয়্যাতের অনুসারী মানুষের কাফেলা ভারী হতে দেখে স্বার্থান্বেষী, তোষামোদী ও চাটুকার দরবারীরা প্রমাদ গুণলেন। সম্মুখে তারা নিজেদের দুর্দিনের সুস্পষ্ট আভাস অনুভব করতে শুরু করলেন। কায়েমী স্বার্থের প্রাসাদ এই চেতনার ধাক্কায় একদিন ধ্বসে পড়বেই; সত্য একদিন সুস্পষ্ট হবেই এই আতংকে তারা শিহরিত হয়ে উদীয়মান এই সূর্যকে অংকুরেই নির্বাপিত করে দিতে চাইল।

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর যখন ক্ষমতায় আরোহণ করে (১২২৪ হিঃ) তখন মুজাদ্দিদে আলফেসানীর বয়স ৪৩ বৎসর। এ সময় তিনি তাঁর আন্দোলনকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আকবরের দ্বীনে ইলাহীর প্রভাবে ও স্বার্থান্বেষী এবং মূর্খ আলেম নামধারী ব্যক্তিদের দ্বারা সৃষ্ট বিদ'আত ও আকীদাগত বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে তিনি তখন সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখছেন। অগণিত লোক তাঁর আহ্বানের সাথে একাত্ম হয়ে তাঁর সংস্কার আন্দোলনে শরীক হচ্ছে। আল্লাহর দ্বীনকে টিকিয়ে রাখার ঈমানী তাকিদে দুর্নিবার তাদের গতি। গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে ছড়িয়ে পড়েছে এ আন্দোলনের তীব্রতা। সে সময় জাহাঙ্গীর নিজে লিখে ছিলেন 'শায়খ আহমদ নামে জনৈক ধোঁকাবাজ (নাউযুবিল্লাহ) সেরহিন্দে ধোঁকা ও প্রতারণার জাল বিস্তার করেছে। বহু অন্তসার শূন্য, জাহির পুরুস্ত, স্থুলদৃষ্টি সম্পন্ন লোক তার খপ্পরে পড়ে গেছে। প্রতিটি শহর ও পল্লীতে সে আপন মুরীদদের এক এক জনকে খলীফা বানিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। এরা ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে অন্যের তুলনায় অধিক চতুর।' জাহাঙ্গীরের এই বক্তব্য থেকে তাঁর আন্দোলনের তীব্রতার অনুমান করা যায়। এই আন্দোলনের ফলে কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলে আতংক দেখা দেয়। নিজেদের স্বার্থকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা শায়খ আহমদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে। বিভিন্ন জন বিভিন্ন অজুহাতে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপা ছিল। আপন জামাতাকে সম্রাটের পর ক্ষমতাসীন করার স্বার্থে সম্রাজ্ঞী নুরজাহান তাঁর প্রতি ক্ষেপা ছিলেন। কেননা আহমদ সেরহিন্দী ভালবাসতেন সম্রাটপুত্র শাহজাহানকে। নাচগানে মত্ত দরবারীরা অসন্তুষ্ট ছিলেন এজন্য যে, তাঁর প্রচারণার কারণে যেসব বন্ধ হবার

উপক্রম হয়েছিল। সুফীরা ক্ষেপা ছিলেন তাদের প্রচলিত ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে মুজাদ্দিদ রাহ. এর সুস্পষ্ট বক্তব্যের কারণে। শাহী দরবারের চাটুকার দরবারী আলেমরা ক্ষেপা ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর সমালোচনার কারণে।

শিয়ারা অসন্তুষ্ট ছিল তাদের ধর্মমতের অসারতা প্রমাণ করে মুজাদ্দিদ রাহ. কর্তৃক গ্রন্থ প্রণয়নের কারণে। এই রুষ্ট শ্রেণী সম্মিলিতভাবে তাকে অবদমিত ও প্রতিহত করার জন্য প্রয়াস চালায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মুজাদ্দিদ রাহ. এর এক মুরীদ হাসান আফগানীর সাথে অপর মুরিদানের একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে সে জন্য সে মুজাদ্দিদ সাহেবকে দায়ী করে এবং উল্লেখিত রুষ্ট শ্রেণীর সাথে একত্রিত হয়ে মুজাদ্দিদ রাহ. এর একটি লেখাকে বিকৃত করে তৎকালীন ভারতের প্রখ্যাত আলেম-উলমাদের কাছে প্রেরণ করে তাঁর সম্পর্কে কুফরী ফতুয়া সংগ্রহ করে। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল হক দেহলভী রহ. এর ফতওয়ার কারণে সম্রাট বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন। তারা সম্রাটকে এও বুঝাতে শুরু করে যে, সেরহিন্দের সেই যুবক বড়ই অহংকারী। সম্রাটের চিন্তাধারার সে একজন ঘোর সমালোচক। সে সম্রাটের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। সে এতটাই দাম্ভিক যে, কারো মতামতের তোয়াক্কা করে না। এমন কি সে এও প্রচার করে যে, সম্রাটকে সিজদা করা বৈধ নয়। সম্রাটের যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে তাকে একবার দরবারে ডাকিয়ে দেখতে পারেন। তাছাড়া তাকে কেন্দ্র করে নতুন চিন্তা-চেতনার আলোকে যে নতুন আন্দোলন গজিয়ে উঠছে তা জাহাপনার সিংহাসনের জন্য আশঙ্কাজনক বলে মনে করা হচ্ছে।

আকবরের চিন্তা-চেতনার উত্তরাধিকারী জাহাঙ্গীর কেবল যে পিতার আদর্শকে অক্ষুন্নভাবে টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন তাই নয় বরং ক্ষেত্র বিশেষে তিনি আকবরকেও ডিঙ্গিয়ে গিয়ে ছিলেন। ইউরোপিয়ান ও খৃষ্টানদের প্রতি তার অতিআসক্তিই পরবর্তীকালে ভারতের পরাধীনতার দ্বার খুলে দেয়। এমনি আরও বহুতর অনাচারের জন্মদাতা জাহাঙ্গীর দরবারীদের উস্কানীতে বিভ্রান্ত হন এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন শেখ আহমদের বিরুদ্ধে। কেন মানুষকে এভাবে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে এবং বিভ্রান্ত করা হচ্ছে তার কৈফিয়ত চেয়ে দরবারে ডেকে পাঠান তাঁকে। তেজদ্বীপ্ত এই সংগ্রামী পুরুষ এসে হাযির হলেন দরবারে। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে প্রচলিত সম্রাটকে সিজদা করার শিরকী প্রথা ও নানারূপ অন্যায় অবিচারে কলুষিত মোঘল দরবারের অশুভ পরিবেশকে প্রকম্পিত করে উন্নত মস্তকে প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে জিহাদ হিসাবে সুন্নত তরীকায় 'আসসালামু আলাইকুম' বলে তিনি অভিবাদন জানালেন সম্রাটকে। এই অভিবাদন দরবারীদের ষড়যন্ত্রে তাঁর জন্য এক মহা দণ্ডের শাস্তি বয়ে আনল। আর তার সাথে তৈরি করল সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট।

সম্রাট তাঁকে বন্দী করে পাঠিয়ে দিলেন গোয়ালিয়র দুর্গে এবং তাঁর সব সহায় সম্পদ করা হল বাজেয়াপ্ত। কিন্তু ঐশী চেতনায় প্রদীপ্ত প্রাণকে জেল জুলুম ও

হত্যার ভয় দেখিয়ে অবদমিত করা যায় না। চেতনার বহ্নিকে রোধ করা যায় না কারারুদ্ধ করেও। সম্রাটের ক্রোধ, দরবারীদের আক্রোশ, দুর্গের প্রস্তর প্রাচীর ঘেরা অন্ধকার প্রকোষ্ঠের বন্দিত্ব কোন কিছুই অবদমিত করতে পারল না মুজাদ্দিদে আলফে সানীকে। তিনি দুর্গে বন্দী অন্যান্য লোকদের মাঝে প্রচার করতে শুরু করলেন ইসলামের অমিয়বাণী। ইসলামের সঠিক ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার কথা ব্যাখ্যা করে বুঝালেন তাদেরকে। তাঁর কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক বলিষ্ঠ উপস্থাপনা ও চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে কয়েদী তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করতঃ সংস্কারবাদী এই চেতনার দীক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করল। চোর, ডাকাত, ব্যভিচারাসক্ত, মদ্যপ, ঘাতক, খুনী লুটেরা সব ধরনের কয়েদী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে অল্পদিনেই পাল্টিয়ে ফেলল জীবনের গতিধারা। জিন্দানখানা পরিণত হল ইবাদাত খানায়। তাঁকে জেলে বন্দী করার কারণে সারা দেশে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং তাকে মুক্ত করার জন্য শুরু হয় দুর্বার আন্দোলন। দু'বছর কেটে গেল জিন্দান খানায়।

দুর্গপতি সম্রাটকে লিখে পাঠালেন, 'নবাগত এই বন্দীর প্রভাবে এখানকার পশুগুলো মানুষে আর মানুষগুলো ফেরেশতায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে।' রিপোর্ট পাঠে সম্রাট ঘাবড়ে গেলেন, অভিভূতও হলেন এবং সাথে সাথেই তাঁকে মুক্তি দিয়ে সসম্মানে দিল্লী নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। যুবরাজ শাহজাহানকে পাঠানো হল তাঁকে সংবর্ধনা দিয়ে এগিয়ে আনার জন্য। দরবারে পৌঁছলে সম্রাট নিজেই তাঁকে স্বাগত জানালেন। কিন্তু পূর্বের ন্যায় আবারও সিজদা কিংবা কুর্ণিশের পরিবর্তে শেখ আহমদের তেজদীপ্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হল 'আসসালামু আলাইকুম'। রাজ অতিথি হিসাবে দরবারে আসার এ সুযোগকে তিনি কাজে লাগালেন তাঁর সংস্কার আন্দোলনের পক্ষে। সম্রাটের সঙ্গে তিনি মতবিনিময় করলেন এবং তিনি সম্রাটকে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সকল অনাচারের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিলেন। তিনি দাবী জানালেন ইসলামের কল্যাণে সম্রাটকে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়াদি আঞ্জাম দিতে হবে।

(১) সম্রাটকে সিজাদ করার রীতি সম্পূর্ণরূপে রহিত করতে হবে।

(২) মুসলমানদের গরু জবাই করার অনুমতি দিতে হবে।

(৩) বাদশাহ ও তাঁর সভাসদদেরকে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতে হবে।

(৪) শরইয়্যাহ বিভাগ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতঃ কাজীর পদ পুনঃ বহাল করতে হবে

(৫) সকল প্রকার বিদ'আত ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

(৬) ইসলাম বহির্ভূত সকল আইন রহিত করতে হবে।

(৭) ভগ্ন ও বিধ্বস্ত মসজিদসমূহ পুনঃ সংস্কার করত ঃ সেগুলো আবাদ করতে হবে। সম্রাট তাঁর এসব দাবী মেনে নিয়েছিলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে এ মর্মে

শাহী ফরমানও জারী করেছিলেন। এটা ছিল মুজাদ্দিদ রহ. এর সফলতার এক বিরাট মাইলফলক। এক্ষেত্রে মুজাদ্দিদে আলফেসানীর মূল দর্শন ছিল সম্রাট পরিবর্তনের মাঝে সফলতা নেই; যদি না সম্রাটের মন মানসিকতার পরিবর্তন হয়। তাই তিনি সম্রাট বদলের আন্দোলনের পথে অগ্রসর না হয়ে সম্রাট ও তার সভাসদদের মানসিকতার পরিবর্তন করে দেওয়ার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন।

সম্রাট তাঁর অভিনব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হলেও এবং তাঁর দাবী দাওয়া মেনে নিলেও দরবারীদের তাঁর প্রতি যে আক্রোশ ছিল, তারা তা কাজে লাগালেন অপকৌশলের মাধ্যমে। তারা সম্রাটকে বুঝালেন যে, এ লোকটির প্রতি যে ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে তাতে সে যে কোন সময় সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসতে পারে। অতএব তাকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে দেওয়া যায় না। ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতাচ্যুতির যে স্বভাবজাত আশঙ্কা থাকে সেই আশঙ্কায় দরবারীদের কুট কুমন্ত্রণাকে যুক্তিযুক্ত মনে করলেন সম্রাট। ফলে গোয়ালিয়র দুর্গের বন্দী জীবনের অবসান হলেও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার মুজাদ্দিদে আলফেসানী পেলেন না। তাঁকে রাজ অতিথির সম্মানে সেনা ছাউনীতে নজরবন্দী করে রাখা হল। কিন্তু আল্লাহ প্রেমের অনির্বাণ চিতায় যে প্রাণ বিদগ্ধ তাকে যে অবস্থায় রাখা হউক না কেন সে অবস্থাতেই তিনি খুশি এবং সকল অবস্থায়ই তার অন্তর থেকে উৎসারিত হবে আল্লাহ প্রেমের অমিয় সুধা যা দ্বারা উপকৃত হবে কুল মাখলুকাত।

নজরবন্দী জীবনেও মুজাদ্দিদ রাহ. তাঁর কর্মচেতনা ও মিশনের কথা ভুলে রইলেন না, বরং তিনি যা করতে চান; আল্লাহ যেন নিজ হাতেই তাঁর জন্য সে সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেন। প্রতিদিন বাদশার সাথে বৈঠক হত তাঁর। আলাপাচ্ছলে ইসলামের চিন্তা চেতনা, মূল্যবোধ, নিয়মনীতি, আচার অনুষ্ঠান, আত্মদর্শন এমনকি সুফিবাদের জটিল বিষয়গুলোও তিনি তুলে ধরতেন সম্রাটের কাছে। স্বীয়পুত্রের নিকট লেখা এক পত্রে তিনি এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এভাবে যে, "এখানকার অবস্থা সন্তোষজনক। কারণ বিচিত্র ধরনের মানুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ হচ্ছে। আল হামদু লিল্লাহ। এই মেলা মেশার সময় দ্বীনি বিষয়াসয় ও ইসলামী বিধি বিধান নিয়ে বাদশার সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা হচ্ছে তাতে বিন্দুমাত্র প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে না এবং লৌকিকতার ভাষাও ব্যবহৃত হচ্ছে না বরং ব্যক্তিগত একান্ত আলাপচারিতায় যে ভাষা ব্যবহার করা হয় সে ভাষাতেই আলোচনা হচ্ছে। এক এক বৈঠকে যে সব আলোচনা করা হয় তার বর্ণনা দিতে গেলে একটি বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে। অদ্য ১৭ই রমজান রাতে আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য, ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের বিধি-বিধান, শরীয়তের বোধগম্যতা কেবল জ্ঞান ও আকলের উপর নির্ভরশীল নয় বরং আখেরাতের বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল, তাছাড়া আল্লাহর দীদার, নবুওয়্যতের সমাপ্তি, প্রত্যেক যুগের মুজাদ্দিদ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণের

প্রয়োজনীয়তা, তারাবীহ নামাজের সুন্নত হওয়া, জন্মান্তরবাদের অসারতা, জ্বীন-পরী ও শাস্তি-পুরস্কার ইত্যাদি বহু বিষয়ে অত্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সবাই খুব ধৈর্য সহকারে এসব শুনছে। কুতুঁব, ওয়ালী, আবদাল-এর বৈশিষ্ট্য নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আলহামদুল্লিল্লাহ! আমার বিশ্বাস যথা পাত্রেই এসব আলোচনা হচ্ছে।"

এই নজরবন্দী থাকাকালে সেনাপ্রধান ও দরবারের আমির উমারাদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ ঘটে। তাঁর আদর্শ ও চরিত্র মাধুরিমায় মুগ্ধ হয়ে তাঁরা তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। তিনি তাদেরকে আপন মতে দীক্ষিত করেন। এদের প্রত্যেকেই জাহাঙ্গীরের দরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন ছিলেন। অবশ্য এদের অনেকে পূর্ব থেকেই মুজাদ্দিদ সাহেবের ভক্ত ছিলেন। শেখ ফরিদ নামে একজন উচ্চ পদস্থ দরবারী অনেক পূর্ব থেকেই মুজাদ্দিদ সাহেবের মুরীদ ছিলেন। জাহাঙ্গীর ক্ষমতায় সমাসীন হওয়ার পর পরই মুজাদ্দিদ রহ. তাকে যে দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন; তাতে তিনি বাদশাকে বুঝিয়ে প্রকৃত ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনার জোর প্রচেষ্টা চালানোর জন্য তাকে ভীষণভাবে তাকিদ করেন। সম্ভবত শেখ ফরীদের মাধ্যমে দরবারের অপরাপরদের পর্যন্ত মুজাদ্দিদ রহ. এর পরিচিতি সম্প্রসারিত হয় এবং মুজাদ্দিদ রহ. এর ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেন।

বস্তুতঃ রাজার পরিবর্তন না করে রাজা ও রাজদরবারের সভাসদদের চিন্তাচেতনাকে পরির্বতন করে প্রকৃত ইসলাম অভিমুখী করে দেওয়ার যে সূক্ষ্ম কৌশল নিয়ে তিনি তাঁর মিশন পরিচালনা করেছিলেন; তাতে তিনি এতটাই সফল হয়েছিলেন যে, বাদশাহ আওরঙ্গজেব পর্যন্ত রাজা ও রাজকর্মচারীরা নকশেবন্দীয়া তরীকার মুরীদ ছিলেন।

আকবরের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে রাজা ও রাজ দরবারের সদস্যবর্গের মাঝে ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে যে অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছিল, তা তিনি সংস্কার করতে সক্ষম হন এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলাম বিরোধী যে সব কার্যকলাপ ও অপবিশ্বাস চালু হয়েছিল তিনি তা রহিত করতে সমর্থ হন।

বিদ'আত ও কুসংস্কার উচ্ছেদে তাঁর অভিযান ঃ

কুসংস্কার ও বিদ'আত উচ্ছেদের ক্ষেত্রে তিনি যে মূলনীতি গ্রহণ করেছিলেন; তা হলো সরাসরি বিদ'আতের বিরোধিতায় না গিয়ে সকল ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নববী সুন্নতের প্রচলন ঘটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা। এ জন্য তিনি সুন্নতের অনুসরণের গুরুত্ব সমাজের সম্মুখে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন এবং বিদ'আতের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে উম্মতকে সচেতন করে দেন।

তিনি বলতেন, বন্দেগীর সকল প্রকার হক আদায় করা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ অভিমুখী হওয়া ও তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাই মানব সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য। আর এ অবস্থা মানুষের মাঝে তখনই সৃষ্টি হবে যখন সে সম্পূর্ণরূপে সুন্নতে নববীর অনুসারী হবে।

সে সময় আলেমগণ বিদ'আতকে বিদ'আতে হাসানা ও সাইয়িয়াহ এই দুইভাগে ভাগ করতেন এবং তারা নিজেদের মনগড়া কোন কাজের সূচনা করে তাকে বিদ'আতে হাসানাহ বলে সমাজে চালু করে দিতেন। এভাবে বহু নতুন নতুন রুসুমাত সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেগুলো সাধারণ মানুষের কাছে গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছিল।

মুজাদ্দিদ রাহ. স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন, বিদ'আতে হাসানা বলতে কিছু নেই। হাদীসে সকল বিদ'আতকেই গোমরাহী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও ক্বিয়াসের ভিত্তিতে যে আমল প্রতিষ্ঠিত তা বিদ'আত নয়। আর যে আমল এই চার মূলনীতির আওতাভুক্ত নয়, তা আপাত দৃষ্টিতে যত সুন্দরই মনে হউক, মূলতঃ তা গোমরাহী। হাসানা হবে না। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "এই অধম বিদ'আতের কোনটির মাঝেই সৌন্দর্য দেখতে পায় না। শুধু অন্ধকার, পঙ্কিলতা ও ত্রুটিই অনুভব করে। যদি আপাত দৃষ্টিতে কোন বিদ'আতীর নিকট কোন কোন বিদ'আতের কল্যাণ ও সৌন্দর্য দৃষ্টিগোচর হয়ও কিন্তু আগামীকাল যখন তার আত্মশক্তি বলিষ্ঠ হবে তখন সে অবশ্যই বুঝতে পারবে যে এর পরিণাম একমাত্র ধ্বংস ও বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।" তিনি আরও বলতেন যে, 'হাদীস থেকে বুঝা যায়, যখনই কোন জাতি কোন বিদ'আত উদ্ভাবন করে ঠিক তখনই তাদের থেকে অন্য একটি সুন্নতকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। অতএব সুন্নতকে আঁকড়ে থাকা ও তা থেকেই দলিল প্রমাণ গ্রহণ করে কোন আমল করা বিদ'আত থেকে অনেক উত্তম।' সে যুগে সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সকলের মাঝেই ফরজের চেয়ে নফলের গুরুত্ব ছিল অধিক। এ কারণে তিনি শরিয়তের কোন আমলের গুরুত্ব কতটুকু তা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলতেন, 'যে সব আমলের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়, তা কি ফরজগুলো? না নফলগুলো? ফরজের মুকাবেলায় নফলের কোন মূল্যই নেই। যথা সময়ে একটি ফরজ আদায় করা হাজার বছরের নফল ইবাদত থেকে উত্তম, তা যত ইখলাছের সাথেই করা হউক না কেন। তিনি রাসূল সা. এর সুন্নতসমূহ দুইভাগে বিভক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

১. যা তিনি ইবাদত হিসেবে আদায় করেছেন।

২. যা তিনি দেশাচার ও সামাজিক প্রথা ও অভ্যাস হিসেবে করেছেন।

যা তিনি ইবাদত হিসেবে করেছেন তার বিপরীত কিছু করাকেই তিনি বিদআতে মুনকার বলেছেন এবং এগুলোকে প্রতিহত করার জন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আর যে সব আমল নবী সা. দেশাচার বা অভ্যাস হিসেবে করেছেন তার বিপরীত কিছু করাকে তিনি বিদ'আতে মুনকার বলে মনে করতেন না। তবে তিনি এ কথা বলতেন যে, নবী স. দেশাচার বা অভ্যাসবশত: করেছেন এমন সুন্নতের অনুসরণও সর্বোচ্চ সফলতা দান করে নিঃসন্দেহে। এভাবে তিনি তাঁর

অব্যাহত তৎপরতার মাধ্যমে সমকালীন প্রচলিত বহু বিদ'আত ও কুসংস্কার উচ্ছেদ করে তদস্থলে সুন্নতের প্রচলন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সূফীবাদের সংস্কারে তাঁর পদক্ষেপ ঃ

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, সুফীদের জ্ঞান দীনতার কারণে আত্মশুদ্ধির নির্মল ধারা-যা মূলতঃ কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রবর্তিত ছিল, প্রাচ্যদেশীয় বিভিন্ন ধর্ম দর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং এ সকল ধর্ম দর্শনের কিছু কিছু বিষয় আত্মস্থ করে এমন এক নতুন ধারার উদ্ভব ঘটে যা কুরআন ও সুন্নার সাথে সঙ্গতিহীন ছিল। অথচ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত এই ধারায় আত্মসাধনায় মগ্ন হওয়াকে জাহেরী শরীয়তের বিধি বিধান মেনে চলার চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত। ফলে এসব সুফীদের কাছে জাহেরী শরীয়তের বিধিবিধান অনুসরণের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এমনকি জাহেরী আমল ছেড়ে দিয়ে যোগসাধনা ও রিয়াজত মুজাহাদার পিছনেই মানুষ মত্ত হয়ে পড়ে। অবস্থা এমন রূপ ধারণ করেছিল যে, ইসলামের জাহেরী বিধিবিধানের পূর্ণ অনুসারী ব্যক্তিদেরকেও এই বলে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা হত যে, এরা মা'রিফাত সম্পর্কে অজ্ঞ, বাহ্যপূঁজারী। অথচ কুরআন সুন্নাহ বিবর্জিত এই মনগড়া পন্থায় আত্মসাধনায় লিপ্ত মানুষ একদিকে যেমন প্রকৃত আত্মসাধনার পথ থেকে বিচ্যুত হত, সাথে সাথে সৃষ্টি হত বহু মনগড়া বিশ্বাস ও ধারণা, যে কারণে একজন সাধক তার সাধনার পথে খেই হারিয়ে ফেলে নিজের মাকাম ও উন্নতির পর্যায় সম্পর্কে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হত। সায়ের ফিল্লাহর মাকামে পৌঁছে ফানাফিল্লাহর মাকামে পৌঁছে গেছে বলে মনে করত। এ ধরনের আরও বহু বিভ্রান্তির শিকার ছিল তারা। মুজাদ্দিদ রাহ. সুফীবাদেও আমূল সংস্কার সাধন করেন। তিনি ঘোষণা করেন, যে কর্মের সাথে নববী আদর্শের কোন সঙ্গতি নেই; তা যে নামেই এবং যে উদ্দেশ্যেই করা হউক না কেন, তা নিষ্ফল হতে বাধ্য। তাঁর ছেলেকে লেখা এক চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন-

প্রিয় বৎস! কিয়ামতের দিন একমাত্র রাসূল স. এর অনুসরণ ও অনুকরণই কাজে আসবে। সুফীদের হাল, ওয়াজদ, তত্ত্বজ্ঞান, মা'আরিফ, রহস্য ও ইঙ্গিত এগুলো যদি সেই আদর্শ অনুযায়ী হয় এবং সুন্নতে নববীর অনুসরণে হয়, তাহলে তো ভালই। আর তা না হলে সবই ব্যর্থ, নিষ্ফল ও ক্ষতিকর। পরিণামে এসব আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তির কারণ হবে। হযরত জুনায়েদকে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে জুনায়েদ বললেন, 'সকল তত্ত্ব ও রহস্য, হাকায়েক ও মা'আরিফ নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং এগুলো ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। কেবলমাত্র নবী স. এর অনুসরণে যা কিছু করে ছিলাম সেগুলোই কাজে এসেছে'। সুতরাং রাসূল স.ও তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীনের পদাঙ্কানুসরণ করাকে জরুরী মনে করো। কেননা এর পুরোটাই বরকতময় ও কল্যাণকর'।

তিনি আরও বলেছেন, 'আধ্যাত্মিক সাধকরা বহু প্রকারের সাধনা ও মুজাহাদা করে থাকেন। তাদের এই সাধনা যদি শরীয়ত মুতাবিক না হয় তাহলে তা অবশ্যই নিষ্ফল ও ব্যর্থ হবে। আর এই কঠিন সাধনার ফলে তাদের কিছু প্রতিদান লাভ হলেও তা পার্থিব বৈ কিছু নয়'। শরীয়তের গুরুত্ব সর্বাধিক এ কথা বুঝানোর জন্য তিনি বলেন, কোন মুস্তাহাব কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং মাকরূহে তাহরিমী থেকে বিরত থাকা এমনকি মাকরূহে তানজিহী থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা, যিকির ফিকির ও মুরাকাবার চাইতে বহুগুণে উত্তম। তবে হাঁ, সুন্নত ও মুস্তাহাবসমূহ আদয় করার পর যদি যিকির, ফিকির, ধ্যান-সাধনা করা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এমন ব্যক্তি সফলকাম হবে। শরীয়তের নির্দেশ মুতাবেক যে পরিমাণ আমল করা হয়, সে পরিমাণেই খাহিশাতে নফসানীর পতন ঘটে। সুতরাং প্রবৃত্তি ও খাহিশাতকে দমন করার উদ্দেশ্যে শরীয়তের একটি বিধানকে অনুসরণ করাও কল্পিত পন্থায় হাজার বছর ব্যাপী মুজাহাদা ও সাধনার চেয়েও উত্তম। বরং শরীয়তের পরিপন্থী এসব সাধনা ও মুজহাদা নিজের প্রবৃত্তি ও খাহিশাতেরই সহায়তা করে থাকে এবং খাহিশাতে নফসানীকে পরিপুষ্ট করে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, হিন্দু যোগী ও সন্যাসীদের যোগসাধনা তাদের প্রবৃত্তিকে দমন করেনি বরং তাদের লালসাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। তথাকথিত সূফীবাদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদনের জন্য তিনি শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন কাজের গুরুত্ব কতটুকু এবং কোনটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করতে হবে; এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে সর্বাগ্রে আকাইদ ও বিশ্বাসের পরিশোধন অপরিহার্য। অতঃপর শরীয়তের হালাল-হারাম, ফরয-ওয়াজিব ইত্যাকার বিধিবিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। এর পর হল তায্কিয়্যাহ বা আত্মশুদ্ধির স্থান। তিনি মনে করতেন আকাঈদ ঠিক না করে শরীয়তের বিধি বিধান ও হুকুম আহ্কামের জ্ঞানার্জন কোনই উপকারে আসবেনা। এ দুটো বিষয় অর্জিত না হলে এবং শরীয়তানুযায়ী আমল না করলে আত্মশুদ্ধি অসম্ভব। এই চারটি বিষয়ের পূর্ণতা বিধানের পরেই সুন্নত ও নফলের স্থান। গোটা শরীয়তকে তিনি ইলম (জ্ঞানার্জন), আমল (জ্ঞানকে কর্মে বাস্তবায়ন), ইখলাস (নিষ্ঠা ও আল্লাহ প্রেমের প্রেরণায় কর্ম সম্পাদন) এই তিনভাগে ভাগ করেছেন। এই তিনটি বিষয়ের সমন্বিত রূপই শরীয়ত। আর শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাঝেই আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত। সুতরাং দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হল শরীয়ত। আর মারিফত, হাকিকত ও তরীকত এক কথায় সূফীগণের সকল সাধনা ও বৈশিষ্ট্যময় কর্মকাণ্ড শরীয়তের পূর্ণতা বিধানে সহায়ক। তিনি বলতেন, তরীকত ও হাকীকত শরীয়তের তৃতীয় বিষয় অর্থাৎ ইখলাসের পূর্ণতা বিধানকারী। অতএব এগুলো শরীয়তের খাদেম স্বরূপ।

এছাড়াও সূফীবাদের অনুসারীরা মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবীর মারিফত (আল্লাহর পরিচয়) সংক্রান্ত "ওয়াহদাতুল উজুদ" এর দর্শন আমদানী করে ব্যাপকভাবে তার চর্চা শুরু করেছিল। যার সারকথা ছিল; বিশ্ব চরাচরের সকল বস্তু এক একটি একক শক্তি। আর এই একক শক্তিগুলোর সামষ্টিক রূপই হল আল্লাহ। যার অর্থ দাঁড়ায়; আল্লাহ একটি সামষ্টিক একক। আর পৃথিবীর সকল বস্তুই তার এক একটি ক্ষুদ্র একক। এই একক গুলোর বাইরে আল্লাহর পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। এ কারণে সূফীগণ তখন বলতেন– همه اوست

সর্বত্রই তাঁর অস্তিত্ব বিদ্যমান। এরা আবার তকদীরের ব্যাপারে এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল যে, জগতের সব কিছুই বস্তুর প্রভাবে হয়। আর সব বস্তুই যেহেতু ইশ্বরের একক, অতএব বলা যায় সব কিছুই ইশ্বর থেকেই ঘটে। এ কারণে তারা সর্বেশ্বরবাদী বিশ্বাসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। মুজাদ্দিদে আলফে সানী এরও সংস্কার করেন। তিনি এই 'ওয়াহদাতুল উজুদ এর ধারণা প্রত্যাখ্যান করে 'ওয়াহদাতুশ-শুহুদ' এর ধারণা সাধারণ্যে প্রচার করেন। যার সার অর্থ ছিল সকল সৃষ্টিই এক শ্রেণীভূক্ত। অর্থাৎ তাঁরা কেউই স্রষ্টা না, বরং সকলেই অন্য কর্তৃক সৃষ্ট। আর স্রষ্টা তার পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজমান। সৃষ্টি তাঁর স্রষ্টাকে একত্রিত করে সূফীরা যেখানে 'সর্বত্রই তিনি' বলে শ্লোগান দিচ্ছিল, তিনি সেখানে "সর্বত্রই তিনি নয়" বরং همه از اوست "সবকিছুই তাথেকে সৃষ্ট" এই শ্লোগান শুনিয়ে দিলেন। এভাবে আধ্যাত্ম সাধনার স্তর বিন্যাস করে কোন স্তরের কি হাল হয় তা সবিস্তারে বর্ণনা করে দিয়ে একদিকে যেমন তিনি সাধকদেরকে বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। তেমনি ভাবে সাধারণ মানুষকেও বিভ্রান্ত সূফীদের প্রবঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। বলতে গেলে দিক-ভ্রান্ত সূফীদেরকে তিনি কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক একটি গতিশীল ধারায় প্রবাহিত করেছেন[২]।

---

১. **টিকাঃ** ওয়াহ্‌দাতুল উজুদ-এর অবশ্য অন্য ব্যাখ্যাও রয়েছে। তবে আমরা এই ব্যাখ্যাটি তারীখে দাওয়াত ও আযীমত গ্রন্থের ব্যাখ্যা থেকে গ্রহণ করেছি।

২. **গ্রন্থপঞ্জী ঃ** (১) ইসলামী বিশ্বকোষ ৩/৩৩৬ (২) ওলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী ১ম খণ্ড (৩) তারিখে দাওয়াত ও আযীমত (৪) দ্বীনে ইলাহী ও মুজাদ্দিদে আলফে সানী (৫) মাকতুবাত (৬) আত্মদর্শনে সত্য দর্শন (৭) মুজাদ্দিদে আলফে সানীর সংস্কার আন্দোলন। (৮) তারীখে দাওয়াত ও আযীমত (৯) আদ-দ্বীনুল কাইয়্যিম। (১০) বাওয়াদেরুন নাওয়াদের।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রাহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবন ও সংস্কার আন্দোলন

১৭০৩ ইং-----১৭৬৫ ইং

আওরঙ্গজেব-----দ্বিতীয় আলমগীর পর্যন্ত

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহ. ছিলেন মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহ. -এর আদর্শ ও চিন্তা-চেতনার বলিষ্ঠ উত্তরাধিকারী ও তাঁর মানস সন্তান। এ দেশের মুসলমানদেরকে কুসংস্কারের বেড়াজাল ও চিন্তা চেতনার অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করে হিদায়েতের আলোকোজ্জ্বল পথে আনা এবং তাদের মাঝে আদর্শিক চেতনার নতুন প্রাণ সঞ্চার করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য।

জন্ম ও বংশপরিচয় ঃ ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহ. ১৭০৩ খ্রীঃ মুতাবেক ১১১৪ হিজরীর ৪ঠা শাওয়াল বৃহস্পতিবার সূর্যোদয়ের সময় উত্তর ভারতে অবস্থিত (তাঁর নানার বাড়ী) মুজাফ্ফর নগর জিলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মূল নাম আহমদ, উপাধি আবুল ফাইয়াজ, ঐতিহাসিক নাম আযীমউদ্দীন। তবে তিনি ওয়ালি উল্লাহ্ নামেই জগদ্বিখ্যাত। তাঁর পিতা শায়েখ আব্দুর রহীম বংশগত দিক থেকে হজরত উসমান রা. এর বংশধর, মতান্তরে হজরত উমর রা.-এর বংশধর এবং তাঁর মাতা ইমাম মূসা আল-কাযিমের বংশধর।

শিক্ষা জীবন ঃ শৈশবে তাঁর আচার আচরণ ছিল অত্যন্ত মার্জিত। তাঁর সময়ানুবর্তিতার মাঝে ভবিষ্যতে মহামনীষী রূপে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল। যুযবে লতীফ নামক গ্রন্থে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, যখন আমার বয়স পাঁচ বছর, তখন মক্তবে ভর্তি হই এবং পিতার নিকট ফার্সীভাষা শিক্ষা করি। সাত বছর বয়সে আমার পিতা আমাকে নামাজ পড়ার আদেশ দেন, এবং ঐ বৎসরই পবিত্র কুরআনের হিফজ সমাপ্ত করি। মাত্র পনের বছর বয়সে তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, উসূলে ফিকাহ, তর্কশাস্ত্র, কালামশাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যামিতি ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে স্বীয় পিতার হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। এ বৎসরই তাঁর বিবাহ কার্য সম্পাদন করা হয়, বিবাহের মাত্র দু'বছর পর তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন।

কর্মজীবন ঃ পিতার ইন্তেকালের পর শাহ সাহেব মাদ্রাসায়ে রহীমিয়াতে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। দীর্ঘ বার বছর যাবৎ শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন কালে শাহ সাহেব তাঁর পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছেন গভীর ভাবে। এসময় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থান পতন দেখে তিনি

একথা উপলদ্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মুসলিম সমাজ ও জাতিকে চলমান অন্ধত্ব ও গোমরাহী থেকে বাঁচতে হলে তিনটি বিষয়ে প্রজ্ঞা অর্জন একান্ত প্রয়োজন।

১. যুক্তিদর্শন ঃ শাহ সাহেব উল্লেখ করেছেন যে, তৎকালে মুসলমানরা গ্রীক দর্শনের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। আর এই দর্শনের মূল ভিত্তি হল তর্কশাস্ত্র। ফলে তর্কশাস্ত্রের অবান্তর প্রশ্নের প্রভাবে জাতির চিন্তা-চেতনায় নানাধরনের ফিৎনা ফাসাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। সুতরাং সামাজকে এ রোগ থেকে মুক্ত করতে হলে যুক্তি দর্শন শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

২. আধ্যাত্মিক দর্শন বা তত্ত্বদর্শন ঃ সে যুগের মুসলমানরা কুরআন সুন্নাহকে উপেক্ষা করে শুধু আধ্যাত্মিক সাধনাকে সাফল্যের চাবিকাঠি মনে করত, এমন কি সূফীদের অনুমোদন ছাড়া তারা কোন কিছুই সত্য বলে বিশ্বাস করতো না। তাই যুগের প্রেক্ষাপটে আধ্যাত্মিক সাধনা তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অঙ্গ বলে বিবেচিত হত। একারণে এ বিষয়ে সঠিক ধারণা অর্জন করাও একান্ত প্রয়োজন।

৩. ইলম বির-রিওয়ায়াহ ঃ অর্থাৎ রাসূলে কারীম সা.-এর মাধ্যমে যে জ্ঞান বিশ্ববাসী লাভ করেছিল। এর মাঝে কুরআন ও সুন্নার জ্ঞানই ছিল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

শাহ সাহেব বলেন, 'উক্ত তিনটি বিষয় ছাড়াও তৎকালিন যুগের শিক্ষিত ব্যক্তিরা আত্মকেন্দ্রিকতার রোগে মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত ছিল। কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হলে কেউ কারো সাথে আলাপ আলোচনার প্রয়োজন মনে করত না। ছোট-বড় সবাই নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী শরীয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত'।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁকে উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করতে হয়েছে। তিনি দীর্ঘ বার বৎসর যাবৎ পতনোম্মুখ মুসলিম সমাজের বিভিন্ন দিকের গবেষণা ও পর্যালোচনা দ্বারা যে উপলদ্ধি অর্জন করেন, তারই আলোকে তিনি তাঁর সংস্কারমূলক আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে ছিলেন। এব্যাপারে তিনি মৌলিকভাবে দু'টি বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেন।

১. তিনি মনে করতেন মানুষের ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে কুরআনের সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকৃতপক্ষে কুরআনের আলৌকিকত্ব। তাই পবিত্র কুরআনের ব্যবহারিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠাকে তিনি তাঁর শিক্ষাসংস্কারের বুনিয়াদ রূপে গ্রহণ করেছিলেন।

২. তিনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের অভাবকে সমাজ, রাষ্ট্র এবং জাতীয় জীবনের নৈতিক, ব্যবহারিক বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার কারণ বলে নির্দেশ করেছিলেন।

শাহ্ সাহেব এ দু'টি বিষয়কে সামনে রেখে আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে শুরু করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, যদি কুরআনের আলৌকিকত্বকে একমাত্র তাঁর

ভাষাগত অলংকারেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়, সে ক্ষেত্রে কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক ব্যতীত আর সবাই কুরআনের মাধুর্য থেকে বঞ্চিত থাকবে, তাই তিনি কুরআনের ব্যবহারিক দিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের দর্শনকে তাঁর সংস্কার মূলক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সাধারণভাবে নৈতিক জীবন বোধই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি, আর নৈতিকতার বিকাশ তখনই ঘটবে যখন অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া যাবে।

কিন্তু মানব জীবনের সাথে জীবিকার এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কেউ কোন দিন উপলব্ধি করেনি, ফলে আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা অন্তসারশূন্য হয়ে পড়েছিল। এমনকি বিদ্যান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরা দেশের রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকাকেই জীবনের সাফল্য মনে করতে শুরু করে ছিলেন।

পক্ষান্তরে শাহ্ সাহেব এ ধ্রুব সত্যকে বাস্তব দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। তিনি তাঁর লিখিত গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় এ বিষয়ে বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মোট কথা সামাজ জীবনে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিধান একান্ত জরুরী, কারণ জীবিকার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত মানুষ নীতি, আদর্শ ও অন্যান্য দিকের উন্নতির প্রতি সুযোগ দিতে পারে, নচেৎ মানব জীবন পশু জীবনে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক। শাহ্ সাহেব এ সত্য উপলব্ধি করে মুসলিম মিল্লাতকে এ ঘোর অমানিশা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে সুষ্ঠু ও তত্ত্বভিত্তিক গবেষণার জন্য তৈরী হন। তবে এর জন্য প্রয়োজন ছিল হাদীস শাস্ত্রে পূর্ণ পাণ্ডিত্য। কিন্তু দিল্লীতে আশানুরূপ গ্রন্থ না থাকায় তাঁকে হিজাযে সফর করতে হয়।

হিজায সফর ঃ শাহ্ সাহেব নিজে উল্লেখ করেন "দীর্ঘ বার বছর যাবৎ এ সকল বিষয়ে গবেষণা করার পর মক্কা-মদীনার সফরের প্রতি আমার প্রবল আগ্রহ জন্মে। সুতরাং ১১৪২ হিজরীতে মক্কা শরীফ চলে যাই এবং দু'বছর সেখানে অবস্থান করে শায়খ আবু তাহের ও অন্যান্য আলেমদের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করি"। শায়খ আবু তাহের থেকে তাসাউফের খিরকা লাভ করে ১১৪৪ হিজরীতে তিনি দিল্লীতে ফিরে আসেন। সংস্কার আন্দোলনের জন্য ফেকাহ্ ও হাদীসশাস্ত্রে স্বাধীনভাবে ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করা ছিল একান্ত আবশ্যক। মক্কা মদীনায় অবস্থান কালে শাহ্ সাহেব এই বিষয়ে পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেন।

আন্দোলনের পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থা ঃ

শাহ্ সাহেবের যুগে ভারতের অবস্থা নিতান্ত নাজুক ছিল। সম্রাট আলমগীরের মৃত্যুর চার বছর পূর্বে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। আলমগীরের মৃত্যুর পর ভারতে যে বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতা দেখা দেয় তা সকলেরই জানা। মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক দিকে যেমন পাঞ্জাবে শিখ আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে, তেমনি দাক্ষিণাত্যে মারাঠা আন্দোলন তৎকালীন যুগে মোঘল সাম্রাজ্যের জন্য এক বিরাট

হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া নাদের শাহের আক্রমণ, পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আহমদ শাহ্ আবদালীর বিজয়, ভারতীয় রাজনীতিতে রুহিলাদের অংশগ্রহণ, ইরান ও তুরস্কের মাঝে ক্ষমতার লড়াই, ইংরেজদের বাংলা বিহারের উপর আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদি বিষয় ভারতের রাজনৈতিক আকাশকে ঘোলাটে ও মেঘাচ্ছন্ন করে তোলে। এ তো ছিল বাহ্যিক অবস্থা, আভ্যন্তরীণ দিক থেকেও মুসলিম জাতি ছিল নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার। এর একমাত্র কারণ ছিল সম্রাটের উদাসীনতা এবং যথাসময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করা। এ সকল কারণে তখনকার দিনের দিল্লীর মসনদ উত্তাল তরঙ্গাঘাতে দোল খাচ্ছিল। তাছাড়া মানব জীবনের একটি মৌলিক চাহিদা হলো অর্থনৈতিক চাহিদা। অথচ এক্ষেত্রেও কোন ভারসাম্য ছিল না বললেই চলে। এ বিষয়ে কেউ কোন দিন চিন্তা ভাবনার প্রয়োজনও মনে করেনি। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যদি ভারসাম্যের অভাব থাকে, তাহলে মানুষ নীতিগত ও আদর্শের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে থাকবে। মোট কথা ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে মানুষ এক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এ ছিল তৎকালীন ভারতের সংক্ষিপ্ত চিত্র।

সংস্কার আন্দোলন ও বিপ্লবী কর্মসূচী ঃ

শাহ্ সাহেব ভারতের এ অবস্থা দেখেই মক্কা যান এবং ফিরে এসেও একই অবস্থা দেখেন। হজ্জ থেকে ফিরে এসে তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। তিনি পুরুষানুক্রমিক শিক্ষকতার পাশাপাশি নতুনভাবে ইসলামের খেদমত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাই এক বিপ্লবী কর্মসূচীর মাধ্যমে নতুন জীবনের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর সংস্কার আন্দোলনের মূল দাবী ছিল 'প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে সমাজ গড়তে হবে এবং বর্তমানে যে শাসন ব্যবস্থা রয়েছে তা পরিবর্তন করে নতুনভাবে শাসন ব্যবস্থা তৈরী করা একান্ত প্রয়োজন'। এ দাবীকে সামনে রেখে তিনি তাঁর আন্দোলনের কর্মসূচী পেশ করেন। তাঁর কর্মসূচীকে আমরা মোটামুটি দশটি ধারায় বিভক্ত করতে পারি।

১. কুরআন ও সুন্নার যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ঃ

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. যুগ পরিবর্তনের এক সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়ে ছিলেন। সেটা ছিল বস্তুবাদ বিকাশের সূচনালগ্ন। ইউরোপে বিকশিত বস্তুবাদের ঢেউ সবে মাত্র ভারতের মাটিতে আছড়ে পড়ছিল। তিনি তার তীক্ষ্ণ মেধার আলোকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার সায়লাব থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করা খুবই কঠিন হবে। এ চিন্তা ভাবনার বিকাশ ঘটলে মানুষ পার্থিব সফলতার প্রতি ঝুঁকে পড়বে অবশ্যম্ভাবী ভাবেই। বস্তুবাদীরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তৈরী অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাকার জাগতিক সফলতার মুখরোচক শ্লোগান দিয়ে সহজেই বিভ্রান্ত করবে মুসলিম উম্মাহকে।

এ সায়লাবের সফল মুকাবেলা করতে হলে কুরআন ও সুন্নায় মানুষের ইহজাগতিক সফলতার যে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে তা সুবিন্যস্তভাবে তুলে ধরতে হবে মানুষের সম্মুখে। অন্যথায় এ সায়লাব ঠেকানো সম্ভব হবে না।

তাই তিনি কুরআন ও সুন্নায় উল্লিখিত অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, নগর উন্নয়ন নীতি ইত্যাকার বিষয়কে সুবিন্যস্ত আকারে উপস্থাপনের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে চেষ্টা করেন যে, ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে দিক নির্দেশনা দিয়েছে তা মানুষের স্বভাব ও ফিতরাতের সম্পূর্ণ অনুকূল, উপরন্তু তা যে কোন নবআবিষ্কৃত চিন্তাধারার চেয়ে সর্বাংশে উত্তম। তিনি তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় এসব বিষয়ের উপর জোরালো আলোচনা করেছেন। সম্ভবত ভারতীয় উপমহাদেশে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি কুরআন ও সুন্নায় উল্লেখিত অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, নগর উন্নয়ন নীতি ইত্যাকার বিষয়কে পৃথক শিরোনামে বিন্যস্ত করে উপস্থাপন করেছেন। তিনি এও বুঝতে পেরেছিলেন যে, যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের রুচি বদলায় সুতরাং আগত পৃথিবীতে মানুষ ধর্মীয় বিধি-বিধানের যৌক্তিকতার বিচার বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হবে। অতএব সকল বিধি-বিধানকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য যুক্তির আলোকে উপস্থাপন করাও তাঁর সংস্কারমূলক কার্যক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল।

কিন্তু সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয় হল এই যে, আধুনিক চিন্তাবিদদের ন্যায় তিনি কুরআন ও সুন্নাহকে যুগসম্মত করে উপস্থাপন করতে গিয়ে ইসলামের সনাতন ধারা থেকে মোটেও সরে যাননি। বরং তিনি শরীয়তের মেজায ও ইসলামের রুহানিয়্যাত তথা আধ্যাত্মিক চেতনাকে সমুন্নত রেখেই অত্যন্ত নিপূণভাবে এ কাজ আঞ্জাম দিতে সমর্থ হয়েছেন। যুগ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে তাঁর এই পদক্ষেপের ফলে ইসলাম একটি ঘনায়মান সংকট কাল উত্তরণ করতে সক্ষম হয়েছে নিঃসন্দেহে। বলতে গেলে এই যুগান্তকারী পদক্ষেপের জন্যই তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

২. শিক্ষানীতিতে সংস্কার ঃ

বাদশাহ হুমায়ুনের আমলে ইরানী শিয়াদের মোঘল রাজদরবারে প্রভাব বৃদ্ধি পেলে তাদের যোগ সাজসে ভারতীয় শিক্ষানীতিতে গ্রীক দর্শনের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। অবস্থা এমন পর্যায়ে গড়িয়েছিল যে, গ্রীক দর্শনে পাণ্ডিত্যই জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, অথচ কুরআন ও সুন্নার জ্ঞান ছিল অনেকাংশেই অবহেলিত। বলতে গেলে ওগুলোই ছিল কুরআন সুন্নার জ্ঞান-াহরণের পথে অন্তরায়।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রাহ.ই সর্ব প্রথম কুরআন সুন্নার জ্ঞান আহরণের বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে মাদ্রাসায়ে রহীমিয়্যার সিলেবাসে আমূল পরিবর্তন সাধন করেন।

তাঁর এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ ভারতবর্ষে ইলমে হাদীস ও ইলমে তাফসীরের চর্চার ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা করে। শিক্ষার্থীরা কুরআন সুন্নার নির্দেশিত জীবনবোধের সাথে হয় পরিচিত, ফলে কুরআন সুন্নার জ্ঞান বিকাশের পথ হয় উন্মোচিত।

৩. মুসলিম জাতির আকীদার সংশোধন ও কুরআনের প্রতি আহ্বান ঃ

প্রকৃত পক্ষে কোন দেশে সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের আত্মশুদ্ধি করা একান্ত কঠিন ব্যাপার। এর জন্য প্রয়োজন আম্বিয়া-ই-কিরামের সংস্কার ধারা বজায় রেখে দ্বীনের পূর্ণ জাগরণ। সম্রাট আকবর প্রবর্তিত তথাকথিত দ্বীনে ইলাহীর প্রভাবে মুসলমানদের ঈমান আকীদার ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করেছিল তা সকলেরই জানা। এর প্রভাবে মানুষের মাঝে কুরআনের আদর্শ হতে সরে আসার যে ব্যাপক মহামারী শুরু হয়েছিল, তা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। শাহ সাহেব এ সত্যকে উপলব্ধি করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এ বিপর্যয় থেকে মুসলমানদের উদ্ধার করতে হলে ব্যাপক ভাবে কুরআনের দাওয়াত প্রচার করতে হবে। মহাগ্রন্থ আল্-কুরআন সর্বজনীন ও আন্তর্জাতিক। যে কোন যুগে যে কোন স্থানে এর বৈপ্লবিক নীতিকে অনুসরণ করলে ইসলামের প্রাথমিক যুগের ন্যায় (অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদার যুগ) নব জাগরণের সূচনা সম্ভব। এ কাজ আঞ্জাম দিতে গিয়ে তিনি সর্ব প্রথম ফার্সী ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করেন। যার নাম 'ফাতহুর রহমান'। একাজ করতে গিয়ে তাকে অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এক শ্রেণীর আলেম তো বলেই উঠলেন কুরআনের ভাষান্তর দ্বারা এর অলৌকিকতা ও মাধুর্য ক্ষুন্ন হয়। সুতরাং একাজ কুফ্রীর সমতুল্য। এক পর্যায়ে শাহ্ সাহেবকে কুফ্রীর ফতওয়াও দেয়া হয়। কিন্তু একথা চিরসত্য যে, কুকুরের ঘেউ ঘেউ পূর্ণিমার আলোকে নির্বাপিত করতে পারেনা।

৪. হাদীস ও সুন্নাহর ব্যাপক প্রচার প্রসার ঃ

এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে জানতে হবে দ্বীনের মাঝে হাদীসের গুরুত্ব কতটুকু? হাদীসের প্রচার ও তার সংরক্ষণ প্রয়োজন কেন ? হাদীস সর্ম্পকে অজ্ঞতা বা অবহেলা প্রদর্শন করার দ্বারা কি ক্ষতি ?

প্রকৃতপক্ষে হাদীস হলো উম্মতের ঈমান আকীদার জন্য মানদণ্ড তথা মাপকাঠি। শাহ সাহেবের প্রথম কর্মসূচী ছিল "কুরআনের প্রতি আহবান"। এ কাজের জন্য হাদীসের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। তার কারণ পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাই হলো হাদীস এবং হাদীসই হলো সুন্নাতে নববী। ইরশাদ হচ্ছে "তোমাদের জন্য রাসূলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ" (আল কুরআন)। হিন্দুস্থানে যে শিরক বিদ্আতের সায়লাব দেখা দিয়েছিল তার একটা কারণ ছিল হাদীস ও সুন্নাতে নববীর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন। নবী সা. ইরশাদ করেন, যখন কোন সম্প্রদায় একটি বিদ'আতে লিপ্ত হয়, তখন তাদের থেকে

একটি সুন্নাত উঠিয়ে নেয়া হয় (মিশকাত)। শাহ সাহেব সমাজ থেকে শিরক বিদ্আত উচ্ছেদ করার জন্য হাদীস শাস্ত্রের ব্যাপক প্রচার প্রসার শুরু করেন। মূলতঃ তিনিই উপমহাদেশে সর্ব প্রথম নিয়মতান্ত্রিক ভাবে হাদীসের দরস চালু করেন। হাদীস শাস্ত্রে তার লিখিত মুছাফ্ফা সরহে মুছাওয়া, তরজমায়ে সহীহ্ বুখারী, আল ফছলূল মুবীন মিন হাদীসিন নাবিয়্যিল আমীন ইত্যাদি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ফিকাহ্ ও হাদীসের মাঝে সমন্বয় ঃ যুগ যুগ ধরে মুসলমানগণ হাদীস ও ফিকাহর চর্চা করে আসছে। কিন্তু তা ছিল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। শাহ সাহেব সর্ব প্রথম হাদীস ও ফিকাহর মাঝে সমন্বয় সাধন করেন। হাদীসের উপর ফেক্হী আলোচনা এবং হাদীস থেকে মাসাইল ইসতিমবাত্ এবং ফেকাহবিদদের মতের বিভিন্নতা ও তাদের যুক্তি প্রমাণ, কোন মতটি অধিক গ্রহণীয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করে তিনি হাদীসের দরস দানের প্রথার উদ্ভাবন করেন।

৫. যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যার আলোকে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন ঃ

অনেকে ধারণা করে থাকেন যে, শরীয়তের হুকুম আহকাম কোন উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কাজের সাথে তার ফলাফলের কোন সম্পর্ক নেই। এ ধারণা ভুল। ইজমা, ক্বিয়াস ও খাইরুল কুরূনের মনীষীগণের গবেষণালব্ধ মতামত উক্ত মতবাদকে খণ্ডন করেছে। যেমন - নামাজের হুকুম আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাঁর নিকট মোনাজাত করার জন্য প্রদান করা হয়েছে। গরীব এবং অসহায়দের অভাব অনটন দূর করা এবং ধনীদের অন্তর থেকে কৃপণতার ছাপ মুছে ফেলার জন্য যাকাতের বিধান দেওয়া হয়েছে। আত্মাকে কু-প্রবৃত্তির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য রোযাকে ফরজ করা হয়েছে। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপক প্রচার প্রসার এবং ফিৎনা ফাসাদ দূর করার লক্ষ্যে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে নবী সা.-এর আদেশ নিষেধের মাঝেও কোন না কোন রহস্য লুকায়িত রয়েছে। যেমন-জোহরের পূর্বে চার রাক'আত নামাজ সম্বন্ধে নবী সা. বলেন ঐ সময় আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়, আমার ইচ্ছা হয় যে, এ সময় যেন আমার কোন নেক আমল উর্ধ্বে আরোহণ করে। এভাবে প্রত্যেক আহকামের মাঝে কোন না কোন রহস্য লুকায়িত রয়েছে। এক শ্রেণীর মানুষ মনে করত ইসলামের বিধি-বিধানকে যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ করা এবং এগুলোর রহস্য উদঘাটন করতে যাওয়া ইসলামের জন্য ক্ষতিকারক। পক্ষান্তরে শাহ সাহেব মনে করতেন এ ধারণা ভুল। তাঁর মতে যুক্তির আলোকে ইসলামী হুকুম-আহকামের বিচার বিশ্লেষণ করলে ক্ষতিতো নয়ই বরং বহুবিধ উপকার হবে। যেমন আমলের প্রতি আগ্রহ বাড়বে, তাছাড়া ফিক্হী ইজতিহাদের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হবে। এ দিকে লক্ষ্য করেই শাহ সাহেব এ কাজকে তাঁর বিপ্লবী কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেন।

৬. ইসলামী খিলাফতের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর দাঁসত্ব করার জন্য। মূলতঃ এই দাসত্বের কাজকে সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্য মানুষকে তিনি যে দায়িত্ব দিয়েছেন মূলতঃ তাই হলো খিলাফত। খিলাফত মানব জীবনের একটি মৌলিক বিষয়। এর মাঝে নিহিত রয়েছে মানব জীবনের বহু কল্যাণকর বিষয়। শাহ সাহেব এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণের মাঝে এমন ভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা নজীর বিহীন। তিনি তার 'ইযালাতুল খিফা 'আন খিলাফাতিল খোলাফা' নামক গ্রন্থে খেলাফতের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে,

الخلافة هى اللرياسة العامة فى التصدى لاقامة الدين باحياء العلوم الدينية واقامة اركان الاسلام والقيام بالجهاد - ومايتعلق به من ترتيب الجيش الفرض للمقاتلة واعطا ئهم من التفصى والقيام بالقضاء واقامة الحدود ورفع المظلم والامر بالمعروف والنهى عن المنكر نيابة للنبى صلى الله عليه وسلم

বস্তুতঃ খিলাফত হল, নবী কারীম সা. এর প্রতিনিধি হিসাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্দেশ্যে জনগণের নেতৃত্ব দান করা। আর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা হবে দ্বীনি শিক্ষা, আদর্শ ও চিন্তা-চেতনা উন্মেষ ঘটিয়ে ধর্মীয় বিধি বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে ও জিহাদের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এবং এর সাথে আরো যেসব বিষয় সংশ্লিষ্ট রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে যেমন- শত্রু বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীকে সুবিন্যস্ত ও সুগঠিত করা, তাদের অবকাশ যাপনের সুযোগ দান, বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা,শরয়ী দণ্ডবিধি কার্যকর করা, জুলুম নির্মূল করা, সৎকাজের নির্দেশ দান এবং অসৎকাজ থেকে বাধা প্রদান ইত্যাদি।

এ সময় শিয়াদের প্রভাবে আরো একটি বিষয় মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। তা হলো খেলাফতে রাশেদা সম্পর্কে ভিত্তিহীন সন্দেহ প্রকাশ। শাহ্ সাহেব উক্ত গ্রন্থে' বিরুদ্ধবাদীদের এ সকল ভ্রান্ত ধারণাকে এমনভাবে খণ্ডন করেছেন যা ইতিহাসে বিরল। তাঁর সবগুলো যুক্তিই কুরআন-হাদীস ভিত্তিক ছিল।

৭. শ্রমজীবীদের উপর থেকে বাড়তি চাপ রহিত করা এবং শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন করা ঃ

শাহ্ সাহেব বলতেন শ্রমজীবীদের উপর থেকে চাপ রোধ করা ব্যতিত সমাজে ভারসাম্য সৃষ্টি হতে পারে না, (যার বাস্তব প্রমাণ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন)। অতীতে রোম পারস্যে যে নৈতিক অধঃপতন নেমে এসেছিল তারও মূল কারণ ছিল শ্রমিক নিপীড়ন। সুতরাং সমাজে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে হলে কুরআনের সেই বৈপ্লবিক চেতনা ফিরিয়ে আনতে হবে। শাহ্ সাহেব সেই চেতনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত শ্রমনীতিকে মুসলমানদের জন্য আদর্শ বলে বর্ণনা করেন।

৮. উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতি সংশোধনীর আহবান ঃ

শাহ্ সাহেব দরস তাদরীসের পাশাপাশি সমকালীন সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও তার ব্যাধি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন। তিনি সমাজের সকল স্তরের রোগ সম্পর্কে অবগত হয়ে সকলকে সংশোধনীর প্রতি আহ্বান জানান।

৯. শিক্ষা ও তারবিয়াতের মাধ্যমে যোগ্য উত্তরসূরী তৈরি করা ঃ

এমন একদল আদর্শ সচেতন উত্তরসূরী তৈরি করে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি খুবই তৎপর ছিলেন-যারা পরবর্তীতে তাঁর আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। এরই ফলশ্রুতিতে শাহ আঃ আযীয, শাহ ইসহাক, মাওলানা বেলায়েত আলী, সাইয়্যিদ আহমদ বেরলভী, শাইখুল হিন্দ, হোসাইন আহমদ মাদানী, শাব্বীর আহ্মদ উসমানী প্রমুখ আলেমগণ গড়ে উঠেছিলেন।

১০. সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্যোগের কবল থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করা ঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলমগীরের মৃত্যুর পর ভারতে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তা মুসলমানদের জন্য খুবই বিপদজনক ছিল। শাহ্ সাহেব মুসলিম জাতিকে এ দুর্যোগ থেকে উদ্ধারের লক্ষ্যে জনসাধারণের মাঝে জেহাদী প্রেরণা সৃষ্টির প্রয়াস চালান। যার বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে।

রচনাবলী ঃ বিশেষজ্ঞদের মতে তাঁর রচনা দুইশতেরও বেশী। হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ্, উসূলে ফিকাহ্, রাষ্ট্রনীতি, তাসাউফ-এমন কি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাঁর গ্রন্থ রচনার অবদান রয়েছে।

ইন্তেকাল ঃ ৬১ বৎসর বয়সে ১১৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মুহাররাম যোহরের সময় তিনি ইন্তেকাল করেন। মাও. আব্দুল আযীয, শাহ রফি উদ্দীন, শাহ আব্দুল কাদির ও শাহ আব্দুল গণী নামে চারজন যোগ্য সন্তান রেখে যান।

তথ্য গ্রন্থ ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ ৫ম খণ্ড, তারিখে দাওয়াত ও আজীমত ৫ম খণ্ড, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ ও সমকালীন রাজনীতি, মিশকাত শরীফ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, আল-ফাওজুল কাবীরের ভূমিকা, ইযালাতুল খিফা আন্ খিলাফাতিল খোলাফা, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর রাজনৈতিক চিন্তাধারা।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর রাজনৈতিক কার্যক্রম ঃ

হিজরী দ্বাদশ শতকে মোঘল সম্রাট আলমগীরের মৃত্যুর পর উপমহাদেশে মুসলিম সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ বলতে গেলে ধ্বসে পড়ে। পরবর্তী সম্রাটদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, উত্তরাধিকার নিয়ে কোন্দল, আমীর-ওমরাদের পারস্পরিক স্নায়ুযুদ্ধ, প্রশাসনিক অবক্ষয় ও সামরিক দুর্বলতা মুসলমানদেরকে চরম ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। সর্বস্তরে মুসলমানদের এহেন দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাসের সফল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ ও শতাব্দির শ্রেষ্ঠ সংস্কারক শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিল্লীর রাজ-তখতের বিপর্যয় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা রোধ করার উদ্দেশ্যে একটি বৈপ্লবিক কর্মপন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। ইতিহাসে এ কর্মপন্থাই শাহ ওয়ালী উল্লাহ-এর আন্দোলন নামে খ্যাত।

উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণের অগ্রপথিক হযরত আবুল ফায়্যাজ আহমদ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ ছিলেন দিল্লীর তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ আলেম ও শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ, স্বাধীনতা আন্দোলনের স্থপতি ও যুগশ্রেষ্ঠ সংস্কারক।

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের বিকাশকালে এই মহামনীষী জন্ম গ্রহণ করেন। শিল্প বিপ্লবের ক্রমবর্ধমান বিকাশ আধ্যাত্মবাদী পৃথিবীকে ক্রমান্বয়ে বস্তুনির্ভর বিলাসী জীবনের দিকে ঠেলে দেয়। এই বিপ্লব মানুষের চিন্তা-চেতনার জগতেও বিরাট প্রভাব ফেলে। ঐশী শক্তির উপর বিশ্বাসকে ক্রমান্বয়ে শিথিল করে দেয় এবং মানুষকে বস্তুর শক্তিতে বিশ্বাসী করে তোলে। ফলে বস্তুবাদী যে ধ্যান-ধারণার জন্ম নেয় তা ক্রমান্বয়ে মানুষকে নাস্তিক্যবাদী চিন্তার দিকে ঠেলে দেয়। এর ফলে মানুষের মনোজগতে ধর্মের প্রতি আস্থা শিথিল হতে থাকে। যার স্বাভাবিক পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রতি মানুষের যে দ্বিধাহীন আনুগত্য ছিল তা আর বহাল থাকে না। মানুষ হয়ে ওঠে চরম যুক্তিবাদী। ধর্মীয় সকল বিধি-বিধানকেও তারা একদেশ দর্শী স্থূলবুদ্ধিজাত যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে শুরু করে। মূলতঃ এগুলোও ছিল ধর্মীয় বিধি-বিধানের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে অবাধ ভোগের ভুবনে বিচরণের নিমিত্তেই। এ ভাবে বস্তুবাদী দর্শনের চোরাপথ বেয়ে পৃথিবীময় যে ভোগবাদী মানসিকতা জন্ম নিচ্ছিল তার পরিণাম যে আগত পৃথিবীর জন্য কত ভয়াবহ হবে, এ পথ বেয়েই যে পৃথিবী ব্যাপী জন্ম নেবে আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা এবং বিদায় নেবে আত্মিকগুণাবলী ও নৈতিকতাবোধ, চরম বেহায়াপনা ও অশ্লিলতার স্রোতে ভেসে যাবে মানবীয় বৈশিষ্ট্যাবলী, তদস্থলে জন্ম নিবে হায়েনা ও পশুবৎ এক বাঁধা-বন্ধনহীন সমাজ, যার যুপকাষ্ঠে বলি হবে সুন্দর মননশীল জীবনবোধ, ত্যাগ ও সহানুভূতির মনোবৃত্তি এবং শুরু হবে আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব ও সংঘাত-তা হয়ত তখন কেউ তলিয়ে দেখেননি। বস্তুবাদী এই চিন্তা-চেতনার ঢেউ ইউরোপের গণ্ডি পেরিয়ে যখন ভারতের মাটিতে আঘাত হানতে শুরু করে ছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই আবির্ভূত হয়েছিলেন এই যুগ সচেতন ক্ষনজন্মা সংস্কারবাদী মানুষটি। তিনি বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা সমাপন করতঃ

দীর্ঘ ১২ বছর অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে নিবিষ্ট থাকেন। অতঃপর এপ্রিল, ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে হজ্জ সমাপনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুয়াজ্জমায় গমন করেন। হজ্ব সমাপ্তির পর দু'বছর মক্কা মুয়াজ্জমায় অবস্থান করে তুরস্কের উসমানী সাম্রাজ্য ও বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সামাজিক, রাজনৈতিক কার্যাবলী এবং ধর্মীয় অবস্থা'সমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এ সময় তিনি তাঁর বিশিষ্ট উস্তাদ শায়েখ আবু তাহির মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীমের সাহচর্য গ্রহণ করেন এবং তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা ও চিন্তাধারায় বেশ প্রভাবিত হন। ১৭৩৩ সালে সমাজ সংস্কারের এক মহান চেতনা নিয়ে তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে এক বৈপ্লবিক আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন।

রাজনীতিতে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর যোগদানের কারণ ঃ

নিম্মোক্ত কারণগুলো শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রহ. এর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগদানের প্রেক্ষাপট তৈরি করে।

ক. মোঘল সাম্রাজ্যের অধপতন ঃ

হিজরী দ্বাদশ শতকে সম্রাট আলমগীরের মৃত্যুর সাথে সাথেই উপমহাদেশের মুসলিম সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যরবি অস্তমিত হতে শুরু করে। দিল্লীর মসনদের উত্তরাধিকার নিয়ে আলমগীরের পুত্র মুহাম্মদ মুয়াজ্জম, আযমশাহ ও কামবখশ চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলে রাজ্যের আমীর-ওমারা ও সেনাপতিগণ সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে চক্রান্তের ফাঁদ পাতে। দাক্ষিণাত্যে নিযামূলমুলক, অযোধ্যায় সাদাত খাঁন ও বঙ্গদেশে আলীবর্দী খান স্বাধীন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করে। সমগ্র সাম্রাজ্য রাজনৈতিক যুদ্ধ ও টানাটানির রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ফলে আলমগীরের মৃত্যুর ৬০ বছরের মধ্যেই দিল্লীর মসনদ দশজন সম্রাটের উত্থান পতন প্রত্যক্ষ করে। এদের মধ্যে কেবল দুজন ব্যতীত অন্যদেরকে হয়ত সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেয়া হয় কিংবা সিংহাসনে উপবিষ্ট রেখেই হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে অনেকে এমনও ছিলেন যাদের শাসনকাল ছিল চার মাস, আবার অনেকে এমনও ছিলেন যারা ছিলেন মাত্র কয়েকদিনের শাসক। এ সময় দলাদলির বিষাক্ত প্রভাবে প্রশাসনের সর্বত্র সুদ, ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, অনিয়মতান্ত্রিকতা ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। অধর্ম, অবিচার, অন্যায় ও বিদ্রোহ সেনাবাহিনীর সুশৃঙ্খল ভিতকে ধ্বংস করে দেয়। সৈনিকদের নির্ধারিত বেতন প্রদান না করায় তারা নির্বিচারে হত্যা ও লুণ্ঠন শুরু করে। এ ছাড়াও সম্রাটের আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতার সুযোগে ইরানী ও তুরানী অমাত্যবর্গ এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, তারাই দিল্লীর সম্রাটদের ভাগ্য নির্ধারণ করতেন। এভাবে মোঘল সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ক্রমেই খর্ব হতে থাকে।

খ. মারাঠা শক্তির উত্থান ঃ

সম্রাট আলমগীরের জীবদ্দশায় ভারতীয় মুসলমানদের জন্য দুটি ভয়ংকর আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। তন্মধ্যে একটি পাঞ্জাবের শিখ আন্দোলন, অন্যটি দক্ষিণভারত হতে উদ্ভূত শিবাজীর নেতৃত্বে (খালেস হিন্দু রাষ্ট্র কায়েমের উদ্দেশ্যে) মারাঠা আন্দোলন। ১৬৫৬

সালে শিবাজী কনকানের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে তার পিতার দেয়া জায়গীরগুলোকে জাঠরাজ্যের সাথে সম্পৃক্ত করে একটি স্বাধীন মারাঠা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। সম্রাট আলমগীর, ১৬৫৯ সালের নভেম্বর মাসে জেনারেল আফজাল খানের নেতৃত্ব এবং ১৬৬৩ সালে এপ্রিল মাসে শায়েস্তা খানের নেতৃত্বে মারাঠাদের বিরুদ্ধে দুটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। জুন ১৬৬৫ সালে দাক্ষিণাত্যের ভাইসরয় মির্জা রাজা জয়সিং পুনরায় শিবাজীর উপর আক্রমণ করে এবং তাকে পরাজিত করে তার রাজ্যের চার-পঞ্চমাশং তাকে ছেড়ে দিয়ে আনুগত্যের সাথে সম্রাটের সেবা করার প্রতিশ্রুতিতে পুরান্দয়ের সন্ধিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। সম্রাট আলমগীর এভাবেই তাঁর কঠোর শাসন ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দ্বারা মারাঠা আন্দোলনকে দমন করে রাখেন। কিন্তু সম্রাটের মৃত্যুর পর দিল্লীর মসনদের উত্তরাধিকার নিয়ে পরবর্তী সম্রাট ও আমীর-ওমারাদের কোন্দলের সুযোগে শিবাজীর কনিষ্ঠপুত্র রাজা রামের নেতৃত্বে মারাঠা শক্তি দুর্জেয় হয়ে ওঠে। দক্ষিণাত্যের কোন স্থানই তাদের দ্বারা অনুপদ্রুত ছিল না। এমনকি তারা ১৭৫৭ সালে দিল্লী দখল করে ইমাদুল মুলক নামে তাদের একজনকে সিংহাসনে আসীন করে। তাদের আক্রমণ এত নির্মম ও বর্বরোচিত ছিল যে, তাদের ভয়ে গ্রামের পর গ্রাম বিরাণভূমিতে পরিণত হয়। ক্রমেই তারা ভারতবর্ষে এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যা অনাগত ভবিষ্যতের জন্য ছিল চরম হুমকি স্বরূপ।

গ. রাজপুত ও জাঠদের বিদ্রোহ ঃ

সম্রাট আকবরের সময়েই দক্ষিণ ভারতে রাজপুতগণ মোঘল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উত্তোলন করে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে তারা একটি মজবুত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলে, যার প্রভাবে মোঘল প্রশাসনের ভিত নড়বড়ে হয়ে উঠে। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর সময়ে যদিও রাজপুতদের শক্তি অনেকটা খর্ব হয়ে গিয়েছিল তথাপি ভবিষ্যতে ভরতীয় রাজনীতিতে তাদের পুনরুত্থানের যথেষ্ঠ সম্ভাবনা ছিল।

জাঠদের ক্রমবর্ধমান উন্নতিও মোঘল প্রশাসনের প্রতি এক বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দিল্লী ও আকবরাবাদে তারা দু'টি দূর্গ দখল করে নির্বিঘ্নে তাদের পৈশাচিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল। রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এরূপ একটি বিরোধী শক্তির অস্তি ত্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল।

ঘ. শিখ সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ ঃ

হিজরী একাদশ শতকের প্রথম দিকে পাঞ্জাবের শিখরা ধর্মভিত্তিক সংস্কার মূলক আন্দোলন শুরু করে। ১১২৫ হিজরীতে গুরু গোবিন্দসিং এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দেয়। কাবুলের গভর্ণর যুবরাজ মোয়াজ্জমের বিরুদ্ধে গোবিন্দসিং-এর নেতৃত্বে যাযাউরের যুদ্ধে বিজয়ের পর শিখদের অবস্থান সুদৃঢ় হয়। ১১২৭ হিজরীতে লক্ষণদাস বান্দা বাহাদুরের নেতৃত্বে শিখরা নিয়মিত গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে এবং অল্পদিনের মধ্যেই ফাতদারাস, সাচ্চাপাদশা ও সাহারানপুর থেকে শুরু করে সাটলেজ নদী হয়ে যমুনা নদী পর্যন্ত শহরগুলো অধিকার করে নেয়। বিজিত শহর গুলোতে তারা বর্বর ও পৈশাচিক

হত্যাযজ্ঞ চালায়। ক্রমবর্ধমান শিখদের এ অগ্রযাত্রা উপমাহাদেশের রাজনৈতিক আকাশকে ক্রমেই আচ্ছন্ন করে ফেলে।

ঙ. শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ ঃ

আহলে সুন্নত ওয়াল্-জামা'আত ও শিয়াদের মাঝে মতদ্বৈততা ও বৈরীভাব হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথম থেকেই শুরু হয়। কিন্তু শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর যুগে ভারতে এ দুই দলের বৈরীভাব ও কলহ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। শিয়ারা তাদের ঈমামদের মাসুম বা নিস্পাপ মনে করে, তারা হযরত মুহাম্মদ সা. কে রা:সূল হিসাবে স্বীকার করলেও তাদের ইমামদেরকে নববী বৈশিষ্ট্যবলীর অধিকারী বলে বিশ্বাস করে। যেমন ইমামদেরকে নবীদের ন্যায় মা'সুম ও নিস্পাপ এবং বিধি-বিধান প্রবর্তন ও রহিত করনের ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে। এবং প্রথম তিন খলিফার উপর হযরত আলী রা. কে প্রাধান্য দেয়। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নত ওয়াল-জামা'আত বা সুন্নাহপন্থীগণ বিশ্বাস করেন, আম্বিয়ায়ে কিরামই কেবল মাসূম এবং প্রথম তিন খলীফা হযরত আলী রা.-এর উপর মর্যাদাবান। এ ধরণের বহু আকীদাগত বিষয় নিয়ে বহছ-মোবাহাছাহ, তর্কযুদ্ধ, বাকযুদ্ধ, পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, কখনো কখনো লাঠি যুদ্ধ তৎকালিন ভারত উপমহাদেশে সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

চ. ইরানীদের লুণ্ঠন ও নাদীর শাহের ভারত আক্রমণ ঃ

সম্রাট মুহাম্মদ শাহের শাসনামলে ইরান সম্রাট নাদীর শাহের ভারত আক্রমণের ফলে উপমাহাদেশের বুক থেকে মোঘল পরিবারের প্রতাপ ও ক্ষমতার শেষ চিহ্নটুকু ধুয়ে মুছে য়ায়। নাদীর শাহের রাজকোষ অর্থসংকট দেখা দিলে তা পূরণের জন্য মার্চ ১৭৩৮ সালে তিনি ভারত অভিযান শুরু করেন এবং কাবুল, কান্দাহার, পেশোয়াঁরি, জালালাবাদ, লাহোর জয় করে জানুয়ারী ১৭৩৯ সালে দিল্লী দখল করেন। তবে তিনি মুহাম্মদ শাহের সিংহাসন রক্ষায় প্রতিশ্রুত ছিলেন। এসময় দিল্লীর জনগণ কর্তৃক ৩০০০ ইরানী নিহত হলে প্রতিশোধ স্পৃহায় নাদীর শাহ গণহত্যার নির্দেশ দেন। ফলে মাত্র ৫ ঘন্টার ব্যবধানে দিল্লীর রাজপথ ২০ হাজার লোকের তাজাখুনে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। অবশেষে মার্চ ১৭৩৯ সালে নাদীর শাহ্ দিল্লীর রাজকোষ শূন্য করে ৭০ কোটি রূপি নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

ছ. ইংরেজদের বিহার ও বাংলায় আধিপত্য বিস্তার ঃ

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অন্যতম কারণ হল বাণিজ্যের ছদ্মাবরণে উপমাহাদেশের রানীতিতে ইংরেজদের অনুপ্রেবেশ। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ২১৮ জন ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নামে একটি বানিজ্যিক সংস্থা খুলে ভারতে আসে এবং ব্যবসার ছদ্মবরণে ভারতের অভ্যন্তরে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মারাঠা, শিখ ও জাঠদের সাথে সন্ধি করে ক্রমেই তারা উপমাহাদেশে শক্তিশালী হয়ে উঠে, কর্ণাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধে ফরাসীদের পরাজিত করে মাংগালোর, কর্নাটক ও বিহারে নিজেদেরে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। অবশেষে ইংরেজরা বঙ্গ দেশের

রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে এবং মীরজাফর, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ ও রায়দূর্লভ প্রমুখ বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাকে ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে পরাজিত করে বাংলা বিহার-উড়িষ্যায় নিজেদের শাসনদণ্ড প্রতিষ্ঠা করে।

জ. অর্থনৈতিক দুরবস্থা ঃ

ঐতিহাসিকদের মতে মোঘল সাম্রাজ্যর পতনের অন্যতম কারণ হল অর্থনৈতিক দুরবস্থা। চরম অর্থনৈতিক সংকটের ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অসৎ রীতি-নীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সেনাবাহিনী তাদের নির্ধারিত বেতন না পাওয়ায় নির্বিবাদে হত্যা, লুণ্ঠন চালায়। ফলে প্রশাসনিক অবকাঠামো চুরমার হয়ে যায়।

ঝ. হিন্দু মুসলিম আত্মঘাতী সংঘর্ষ ঃ

এদেশে হিন্দু ও মুসলমানরা প্রধান দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করে আসছিল। ১৬৫৬ সালে শিবাজী খালেছ হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মানসে পিতার দেওয়া জায়গীরকে কেন্দ্রকরে কনকানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলে এবং হিন্দুদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। আয়োজন করা হয় শিবাজী মেলার। এর ফলে হিন্দু মুসলিম বিদ্বেষ আবার দানা বাঁধতে শুরু করে। কখনো কখনো তা আত্মঘাতী সংঘর্ষের রূপ ধারণ করতে শুরু করে।

ঞ. ধর্মীয় বিষয়ে মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধ ঃ

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর যুগে ধর্মীয় বিষয়ে ভরতবর্ষের পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বহু ফেরকার মানুষ একই আবাসভূমিতে বসবাস করত। ফলে মুসলিম সমাজে বহু হিন্দুয়ানী রীতিনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। অধিকন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে শীয়াদের সঙ্গে সম্প্রতি স্থাপনের দরুন এ সমস্যা আরো প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। ফলে শিয়া সুন্নী বিরোধ প্রকট রূপ ধারণ করে। সর্বত্র অবৈধ রেওয়াজ, কবর পূজা, নজর-নেওয়াজ ইত্যাদির সয়লাব চলতে থাকে। এভাবে মুসলমানগণ ঈমানের সূষমা হতে বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. সামাজের এসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি উপলব্ধি করেন, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ব্যতীত এসব সংকট থেকে উত্তরণের কোন পথ নেই। তাই তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তাছাড়া দরবারে রিসালাতের নির্দেশও তাঁর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার পিছনে অন্যতম কারণ হিসাবে কাজ করে।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর রাজনৈতিক কার্যক্রম ঃ

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. মোঘল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক অবক্ষয় রোধ করার জন্য ১১৩৩ হিজরীতে মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে ফিরে এসে যে বৈপ্লবিক আন্দোলনের গোড়পত্তন করেন, তার কার্যক্রম দু'ভাবে বিভক্ত।

১) পরোক্ষ রাজনৈতিক কার্যক্রম বা চিন্তাধারার বিনির্মাণ।

২) প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যক্রম।

১. পরোক্ষ রাজনৈতিক কার্যক্রম ঃ

রাজনীতির মূল কথা হল আদর্শ ভিত্তিক দেশ পরিচালনার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে জনমত তৈরি করা। এ ক্ষেত্রে সফলতার মূলভিত্তি হল দুটি। (১) নির্ভুল ও পরিমার্জিত আদর্শ। (২) আর সেই আদর্শের সফল বাস্তবায়ন। সফল বাস্ত বায়নের পূর্বশর্ত হল উক্ত আদর্শের প্রতি অনুরক্ত একদল বলিষ্ঠ, প্রত্যয়ী ও নিষ্ঠাবান কর্মীবাহিনী।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ধর্ম ও আত্মিক উৎকর্ষে বিশ্বাসী (মুসলমান হিন্দু বৌদ্ধ ইত্যাদি) বহু জাতিক ভারতে মুসলিম আধিপত্য যখন পতনোম্মুখ এবং ইউরোপীয় বস্তুবাদী জীবন-দর্শনের ধাক্কায় ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস যখন টল টলায়মান ঠিক তখনই শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. জন্ম গ্রহণ করেন। দীর্ঘ অধ্যায়ন ও ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, ইসলামী আদর্শই হতে পারে আগত দিনে ভারতবর্ষের মানুষের জন্য সুস্থ রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিকাশের একমাত্র নিয়ামক এবং এই আদর্শের সামগ্রিক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ঠেকানো যেতে পারে ইউরোপীয় বস্তুবাদী ও ভোগবাদী দর্শনের ধ্বংসাত্মক সায়লাব। তাই তিনি ইসলামী জীবনাদর্শকে উপমহাদেশীয় পরিসরে সুস্পষ্ট ও যুগোপযোগী ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণ করেন। ইসলামের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক দিকগুলোকে সুবিন্যস্তভাবে তুলে ধরার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন তীব্রভাবে। তিনি মনে করতেন যে, কুরআনে কারীমই হল সঞ্জীবনী শক্তি, যার সর্বজনীন ও কালজয়ী আদর্শ মানুষকে মুক্ত করতে পারে। এ কারণে তিনি সর্ব সাধারণ পর্যন্ত কুরআনের আবেদনকে পৌঁছে দেয়ার সাহসী প্রয়াস গ্রহণ করেন।

আগত পৃথিবীর যুক্তিবাদী ধ্যানধারণার প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে তিনি ইসলামের সকল বিধি-বিধানকে যুক্তির আলোকে বোধগম্য করে তোলার বলিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। উপমহাদেশে তিনিই সর্বপ্রথম কুরআনে বর্ণিত অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয়সমূহকে বিষয় ভিত্তিক বিন্যস্ত করে ইসলামের সর্বজনীনতা ও সামগ্রিকতাকে তুলে ধরে গোটা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দেন। তিনি নির্জীব মৃয়মান মুসলিম জাতির অবক্ষয়ী চেতনাকে একটি তেজদীপ্ত গতিশীল বৈপ্লবিক খাতে প্রবাহিত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কুরআনের শাশ্বত পয়গাম মানুষকে যে গতিশীল ও সজীব জীবনের পথে আহবান জানায়, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মুসলিম মানসের সেই চেতনায় মর্চে ধরে গেছে। তাই তিনি সব কিছুকে ঢেলে আবার নতুন করে সাজাতে সচেষ্ট হয়েছিলন।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, পতনোম্মুখ মোঘল রাজক্ষমতা অনিবার্য ভাবেই অবলুপ্ত হতে চলেছে। এর পর এদেশে ক্ষমতার যে নতুন মেরুকরণ হবে তাতে সম্ভাবনাময় শক্তি হিসাবে অনেকেই রয়েছে। যদি

ভারতে আদর্শিক চেতনার নতুন কোন বিপ্লব না ঘটে, অবস্থা এরকমই থেকে যায়, আর ইউরোপীয় দেশসমূহে গণতন্ত্রের যে জোয়ার শুরু হয়েছে তার সায়লাব ভারত বর্ষ পর্যন্ত গড়ায়, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরাই আবার ক্ষমতার শীর্ষে চলে যাবে। আর দেশীয় রাজন্যবর্গের আত্মকলহের সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তির অনুপ্রবেশ এদেশের ইতিহাসের এক নির্মম বাস্তবতা, দারিয়ুস, সাইরাস, আলেকজান্ডার, মৌর্য, শক, ক্ষত্রপ, পাণ্ডব, হুন, এফথেলাইটদের আগ্রাসনের ইতিহাসতো সর্বজন বিধিত। অতএব আলমগীর রাহ. এর পরবর্তীতে দেশময় রাজন্যবর্গের মাঝে যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছিল, তাতে যে কোন আগ্রাসী শক্তিও হয়ে যেতে পারে আগামী দিনে ভারতের ভাগ্য বিধাতা। এছাড়া শিখ, শিয়া, জাঠ, মারাঠা এদের সম্ভাবনাকেও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। অন্যদিকে দীর্ঘদিনের মুসলিম শাসনের ঐতিহ্যকে সম্বল করে যদি ইসলামী আদর্শের জোয়ার সৃষ্টি করা যায়, আর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কুরআন সুন্নাহর নির্দেশিত ন্যায় ভিত্তিক ইনসাফের শাসন প্রবর্তন করা যায়, তাহলে এর ছায়াতলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল বর্ণের মানুষই শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সুস্থ ও সুন্দর জীবনের সন্ধান পাবে। আর এই পথে ভারতে মুসলিম শাসনের ঐতিহ্যকে যেমন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসীশক্তি ও ভোগবাদী ধ্বংসাত্মক জীবন দর্শনের সায়লাব থেকে আধ্যাত্মবাদী ভারতের সকল ধর্মের ঐতিহ্য ও আদর্শকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে।

অবশিষ্ট মোঘল রাজশক্তির বোধোদয় ঘটিয়ে যদি ভারতকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করিয়ে দেয়া যায় তাহলেই নির্বিঘ্নে সফলতার কাঙ্খিত মঞ্জিলে পৌঁছা সহজ হবে মনে করেই তিনি ভবিষ্যত সম্পর্কে হুশিয়ার করে মোঘল সম্রাট ও আমীর উমারাদেরকে বিভিন্ন বার চিঠি পত্র লিখেন। এসব চিঠিতে ভারতকে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণার প্রতি যেমন জোর আবেদন ছিল তেমনি প্রশাসনিক বিন্যাস ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকনির্দেশ সহ দেশের ভবিষ্যত সংকটের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছিল।

এ জন্যই তিনি ইযালাতুল খিফা গ্রন্থে ইসলামী রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র প্রধানের গুণাবলী, প্রশাসনিক অবকাঠামোর রূপ রেখা সুবিন্যস্তভাবে তুলে ধরেছেন। সার কথা, শাহ সাহেব মৃতপ্রায় মুসলিম উম্মাহর মাঝে ইসলামী জাগরণের নতুন জোয়ার সৃষ্টির জন্য যে চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে ছিলেন মূলতঃ এটিই পরবর্তীতে ভারতবর্ষে মুসলমানদের পুনঃজাগরণের একটি মাইল ফলক হয়ে কাজ করেছে। তিনি তাঁর ক্ষুরধার লিখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে মৃতপ্রায় জাতির মাঝে চেতনার যে নতুন জোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন তাই ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হয়ে দারুল হরব ঘোষণার মাধ্যমে, বালাকোটের শহীদানদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে, শ্যামলীর ইসলামী সরকারের প্রত্যয়ী ভূমিকার মাধ্যমে, দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের নিরব ভূমিকার মাঝদিয়ে স্বাধীনতার সুফল হয়ে বিকশিত হয়।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. দীর্ঘদিন উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারছিলেন, মুসলিম সাম্রাজ্যকে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশক্তির আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন সমাজের সর্বত্র এহইয়ায়ে দ্বীন তথা সংস্কার ও পুনঃগঠন। আর এর জন্য প্রয়োজন একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জামাতের, প্রয়োজন একটি ব্যাপক ও দীর্ঘ মেয়াদী আন্দোলনের। তাই শাহ সাহেব মাদারিস কেন্দ্রিক ব্যক্তি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ব্যক্তি গঠনে তিনি নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

ক. ইসলামী শারইয়্যাহ-এর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদান ঃ

শাহ সাহেব জানতেন, ইসলামী শারইয়্যাহ-এর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদান ব্যতীত সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব নয়। তাই তার মহান কর্মসুচীর চূড়ান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি একটি জামাতকে হাতে কলমে ইসলামী শারইয়্যাহ-এর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদান করেন।

খ. তাসাওউফের শিক্ষাদান ঃ

শাহ সাহেব সংস্কার আন্দোলন শুরু করে ছিলেন মক্কার ইসলামী আন্দোলনের আদর্শকে সামনে রেখে। তিনি তাসাওউফের বায়'আতকে রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর মতে, প্রকৃত যোগ্যতার অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র অস্ত্রের সাহায্যে কেউ হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। অস্ত্র বলে হয়ত হুকুমত উচ্ছেদ করা যেতে পারে কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের সংস্থাপন না হওয়া পর্যন্ত নতুন সরকারকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। তাই তিনি তাঁর জামাতের প্রত্যেক সদস্যকে তাসাওউফে দীক্ষিত করেন। সে চেতনার উত্তরাধিকারী রূপে ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠে শাহ আব্দুল আযীয, শাহ মুহাম্মদ ইসহাক, সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ, মাওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ এর মত মহান ব্যক্তিবর্গ।

গ. জনসমক্ষে ওয়াজ নসিহত ও গ্রন্থ প্রণয়ন ঃ শাহ সাহেব তার অর্ন্তদৃষ্টি দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন, জিহাদ ব্যতীত উপমহাদেশের মুসলিম সাম্রাজ্যের আসন্ন বিপর্যয়কে এড়ানো সম্ভব নয়। তাই তিনি সর্ব প্রথম জনগণের মানসিকতা গঠনের লক্ষ্যে দিল্লীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ওয়াজন নসীহত শুরু করেন। তিনি তাঁর বৈপ্লবিক চেতনাকে বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেন। তার বৈপ্লবিক কর্ম তালিকা অনুসারে সর্ব প্রথম তিনি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা ছিল ফার্সি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ, যা তৎকালিন রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গণে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

২. প্রত্যেক্ষ রাজনৈতিক কার্যক্রম ঃ

ক. মোঘল সম্রাটদের নিকট পত্র প্রেরণ ঃ

শাহ সাহেব দিল্লীর জনগণকে সচেতন ও জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত করার সাথে সাথে তৎকালের ঐশ্বর্য ও বিলাস প্রিয় সম্রাটদের নিকট উপদেশ সম্বলিত বহু পত্র

প্রেরণ করেন। এসব পত্রে তিনি তার সুতীক্ষ্ণ মেধার আলোকে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন ক্রমান্বয়ে পতনের দিকে ধাবিত হওয়ার মূল কারণ ও পতনোম্মুখ পরিস্থিতি থেকে পুনরুদ্ধার লাভের বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে জরুরী পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি সমকালীন সম্রাটকে লেখা এক চিঠিতে বলেন-

(১) জাঠদের অধিকৃত অঞ্চল এবং তাদের দুর্গগুলা ধ্বংস করার জন্য অহরহ চেষ্টা চালাতে হবে। এ বর্বরদের পর্যুদস্ত করা প্রয়োজনীয় কাজগুলোর অন্যতম।

(২) খালেসার পরিসীমা অধিক বিস্তৃত করতে হবে। বিশেষ করে দিল্লীর আশে-পাশে আগ্রা, হাসার, গঙ্গানদী এবং সারহিন্দসহ সীমান্ত অঞ্চল খালেসার জন্য বর্ধিত করতে হবে।

(৩) বড় বড় আমীর বাছাই করতঃ তাদেরকে জায়গীর দিতে হবে। ছোট ছোটদের মনসবদারী দিতে হবে নগদ মূল্য।

(৪) যারা কোন হাঙ্গামায় মারাঠাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে জায়গীর, মনসব ও রাষ্ট্রীয় কাজ থেকে উচ্ছেদ করতে হবে।

(৫) সুশৃঙ্খলভাবে সেনাবাহিনী সজ্জিত করতে হবে।

(৬) মুসলমান বাদশাহ ও আমীরগণকে অবৈধ আরাম-আয়েশে লিপ্ত না হয়ে অতীত পাপ মুক্তির জন্য সরল অন্তরে তওবা করতে হবে এবং পরবর্তী জীবনে পাপ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

এরপর তিনি লিখেন, উল্লিখিত কথাগুলো যথারীতি পালন করলে সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতার জন্য অদৃশ্য সাহায্য অবতীর্ণ হবে। এটাই আমার আশা।

খ. মারাঠাদের প্রতিরোধে আহমদ শাহ আবদালীকে দিল্লীতে আনয়ন ঃ

শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. মুখোমুখি আলোচনা ও পত্রের মাধ্যমে মোঘল সম্রাটদের পতনোম্মুখ পরিস্থিতি থেকে পুনরুদ্ধার লাভের বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে বারংবার জরুরী পরামর্শ দিলেও মোঘল পরিবার তখন অধঃপতনের এত নিম্নগহ্বরে পৌঁছে গিয়েছিল যে, সেখান থেকে উঠে আসা তাদের পক্ষে সত্যিই দুস্কর ছিল। বলতে গেলে তারা মারাঠীদের আগ্রাসী তৎপরতার সম্মুখে অনেকটা অসহায় ছিল। অবশেষে নিরূপায় হয়ে দিল্লীর মুসলিম আধিপত্যের শেষ প্রদীপটুকু জ্বালিয়ে রাখার মানসে শাহ সাহেব দেশীয় অন্যান্য মুসলিম শক্তিগুলোর সহযোগিতা কামনা করেন। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে একটি বিপর্যয়মুক্ত মুসলিম শাসন ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি তদানিন্তন রোহিলা সর্দার আমীরুল উমারা নওয়াব নজীবুদ্দৌলা ও আফগান গভর্নর আহমদ শাহ আবদালীর প্রতি মনোনিবেশ করেন। তাঁর দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকার জন্য নজীবুদ্দৌলাই ছিল সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি। তাই তিনি তাকেই বিশেষ করে উদ্বুদ্ধ করেন এবং আহমদ শাহ আবদালীর সহযোগিতায় এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা চালান। তদানুযায়ী আহমদ শাহ আবদালী ১৭৫৭ সালে পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদেরকে

শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে রাজধানী দিল্লীকে তাদের কবলমুক্ত করেন এবং নজীবুদ্দৌলাকে দিল্লীর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

শাহ ওয়ালী উল্লাহর অনুরোধে ১৭৫৭ সালে আহমদ শাহ আবদালীর ভারত অভিযান শিখ ও মারাঠা শক্তিকে চরমভাবে বিধ্বস্ত করে। ফলে মোঘল পরিবারের জন্য পুনরায় ক্ষমতা অর্জন করে উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অজেয় শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার যথেষ্ঠ সুযোগ ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ বলেন, দিল্লীর মসনদের উত্তরাধিকার নিয়ে মোঘল পরিবারের কোন্দলের কারণে পানিপথের বিজয়ের সুফল কোন দেশপ্রেমিক মুসলমানের ভাগ্যে জোটেনি। বরং শিয়ারা আবার দিল্লীর সম্রাটের উপর জেঁকে বসে। শাহ সাহেব বুঝতে পারলেন, ঘুণে ধরা নিস্ক্রিয় সমাজ কাঠামো নিয়ে অনাগত রাজনৈতিক কঠিন সমস্যার মোকাবেলা সম্ভব নয়। তাই তিনি সংগ্রামের এক নতুন পথ বেছে নিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রত্যয়ের সাথে ঘোষণা করলেন 'ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দাও, নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোল'।

এরপর তিনি একটি নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁর রাজনৈতিক কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে শুরু করেন। তিনি তাঁর ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত ও তাসাওউফের দীক্ষায় দীক্ষিত জামাআত দ্বারা একটি সশস্ত্র আন্দোলন পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

গ. জিহাদের প্রশিক্ষণ দান ঃ

শাহ সাহেব জানতেন, জ্ঞান ও সাহিত্যের দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করা যায় কিন্তু কোন সাম্রাজ্য জয় করা যায় না। তাই শাহ সাহেব তাঁর শিষ্যদেরকে জিহাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি সুসংঘবদ্ধ বাহিনীতে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ঘ. মজবতু সংগঠন ঃ

শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. এক যুগ সাধনার পর তার স্বহস্তে গড়ে তোলা মহান জামাআতের সাহায্যে একটি মজবুত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেই এ সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা স্থির করেন। একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠন করেন এবং এর শাখা সারা দেশে ছড়িয়ে দেন। এভাবে শাহ ওয়ালী উল্লাহ কর্তৃক একটি শক্তিশালী মুসলিম সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে সাইয়্যিদ আহম্মদ শহীদ রাহ. এর নেতৃত্বে এ সংগঠন একটি অস্থায়ী সরকারের রূপ ধারণ করে। কিন্তু ১২৪৬ হিজরীর ২৭ শে জিলকদ মোতাবেক ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৬ মে শুক্রবার বালাকোটের ময়দানে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

শাহ ওয়ালী উল্লাহর আন্দোলনের ফলাফল ঃ

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর আন্দোলনের ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শুরু হয় তাঁর থেকে এবং শেষ হয় এক

শতাব্দীকাল পরে। এই এক শতাব্দীকালের মধ্যে এ আন্দোলনের পুরোভাগে তিনজন ইমাম বা জাতীয় নেতার আবির্ভাব ঘটে এবং একটি জাতীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১. ঈমাম ওয়ালী উল্লাহ ১৭৩১-১৭৬৩ খ্রীঃ। ২. ইমাম আব্দুল আযীয ১৭৬৩-১৮২৪ খ্রীঃ। ৩. ইমাম মুহাম্মদ ইসহাক ১৮২৪-১৮৪৬ খ্রী ঃ

শতাব্দীকাল ব্যাপীয়া এই আন্দোলনের প্রথম পর্যায় ব্যক্তি গঠন, জিহাদের প্রশিক্ষণ দান ও সংগঠনের মধ্যদিয়েই শেষ হয়।

আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ইমাম মুহাম্মদ ইসহাক রাহ. এর নেতৃত্বে ১৮৩১ সনে। এ সময় থেকেই শুরু হয় ইংরেজ বিরোধী নিয়মিত আন্দোলন ও সশস্ত্র সংগ্রাম। অনেক রক্ত ঝরিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা, ইংরেজদের কুটকৌশল ও আধুনিক মারণাস্ত্রের মুখ থেকে স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনা সম্ভব নয় বুঝেই আন্দোলনকে নতুন ধারায় প্রবাহিত করা হয়। ১৮৬৬ ইং প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলূম দেওবন্দ। আন্দোলন প্রবাহিত হয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক স্বচেতনতা সৃষ্টির খাতে।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান রাহ. এ আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা করেন। তৃতীয় পর্যায়ের এ আন্দোলনের মাধ্যমেই ভারত উপমহাদেশ ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত হয়।

উপসংহার ঃ উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহ. ছিলেন ইতিহাসের একজন সফল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি উপমহাদেশের এক কঠিন ক্রান্তিকালে আবির্ভূত হয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূচনা করেন তা বিশ্ব ইতিহাসে সত্যিই বিরল। তিনি বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন মতবাদের সংযোজন করেন। ভারতবর্ষের মুসলিম উম্মাহ সকল ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কাছে ঋণী হয়ে আছে।

ভারতবর্ষে বিদেশী বণিকদের আগমন ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর তৎপরতা

১৫০০ ইং -------- ১৮৫৭ ইং

ভারতবর্ষে বহিঃশক্তির অনুপ্রবেশ প্রাচীনকাল থেকেই অব্যাহত ছিল। এদেশের ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের কথা রূপকথার ন্যায় বিশ্বময় ছড়িয়ে ছিল। ধন-রত্নে পূর্ণ এ উপমহাদেশের প্রতি বহিঃবিশ্বের দৃষ্টি ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হত। ফলে বিভিন্ন দেশ থেকে বণিকেরা এদেশের ব্যবসা বাণিজ্য করতে আগমন করত।

আরবদের আগমন ও ইসলামের প্রভাব ঃ

৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মদীনায় রাসূলে কারীম সা. কর্তৃক ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাত্র এক শতাব্দীর মাঝে মুসলমানগণ পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা, স্পেন, মধ্য এশিয়া, এমনকি ভারত উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত দখল করে ইসলামের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক সোনালী অধ্যায়ের সূচনা হয়। ৭১০ খ্রীষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম এর সিন্ধু বিজয়ের মধ্য দিয়ে এখানে যে সত্য ও সুন্দরের বিজয় পতাকা উত্তীর্ণ হয়েছিল তা স্থির লক্ষ্যে পৌঁছে ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধে শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘুরীর বিজয় এবং চৌহান রাজ ও পৃথিরাজের পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে। মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ স্থাপন করে মুসিলম সুলতান ও বাদশাহগণ ন্যায় ও ইনসাফের শাসন দ্বারা এদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির জোয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইসলামী তাহজীব- তামাদ্দুনের সংমিশ্রণে ভারতবর্ষ পরিণত হয়েছিল এক স্বর্গীয় আবাসভূমিতে। দিগ্বিজয়ী আরবদের প্রতি অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। রামপ্রাণ গুপ্ত বলেন 'ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের অব্যবহতি পরেই মুসলমানগণ স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে ছিলেন। এ সময় হতে আরবগণ পরস্বাপহরণ মানষে বহুবার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন।' কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে অমূলক। অপর একজন প্রখ্যাত হিন্দু ঐতিহাসিক বলিষ্ঠ ভাষায় এর প্রতিবাদ করে বলেছেন যে, 'ভারতবর্ষে বলপূর্বক ইসলাম বিস্তার করা হয় নাই; কারণ ইতিহাসে অমুসলমানদের প্রতি অকথ্য নির্যাতনের কোন নজীর নাই। স্যার থমাস আরনল্ডের মতে অত্যাচারী ও নিপীড়কদের বর্বরতা অথবা গোঁড়া পন্থীদের নির্যাতনে ইসলাম ধর্ম প্রচারের মূল সূত্র পাওয়া যাবে না বরং সওদাগর ও ধর্ম প্রচারকদের আত্মত্যাগ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই ইসলাম পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে। ভারতবর্ষে সর্ব প্রথম মালাবারে মুসলমান আরব ব্যবসায়ীগণ আগমন করেন। পরবর্তীতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে এ উপমহাদেশে ইসলামী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

তুর্কীদের আগমন ঃ

রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের দিক থেকে আরবদের সিন্ধু বিজয় তেমন কোন কার্যকর ভূমিকা রাখেনি। আব্বাসীয় খলীফাদের শাসনামলে অর্থাৎ সিন্ধু অভিযানের প্রায় আড়াই শতাব্দী পর যে সব মুসলমান ভারতবর্ষে সামাজ্য বিস্তারের প্রয়াস পান তারা আরব ছিলেন না, তারা ছিলেন নব-দীক্ষিত তুর্কী মুসলমান। দুর্বল আব্বাসীয় খলিফাদের দরবারে তেজোদীপ্ত তুর্কীদের প্রাধান্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী বংশ -যা গজনী বংশ নামে পরিচিত ছিল– গজনীতে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন। পরে এরাই ভারত বর্ষের মুসলিম শাসনের স্থায়ী বুনিয়াদ গড়ে তোলেন এবং ৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকেন।

পর্তুগীজদের আগমন ঃ

ভৌগোলিক আবিস্কারের দিক থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন দুঃসাহসিক পর্তুগীজগণ। প্রিন্স হেনরী নাবিকদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সমুদ্র অভিযানের প্রশিক্ষণ দান করেছিলেন। ফলে তারা আফ্রিকার উপকুলীয় অঞ্চল সম্পর্কে জানতে পারে। ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দে তারা বিষুবরেখা অতিক্রম করে এবং ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে কঙ্গো পর্যন্ত অভিযান করে। ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত পর্তুগীজ নাবিক বার্থালোমিউডিয়াজ দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করেন। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ইয়ামুয়েলের পৃষ্ঠপোষকতায় ভাস্কো-দা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ পার হন এবং আরব নাবিকদের সহযোগিতায় ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ শে মে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। ভাস্কো-দা গামার ভারতবর্ষে আগমন একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগের সূচনা করে। কালিকটের স্থানীয় রাজা জামেরীন তাকে আতিথ্য দান করেন। তবে আরব বণিকদের সাথে মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়ায় ভাস্কো দা-গামা তিন মাস অবস্থানের পর ভারতবর্ষ ছাড়তে বাধ্য হন।

ভাস্কো-দা-গামার জলপথ আবিস্কারের পর এদেশে পর্তুগীজ বণিকগণ ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসতে শুরু করে। তারা সর্ব প্রথম ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে গোয়াতে তাদের কুঠি স্থাপন করে এবং ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে তা বাংলায় স্থানান্তরিত করে বলে জানা যায়।

এছাড়াও চট্টগ্রাম, সাতগাঁও, হুগলী প্রভৃতিস্থানে পর্তুগীজরা তাদের বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। পর্তুগীজদের কৃতিত্বপূর্ণ আমদানী রপ্তানীর ফলে হুগলী জনবহুল সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। তারা বিভিন্ন দেশ থেকে রেশমী কাপড়, লবঙ্গ, এলাচী, দারুচিনি, বাদাম ইত্যাদি বাংলাদেশে আমদানী করত। বাংলা থেকে চাল, ডাল, ঘি, তেল ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করত। কালক্রমে পুর্তগীজরা ব্যবসা বাণিজ্যের রীতিনীতি উপেক্ষা করে দেশীয় জনগণের উপর

নির্যাতন চালাতে শুরু করে এবং সরকারী শুল্ক ফাঁকি দিয়ে সরকারকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। এসব নানাবিধ কারণে সম্রাট শাহজাহান পুর্তগীজদের বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। কাশিম খাঁন ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে তার সেনাবাহিনী নিয়ে হুগলী দুর্গ অবরোধ করেন এবং তাদেরকে হুগলী থেকে বিতাড়িত করেন এবং বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান তাদেরকে চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ থেকে চিরতরে বিদায় করে দেন।

ওলন্দাজ ঃ

হল্যান্ডের একদল উৎসাহী বণিক ব্যবসার উদ্দেশ্যে ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে ডাচ ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে ভারতবর্ষে আগমন করে। তারা ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে মসলিপট্রমে, এবং ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে পুলিকটে কুঠি স্থাপন করে। বাংলায় ওলন্দাজদের প্রধান কুঠি ছিল চঁচুড়া (১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে) বালেশ্বর, কাশিম বাজার, বরা নগর প্রভৃতি স্থানে। ওলন্দাজরা এদেশ থেকে কাঁচা মাল রেশমী সুতা, সুতি বস্ত্র, চাল, ডাল প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী করত। সুমাত্রা, যাভা প্রভৃতি দ্বীপ থেকে বিভিন্ন প্রকার মশলা আমদানী করত। কালক্রমে তাদের বাণিজ্য বর্তমান মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় সীমিত হয়ে পড়ে।

দিনেমার ঃ

ডেনমার্কের অধিবাসীরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে দিনেমার ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে ভারতে আগমন করে এবং তারাও বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন করে। তাদের কুঠিগুলোর মাঝে ১৬৬৭ সালে ত্রিবাঙ্কুর ও শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত কুঠিদ্বয় ছিল প্রসিদ্ধ। কিন্তু বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে তেমন সুবিধা করতে না পেরে ১৭৪৫ সালে ইংরেজদের কাছে তাদের কুঠিগুলো বিক্রি করে উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যায়।

ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ঃ

ফরাসী সম্রাট চতুর্থ লুই-এর রাজত্বকালে তারই অর্থসচিব কোলবার্ট "ফরাসী ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী" গঠন করেন। সম্রাট এই কোম্পানীকে পর্যাপ্ত অর্থ ঋণ দান করেন। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঁসোয়া ক্যারো সর্ব প্রথম সুরাটে ফরাসী বাণিজ্য-কুঠি প্রতিষ্ঠা করেন। পরের বৎসর মারকারা মৌসলিপট্রমে অপর একটি কুঠি স্থাপন করেন। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের সন্নিকটে ওলন্দাজদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়, এবং ফরাসীগণ পরাজিত হয়। ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঁসোয়া মার্টিন ও লেসপিনে পন্ডিচেরিতে একটি ফরাসী উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নবাব শায়েস্তা খান ফরাসীদের বাংলায় চন্দন নগরে একটি বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন। ১৬৯০-৯২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝে চন্দন নগর একটি শক্তিশালী ফরাসী সুরক্ষিত কুঠিতে পরিণত হয়। ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে সেটি ওলন্দাজগণ কর্তৃক অধিকৃত হলে পুনরায় তা ফরাসীদের ফেরত দেয়া হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে

ফরাসী ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর অর্থবল হ্রাস পেলে মৌসুলিপট্রম, সুরাট ও সানটোমের কুঠি তারা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী কোম্পানী পুনরায় গঠিত হলে তারা মাহে ও কারিকল বন্দর পুনরুদ্ধার করে। বাংলায় ফরাসীরা বলেশ্বর, কাশিমবাজার, চন্দন নগর প্রভৃতি স্থানে কুঠি স্থাপন করে। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের পরে ইংরেজদের সাথে প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যে টিকে থাকার প্রশ্নে তারা ক্রমশ ঃ রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের মনোনিবেশ করেন।

বৃটেনিয়ান ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ঃ

পর্তুগীজদের সাফল্যজনক নৌ অভিযান ও সমুদ্র -বাণিজ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্য করার মানসে প্রাচ্যে আগমনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস ড্রেকের সমুদ্র পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ এবং ইংরেজ নৌ বহর কর্তৃক স্পেনীশ আর্মডার পরাজয় ইংরেজদের সমুদ্র অভিযানে উৎসাহিত করে। উপরন্তু, র‍্যালফফীচ এবং জন মিনডেনহল (১৫৮৫-১৫৯৯) প্রমুখ ইংরেজ পর্যটকদের বর্ণনায় ভারতবর্ষের অতুলনীয় বৈভব ও ঐশ্বর্যের কথা ইংরেজগণ জানতে পারে। ১৫৯১ হতে ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মাঝে জেমস ল্যাংকাষ্টার উত্তমাসা অন্তরীপ ও পেনাঙ্গে আগমণ করেন; ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বেনজামিন উড প্রাচ্যদেশে সমুদ্রাভিযান করেন; ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জন মিনডেনহল স্থলপথে লন্ডন হতে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং সাত বৎসর ভারতবর্ষে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি ভারতের বাণিজ্য সম্ভাবনার কথা স্বদেশী পত্র-পত্রিকায় তুলে ধরেন। ফলে প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য করার জন্য লন্ডনে ২১৮ জন সদস্য নিয়ে একটি বণিক সম্প্রদায় গঠিত হয় এবং রাণী প্রথম এলিজাবেথের নিকট হতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে তারা একটি সনদ লাভ করেন। পনের বৎসর মেয়াদ সম্পন্ন এই সনদে প্রাচ্য দেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এই বণিক সম্প্রদায়কে একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা হয়। এই বণিক সম্প্রদায়ই ইতিহাসে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী নামে পরিচিত। ইংরেজ বণিকগণ এদেশে আসার পর প্রধানতঃ দুই ধরনের তৎপরতা চালায়। যথা- (১) ব্যবসায়িক তৎপরতা (২) রাজনৈতিক তৎপরতা।

ব্যবসায়িক তৎপরতার বিস্তারিত বিবরণ ঃ

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তাদের তৎপরতাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন ও এদেশীয় সরকারের অনুমোদন লাভ। (খ) অপরাপর বণিকদের সাথে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা।

ক. বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন ও এদেশীয় সরকারের অনুমোদন লাভ ঃ

সুরাটে কুটি স্থাপন ঃ কোম্পানী প্রথম কয়েক বৎসর পৃথক পৃথকভাবে মসলা ব্যবসার জন্য কয়েকটি বাণিজ্য জাহাজ সুমাত্রা, মালাক্কা ও জবদ্বীপে প্রেরণ করে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপটেন হাকিন্স ইংল্যান্ডের

রাজা প্রথম জেমসের আদেশে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আগমণ করেন। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর হকিন্সের আবেদন ক্রমে সুরাটে ইংরেজদের একটি কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন। কিন্তু সুরাটের বণিকদের বিরোধিতা ও পূর্তুগীজদের প্ররোচনায় পরে এই অনুমোদন নাকচ করে দেয়া হয়।

আগ্রা, আহমদাবাদ, ভারুচ প্রভৃতিস্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন ঃ ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জেমস-'স্যার টমাস রো' কে জাহাঙ্গীরের দরবারে ইংরেজ দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। তিনি ১৬১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজদরবারে অবস্থান করেন। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ইংরেজ বণিকগণ বিশেষ কতকগুলি সুযোগ সুবিধা অর্জন করে, যদিও প্রচলিত কোন বাণিজ্য চুক্তি মোঘলদের সাথে সম্পাদিত হয়নি। ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে টমাসরোর ভারতবর্ষ ত্যাগের পূর্বে ইংরেজগণ সুরাট, আগ্রা, আহমদাবাদ, ভারুচ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে পুর্নোদ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে দেয়।

এছাড়াও ইংরেজগণ বাণিজ্যিক সুবিধার্থে নানাস্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। যেমন ঃ ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে, ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে মৌসলিপট্রমে প্রধান কেন্দ্র স্থাপন, আরামগাঁও নামে অপর একটি কুঠি স্থাপন এগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য। বাংলার হরিপুর ও বলেশ্বরে ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাদের কুঠি স্থাপিত হয়। ক্রমান্বয়ে পাটনা, কাশিম বাজার, ঢাকা ও রাজমহলসহ গোটা উপমহাদেশে তারা শক্তিশালী কুঠি স্থাপন করে ফেলে।

অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ লাভ ও কোম্পানীর আগ্রাসী তৎপরতা ঃ বণিক বেশী এই শ্বেত ভল্লুকেরা সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত হয়। অবশ্য ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও মোঘল সম্রাটদের আভ্যন্তরীণ জটিলতা তাদেরকে এই সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রভাবশালী ডাইরেক্টর স্যার যশুয়া চাইল্ড সর্বপ্রথম রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই নীতির অনুসরণে যশুয়া চাইল্ডের ভ্রাতা স্যার জন চাইল্ড বোম্বাই বন্দর অবরোধ করেন এবং মোঘল বন্দরসমূহ হতে নৌবহর আটক করেন। ইংরেজদের এহেন রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে মোঘলসম্রাট আওরঙ্গকে ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের সমুচিত শিক্ষা প্রদানের জন্য বোম্বাই দখলের আদেশ দেন। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জন চাইল্ড ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং উভয় পক্ষের স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরেজগণ দেড় লক্ষ টাকা এবং অধিকৃত অঞ্চলসমূহ ফেরত দিতে অঙ্গীকার করে।

বাংলায় ক্রমবর্ধমান ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারে মোঘলগণ শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং ইঙ্গ-মোঘল সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হতে সংগৃহীত পণ্যের জন্য ইংরেজদের স্থানীয় শুল্কনীতি অনুসারে কর দিতে হত। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার শাহ সুজা মাত্র তিনি হাজার টাকা বাৎসরিক খাজনার

বিনিময়ে ইংরেজদের বাংলায় শুল্ক মুক্ত অবাধ বাণিজ্য করার সুযোগ প্রদান করেন। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খাঁন ইংরেজদের বিনাশুল্কে অবাধ বাণিজ্য করার অনুমতি দেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং আওরঙ্গজেব পণ্য দ্রব্যের উপর শতকরা দু'টাকা ছাড়াও দেড় টাকা জিযিয়া কর হিসাবে প্রদানের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে সমগ্র সাম্রাজ্যে ইংরেজদের অবাধে বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়ে ফরমান জারী করেন।

ইংরেজদের সামরিক প্রস্তুতি ঃ

এ দিকে মোঘলদের অধীনস্থ স্থানীয় কর্মচারীগণ লোভের কারণে ইংরেজদের কাছ থেকে অবৈধ কর আদায় করতে শুরু করে। কখনও তাদের পণ্যও বাজেয়াপ্ত করে ফেলা হত। এই অজুহাত দেখিয়ে হুগলীর ইংরেজ কুঠিয়াল সাহেবরা তাদের কুঠি সুরক্ষিত করে অত্যাচারী কর্মচারীদের বাধা প্রদানের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ইংরেজগণ বলপূর্বক হুগলী দখল করলে মোঘলদের সাথে সংঘর্ষ হয় এবং শায়েস্তা খান হুগলী দখল করে ক্ষমতালিপ্সু ইংরেজদের শুধুমাত্র শায়েস্তাই করেননি বরং বাংলা হতে বিতাড়িত করেন। বিচক্ষণ ইংরেজ জবচার্নক আওরঙ্গজেবের অনুমতি নিয়ে বর্তমান কলিকাতার শোভাবাজার এলাকায় যা সুতানটি নামে পরিচিত ছিল- স্বগোত্রীয়দের নিয়ে ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি বসতি স্থাপন করেন। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপটেন উইলিয়ম হীমের নেতৃত্বে একটি নৌ বহর চট্টগ্রাম অধিকার করলে মোঘলদের সঙ্গে পুনরায় সংঘর্ষ শুরু হয়। ফলে জবচার্নক সুতানটি ত্যাগে বাধ্য হয়।

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে মোম্বাইয়ের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আওরঙ্গজেবের চুক্তি হলে জব চার্নক পুনরায় বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে সুবাদার ইব্রাহিম খান সম্রাটের আদেশক্রমে ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যের অনুমতি দেন।

১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ তাদের বাণিজ্য কুঠিকে জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে রক্ষার অজুহাতে সেগুলোকে দুর্গে পরিণত করার সুযোগ লাভ করে এবং এর ফলে বাংলায় তাদের ব্যবসা বাণিজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির সুদৃঢ় ভীত তৈরী হয়। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ বাৎসরিক বার শত টাকা খাজনা প্রদানের অঙ্গীকার ভিত্তিতে কলিকাতা (কালীঘাট), সুতানটি, গোবিন্দপুর নামে ৩টি গ্রামের জমিদারী লাভ করেন। পরবর্তীকালে এটিই মহানগরী কলিকাতায় রূপান্তরিত হয়।

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের তদানিন্তন রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামানুসারে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তির অভ্যূত্থানের প্রধান তিনটি কেন্দ্রে পরিণত হয়।

১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে একটি বিলের মাধ্যমে ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী নামে অপর একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। পুরাতন ও নতুন কোম্পানীর মধ্যে দ্বন্দ্ব

বেধে গেলে ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে এ দু'টি কোম্পানী যৌথভাবে 'ইউনাইটেড ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' নামে পরিচিত হয় এবং ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ কোম্পানী যৌথ ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে।

ফররুখ শিয়রের ফরমান ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের পথ সুগম হয়। ১৭১৫ খ্রীঃ কলিকাতা হতে ইংরেজ দূত জন সুরমান মোঘল সম্রাট ফররুখ শিয়রের দরবারে উপস্থিত হয়ে সমগ্র মোঘল সাম্রাজ্যে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের চেষ্টা করেন। জন সুরমানের সঙ্গে চিকিৎসক হ্যামিলটনও দিল্লীতে আগমন করেন এবং ফররুখ শিয়রের কঠিন অসুখের চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে তোলেন। এতে সম্রাট ইংরেজদের উপর প্রীত হয়ে ফরমান জারী করে সকল প্রদেশের সুবাদারকে ইংরেজদেরকে সকল প্রকার বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের আদেশ দেন। এ ফরমানের বদৌলতে ইংরেজরা বিনাশুল্কে বাৎসরিক মাত্র ৩০০০ টাকা খাজনা প্রদানের অঙ্গীকারে বাংলায় একচেটিয়া ব্যবসা করার অধিকার লাভ করে এবং কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ইজারা নেয়ার অধিকারও তারা লাভ করে। বাৎসরিক ১০,০০০ টাকার বিনিময়ে বিনা শুল্কে তারা সুরাটে অবাধ বাণিজ্য করতে থাকে। এই ফরমান বলেই কোম্পানী বোম্বাইয়ে মুদ্রা ছেপে সমগ্র মোঘল সাম্রাজ্যে চালু করে। ঐতিহাসিক ওরমে এই ফরমানকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 'ম্যাগনা কার্টা' অথবা মহাসনদ বলে অভিহিত করে।

আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঃ

সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর দিল্লীর সরকার আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে দেশীয় রাজন্যবর্গ স্ব- স্ব অঞ্চলে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। যেমন, দাক্ষিণাত্যে নিযামুল মুলক, অযোধ্যায় সাদাত খান, বাংলায় নবাব আলীবর্দী খান প্রভৃতি। এদিকে আঞ্চলিক অমুসলিম বিদ্রোহী শক্তিগুলো আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যেমন, মারাঠা, জাঠ, শিখ, রাজপুত প্রভৃতি। এসব কারণে উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মারাত্মক বিশৃংখলা দেখা দেয়, ফলে ইংরেজরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে।

খ. অপরাপর বণিক সম্প্রদায়ের সাথে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা ঃ

বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ইংরেজদেরকে এদেশে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক দলের সাথে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হয়। কিন্তু ফরাসী বণিক শ্রেণী এক্ষেত্রে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধে ফরাসীরা পরাজিত হলে এদেশে ইংরেজ বণিকদের একচ্ছত্র বাণিজ্যিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার বিবরণ ঃ

ধূর্ত ইংরেজরা তাদের বাণিজ্যিক ভিত্তি মজবুত করার পাশাপাশি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্নেও মেতে ওঠে। তাই রাজক্ষমতা দখল এবং তা চিরস্থায়ী করার জন্য ইংরেজগণ বিভিন্নমুখী তৎপরতা চালায়। তাদের এই কর্মতৎপরতাকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(ক) পলাশীর যুদ্ধ ও বাংলার ক্ষমতা দখল।

(খ) সাম্রাজ্য বিস্তার।

(গ) শাসন শোষণের ভিত চিরস্থায়ী করণের প্রচেষ্টা।

ক. পলাশীর যুদ্ধ ও বাংলার ক্ষমতা দখল ঃ

ইংরেজরা সর্বপ্রথম বাংলার স্বাধীনতা সূর্য ছিনিয়ে নেয়। ক্রমান্বয়ে একে কেন্দ্র করে গোটা ভারতবর্ষে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এদেশের স্বাধীনতা সূর্য ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তারা যে ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করেছিল তা নিম্নরূপ।

উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক বিশৃংখলার সুযোগ নিয়ে ইংরেজগণ রাজনীতিতে হস্ত ক্ষেপ শুরু করে। যার কারণে তারা সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করতে থাকে। ফোর্ট উইলিয়াম ঘাটিকে শক্তিশালী সামরিক দুর্গে পরিণত করে নবাবের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

এ সময়ে তারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের এক সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়ে যায়। দেশীয় বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, রায় দুর্লভ, জগৎশেঠ ও ঘসেটি বেগম সিরাজুদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। কোম্পানীর প্রধান লর্ড ক্লাইভ এই সুযোগ লুফে নিয়ে তাদেরকে নবাবের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই মর্মে তাদের মাঝে একটি গোপন চুক্তিও স্বাক্ষতির হয় এবং যুদ্ধে জয় লাভের পর মীরজাফরকে ক্ষমতায় বসানো এবং ক্লাইভের পুরস্কারের বিষয়টিও নির্ধারিত হয়ে যায়।

১৭৫৬ ইং সালে নবাব সিরাজ উদ্দৌলা বাংলা বিহার উড়িষ্যায় ক্ষমতা লাভ করেন। তার দু'মাস পর কতিপয় বিদ্রোহী পালিয়ে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলে নবাব তাদেরকে গ্রেফতার করে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা নবাবের এই নির্দেশকে অমান্য করে। বাংলার ননাব সিরাজুদ্দৌলা তাদের এ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে ভীষণ ক্ষুব্ধ হন এবং কলিকাতা আক্রমণ করে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করে নেন। পরে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভ কলিকাতা দুর্গ পুনঃদখল করে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন। ফলে ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন পলাশীর আম্রকাননে ইংরেজ বাহি-নীর সাথে নবাব সিরাজুদ্দৌলার প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে দরবারী আমলা ও

মীরজাফরদের বিশ্বাস ঘাতকতার ফলে নবাবের বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। ফলে সারা বাংলায় ইংরেজদের আধিপত্য সৃষ্টি হয়।

পলাশীর যুদ্ধের পর গোপন চুক্তি অনুযায়ী মীরজাফরকে ক্ষমতায় বসানো হয়। কিন্তু সে ইংরেজদের চুক্তি পুরোপুরি পালন করতে ব্যর্থ হলে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে মীর কাশিমকে বাংলার মসনদে বসানো হয়। কিন্তু মীর কাশিম ছিলেন স্বাধীন চেতা মানুষ। ইংরেজদের অধীনতা তিনি সহ্য করতে না পারায় তাদের সাথে সংঘর্ষ বাধে। অবশেষে মীর কাশিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং বাংলার মসনদ পুনরুদ্ধার কল্পে মোঘল সম্রাট শাহ আলমের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। অতপর তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মোঘল সম্রাট শাহ আলমকে সঙ্গে নিয়ে এক মৈত্রীজোট গঠন করেন। এই ত্রিপক্ষীয় যুক্ত বাহিনী ১৭৬৪ সালের ২২শে অক্টোবর ইংরেজ সেনাপতি মেজর হেক্টর মুলরোর বিরুদ্ধে বক্সারের যুদ্ধে মুখোমুখি হয়। যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। মীর কাশিম পালিয়ে নিরুদ্ধেশ হন এবং সম্রাট শাহ আলম গোলামী চুক্তিতে স্বাক্ষর করে দিল্লীতে ফিরে যান। এ সন্ধি অনুসারে দিল্লীর লাল কেল্লা ও তৎপার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চল ব্যতীত অবশিষ্ট মোঘল সম্রাজ্য ইংরেজদের দখলে চলে যায়।

খ. সাম্রাজ্য বিস্তার ঃ

সম্রাট শাহ আলমের সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ফলে গোটা উপমহাদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তিসমূহ দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

১। ইংরেজ পক্ষ অবলম্বনকারী নতজানু সম্প্রদায়। যেমন, দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম, অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌলা, হায়দারাবাদের নবাব নিযাম, শিখ শক্তি প্রভৃতি।

২। স্বাধীতাকামী শক্তি। যেমন রোহিলা খণ্ডের পাঠান রাজন্যবর্গ, মহীশুরের সুলতান ফতেহ আলী টিপু, মারাঠাদের বিভিন্ন দল প্রভৃতি।

স্বাধীনতাকামী শক্তিগুলোকে অবদমিত করার জন্য ইংরেজরা যেসব কুট-কৌশলের অশ্রয় নেয় এবং ঘৃন্যনীতি অবলম্বন করে তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) পরস্পরের উস্কে দেয়ার নীতি ঃ স্বাধীনতাকামী শক্তিসমূহকে দুর্বল করে ফেলার জন্য ইংরেজরা সর্বপ্রথম দেশীয় রাজন্যবর্গের মাঝে পারস্পরিক বিদ্বেষ সৃষ্টির প্রয়াস চালায়। এই চাল প্রয়োগ করে রোহীলা খণ্ডের স্বাধীনতাকামী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে উস্কে দেয়। ফলে সুজাউদ্দৌলা ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বাহিনীর সহায়তায় রোহিলা নেতা হাফেজ রহমত খানের বিরুদ্ধে মীরণপুর কাটারার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে রহমত খান পরাজিত ও নিহত হলে রোহিলাদের পতন ঘটে। এ ছাড়াও ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষ উস্কে দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে রাখা ছিল তাদের শাসননীতির এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য

(২) অধিনতামূলক মিত্রতা নীতি ঃ রোহিলা অধিকৃত হওয়ার পর ইংরেজরা অপর স্বাধীনতাকামী শক্তি সুলতান ফতেহ আলী টিপুর দিকে মনোনিবেশ করে। তার বিরুদ্ধে দেশীয় রাজন্যবর্গকে উস্কে দেয় এবং টিপুর বিরুদ্ধে তাদেরকে সামরিক সাহায্য প্রদান করে। তিন তিন বার যুদ্ধের পর যখন তাকে কাবু করা সম্ভব হলনা, তখন ওয়েলেসলি টিপুকে এই নীতি গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তিনি তা অপমানজনক মনে করে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে ওয়েলেসলি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং দেশীয় রাজন্যবর্গকে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। অবশেষে হায়দরাবাদের নিযামকে টাকার বিনিময়ে ও রাজনৈতিক স্বার্থের লোভ দেখিয়ে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে। আপন সেনাপতি মীর সাদেকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ১৭৯৯ সালে ইংরেজ ও নিযামের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে মালভেলীর ময়দানে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা পাগল টিপু শহীদ হন। এভাবে টিপুর রাজ্য ইংরেজদের দখলে চলে আসে। ওয়েলেসলি মারাঠাদেরকেও এই নীতি গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালে তারাও তা প্রত্যাখ্যান করায় তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করে। দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধে জয় লাভের পর ফটক, সিন্ধিয়া প্রভৃতি ইংরেজদের দখলে চলে আসে।

ইংরেজ কর্তৃক দিল্লী দখল ঃ আহমদ শাহ আবদালী চলে যাওয়ার পর দিল্লীর সরকারের দুর্বলতার সুযোগে মারাঠিরা আবার লাল কেল্লা দখল করে নেয়। যদিও তাদের পূর্বের শৌর্যবীর্য ছিল না, তবু দিল্লীর সরকার তাদের চেয়েও দুর্বল ছিল। মারাঠিদের দমনের অজুহাতে ইংরেজ সেনাপতি লর্ডলেক ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লী অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন। মারাঠিনেতা সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে মারাঠিরা ইংরেজদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসলেও তারা পরাজিত হয়। শেষ রক্ষার তাড়নায় আমীর খান ও হোলকার খান ইংরেজদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন, কিন্তু ইংরেজ শক্তিকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। ফলে সকলকে সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হয়। এভাবেই ইংরেজরা দিল্লী দখল করে নিয়ে এ মর্মে ঘোষণা দেয় যে, ভারতবর্ষের প্রশাসনিক নীতি এখন থেকে এরূপ হবে যে 'সৃষ্টি আল্লাহর, সাম্রাজ্য সম্রাটের, আর প্রশাসন নীতি চলবে কোম্পানীর।'

এহেন পরিস্থিতি দৃষ্টেই হযরত শাহ আঃ আযীয রাহ. ভারতকে দারুল হরব ঘোষণা করেন। ফলে দেশীয় রাজন্যবর্গ ও স্বাধীনতাকামী শক্তিগুলো ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে একদিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় হয়নি। সম্মিলিত বাহিনীতে ছিল মারাঠিদের নেতা মহারাজ যশোবন্তরাও, হোলকার, দৌলত রাও, সিন্দিয়া, রোহিলা খন্ডের নেতা আমীর খান, মধ্য ভারতের নেতা সর্দার করিম খাঁর নেতৃত্বে পিন্ডারী নামক যাযাবরদের একটি দল। মারাঠিরা তেমন শৌর্যবীর্য দেখাতে পারেনি। আত্মকলহের শিকার হয়ে তাদের এক নেতা বাজিরাও পেশওয়া কে অপসারণ করে, ফলে তার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মহারাজ হোলকারও পরাজয়ের লক্ষণ

দেখে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। পিন্ডারী নেতা চীতু আত্মসমর্পন করেন।

যুদ্ধ শেষে ধূর্ত ইংরেজরা একেকজনকে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের অধিপতি বানিয়ে দিয়ে তাদের সাম্রাজ্যকে নিষ্কন্টক করে তোলে। পরবর্তীতে লর্ড হেস্টিংস ১৮১৮ সালে মারাঠার তৃতীয় যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করে হোলকার ও ভোসলা রাজ্য অধিকার করেন। এ ছাড়া লর্ড এলেনবারার ১৮৪৩ সালে কোন যৌক্তিকতা ছাড়াই সিন্ধু অঞ্চল কুক্ষিগত করে ইংরেজ রাজ্যভূক্ত করেন।

(৩) পর রাজ্য দখল নীতি ঃ শক্তি প্রয়োগ করে বা প্রত্যক্ষ যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্য দখল। এই নীতি অবলম্বন করে ইংরেজগণ উপমহাদেশের অধিকাংশ রাজ্য দখল করে নেয়। লর্ড ডালহৌসী এই নীতির ভিত্তিতে ১৮৪৮ সালের দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের মাধ্যমে সমগ্র পাঞ্জাব এবং ১৮৫২ সালের দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের মাধ্যমে পেংগু প্রদেশ দখল করে নেয়।

বর্তন নীতি বা স্বত্ব বিলোপ নীতি ঃ এই নীতির মূল কথা ছিল বৃটিশের অধীন বা বৃটিশ শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট কোন দেশীয় রাজ্যের রাজবংশের কোন উত্তরাধিকারী না থাকলে রাজ্যগুলো সরাসরি বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যাবে। ডালহৌসী এই নীতি প্রয়োগ করে সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি রাজ্য দখল করেন।

প্রজাহিতের অজুহাতে রাজ্য দখল নীতি ঃ

কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যার নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করে ডালহৌসী বিশাল অযোধ্যা রাজ্যটি অধিকার করে নেন। নিযামের বেরায় প্রদেশ, সিকিম প্রভৃতি রাজ্যও একই অজুহাতে দখল করা হয়। এভাবে একদিন গোটা উপমহাদেশ ইংরেজদের দখলে চলে যায় এবং গোটা উপমহাদেশের মানুষ কার্যতঃ তাদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে।

গ. শাসন শোষণ সংক্রান্ত কর্ম তৎপরতা ঃ

বিশাল উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য ইংরেজরা এ দেশের জনসাধারণের উপর নির্যাতনের স্টীমরোলার চালায়। এদেশের মানুষকে দাবিয়ে রাখার জন্য তারা যে সমস্ত কর্মতৎপরতা চালায় সেগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১. অর্থনৈতিক আগ্রাসন ও শোষণ। ২. রাজনৈতিক নির্যাতন ও হয়রানি। ৩. ধর্মীয় আগ্রাসন। ৪. শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আগ্রাসন।

এ সকল ক্ষেত্রে তাদের আগ্রাসন ও নির্যাতনের উপর বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে।

উপসংহার ঃ ভারতীয় উপমহাদেশে আগত বিদেশী বণিকদের মাঝে ইংরেজরা দীর্ঘ প্রায় ২'শ বছর পর্যন্ত রাজত্ব করে। ফলে ভারতীয় মুসলিম শাসনের ঐতিহ্য ধ্বংস হয়ে পড়ে। যার কারণে গোটা ভারতবর্ষে নেমে আসে এক নৈরাশ্যের অমানিশা। মূলতঃ উনবিংশ শতকের শুরুর দিকে যখন ইংরেজ কর্তৃক দিল্লীর মসনদের ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে পড়ে তখন থেকেই এ দেশের মানুষ স্বাধীনতার

প্রশ্নকে সুদূর পরাহত ভাবতে শুরু করে। বলতে গেলে স্বাধীনতার পক্ষশক্তি বলতে আর কোন শক্তিই অবশিষ্ট ছিল না। দেশের সাধারণ মানুষ ভাগ্যকে মেনে নিয়ে ইংরেজ শাসনকে ইচছায় অনিচ্ছায় গ্রহণ করে নিয়েছিল।

কিন্তু তখনও একটি শক্তি অতি বিচক্ষণতার সাথে স্বাধীনতার স্বপক্ষে আন্দোলনের চেতনা বিলিয়ে যাচ্ছিল। শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ.-এর চেতনার উত্তরসুরী ও সুযোগ্য সন্তান হযরত মাওঃ শাহ আব্দুল আযীয রাহ. এর নেতৃত্বে চির স্বাধীনতাকামী আলেম সমাজ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার নিরবচ্ছিন্ন মেহনত চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ইংরেজদের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র, পাহাড়সম শক্তি, তাদের নির্যাতন নিপীড়ন কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থাশীলতায় এগিয়ে যাচ্ছিলেন তারা আপন অভীষ্ঠ লক্ষ্যের পানে। স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তিগুলোকে একত্রিত করে একটি চূড়ান্ত লড়াইয়ের লক্ষ্যে আদর্শিক ও সামরিক শক্তি গড়ে তোলার জন্য তারা কাজ করে যাচিছলেন নিরবে নিরবচ্ছিন্নভাবে। তাদের মেহনতের বদৌলতেই পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতার চেতনা দানা বাধতে শরু করে[১]।

[১] গ্রন্থাপূঞ্জী : ভারতবর্ষের ইতিহাস, ডঃ এস এম হাসান কৃত, ভারত বর্ষের ইতিহাস প্রগতি প্রকাশন মস্কো, ভারত বর্ষে মুসলমানদের ইতিহাস, মুজাহিদ বাহিনীর ইতিবৃত্ত, শাহ ওয়ালি উল্লাহ ও তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা, টিপু সুলতান, ভারত বর্ষের ইতিহাস, তারিখে দাওয়াত ও আযীমাত ইত্যাদি।

ইমাম শাহ আব্দুল আযীয রাহ. এর জীবন ও সাধনা

১৭৪৬ ইং ...... ১৮২৮ ইং
আহমদ শাহ্ ...... বৃটিশ শাসন

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সূর্য যখন অস্তগ্রামী, বিদেশী বেনিয়াদের আগ্রাসনের শিকার যখন এদেশের মানুষ; আগ্রাসী শক্তির তৎপরতা প্রতিরোধে কিংকর্তব্যবিমূঢ় যখন এদেশের মুসলমান, ঠিক এহেন দুর্যোগপূর্ণ সময়ে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে যিনি রাহনুমায়ী করে ছিলেন এদেশের মানুষকে, ইতিহাসে 'তিনি সিরাজুল হিন্দ' নামে পরিচিত।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ তাঁর প্রকৃত নাম শাহ আব্দুল আযীয, তাঁকে গোলাম হালীম নামেও ডাকা হত, অনেকেই তাকে 'হুজ্জাতুল্লাহ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি ছিলেন শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এর অন্যতম সন্তান। সিরাজুলহিন্দ শাহ্ আব্দুল আযীয রাহ. ১৭৪৬ ইং মোতাবেক ১১৫৯ হিজরীর ২৫ শে রমযান দিবাগত রাত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। খুব অল্প বয়সেই পবিত্র কুরআন শরীফ হিফজ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর পিতার নিকট থেকেই শুরু হয়। পিতার নিকট থেকেই সকল বিষয়ের ইলম হাসিল করতে থাকেন। ক্রমে সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জনে সক্ষম হন। ১২ বছর বয়সে পিতার ইন্তেকালের পর শায়েখ নুরুল্লাহ বুরহানুবী, শায়েখ মুহাঃ আমীন কাশ্মীরি এবং মাওলানা আশেক বিন উবায়দুল্লাহ প্রমুখ বিজ্ঞ আলেমদের নিকট হাদীস ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। উপরোক্ত আলেমগণ শাহ ওয়ালী উল্লাহর আদর্শে উজ্জীবিত এবং বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উচ্চ দরজার আলেম ছিলেন। শাহ আব্দুল আযীয রহ. নিজেই এক পুস্তিকায় তাঁর গোটা শিক্ষাজীবনের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন। মোট কথা তখনকার আলিম সমাজ যে সব বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতেন তিনিও সে সব বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

তিনি দীর্ঘাঙ্গী ও ক্ষীণকায় ছিলেন। শরীরের রং ছিল বাদামী, চোখ দুটো বেশ টানা টানা ও প্রশস্ত ছিল। দাড়ি ছিল খুব ঘন ও কালো। তিনি সুন্দর হস্তাক্ষরের অধিকারী ছিলেন। তীর নিক্ষেপন, অশ্বারোহন, সঙ্গীতবিদ্যা ইত্যাদিতেও তাঁর বেশ দখল ছিল।

কর্ম জীবন ঃ ইমাম আব্দুল আযীয রাহ. এর বয়স যখন মাত্র সতের বছর তখনই পিতা শাহ ওয়ালী উল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পরিষদ তাকে ইমাম হিসেবে মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এজন্য তাকে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় পরিষদ উদ্যোগ গ্রহণ করে।

পিতার ইন্তেকালের পর তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার পাশাপাশি পিতার রেখে যাওয়া সংস্কার ও পুনর্গঠনের অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করতে আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি পাঠ্য পুস্তকে যে বিষয়গুলি ওয়ালী উল্লাহ রাহ. এর দর্শনের বিরোধী দেখতে পেতেন সে গুলির খুব সাবধানে সমালোচনা করতেন এবং পিতার রীতিতেই খুব সহজ সরল ও বোধগম্য ভাষায় তাঁর বক্তব্য ও যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করতেন। এভাবেই তিনি সাধারণ শিক্ষিত মানুষকে শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতবাদের সাথে পরিচিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। দীর্ঘ ষাট বছর পর্যন্ত তিনি এই প্রণালীতে কাজ করে যান। যার কারণে মানুষের মাঝে শাহ ওয়ালী উল্লাহর জ্ঞান-গবেষণা, চিন্তা- চেতনা ও দর্শন বদ্ধমূল হয়ে যায়। মোট কথা তিনি তার পিতার প্রবর্তিত কর্মসূচীকে সামনে রেখেই কর্ম জীবনের যাত্রা শুরু করেন।

তিনি তার লক্ষ্যে পৌছার জন্য কতগুলি কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলেন। যথা ঃ

(১) কুরআন প্রচার।

(২) ইলমে হাদীসের প্রচলন দান ও উন্নতি বিধান।

(৩) বাতিলের খণ্ডন ও হকের প্রতিষ্ঠা।

(৪) পিতার আদর্শে আদর্শবান কর্মীবাহিনী গঠন।

(৫) গণ জাগরণ সৃষ্টি।

১. কুরআনের প্রচার ঃ

শাহ ওয়ালী উল্লাহর চিন্তা ধারার সাথে শিক্ষিত সমাজকে পরিচিত করার লক্ষ্যে এবং সর্ব সাধারণের ঈমান আক্বীদা দুরস্ত করে তাদের অন্তরে সরাসরি কুরআনের আবেদন পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে শাহ আব্দুল আযীয রাহ. সর্ব প্রথম গ্রন্থ রচনার কাজে হাত দেন। প্রথমে তিনি তাঁর পিতার অসমাপ্ত তাফসীর সমাপ্ত করার কাজ শুরু করেন, যা তাঁর পিতা সুরা নিসার ১৩ আয়াত পর্যন্ত করার পর ইন্তেকাল করেছিলেন। কিন্তু তিনিও সেটি সমাপ্ত করতে পারেননি। পরবর্তীতে তাঁর পুত্র শাহ ইসহাক এটাকে সমাপ্ত করেন। এছাড়া তিনি শাহ ওয়ালী উল্লাহ কর্তৃক লিখিত তাফসীরে "ফতহুর রহমান"কে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করার জন্য তাফসীরে-আযীযী লিখেন। তাফসীরে আযীযী অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য তাফসীর। এর মাধ্যমেই তিনি সর্বসাধারণের কাছে কুরআনের মর্মার্থ তুলে ধরেছেন।

ইলমে হাদীসের প্রচলন দান ও উন্নতি সাধন ঃ উপ মহাদেশে হাদীসকে পাঠ্যক্রমের শীর্ষে স্থান দেওয়ার বিষয়টি শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. চালু করে গিয়েছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর শাহ আঃ আযীয রাহ. ও ইলমে হাদীসের যে বিশাল খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন পৃথিবীতে তার নজির মেলা ভার। তিনি অন্তত চৌষট্টি বছর ইলমে হাদীসের খিদমাত করেছেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সিহাহ সিত্তাহ্-এর দরস ছাড়াও নিজেই অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের কিতাব লিখে গেছেন। তিনি তাঁর লিখিত 'নুজহাতুল খাওয়াতির' নামক কিতাবে এমন চল্লিশজন মুহাদ্দিস এর নাম উল্লেখ করেছেন যারা যুগের অনন্য মুহাদ্দিস হিসেবে শুধু এই উপমহাদেশেই নয় বরং হিজাযসহ অনেক আরবীয় অঞ্চলেও হাদীসের খিদমাত করেছেন।

বাতিলের খণ্ডন ও হকের প্রতিষ্ঠা ঃ শিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে হযরত আবুবকর রা. হযরত উমর রা. এবং তাদের খিলাফতের প্রতি যে সব মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল সেগুলির প্রতিবাদে শাহ ওয়ালী উল্লাহ তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইযালাতুল খিফা' রচনা করেছিলেন, আর শাহ আঃ আযীয রাহ. এরই ভূমিকা স্বরূপ 'তুহফায়ে ইসনা আশারিয়া' রচনা করেন। শিয়াদের বিভ্রান্তির কবল থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্যই তিনি এটা লিখেছিলেন। মানুষ এটাকে সাদরে গ্রহণ করলেও এটা লেখার আসল উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কারণ মানুষ এর মাধ্যমে শাহ ওয়ালী উল্লাহর লেখা ইযালাতুল খিফা বুঝার চেষ্টা করেনি।

এছাড়াও শিরক বিদ'আত ইত্যাদির মূলোৎপাটন এবং যাবতীয় আত্মিক ব্যাধি থেকে মানুষকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তাঁর অভিযান ছিল অনন্য।

কর্মী বাহিনী গঠন ঃ শাহ আব্দুল আযীয রাহ. কর্তৃক গৃহীত ব্যাপক আন্দোলন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ ছিল। এ পরিষদের সদস্য ছিলেন হযরত ইসমাইল শহীদ, সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ এবং মাওলানা আব্দুল হাই। এই নব গঠিত পরিষদের আমীর ছিলেন শাহ মুহা. ইসহাক। সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ ছিলেন সংগ্রাম বিভাগের আহ্বায়ক ও আমীর। এই সংগ্রামী পরিষদের মাধ্যমে শাহ আব্দুল আযীয রাহ. দিল্লীর মসনদকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এ পরিষদ ছিল একটি অস্থায়ী সরকারের ন্যায়। তবে দিল্লীকে একাজের জন্য তেমন অনুকূল মনে না করায় এই পষিদের কেন্দ্রকে সীমান্ত প্রদেশে স্থানান্তরিত করা হয়।

মোট কথা এই পরিষদের মাধ্যমেই শাহ আঃ আযীয রাহ. শাহ ওয়ালী উল্লাহর চিন্তা-চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ একটি মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে ছিলেন।

গণজাগরণ সৃষ্টি ঃ বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী ও মুজাহিদ তৈরি হয়ে যাওয়ার পর শাহ আব্দুল আযীয (রাহঃ) জনসাধারণের মাঝে আন্দোলনকে ব্যাপক করে তোলার লক্ষ্যে প্রতি সপ্তাহে মঙ্গল ও শুক্রবার দিল্লীর কুচাচিলান মাদ্রাসায় দু'টি করে জনসভা করতে শুরু করেন। সমাবেশে সভ্রান্ত বিশিষ্ট এবং সাধারণ লোকের বিরাট সমাগম হতে লাগল। দলমত নির্বিশেষে সকলেই তাঁর বক্তৃতা পছন্দ করত, যার ফলে অল্পদিনের মাঝেই এই নিয়মিত বক্তৃতা জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক সাড়া সৃষ্টি করে। তিনি এই মাহফিলে এমন নিয়মিতভাবে উপস্থিত হতেন যে, গুরুতর অসুস্থাবস্থায়ও মাহফিলের নির্দিষ্ট তারিখে তাকে শয্যা থেকে তুলে দিতে বলতেন এবং ওয়াজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যকারীদেরকে দূরে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন। ওয়াজ এবং বক্তৃতার এই সাধারণ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শাহ আব্দুল আযীয রাহ. কর্তৃক গঠিত পরিষদের সদস্যগণ তাঁরই নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে উচ্চ ও সাধারণ শ্রেণীর মানুষকে সচেতন ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পুস্তক রচনা করতে আরম্ভ করেন। বিশিষ্ট লোকজনদের জন্য

মাওলানা রফিউদ্দীন 'আসরারুল মুহাব্বাত' এবং 'তাকমীলুল আযহান' প্রণয়ন করেন। এছাড়াও তিনি আরো অনেক ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। মূলতঃ এগুলো সবই ছিল শাহ ওয়ালী উল্লাহর চিন্তা ধারার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।

রচনাবলী ঃ তাফসীরের মাঝে তার প্রসিদ্ধ তাফসীর হল 'ফতহুল আযীয'। যার বেশির ভাগ অংশ ১৮৫৭ এর গোলযোগের সময় নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। এখন শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাওয়া যায়। ফতওয়ার ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'আল ফাতাওয়া ফিল মাসাইলিল মুশাককাকাহ', শিয়াদের প্রতিরোধে 'তুহফায়ে ইসনা আশারিয়্যাহ', হাদীস ও মুহাদ্দেসীনদের সম্পর্কে 'বুস্তানুল মুহাদ্দেসীন', উসূলে হাদীসের ক্ষেত্রে 'আল-উজালাতুন নাফেআহ', ইলমে বালাগাতে 'মিযানুল বালাগাহ', কালাম শাস্ত্রে 'মিযানুল কালাম', খোলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কে 'সিররুল জলীল ফি মাস'আলাতিত তাফযীল', শাহাদাতে কারবালা সম্পর্কে 'সিররুশ শাহাদাতাইন' ইত্যাদি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

মৃত্যু ঃ দীর্ঘ ৭৮ বৎসরের কর্মময় জীবন পাড়ি দিয়ে এ-মহান কৃতিপুরুষ ৭ই শাওয়াল ১২৩৯ হিজরী মুতাবিক ৬ই মে ১৮২৮ ইংরেজি সালে ইহধাম ত্যাগ করেন। পিতা শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. এর কবরের পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

শাহ আঃ আযীয রাহ.-এর যুগে ভারতের অবস্থা ঃ

শাহ ওয়ালী উল্লাহর ইন্তেকালের পরে ভারতের অবস্থা দ্রুত পরিবর্তন হতে শুরু করে। তার যুগে দিল্লীতে মুসলিম রাজত্বের প্রাণ কিছুই বাকি ছিল না। খাস দিল্লীতেই ইংরেজ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিল। দিল্লীর নামে মাত্র সম্রাট ছিল ইংরেজদের হাতের ক্রীড়নক, ইংরেজদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করার অধিকার ছিল না দিল্লীর সম্রাটের।

ঐতিহাসিক দারুল হরব ঘোষণা

শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট ইউরোপের পুঁজিবাদী গোষ্ঠী কাঁচামাল আহরণ ও নয়া বাজারের তালাশে পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং যে কোন মূল্যে সাম্রাজ্য বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনে আদা জল খেয়ে লেগে যায়। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ইমানুয়েল-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ভাস্কোদাগামা উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে এবং আরব বণিকদের সহযোগিতায় ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ শে মে তৎকালীন পৃথিবীর সবচাইতে সমৃদ্ধ নগরী বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের রাস্তা আবিষ্কার করার ফলে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জুয়াদের সামনে এক নয়া দিগন্ত খুলে যায়। দলে দলে তারা এসে ভীড় জমাতে থাকে এই উপমহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিম উপকুলে। তারা ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রাণী প্রথম এলিজাবেথের কাছ থেকে একটি বাণিজ্য সনদ নিয়ে ভারতবর্ষে পদার্পণ করে। এই বণিক সম্প্রদায়ই ইতিহাসে বৃটেনিয়ান ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী নামে পরিচিত। কিন্তু বণিকবেশী এই সাম্রাজ্যবাদীরা এদেশের রাজন্যবর্গের আভ্যন্তরীণ কলহ ও দুর্বলতার সুযোগে এদেশের রাজনীতিতে হস্ত

ক্ষেপ করতে শুরু করে এবং নানা ধরণের কুট ষড়যন্ত্র ও কলাকৌশল অবলম্বন করতে থাকে। অবশেষে এদেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের যোগসাজশে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মসনদের উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নেয়। যেহেতু এই অঞ্চল ইতিপূর্বেই দিল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তাই দিল্লীর সম্রাটরা তখন এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। কিংবা বলা যায় যে, সামর্থের অভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাগুলো সামলানোই তাদের জন্য দুরূহ ছিল, ফলে তারা এদিকে মনোনিবেশ করতে পারেননি।

পরবর্তীতে মীর কাসিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিল্লীর সম্রাটের নিকট সাহায্য চাইলে সুজাউদ্দৌলার পরামর্শে বিহার দখলের মানসে সুজাউদ্দৌলাকে সংগে নিয়ে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ ইং ২৩ শে অক্টোবর) মীর কাসিমের বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শাহ আলম ইংরেজদের হাতে বন্দি হয়। অবশেষে দিল্লীর লালকিল্লাসহ আশপাশের কিছু অঞ্চল ছাড়া অবশিষ্ট সাম্রাজ্য নামে মাত্র করের বিনিময়ে ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার হীন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে শাহ আলম দিল্লীতে ফিরে যান।

দেশের কতিপয় রাজন্যবর্গ ইংরেজদের ক্ষমতার দাপট দেখে এবং তাদের দেওয়া প্রলোভনের শিকার হয়ে তাদের অধীনতা স্বীকার করে নিলেও রুহিলা খণ্ডের পাঠান রাজন্যবর্গ ও মহিশুরের স্বাধীনতাকামী সম্রাট ফতেহ আলী টিপু তখনও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বদেশের স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা পাগল টিপুকে অবদমিত করার জন্য কূট কৌশলে পারদর্শী ইংরেজরা প্রলোভন দেখিয়ে দেশীয় রাজন্যবর্গকে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লেলিয়ে দেয় এবং নিজেরা তাদের মিত্রশক্তি সেজে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। পরপর তিনবার যুদ্ধ করেও তাকে অবদমিত করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে হায়দারাবাদের নিযাম ও সেনাপতি মীর সাদেকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মালভেলীর ময়দানে ইংরেজদের মদদপুষ্ট দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের সম্মিলিত বাহিনীর মুখোমুখি হতে হয় দেশ প্রেমিক সংগ্রামী সুলতান টিপুকে। দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন বাজি রেখে তিনি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। এভাবেই নিঃশেষ হয়ে যায় এদেশের স্বাধীনতাকামী দেশ প্রেমিকদের সংগ্রামী ভূমিকা।

আহমদ শাহ আব্দালীর সহযোগিতায় দিল্লীর সম্রাটরা মারাঠীদের প্রভাব থেকে মুক্ত হলেও তাদের নিজেদের দুর্বলতার কারণে আবার মারাঠীরা লাল কিল্লা দখল করে নেয়।

মারাঠীদের দমন করার অজুহাতে ইংরেজ সেনাপতি লর্ডলেক ১৮০৩ সালে দিল্লী অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করলে মারাঠী নেতা সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে মারাঠীরা

ইংরেজদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। কিন্তু তারা পরাজিত হয়। এ সময় দেশীয় অবশিষ্ট স্বাধীনতাকামী রাজন্যবর্গ যথাঃ আমির খান, হোলকার খান সহ কতিপয় নেতৃবৃন্দ শেষ রক্ষার তাড়নায় এগিয়ে আসলেও তেমন সুফল হয়নি বরং পরাজিত হয়ে তাদেরকে সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয়। এভাবেই ইংরেজরা দিল্লী দখল করে নিয়ে এ মর্মে ফরমান জারি করেন যে, এখন থেকে ভারতের প্রশাসনিক নীতি এই হবে যে, সৃষ্টি আল্লাহর, সাম্রাজ্য সম্রাটের, আর প্রশাসন ও কর্তৃত্ব চলবে কোম্পানীর।

ইংরেজরা ক্ষমতা দখল করে নেওয়ার পর এদেশের মানুষের উপর নির্যাতনের যে বিভীষিকা সৃষ্টি করে, অর্থ সম্পদ শোষণের যে দস্যুবৃত্তি তারা শুরু করে, এদেশের মানুষের শিক্ষা সাংস্কৃতি, তাহজীব তামাদ্দুনের উপর তারা যে আগ্রাসী তৎপরতা চালায় এবং ক্ষমতার আসনকে পাকা পোক্ত করার জন্য তারা যে হীন ও জঘন্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে লোমহর্ষক নির্যাতনের শিকার হয় এই উপমহাদেশের মানুষ। বৃটিশ বেনিয়া সাম্রাজ্যবাদীরা স্বাধীনতাকামী মানুষের উপর নির্যাতনের পাশাপাশি একদল পদলেহী খোশামুদে গোষ্ঠীও তৈরি করার প্রয়াস গ্রহণ করে; যারা সাম্রাজ্যবাদী শাসনকেই দেশবাসীর জন্য কল্যাণকর বলে প্রচার চালাতে থাকে।

উপমহাদেশের সূর্য সন্তান শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. বস্তুবাদী সভ্যতার বিধ্বংসী সায়লাব থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য এবং 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' এর আদর্শিক চেতনাকে সমুন্নত রাখার জন্য কুরআন সুন্নাহ ও আকাবিরে দ্বীনের তাশরীহাতের আলোকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও সমাজ সভ্যতার অভিনব দর্শন পেশ করে জাতিকে যে বেগবান ও কার্যকরী কর্মসূচি উপহার দিয়েছিলেন, সেই আলোকে গড়ে উঠা আন্দোলনের দিল্লীতে তখন নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তারই সুযোগ্য সন্তান শাহ আব্দুল আযীয রাহ. । পিতৃপ্রদত্ত কর্মসূচীর আলোকে নয়া বিপ্লবের জন্য তিনি তখন লোক গড়ে চলেছেন।

তিনি যখন এহেন পরিস্থিতি অবলোকনে অনুধাবন করতে পারলেন যে, দেশ সম্পুর্ণভাবে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের করতলগত। তারা দিল্লীর নামে মাত্র ক্ষমতাসীন সম্রাট থেকে এই মর্মে ফরমান আদায় করেনিয়েছে যে, এখন থেকে বাদশাহ সালামতের রাজ্যে ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীরই হুকুম চলবে। সেদিন (১৮০৬ খ্রীঃ) তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ফতওয়া ঘোষণা করলেন- 'ভারত এখন দারুল হরব (শত্রুকবলিত এলাকা) সুতরাং প্রতিটি ভারতবাসীর কর্তব্য হল একে স্বাধীন করা'।

ফতওয়ার প্রতিক্রিয়া ঃ

দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল এই ফতওয়ার ঘোষণা। ভ্রান্ত প্রচারণায় দ্বিধাগ্রস্থ উম্মতের অনেকেই পেয়ে গেল সঠিক সিদ্ধান্ত, কর্তব্য হল সুনিশ্চিত। জ্বলে উঠল স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষের হৃদয়ের বহ্নিশিখা। স্বাধীনতার ইতিহাসে সূচনা হল

নতুন এক অধ্যায়ের। আমীর খানের সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শহীদ সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. ও ইসমাঈল শহীদ রাহ. আব্দুল হাই রাহ. এর নেতৃত্বে জমায়েত হতে থাকল স্বাধীনতা কামী মুজাহিদ বাহিনী। দিল্লী থেকে মুজাহিদ বাহিনীর কেন্দ্র স্থানান্ত রিত হল সীমান্ত প্রদেশে। দলে দলে লোক সমবেত হতে থাকে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাহাড়ের পাদদেশে সিত্তানা দুর্গে। কিন্তু ইংরেজদের হীন ষড়যন্ত্রে জগৎ শেঠ ও রায়দুর্লভদের প্রেতাত্মাদের বিশ্বাসঘাতকতায় ঐতিহাসিক বালাকোটের প্রান্ত রে রক্তের আখরে লিখা হল মুক্তিপাগল স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের নাম। কিন্তু তবু সে আন্দোলন থেমে যায় নি বরং সে আন্দোলনই ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হয়ে ১৮৫৭ সালে এসে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতাকামী আলিম সমাজের নেতৃত্বে সর্বব্যাপী তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ (স্বাধীনতা আন্দোলন) এর রূপ পরিগ্রহ করে। শ্যামেলীতে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন থানা ভবন সরকার। সেই চেতনার ফলশ্রুতিতেই প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দ। যার সূর্য-সন্তানেরা জীবন বাজী রেখে সর্বব্যাপীয়া গণজাগরণ সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করে। ক্রমান্বয়ে সঞ্জীবিত হয় স্বাধীনতার চেতনা। ইংরেজ খেদাও, অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন ইত্যাকার বহু আন্দোলনের পথ মাড়িয়ে আবার উদিত হয় স্বাধীনতার সূর্য। সরে যেতে বাধ্য হয়, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা। মানুষ ফিরে পায় স্বাধীন জীবনের অনাবিল আস্বাদ।

সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ রাহ. ও
তাঁর কর্মতৎপরতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শাহ আব্দুল আযীয রাহ.এর আধ্যাত্ম সাধনা, আদর্শিক চেতনা ও জিহাদী অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে যে সকল ব্যক্তিবর্গ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তাঁর দরবারে ছুটে এসে ছিলেন, হযরত সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. ছিলেন তাদের অন্যতম। আমরণ সংগ্রামী এই মর্দে মুজাহিদ ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার অন্তর্গত রায়বেরেলীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য জীবনেই তাঁর মাঝে সামরিক প্রতিভার স্বাক্ষর পরিলক্ষিত হয়। কথিত আছে যে, বাল্যকালে গাঁয়ের ছেলেদের সাথে খেলতে গিয়ে তিনি তাদেরকে দুই পক্ষে বিভক্ত করে খেলতেন যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। নিজে এক পক্ষের আমীর সেজে বাঁধিয়ে দিতেন তুমুল লড়াই। কাউকে শহীদ কাউকে গাজীর ভূমিকায় অভিনয় করিয়ে চরম তৃপ্তিবোধ করতেন তিনি। সমাজ সেবার প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। খেদমাতে খালক ও মানুষের সেবাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন জীবন ব্রত হিসাবে।

স্বদেশের উপর ইংরেজদের আগ্রাসী তৎপরতা বাল্যকাল থেকেই বিচলিত করে তুলেছি এই মহান মর্দে মুজাহিদকে। স্বদেশের মুক্তি ও মুসলিম ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন তাঁকে তাড়িত করত অহর্নিশ। ইসলাম সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান আহরণ ও আধ্যাত্মসাধনার মাধ্যমে মহান প্রতিপালকের সাথে আপন হৃদয়ের বন্ধনকে গভীর করা এবং ঐশী প্রেমের অমিয় ধারায় নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার এক তীব্র বাসনা তাঁকে তাড়িত করত ভীষণভাবে। তাই স্বদেশ ছেড়ে তিনি এসে উপস্থিত হন দিল্লীতে হযরত আব্দুল আযীয রাহ. এর দরবারে। প্রথম দর্শনেই আব্দুল আযীয রাহ.-এর অর্ন্তদৃষ্টিতে ধরা পরে যায় এই যুবকের সুপ্ত প্রতিভা। তিনি তালীম তরবিয়্যতের মাধ্যমে যোগ্য করে গড়ে তুলতে চাইলেন তাকে। কিন্তু পাঠে বসে সে যুবক বড় উদাসীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, যেন অমনোযোগী। কারণ জিজ্ঞাসা করলে যুবক জানাল, এমনিতে তার দৃষ্টি শক্তিতে কোন ত্রুটি নেই, কিন্তু দরসে বসলে কিতাবের পৃষ্ঠায় কোন কিছুই লেখা দেখতে পায় না সে। আর এটাই তার উদাসীনতার কারণ। শাহ আব্দুল আযীয রাহ. বুঝতে পারলেন, গতানুগতিক শিক্ষার প্রয়োজন হবে না তাঁর। প্রয়োজনীয় ইলম তাকে ঐশীভাবেই সরবরাহ করা হবে। তিনি তাকে তরবিয়্যাত করতঃ খিলাফত দিয়ে দিলেন। যুবক সাইয়্যিদ আহমদ ফিরে গেলেন স্বদেশে। শাহ আব্দুল আযীয রাহ. এর সান্নিধ্যে কাটানো দিনগুলোতে স্বদেশের আযাদীর যে দীক্ষা তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁকে স্থির থাকতে দেয়নি। কি করা যায় সে পরামর্শের জন্য ছুটে আসলেন আপন মুর্শিদের দরবারে ।

শাহ আব্দুল আযীয রাহ. ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে যে নিরব আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন তা যে একদিন সশস্ত্র আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে হবেই,

অন্যথায় আগ্রাসী শক্তির উচ্ছেদ যে সম্ভব হবে না; তা তিনি ভালভাবেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর মাঝে তিনি সুপ্ত সামরিক প্রতিভার ছাপ লক্ষ্য করেছিলেন। তাই আগামী দিনের সশস্ত্র আন্দোলনের পথ তৈরি করতে তিনি সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. কে পরামর্শ দিলেন সশস্ত্র বাহিনীতে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে।

রোহিলা খন্ডের নবাব আমীর খানকে দ্বীনদার ও দেশ প্রেমিক দেখে তিনি তার সেনাবাহিনীতেই গিয়ে ভর্তি হলেন। অল্প দিনেই অসাধারণ সামরিক প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হলেন তিনি। রাজপুতনা ও মালব প্রদেশের বিরুদ্ধে আমীর খান কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখালেন এই নতুন সৈনিক। দিনে দুঃসাহসী যোদ্ধা ও রাতে আল্লাহর দরবারে বিনয়াবনত ও রোনাযারীতে লিপ্ত এক ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তি হিসাবে সকলের দৃষ্টিতে সম্মানীয় হয়ে উঠলেন তিনি। স্বয়ং আমীর খানও তার ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ত্রিমুখী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আমীর খান ইংরেজদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। স্বদেশের স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত চিরস্বাধীন এই মহান সৈনিকের নিকট শত্রুর সাথে মিত্রতাকারী কোন শক্তির অধীনে চাকুরী করা আত্মমর্যাদার অবমাননা বলে মনে হল। চাকুরীতে ইস্তিফা দিয়ে ফিরে আসলেন তিনি আপন মুর্শিদের দরবারে। আমীর খাঁনের বাহিনীতে কর্মরত দিনগুলোর এই সামরিক অভিজ্ঞতা তাঁর জিহাদী জীবনের প্রাথমিক অনুশীলন হয়ে থাকল। তবে তিনি এই সত্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, ক্ষমতাসীনদের অধীনে চাকুরীর মাধ্যমে তিনি তাঁর কাংখিত গন্তব্যে পৌছতে সক্ষম হবেন না। কারণ ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার লিপ্সাই চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং ভারত স্বাধীনতার স্বপ্নকে সফল করতে হলে ইসলামী জীবনাদর্শে বিশ্বাসী, আল্লাহর উপর পরম আস্থাশীল একটি জেহাদী কাফেলা তৈরির কোনই বিকল্প নেই। বিশ্বাসঘাতক ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের অক্টোপাশ থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতার স্বপ্নকে সফল করতে হলে দেশাত্ববোধ ও আদর্শিক চেতনা সমৃদ্ধ একটি বাহিনী একান্ত অপরিহার্য।

এ সময় হযরত শাহ আব্দুল আযীয রাহ. এর কেন্দ্রীয় পরিষদ একটি সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হযরত সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. কে এই সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান করা হয় এবং শাহ আব্দুল আযীয রাহ.-এর আপন ভাতিজা মাওঃ শাহ ইসমাইল রাহ. ও জামাতা মাওঃ আব্দুল হাই রাহ. কে তাঁর উপদেষ্টা ও সহযোগী মনোনীত করা হয়। সাইয়্যিদ আহমদ রাহ.এর কর্মতৎপরতাকে ৪টি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

১. দাওয়াত ও ইসলাহী তৎপরতা।

২. স্বদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে জিহাদী চেতনা সৃষ্টি ও মুজাহিদ সংগ্রহের প্রয়াস।

৩. সংস্কারমূলক কর্ম তৎপরতা।

৪. জিহাদের ময়দানের সশস্ত্র তৎপরতা।

১. দাওয়াত ও ইসলাহী তৎপরতা

আপন মুর্শীদের ইশারায় যে মহৎ লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে আদর্শিক চেতনায় গণমানুষকে উদ্বুদ্ধ করতঃ সুদূর প্রসারী আদর্শিক বিপ্লবের পথ তৈরী করার মহৎ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি বেরিয়ে আসেন কর্মের ময়দানে। উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দূর-দূরান্তে সফর করে তিনি মানুষকে ইসলামের সুমহান আদর্শের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিতে থাকেন। তৎসঙ্গে স্বদেশের মুক্তির জন্য ইসলামের জিহাদী নীতি অনুসরণ করে একটি সশস্ত্র সংগ্রামের জন্যও দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। কুসংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ ঈমানী চেতনাই মানুষের আত্মশক্তিকে বলিয়ান করে তুলে। আল্লাহর উপর আস্থাশীলতা মানুষের হীনমন্যতাবোধকে বিদূরিত করে এবং আত্মপ্রত্যয়ের জন্ম দেয়। তাই তিনি মুক্তির জন্য ঈমানী শক্তির পুনরুত্থানকে অপরিহার্য্য মনে করতেন। এজন্য তিনি স্থানে স্থানে সফর করে মানুষের কাছে ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরতেন এবং তাদের থেকে আত্মশুদ্ধি ও জিহাদ এতদুভয়ের বায়'আত গ্রহণ করতেন। তার এই আত্মশুদ্ধির অভিযানের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে ঈমানের নতুন হাওয়া বইতে শুরু করে।

দাওয়াত ও ইরশাদের এ মিশন নিয়ে তিনি ১৮১৮ খ্রীঃ মুজাফফর নগর, সাহারানপুর, নিজগর, মুক্তেশ্বর, রায়বেরেলী, শাহজাহানপুর, বেনারস, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি এলাকায় গমন করলে স্থানীয় লোকরা তাঁকে ব্যাপক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে এবং দলে দলে লোক তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। হিদায়াতের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে তারা সীরাতে মুস্তাকীমের উপর চলার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করে। তাঁর এই সফরগুলোতে আশে পাশের অঞ্চলসমূহে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হত এবং তাকে দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ সমবেত হত। নির্ধারিত প্রোগ্রাম ছাড়াও পথে পথে অপেক্ষমান সমবেত জনতার বায়'আত গ্রহণের জন্য তাকে সফরে বিরতি দিতে হত। প্রথম সফর থেকে ফিরে এসে তিনি এলাহাবাদ, কানপুর, বেনারস, সুলতানপুর ইত্যাদি অঞ্চলেও সফর করেন। সর্বত্রই বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং মানুষ পঙ্গপালের ন্যায় তাঁর কাছে এসে বায়'আত গ্রহণ করতে থাকে। তাঁর রূহানী প্রভাব এত বেশী ছিল যে, তিনি যে এলাকায় গমন করতেন, সে এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হত এবং সে এলাকার পাপাচারীরা তাঁর ভয়ে পাপকার্য্য পরিত্যাগ করত। এমনকি পানশালা ও বেশ্যালয়গুলোতে পর্যন্ত মানুষের যাতায়াত বন্ধ হয়ে যেত।

মুরীদানের ইসলাহ ও তরবিয়ত দান এবং জিহাদী কার্যক্রম সুচারু রূপে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তিনি স্থানে স্থানে মারকায তৈরি করেছিলেন। তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করার পর মানুষের মাঝে যে দ্বীনি জযবা ও ঈমানী চেতনা সৃষ্টি হত তাকে ধরে রাখার জন্যই মূলতঃ ছিল এই সব কেন্দ্র। যারা তাঁর কাছে বায়'আত হত তিনি তাদেরকে তরবিয়্যাত দান করতেন এবং সুন্নতের অনুসরণের জন্য

বিশেষভাবে তাকীদ করতেন। সুন্নতের তালীম ও জিহাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে তিনি তাদেরকে স্থানীয় মারকাযের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিতেন। আর যারা তাঁর সান্নিধ্যে থাকার জন্য আগ্রহী হত তাদেরকে নিজের সফর সঙ্গী করে নিতেন।

২. জিহাদী চেতনা সৃষ্টি ও মুজাহিদ সংগ্রহ ঃ

সফরের সময় তাঁর মৌলিক কর্মসূচী হত মানুষের কাছ থেকে তরীকতের বায়'আত গ্রহণ এবং একই সঙ্গে জিহাদ ফী সাবীলিল্লার বায়'আত গ্রহণ। সে সময় আধ্যাত্মবাদী সুফীরা তরীকতের ধারাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে, জিহাদকে তারা তাসাউফের পরিপন্থী বলে মনে করত। হযরত বেরলভী রাহ. আধ্যাত্ম ধারার এ বিভ্রান্তির অপনোদন করেন। তিনি আত্মসাধনা ও জিহাদের সংমিশ্রন ঘটিয়ে প্রচলিত ধারার বিপরীতে একটি স্বতন্ত্র ধারার সূচনা করেন। তিনি তার নাম দিয়েছিলেন 'তরীকায়ে মুহাম্মদিয়্যাহ'। তিনি বায়'আত করানোর সময় 'আওর মুহাম্মদিয়াহ' শব্দিটি সংযোজন করে জিহাদী চেতনার প্রতি ইঙ্গিত করতেন। তিনি নিজে অধিকাংশ সময় সমরাস্ত্রে সজ্জিত থাকতেন। মুরীদানদের জন্য সামরিক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। মাঝে মাঝে সামরিক মহড়া ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করা হত।

একই সঙ্গে ব্যাপক গণসংযোগের মাধ্যমে সারা দেশে স্বাধীনতার স্বপক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি, জিহাদের ফযীলত বর্ণনা এবং বর্তমানের প্রেক্ষিতে জিহাদের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে মানুষকে জিহাদের প্রতি অনুপ্রাণিত করা, অনুপ্রাণিতদের সংগঠিত করে সামরিক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা এবং সর্বাত্মক জিহাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার লক্ষ্যে জনগণকে জিহাদ ফান্ডে অর্থদানের জন্য অনুপ্রাণিত করা ইত্যাদি তাঁর সফরের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এজন্য আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোকে অর্থ ও মুজাহিদ সংগ্রহের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হত। কথিত আছে যে, ৪০ হাজারেরও বেশি হিন্দু সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর হাতে বায়'আত হয়ে মুসলমান হয়েছিল এবং তিন লক্ষ মুসলমান সরাসরি তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিল। তাঁর খলিফাদের মাধ্যমে দুনিয়া ব্যাপী যত মানুষ তার তরীকায় বায়'আত গ্রহণ করেছিল তাদের সংখ্যা ছিল অগণিত।

৩. তাঁর সংস্কার মূলক কার্যক্রম ঃ

(ক) চিন্তাধারার পরিশুদ্ধির জন্য তিনি তাঁর মুরিদানকে বিশুদ্ধ চিন্তাধারার দীক্ষা দান করতেন। এ জন্য তিনি শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। কেননা কুসংস্কারের মূলে হল বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাব।

(খ) বিশুদ্ধ চিন্তাধারার বিকাশের জন্য তিনি উর্দূভাষারও পরিমার্জন এবং সংস্কার করেন।

(গ) সে যুগে হিন্দু ধর্মের প্রভাবে বিধবা বিবাহকে ঘৃণ্য মনে করা হত। এজন্য তিনি নিজের ৮০ বৎসর বয়স্কা বিধবা বোনকে বিবাহ দিয়ে এবং নিজে বিধবা বিবাহ করে এ কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করেন।

(ঘ) কবর পূঁজা ও মাজার পূঁজার বিরুদ্ধে তিনি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন ধর্মের প্রভাবে ইসলামী জীবন ধারায় যে সব কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তিনি তারও সংস্কার করেন।

(ঙ) পথের নিরাপত্তার অভাবের অজুহাত দেখিয়ে তৎকালীন আলেমরা ভারতীয়দের জন্য হজ্জ ফরজ নয় বলে সাধারণ্যে ফত্ওয়া দিয়ে বেড়াতেন। ফলে হজ্জের মত গুরুত্বপুর্ণ একটি বিধান এদেশ থেকে অবলুপ্ত হতে চলেছিল । তিনি হজ্জের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য নিজে হজ্জে যাওয়ার ঘোষণা দেন এবং তাঁর সঙ্গে যারা হজ্জে যাবে তাদেরকেও সঙ্গে করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে এক বিরাট বাহিনী তাঁর সঙ্গে হজ্জে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

১৮২১ সালে দিল্লী থেকে ৮০০ সফর সঙ্গী নিয়ে তিনি পদব্রজে রওয়ানা করেন এবং বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে কলকাতা বন্দরে উপস্থিত হন। মোট ১১টি জাহাজ ভর্তি লোকজনের বিশাল কাফেলা নিয়ে এই আল্লাহ প্রেমিক আশেকে রাসূল মক্কা-মদীনার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ১৬ই মে জিদ্দায় গিয়ে উপনীত হন। হ্যামাইন শরীফাইনের ইমাম, মক্কা মুকাররামার মুফতীসহ বহু আলেম উলামা তাঁকে স্বাগত জানায় এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতে মিলিত হয়। ঐতিহাসিক 'আকাবা' প্রান্তরে তিনি তাঁর ভক্ত মুরিদদের থেকে এ'লায়ে কালিমাতুল্লার জন্য সর্বাত্মক জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেন। হজ্জ সমাপনান্তে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সফর করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বব্যাপী আগ্রাসী তৎপরতার বিষয়ে আরবদেরকে সচেতন করার প্রয়াস গ্রহণ করেন। সর্বত্রই তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পরবর্তী বৎসর হজ্জ সমাপন করতঃ দীর্ঘ দুই বৎসর ১০ মাসের ছফর শেষ করে ১৮২৩ ইং ১৭ই মে স্বদেশে ফিরে আসেন।

এ সফরে মুরীদানের তরবিয়্যত ছাড়াও হজ্জের আহকাম সম্পর্কে তা'লীম, কর্মী বাহিনীকে নিজের সুবহতে রেখে বিভিন্ন বিষয়ের প্রশিক্ষণ দান, লেনদেন, আচার আচরণের প্রশিক্ষণ দান, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও প্রতিকূলতা ডিঙ্গানোর বাস্তব ট্রেনিং, ত্যাগ ও কুরবানীর চেতনা সৃষ্টি, ইত্যাদি বিষয় কর্মীদের মন-মানসিকতা গড়ে তোলার মহৎ উদ্দেশ্যও ছিল। তাছাড়া জিহাদ ফী সাবীলিল্লার মহৎকর্ম শুরু করার পূর্বে মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হয়ে সরাসরি তার দরবার থেকে নুসরত কামনা, আল্লাহর পথে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও তাঁর দরবারে রূনাজারী করে রূহানী শক্তি অর্জনের মহৎ উদ্দেশ্য সন্নিহিত ছিল।

৪. জিহাদের ময়দানে সশস্ত্র তৎপরতা ঃ

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরই তিনি পুর্নোদ্যমে আযাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সারা দেশের মারকাযগুলো আযাদী আন্দোলনের এক একটি দুর্গে পরিণত হয়। আযাদীর জিহাদে শরীক হওয়ার জন্যে মার্কাযগুলোর মাধ্যমে দলে দলে লোক কেন্দ্রে এসে সমবেত হতে থাকে। আত্মত্যাগী এসব মুজাহিদদের সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য সৈনিক রূপে গড়ে তোলার জন্য একটি নিরাপদ স্থানের

প্রয়োজন ছিল। দিল্লী সে দিক থেকে মোটেই নিরাপদ নয় মনে করে পাহাড় বেষ্টিত, বীরত্বের ঐতিহ্য মণ্ডিত, মুসলিম অধ্যুষিত সীমান্ত প্রদেশকেই মুজাহিদ বাহিনীর কেন্দ্রর জন্য অধিক উপযুক্ত মনে করা হয়।

সীমান্ত প্রদেশে হিজরত ঃ

মুজাহিদদের এক বিরাট কাফেলাকে সঙ্গে নিয়ে ১৮২৭ সালের ১৭ইং জানুয়ারী সীমান্ত প্রদেশে হিজরত করার মানসে এই মর্মে মুজাহিদ দিল্লী থেকে রওয়ানা হয়ে যান। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট, মুতাবেক ১২৪৮ হিজরী সনের ১২ই জমাদিউস সানীতে হান্ড নামক স্থানে পৌছে হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ তার ইমামতের বায়'আত গ্রহণ করেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও উলামায়ে কিরামের এক বিরাট জামা'আত তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। এ খবর চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়লে দলে দলে আমীর ওমারা ও আলেম উলামারা এসে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করতে থাকে। এ সময় তিনি ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও আলেম উলামাদের নামে চিঠি পত্র প্রেরণ করেন। হান্ডের সন্নিকটে এক স্থানে অবস্থান কালে খাদ্দ ও খেলের অধিপতি ফাতাহ্ খান তাঁর হাতে ইমামতের বায়'আত গ্রহণ করেন এবং সোয়াতের সন্নিকটে পর্বত পরিবেশিষ্ট পাঞ্জতার নামক এলাকটিতে মুজাহিদ বাহিনীর কেন্দ্র স্থাপনের জন্য নিজ থেকে প্রস্তাব করেন। সে প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাঞ্জতারে মুজাহিদ বাহিনীর মূল কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। দীর্ঘ তিন বৎসর পর্যন্ত পাঞ্জতার মুজাহিদ বাহিনীর সামরিক ছাউনী এবং ইসলাহ ও ইরশাদের কেন্দ্র রূপে পরিগণিত হয়। হান্ড থেকে যাত্রা করে দালামু, ফতেহপুর, বান্দাহ, গোয়ালিয়র হয়ে প্রথমে তাঁরা গিয়ে পৌছেন টুংকে। পথে পথে অসংখ্য ভক্ত মুরিদান তাঁকে খোশ আমদেদ জানায়। হাজার হাজার মানুষ তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। সকলকে তিনি হিদায়াত দিয়ে স্থানীয় মারকাযগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেন এবং জিহাদী কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের নির্দেশ দেন। টুংকে পৌছালে তথাকার শাসক আমীর খান তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। টুংক থেকে আজমীর ও পালি হয়ে তিনি সিন্ধুর হায়দারাবাদে পৌছেন। হায়দারাবাদের শাসনকর্তা মীর মুহাম্মদসহ স্থানীয় আমীর উমারাগণ হযরত বেরলভী রাহ. এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। সেখানে দুই সপ্তাহ অবস্থানের পর তিনি আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। বস্তুতঃ আফগানরা ছিল যোদ্ধাজাতি। কিন্তু পেশাওয়ার, কাবুল, কান্দাহার ও গজনীর গৌত্রিক আত্মকলহ তাদের জাতিসত্তাকে দুর্বল করে রেখেছিল। হযরত বেরলভী তাদের মাঝে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে তাদের সামরিক প্রতিভাকে ইসলামের কল্যাণে কাজে লাগানোর জন্য জোর তৎপরতা চালান। পেশাওয়ার, কাবুল, কান্দাহার ও গজনী হয়ে তিনি গিয়ে পৌছেন হাশত নগরে। সর্বত্রই খান বাহাদুররা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং সাধারণ মানুষ তাঁকে জানায় আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রাণঢালা ভালবাসা। হাশত নগর থেকে নওশিহরায় পৌছে তিনি প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন

করেন এবং সে অঞ্চলকে স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেন। সেই থেকে শুরু হয় কুফর ও শিরকের বিরুদ্ধে এবং জালিম, শোষক ও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে তাঁর জিহাদী কর্মতৎপরতা।

শিখরাজ রঞ্জিৎসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুতি ঃ

পেশাওয়ার, কাবুল, কান্দাহার ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল তখন ছিল লাহোরের শিখ রাজা রঞ্জিৎ সিংহের আয়ত্তাধীন। যদিও স্থানীয় মুসলমান সর্দাররা ক্ষমতায় ছিলেন কিন্তু রঞ্জিৎ সিংহকে কর দিয়ে তাদেরকে বসবাস করতে হত। শিখদের অত্যাচারে এলাকার জনগণ ছিল অতিষ্ঠ। স্থানীয় প্রশাসকরা ছিল এই অত্যাচারের নিরব দর্শক।

মুসলমানদের এই অসহায়ত্ব হযরত সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. কে ব্যথিত করে তোলে। তিনি স্থানীয় প্রশাসকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে শিখরাজ রঞ্জিৎ সিংহের বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত লড়াইয়ের আয়োজন করার জন্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ক্রমান্বয়ে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তাঁর হাতে বায়'আত হতে থাকে এবং মুজাহিদীনদের দল ভারী হতে থাকে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে স্বাধীনতাকামী আলেম উলামা ও জনগণ দলে দলে ছুটে এসে তাঁর হাতে বায়'আত হতে থাকে।

তিনি সম্পূর্ণ খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকায় ইসলামের জিহাদ নীতি অনুসরণ করে তাঁর বাহিনীকে পরিচালনার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। সে ভিত্তিতেই তিনি শিখরাজ রঞ্জিৎ সিংহের নিকট এ মর্মে ফরমান পাঠালেন যে, হয়ত তুমি আমিরুল মুমেনীনের হাতে ইসলাম গ্রহণ করবে, নতুবা জিযিয়া প্রাদন করে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে, অন্যথায় তোমাদের ও আমাদের মাঝে চূড়ান্ত মীমাংসা করবে তরবারী। এ পত্র শিখরাজ রঞ্জিৎ সিংহের আত্মগর্বে চরতভাবে আঘাত হানে। সে সাত হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী হযরত বেরলভী রাহ. এর মুকাবেলায় প্রেরণ করে। এ সংবাদে মুজাহিদ বাহিনীতে বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ দিনের লালিত শাহাদতের স্বপ্নে তারা উদ্বেলিত হয়ে উঠেন। আকাবার প্রান্তরে দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়। মুজাহিদ বাহিনীতে ছিল মাত্র সাতশত সৈন্য। ইশার নামাযান্তে মুজাহিদরা যুদ্ধ শুরু করেন। ঐশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ মুজাহিদরা আল্লাহর অবারিত নুসরত ও মেহেরবানীতে ফজরের পূর্বেই নীল আকাশে তাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করতে সক্ষম হয়, রঞ্জিৎ সিংহের বাহিনী পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে যায়।

এ বিজয় মুজাহিদদের আত্মবিশ্বাসকে আরো বলিষ্ঠ করে তুলে এবং তারা আল্লাহর দ্বীনের পতাকা বহন করে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। বিজিত অঞ্চলে খোলাফায়ে রাশেদার অনুরূপ শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয় এবং সে অঞ্চলে আমীরুল মুমেনীনের নামে জুম'আর খুৎবা দানের প্রথা প্রচলিত হয় এবং তাঁর পক্ষ থেকে মুদ্রাও চালু করা হয়।

আকাবা থেকে সরদার খাবী খান, আশরাফ খান ও অন্যান্য ইউসুফ ঝাই নেতৃবৃন্দ পেশাওয়ারের দুই ক্ষমতাসীন নেতা সরদার ইয়ার মুহাম্মদ খান ও সরদার সুলতান মুহাম্মদ খানকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখেন। এই চিঠিতে সীমান্তের মুসলমানদের দুরবস্থা, শিখদের নির্যাতন এবং এ প্রেক্ষিতে সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর সাথে একাত্মতা ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা তুলে ধরে তাদেরকে আমীরুল মুমেনীনের হাতে বায়'আত গ্রহণের দাওয়াত দেওয়া হয়। (বিভিন্ন রাজনৈতিক স্বার্থ ও দুনিয়াবী সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করে) তারা নিজেদের আন্তরিক সহযোগিতা ও জিহাদে অংশ গ্রহণের সম্মতি জানিয়ে বেরলভী রাহ. এর নিকট চিঠি লিখেন এবং নিজেরা 'সামাহ' অভিযানের সংকল্প নিয়ে সৈন্য-সামন্ত ও গোলা-বারুদ নিয়ে পেশাওয়ার থেকে নওশিহরা অভিমুখে রওয়ানা করেন। সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. তাদের স্বাগত জানাতে আপন লোকজন নিয়ে হান্ড পর্যন্ত এগিয়ে যান। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ হাজার। স্থানীয় লোকজন মিলে প্রায় ৮০ হাজারের এই বিশাল বাহিনী সেখান থেকে নওশিহরায় ফিরে আসে।

শায়দুর ময়দানে বুধসিংহের বাহিনীর সাথে লড়াই ঃ

অতঃপর এই সম্মিলিত বাহিনী সেখান থেকে শায়দুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে, কেননা বুধ সিংহের নেতৃত্বে শিখ বাহিনী তখন সেখানে সমবেত হয়েছিল। শায়দুর এক ক্রোশ দূরত্বে আকাবা নামক স্থানে তারা অবস্থান গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যেই বুধ সিংহের সাথে ইয়ার মুহাম্মদ খানের গোপন আঁতাত হয়ে যায় এবং সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. কে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করে যুদ্ধের পূর্ব রাত্রে ইয়ার মুহাম্মদ খান ওয়ালী মুহাম্মদ ও নজর মুহাম্মদ নামক দুই ব্যক্তির মাধ্যমে হযরতের জন্য বিশ মিশ্রিত খানা প্রেরণ করে। সে খানা আহার করে আমীরুল মু'মিনীন বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং তিনি বেহুশ হয়ে যান। নেতার এহেন অবস্থা দৃষ্টে মুজাহিদরা রাত্রের শেষ প্রহরে এস্থান থেকে যাত্রার আয়োজন করে। বেহুশ অবস্থায় তাকে একটি হাতীর পিঠে উঠিয়ে রওয়ানা করানো হয়। শিখ বাহিনী তাদের অবস্থান স্থল থেকে একটু সামনে অগ্রসর হয়ে কয়েকটি পরিখা খনন করে রেখেছিল। মুজাহিদ বাহিনী পরিখার নিকটবর্তী হলে তারা অতর্কিত হামলা করে বসে, পিছন থেকে কামান দাগানো হয়। মুসলমানরাও অস্ত্র হাতে নেয়, মুজাহিদ বাহিনীর কামানগুলোও গর্জে উঠে। তুমুল লড়াই শুরু হয়ে যায়।

ইয়ার মুহাম্মদ খানের বিশ্বাসঘাতকতা ঃ

মুসলিম বাহিনী যখন বিজয়ের মুখোমুখি ঠিক এই মুহুর্তে ইয়ার মুহাম্মদ খান তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে পরে। একজন সৈনিক চিৎকার দিয়ে বলে উঠে, ইয়ার মুহাম্মদ খান তার বাহিনী নিয়ে চলে গেছে। এতে সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে যায় এবং তারা পিছু হটতে থাকে। দুররানী (অর্থাৎ ইয়ার মুহাম্মদ খানের) বাহিনীর বিশ্বাস ঘাতকতার ফলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়।

আল্লাহর মেহেরবানী ও স্থানীয় জনগণের সহায়তায় পথের সকল প্রতিকূলতা কাটিয়ে সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. ও তাঁর সঙ্গীরা চাঙ্গলাইয়ে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছেন। এ সময় মুজাহিদ বাহিনী চরম খাদ্য সংকট ও অসুস্থতার মুখোমুখি হয়। অনাহারে অর্ধাহারে অসুস্থ অবস্থায় তাদের দিন কাটে, বহু মুজাহিদ এ সময় মৃত্যু বরণ করে। চাঙ্গলাইয়ে অসুস্থদের চিকিৎসার জন্য একমাস অবস্থান করার পরই তিনি বোনের ও সোয়াত সফরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। পথে পথে বহু জনপদে সফর বিরতি করে মানুষের বায়'আত নেন। তালকীন ও ইরশাদের কাজ অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে। নগরের পর নগর অতিক্রম করে তিনি চলতে থাকেন। এ সফরকালে ভারত থেকে বড় বড় আলেম উলামাদের বেশ কয়টি কাফেলা এসে তার সাথে পথে মিলিত হয়। মাওঃ কলন্দর সাহেবের কাফেলা, কাজী আমান উল্লার কাফেলা, মাওঃ রমযান সাহেবের কাফেলা, মাওঃ আব্দুল হাই সাহেবের কাফেলা, মিয়া মুকিমের কাফেলা এগুলোর মাঝে অন্যতম।

পাঞ্জতারে মুজাহিদদের মাঝে ইসলামী জীবন ধারার প্রতিফলন ঃ

সেখান থেকে বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে তিনি পাঞ্জতারে ফিরে আসেন। পাঞ্জতারে অবস্থান কালে মুজাহিদ বাহিনীর জীবন ধারায় ইসলামী আদর্শ, আচার, আচরণ, ইবাদাত, মুজাহাদা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব, সেবা ও সহমর্মিতা, ত্যাগ ও কুরবানী, সহজ সরল জীবন যাপন, কষ্ট ও শ্রম সহিষ্ণুতা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এমন এক দৃশ্য ফুটে উঠেছিল যা সাহাবায়ে কিয়ামের যুগের কথাই স্মরণ করিয়ে দিত।

সোয়াতের ঝটিকা সফর শেষে তিনি হাযারা অভিমুখে রওয়ানা হন। শিখদের অত্যাচারে রাজ্যহারা হাযারার অধিপতিরাও তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। পরবর্তী কালে এই হাযারাই তাঁর বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল।

শায়দুর লড়াইয়ের পর হাযারা অঞ্চলের স্বাধীন মুসলিম অধিপতি পায়েন্দা খানের সাথে তিনি তাঁর কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং মাওঃ মুহাম্মদ ইসমাঈল কে সিপাহসালার নিযুক্ত করে আগ্রাউর ও পিখলী অভিযানে প্রেরণ করেন। যাওয়ার পথে গোপন সূত্রে মাওঃ ইসমাইল রাহ. জানতে পারেন যে, কোন কারণে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সিত্তানায় সমবেত হয়েছে। সুতরাং তাদের কাছ থেকে সাইয়্যিদ আহমদ রাহ.এর ইমামতের বায়'আত গ্রহণের মানসে তিনি পথ পরিবর্তন করে সিত্তানায় গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি এ বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়ে তাদের থেকে সৈয়দ আহমদ রাহ. এর ইমামতের বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে জিহাদের প্রতি অনুপ্রাণিত করেন। সেখান থেকে আম্ব হয়ে ছত্তরবাই ঘাটে সিন্ধু নদী পার হয়ে তারা গিয়ে পৌঁছেন নাক্কাপানিতে। স্থানীয় লোকজন তাদেরকে স্বাগত জানায়। মাওঃ ইসমাইল রাহ. তাদেরকে জিহাদের জন্য অনুপ্রাণিত কারার চেষ্টা করেন। নাক্কাপানি থেকে যাত্রা করে তারা গিয়ে পৌঁছেন আগ্রাউরে। আগ্রাউরের অধিপতি আব্দুল গফুর খান সহ স্থানীয় অনেক নেতৃবৃন্দ থেকে বায়'আত নেওয়া

হয়। এবং সামদারা নামক স্থানে মুজাহিদ বাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করা হয়।

এই বাহিনীর পথ রোধ করার জন্য শিখ নেতা হরিসিং নলওয়া দুই তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী ফুল সিংহের নেতৃত্বে প্রেরণ করে। তারা এসে ডামগালায় ছাউনী ফেলে। মুজাফফরাবাদ ও কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য ডামগালা একটি গুরুত্বপুর্ণ স্থান। সুতরাং মাওঃ ইসমাইল রাহ. এর সাথে পরামর্শ করে এ মর্মে সিদ্ধান্ত করা হয় যে আগ্যামীকাল হয়ত শিখ বাহিনী আক্রমণ করতে পারে, সুতরাং তাদেরকে সে সুযোগ না দিয়ে অদ্য রাতেই তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করা হবে। ৫০ জন মুজাহিদ চৌদ্দ পনর'শ স্থানীয় জনগণের সমন্বয়ে এ নৈশ অভিযানের পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। যুদ্ধে শিখ বাহিনী (স্থানীয় লোকজনসহ যাদের সংখ্যা পাঁচ ছয় হাজার ছিল) পর্যদুস্ত হয়ে পড়ে এবং তারা তাদের অবস্থান স্থল ত্যাগ করে। কিন্তু মুসলিম বাহিনী যখন শত্রুদের পরিখায় প্রবেশ করতে যাবে তখন দেখা গেল মাত্র তিন চার শত লোক ছাড়া বাকীরা কোথায় যেন গায়েব হয়ে গেছেন। তবু এই মুষ্ঠিমেয় লোক নিয়েই মিয়া মুকীম পরিখায় প্রবেশ করলেন। এ সময় পিছিয়ে থাকা স্থানীয় লোকরা শত্রু পক্ষের শিবিরে প্রবেশ করে মালামাল লুণ্ঠনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ফলে যুদ্ধের গতি পাল্টে যায় এবং মুসলিম বাহিনী স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

এ সময় শানকিয়ারীতে অবস্থানরত মাওঃ ইসমাইল শহীদ ও তাঁর সাথী সঙ্গীদের সাথে শিখদের আরেকটি খণ্ড যুদ্ধ হয়। এতে মাওঃ ইসমাইল শহীদ আহত হন, মুজাহিদ বাহিনীর প্রায় ১২ জন শাহাদত বরণ করে, শিখদের প্রায় ২৫০ জন লোক নিহত হয়।

এহেন মুহুর্তে সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর পক্ষ থেকে পাঞ্জতারে ফিরে আসার নির্দেশ নামা পেয়ে তিনি তার বাহিনী নিয়ে কেন্দ্রে ফিরি আসেন।

এ সময় ভারতবর্ষ থেকে দলে দলে লোক পাঞ্জতার আসতে থাকে এবং প্রচুর অর্থ সাহায্যও আসতে থাকে। তাছাড়া বেশ কিছু লোককে মুবাল্লিগ হিসাবে ভারত বর্ষে প্রেরণও করা হয়েছিল। মাওঃ বেলায়েত আলী ছিলেন তাদের অন্যতম। তারা সীমান্তে সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে ভারতে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালান। ফলে ভারত থেকে দলে দলে লোক মুজাহিদ বাহিনীতে শরীক হওয়ার জন্য ছুটে আসে।

এখান থেকে সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. খহর অভিমুখে দাওয়াত ও প্রচারাভিযানে বেরিয়ে যান। এরপর সংঘটিত হয় উৎমানযাই এর যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী বিজয়ী হলে খহরবাসীদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয় এবং তারা দুররাণীদের সাথে আঁতাত করে ফেলে। ফলে মুজাহিদ বাহিনী খহরে প্রত্যাবর্তন করে। এ সময় বুখারার শাসন কর্তার কাছে জিহাদের দাওয়াত দিয়ে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল বুখারায় প্রেরণ করা হয়।

বৃটিশদের ষড়যন্ত্র ঃ

সীমান্তে গজিয়ে উঠা মুজাহিদ বাহিনীর এই আবিরাম কর্মতৎপরতা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরকে আতংকিত করে তোলে। সুতরাং তারা উদিয়মান এই শক্তিটিকে নির্মূল করার জন্য তৎপর হয়ে উঠে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা সরানোর সেই পুরনো পন্থায় তারা রঞ্জিৎ সিংহের সাথে সন্ধিতে আবাদ্ধ হয় এবং অস্ত্র ও সৈন্য-সামন্ত দিয়ে সহযোগিতা করে মুজাহিদ বাহিনীকে নির্মূল করার ষড়যন্ত্রে উঠে পড়ে লেগে যায়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র ও উস্কানীতে রঞ্জিৎ সিংহ আদাজল খেয়ে লাগে। উপজাতীয় নেতাদেরকে প্রলোভন দিয়ে সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর প্রতি তাদের দেওয়া সমর্থনকে প্রত্যাহার করিয়ে নেওয়ার কৌশল অবলম্বন করে। ক্ষমতালিপ্সু উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ সহজেই এই প্রলোভনের শিকার হয়ে পড়ে এবং তারা বিভিন্নভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে থাকে।

ভেন্টুরার অভিযান ও মুজাহিদদের ভূমিকা ঃ

দীর্ঘ দিন যাবত সামাহ্ অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ থেকে রঞ্জিৎ সিংহ বাৎসরিক নলবন্দী বা নজরানা আদায় করে নিয়ে যেত। রঞ্জিৎ সিংহের লোকেরা চাহামা অঞ্চলে আগমন করে স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে বার্ষিক নজরানা নিয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য সংবাদ পাঠাত। কিন্তু সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. অত্র অঞ্চলে আগমনের পর স্থানীয় জনগণকে এ নজরানা দিতে নিষেধ করে দেন। বেশ কিছু দিন যাবৎ রঞ্জিত সিংহের লোকেরা এ এলাকা থেকে নজরানা আদায় করতে পারছিলনা। সুতরাং অত্র অঞ্চল থেকে জনগণের আনুগত্য ও নজরানা আদায়ের জন্য সে নেপোলিয়ানের সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিখ্যাত ফরাসী বীর ভেন্টুরাকে অত্র অঞ্চলঅভিমুখে প্রেরণ করে। ভেন্টুরার বাহিনী চাহামায় আগমন করলে খাদী খাঁন নামক জনৈক স্থানীয় সর্দার তার সাথে আতাত করতঃ তাকে সিন্ধুনদের অপর পারের অঞ্চলগুলোতে আসার জন্য উৎসাহিত করে এবং তাকে তার বাহিনীসহ হিন্ডে নিয়ে আসে। বস্তুত সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর অনুগত এলাকার অপর সর্দার ফাতাহ খাঁন পাঞ্জতারীর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়েই খাদী খাঁন একাজ করে। ভেন্টুরার হয়ে সে নিজে ফাহাহ্ খানকে নজরানা নিয়ে ভেন্টুরার দরবারে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ জারী করে। অন্যথায় ভেন্টুরার বাহিনী পাঞ্জতার আক্রমণ করবে বলে হুমকী দেয়। ফাতাহ খাঁন এ মর্মে জবাব দেন যে, আমরা কোন অবস্থাতেই নজরানা দিতে প্রস্তুত নই, ভেন্টুরা যদি পাঞ্জতারে আক্রমণ করতে চায় তাহলে তাকে আসতে বলুন, আমরা প্রস্তুত রয়েছি। ফলে ভেন্টুরা তার বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয় এবং পত্র মারফত সাইয়্যিদ সাহেবকে হুশিয়ারী প্রদান করে। সাইয়্যিদ সাহেব এপত্রের যথোপযুক্ত জবাব প্রদান করেন এবং মাওঃ খায়রুদ্দীনকে দূত হিসাবে তার দরবারে প্রেরণ করেন। ভেন্টুরা মাওঃ খায়রুদ্দীনকেও পাঞ্জতার আক্রমণের হুমকী দেয় এবং অশালীন আচরণ করে। ফলে মাওঃ খায়রুদ্দীনও তাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন এবং তিনি তাকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনি

আমাদের সংখ্যাসল্পতার কথা ভেবে অত্মগর্বে ফেটে পড়ছেন, কিন্তু মনে রাখবেন আমরা সংখ্যাসল্পতার কারণে মোটেই শংকিত নই। আল্লাহ সাহায্য আমাদের সঙ্গে রয়েছে। পাঞ্জতার আক্রমণের সাধ থাকলে অগ্রসর হউন, আমরা প্রস্তুত আছি।

পরদিন সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. মাওঃ খায়রুদ্দীনকে আমীর নিযুক্ত করে পাঞ্জতারের গিরিপথে (যেখান দিয়ে ভেন্টুরার আগমনের সম্ভাবনা ছিল) প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করতে নির্দেশ দেন। মাওলানা সাহেব গিরিপথ অতিক্রম করে সম্মুখের মাঠে গিয়ে তাঁবু ফেলেন। ভেন্টুরার টহলদার বাহিনীর মাধ্যমে তাকে খরব দেওয়া হয় যে, খলীফার জঙ্গী বাহিনী এসে পৌঁছে গেছে; অতএব তুমি সাবধান হয়ে যাও। এ সংবাদ শুনে সে দিকবিদিক জ্ঞান হরিয়ে ফেলে। আসবাবপত্র ফেলে রেখে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে পলায়ন করে।

অতঃপর মুজাহিদ বাহিনী আটক দুর্গ আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু জনৈক পাঞ্জতারীর বিশ্বাস ঘাতকতার ফলে আক্রমন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

পরবর্তী বছর ভেন্টুরা আবার দশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে পাঞ্জতার আক্রমণের উদ্দেশ্যে আগমন করে। মুজাহিদ বাহিনীও যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তারা নতুন করে মৃত্যুর জন্য বায়'আত গ্রহণ করে। যুদ্ধ শুরু হয়, মুজাহিদ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ভেন্টুরা মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং পরাজয় নিশ্চিত জেনে তার সৈন্যদল নিয়ে পলায়ন করে।

খাদী খানের ষড়যন্ত্র ঃ

খাদী খানের পূর্বোক্ত ধৃষ্টতার জবাব দেওয়ার জন্য এবং তঙ্গীর কতিপয় ব্যক্তির উপর্যপরি অনুরোধের কারণে মাওঃ ইসমাইলের নেতৃত্বে একটি বাহিনী সেথায় প্রেরণ করা হয়। তারা গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে বুঝতে পারেন যে, অনুরোধকারীরা ছিল মূলতঃ প্রতারক। সুতরাং তারা সাইয়্যিদ সাহেবের নিকট ফিরে আসেন। পরে সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এক ঝটিকা আক্রমণ করে হিন্ড দুর্গ অধিকার করেন এবং খাদী খানকে হত্যা করা হয়।

খাদী খান ছিলেন আশরাফ খানের জামাতা, আমীর খান ও মুকাররব খান ছিলেন খাদী খানের সহোদর ভাই। অথচ আশরাফ খান ও মুকাররাব খান ছিলেন সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর ভক্ত। আমীর খানের অনুরোধে আশরাফ খান আমীরুল মুমেনীনের কাছে খাদী খানের পরিজনকে ফিরিয়ে দেওয়ার এবং তার শাসনাধীন এলাকা তার ভ্রাতা আমীর খানের হস্তে সমপর্ণ করার সুপারিশ করেন।

আমিরুল মু'মিনীন দুর্গে অবস্থারত সেনা প্রধান মাওঃ ইসমাইল রাহ. এর নিকট এ মর্মে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই কিছু অনাকাংখিত ঘটনা ঘটে যাওয়ার কারণে মাওঃ ইসমাইল দখলকৃত এলাকা ফেরৎ দেওয়াকে যুক্তি সঙ্গত মনে করেননি। ফলে আমীর খান ও মুকাররাব খান সম্মিলিতভাবে মুজাহিদ

বাহিনীর বিপক্ষে অবস্থান নেয়। স্থানীয় জনগণও মুজাহিদ বাহিনীর এই কঠোরতায় অসন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং মুজাহিদদেঁরকে অবরোধ করে ফেলে। অপরদিকে আমীর খান পেশাওয়ারের অধিপতি ইয়ার মুহাম্মদ খানকে অর্থের প্রলোভন দিয়ে হিন্ড দুর্গ আক্রমণে এগিয়ে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। প্রলোভনে পড়ে ইয়ার মুহাম্মদ তার বিরাট বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়।

সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এ সময় যায়দা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। স্থানটি ছিল হিন্ড দুর্গ থেকে দু' ক্রোশ দূরে। সংবাদ পেয়ে তিনিও মুজাহিদ বাহিনীর সাহায্যে অগ্রসর হন। উভয় বাহিনীর মাঝে খন্ড খন্ড যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে। ইয়ার মুহাম্মদের বাহিনী যুদ্ধের অজুহাতে গ্রামের পর গ্রাম লুটপাট করতে থাকে।

এ সময় শত্রু পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব পাঠানো হয়। এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে সন্ধির আলোচনা শুরু হয়। উভয় পক্ষের দূত আসা যাওয়া করতে থাকে। রাতের মধ্য ভাগে জানা যায় যে, সন্ধি হবে না। সুতরাং মুজাহিদ বাহিনী সে রাতেই আক্রমণ করে। আল্লাহর মেহেরবানীতে মুজাহিদ বাহিনী অসীম সাহসিকতার সাথে শত্রুবাহিনীর আটটি কামান দখল করে নেয়। ইয়ার মুহাম্মদ খান সমস্ত আসবাব পত্র ফেলে শুধু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পেশাওয়ারের পথে পলায়ন করে। এমনকি যাওয়ার সময় তার জুতা জোড়াও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি। সে মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং পেশাওয়ার পৌঁছার পূর্বেই মারা যায়। এ যুদ্ধে ইয়ার মুহাম্মদ খানের ৭ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ মোট তিন শত জন নিহত হয়, আর মুজাহিদদের মাত্র ৪ জন শহীদ হয় ও ৭ জন আহত হয়। বিজয় গৌরব নিয়ে মুজাহিদ বাহিনী পাঞ্জতারে ফিরে আসে। এ সফর থেকে ফিরে এসে সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. কাশ্মীর অভিমুখে অভিযানের চিন্তা ভাবনা শুরু করেন।

তারবিলা অভিযান ঃ

এহেন মুহূর্তে সাইয়্যিদ মুহাম্মদ জামান খাঁনের অনুরোধে তিনি তারবিলায় গমন করেন। সাইয়্যিদ আহমদের বাহিনী বিজিত ৮টি কামান নিয়ে কাহাব্বালে পৌঁছলে এক রাতে আক্রমণ চালিয়ে মুহাম্মদ জামান তারবিলা দখল করেন। কিন্তু শিখ সেনা প্রধান হরিসিংহ এ সময় পাঁচ ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে তারবিলা থেকে কয়েক ক্রোশ দূরত্বে অবস্থান করছিল, সংবাদ পেয়ে সে তার বাহিনী নিয়ে তারবিলা অভিমুখে অগ্রসর হয়। ঘাঁটিতে অবস্থানরত সৈন্যদের সাথে বন্দুক যুদ্ধের পর সে ঘাঁটিটি দখল করে নেয়।

পরিখায় অবস্থানরত কান্দাহারীরা অবস্থা দৃষ্টে পরিখা ছেড়ে কাহাব্বাল অভিমুখে যাত্রা করলে হরি সিংহের বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। এ সংবাদ পেয়ে সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. তাঁর সৈন্য বাহিনীকে যুদ্ধের নির্দেশ দেন। মুজাহিদদের কামানের গোলার মুখে শিখ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে।

পায়েন্দা খানের দূরভিসন্ধি ঃ

এ সময় পায়েন্দা খানের পক্ষ থেকে এমর্মে সংবাদ আসে যে, তিনি সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর সাথে সাক্ষাত করতে চান। সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. দূতকে এ

কথা বলে ফেরত পাঠান যে, আমি সিত্তানায় আকবর শাহের এখানে যাচ্ছি, পায়েন্দা খান যেন সেখানে আমার সাথে সাক্ষাত করে। সিত্তানার সকল নেতৃবৃন্দ পায়েন্দা খানের এ প্রস্তাবে দুরভিসন্ধি আছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। এখানে অবস্থানকালে দূত এ মর্মে সংবাদ নিয়ে আসে যে পায়েন্দা খান আম্ব থেকে উশারায় আগমন করেছেন, সাইয়্যিদ সাহেব যেন উশারার মাঠে তার সাথে সাক্ষাতে মিলিত হন এবং সঙ্গে যেন অল্প কজন সঙ্গী নিয়ে আসেন। প্রকৃত পক্ষেই সে এ সাক্ষাতের নামে বিরাট ষড়যন্ত্র লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু মাওলানা ইসমাইল রাহ. এর দূরদর্শিতার কারণে তার চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। সাক্ষাতের মুহূর্তে পায়েন্দা খানের বাহিনী অতর্কিত আক্রমণ করতে উদ্যত হলে ইসমাইল রাহ. এর গুপ্ত বাহিনী পায়েন্দা খানকে অবরুদ্ধে করে ফেলে সুতরাং তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। পায়েন্দা খান দিশেহারা হয়ে যায়। তার চেহারায় আতংক ছড়িয়ে পড়ে। সাইয়্যিদ সাহেব তাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। সে তখন আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। সাইয়িদ সাহেব বলেন, আমরা চাই আমাদের বাহিনী কাশ্মীর অভিযানে আপনার রাজ্যের উপর দিয়ে যাতায়াত করবে, আপনার লোকেরা এতে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করবে না। সে এতেও রাজী হয়ে ফিরে যায়।

ইতিমধ্যে নিহত ইয়ার মুহাম্মদ খানের দুই ভ্রাতা সুলতান মুহাম্মদ ও পীর মুহাম্মদ হিন্ড দুর্গ আক্রমণ করে বসে। কিন্তু তারা দুর্গরক্ষীদের সাথে যুদ্ধে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। পরে তাদের সঙ্গে আগত নফর 'কিউলের' নিরাপত্তা দানের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে মুজাহিদরা দুর্গ ছেড়ে দেয়। কিন্তু সুলতান মুহাম্মদ তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। এ সংবাদ পেয়ে সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. পেশাওয়ার অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন। গুপ্তচর মারফত এ সংবাদ শুনে সুলতান মুহাম্মদ খান দুর্গ ছেড়ে পেশাওয়ার অভিমুখে চলে যায়। পায়েন্দা খানের অঙ্গিকারের ভিত্তিতে মাওঃ ইসমাইলের নেতৃত্বে একটি বাহিনীকে কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে মুজাফফরাবাদে গমনের জন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু পায়েন্দা খান তার অঙ্গিকার রক্ষা করেনি। বরং মাওঃ ইসমাইলের চিঠির জবাবে সে জানায় যে, আমার রাজ্যের কোন স্থান দিয়েই আপনি গমন করবেন না। যদি আমার কথা না মানেন তাহলে অবশ্যই যুদ্ধ সংঘটিত হবে।

পত্র মারফত মাওঃ ইসমাইল রাহ. সৈয়দ আহমদ রাহ. কে একথা জানালে তিনি তাকে পাঞ্জতারে ফিরে আসতে বলেন। তিনি ফিরে আসলে সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর পক্ষ থেকে পায়েন্দা খানের নিকট তার রাজ্যের ভিতর দিয়ে মুজাহিদ বাহিনী কাশ্মীরে গমনের অনুমতি দানের পুনঃ আবেদন জানিয়ে আরেকটি পত্র দেওয়া হয়। সে পূর্ববৎ ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাব দিলে সাইয়্যিদ সাহেব যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মাওঃ ইসমাইলকে সেনা প্রধান নিযুক্ত করা হয়। তিনি সৈন্য বাহি-নীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে পায়েন্দা খানের এলাকা এভাবে বেষ্টন করে ফেলেন যে, পায়েন্দা খান নিরুপায় হয়ে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে; এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে একটি পত্র মাওঃ ইসমাইল রহ. এর নিকট অন্য

আরেকটি পত্র সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর নিকট প্রেরণ করে। চিঠি পেয়ে সাইয়্যিদ সাহেব খুশী হন এবং দূত মারফত সৈন্য বাহিনীকে আক্রমণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন এবং সৈন্য বাহিনী নিয়ে মাওঃ ইসমাইল রাহ. কে সিত্তায়ানায় ফিরে আসার হুকুম দেন। সৈন্য বাহিনী তাঁর নির্দেশ মত আক্রমণে বিরতি দিয়ে যথাস্থানে ফিরে আসে। কিন্তু কুনহিড়ী পাহাড়ে অবস্থানরত সৈন্যরা এ সময় পায়েন্দা খানের পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর বিরাট কাফেলাকে এগিয়ে আসতে দেখে হতবাক হয়ে পড়ে এবং এটা যে সন্ধির নামে প্রতারণা তা বুঝতে বাকী থাকে না, সুতরাং তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ময়দানে নেমে আসে। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অবশেষে পায়েন্দা খান ও তার বাহিনী পলায়ন করে। মুজাহিদরা উশরা ও কোটলা দুর্গ দখল করে নেয়। অতঃপর মুজাহিদরা আম্ব অভিমুখে যাত্রা করলে পায়েন্দা খান সেখান থেকেও পলায়ন করে। ফলে আম্বেও মুজাহিদদের আধিপত্য সৃষ্টি হয়।

শ্রীকোট ও ফুলড়ার অভিযানঃ

অতঃপর কাশ্মীরের পথ পরিষ্কার করার জন্য মুজাহিদরা শ্রীকোট ও ফুলড়ায় অভিযান করে। তারা শাহকোট দুর্গ অধিকার করে নেয়। পায়েন্দা খান তখন বারুচী নামক স্থানে অবস্থান করছিল। শাহকোটের পলায়নপর সৈন্যরা তাকে গিয়ে জানায় যে, মুজাহিদরা শেরগড় দুর্গ দখল করে নেওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে। সুতরাং সে শেরগড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলে সে অঞ্চল বিনা যুদ্ধে মুজাহিদদের দখলে চলে আসে। এ পর্যায়ে এসে তার শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে সে মহারাজ রঞ্জিৎ সিংহের জায়গীরদার হরিসিং- এর শরনাপন্ন হয় এবং তার নিকট সাহায্যের আবেদন জানায়। কিন্তু হরিসিং তাকে বিশ্বাস ঘাতক বলে আখ্যা দেয়। এমতাবস্থায় আপন পুত্র জাহান্দারকে হরিসিং- এর নিকট জমিন রেখে সে তাকে নিজের দলে আনে।

সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. শাহকোটের বন্দোবস্ত করে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফুলড়ার ময়দানে তাবু ফেলে দীর্ঘ দিন তারা সেখানে অবস্থান করেন। হাযারার যে পথে শিখদের আগমনের সম্ভাবনা ছিল সে পথে কড়া পাহারা মোতায়েন করা হয়। লোক মুখে প্রায়ই শুনা যেত যে, আজ আক্রমণ হবে, কিন্তু হতনা। এভাবে হতে হতে মুজাহিদরা বিষয়টিকে নিছক গুজব মনে করে এবং তারা অসতর্ক হয়ে যায়। ইতিমধ্যে এক দিন মুজাহিদরা ফজরের নামাযের আয়োজনে ব্যস্ত থাকাকালে অতর্কিত আক্রমণ হয়। অসতর্কতার মুহূর্তে এরূপ অতর্কিত আক্রমণের ফলে মুজাহিদ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ অবস্থায় যুদ্ধ চলতে থাকে, বিজয় শিখদের অনুকূলে চলে যায় এবং বহু মুজাহিদ শহীদ হয়। একদল মুজাহিদ এ সময় পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তারা পাহাড়ের উপর থেকে শিখদের উপর অবিরাম গুলি বর্ষণ করতে থাকে। ফলে শিখরা অতিষ্ঠ হয়ে ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে। এ যুদ্ধে বহু মুজাহিদ অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দেন।

মাওঃ ইসমাইল রাহ. এ সময় তার বাহিনী নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আহমদ আলী সাহেব জয়ী হলে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হবেন। কিন্তু আহমদ আলী সাহেবের শাহাদতের সংবাদ শুনে অন্যান্যদের সাথে পরামর্শ করে অন্য একজনকে নেতা নিযুক্ত করে তিনি সৈয়দ আহমদ রাহ. এর নিকট আম্বে ফিরে যান।

এই মর্মান্তিক শাহাদতের সংবাদ শুনে সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং ইশার নামাযের পর শহীদদের মর্যাদা ও ফযীলতের উপর গুরুত্বপূর্ণ বয়ান রাখেন। ওয়াজ শেষে শহীদদের জন্য দু'আ করা হয়।

বিশ্বস্থ সূত্রে সংবাদ পাওয়া যায় যে, পায়েন্দা খানের বাহিনী তাদের গোলা বারুদ ও রসদ সামগ্রী পথে ফেলে রেখে চলে গেছে। সাইয়্যিদ সাহেব মাওঃ জাফর আলীকে সে সব গোলা বারুদ ও রসদ সামগ্রী নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। জাফর আলী সাহেব জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে সব গোলা বারুদ কব্জা করে ১২৪৫ হিজরীর ১০ই জিলহজ্জ আম্বে পৌঁছান। সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. আম্বে অবস্থান কালে (১২৪৫ হিজরী) কাযী মুহাম্মদ হাব্বান সাহেবকে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করা হয় এবং প্রতি গ্রামে গ্রামে, মহল্লায় মহল্লায় কাযী, মুফতী ও মুহতাসিব বা পরিদর্শক নিয়োগ করা হয় এবং সর্বত্র শরয়ী আইন কার্যকর করা হয়। যারা এই আইন অমান্য করবে তাদের জন্য পরামর্শক্রমে জরিমানা ও রাষ্ট্রীয় শাস্তি নির্ধারণ করার ব্যবস্থা করা হয়।

আম্বে অবস্থান কালে পায়েন্দা খান নিজের ভুল স্বীকার করে ভবিষ্যতে শরীয়তের পূর্ণ ইত্তিবা ও আমীরুল মু'মিনীনের পুর্ণ আনুগত্যের অঙ্গিকারে আবদ্ধ হয়। আমীরুল মু'মিনীন ও এ মর্মে ওয়াদা করেন যে, পায়েন্দা খান যদি তার অঙ্গিকারের উপর বহাল থাকে তাহলে হিন্দওয়ালে তার কর্তৃত্ব বহাল থাকবে, আর মুজাহিদ বাহিনীর সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা মূলক আচরণ করলে কাশ্মীরে বিশ হাজার জায়গীর ও পেশোয়ার বিজিত হলে সেখানে দশ হাজার জায়গীর তাকে প্রদান করা হবে।

শিখদের সন্ধির প্রচেষ্টা ঃ

আফগান সীমান্তে ইতিপূর্বে বহু পীর বুযুর্গ জিহাদের ডাক দিয়েছেন। কিন্তু রঞ্জিত সিংহের সরকার তাদের কোন এক অঞ্চলের জায়গীরদারী প্রদান করে কিংবা তাদের জন্য মাসিক ভাতা নির্ধারণ করে দিয়ে তাদেরকে নির্জনবাস, আল্লাহর স্মরণ ও সৃষ্টির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করেছে। আর এ ভাবেই সমস্যা নিরসন হয়ে গেছে। এধরণের একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই রঞ্জিত সিং তার বিশ্বস্ত সহচর হাকীম আযীমুদ্দীন ও ওয়াযীর সিংহের সমন্বয়ে একটি কূটনৈতিক মিশন আম্বে সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর নিকট প্রেরণ করে। আর দ্বীনতুরাকে এ ব্যাপারে মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে আলোচনা চালানোর ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেয়।

হাকীম আযীমুদ্দীন মহারাজা রঞ্জিৎ সিং-এর পক্ষ থেকে যে পত্র নিয়ে আসে তাতে লিখা ছিল যে, 'যদি রাজত্ব করার ইচ্ছা আপনার থাকে তাহলে আটাক নদীর এপারের নয় লক্ষ্য টাকার জায়গীর আপনাকে প্রদান করছি। আর যে এলাকায় আপনি বর্তমানে অবস্থান গ্রহণ করেছেন সে রাষ্ট্রও আপনাকে উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করছি। আপনি নিশ্চিন্তে আল্লাহর বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকুন, আমাদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহের ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন। আর যদি লাহোরে আমাদের কাছে চলে আসেন তাহলে সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদে আপনাকে অভিষিক্ত করব'। কিন্তু এর উত্তরে তিনি বলেন– আমরা এদেশে কারো রাষ্ট্র ছিনিয়ে নিতে আসিনি, আর রাজত্ব করার মোহও আমাদের নেই। বরং জিহাদ ফী সাবীল্লিাহ এর মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। রঞ্জিৎ সিং যদি তার সমগ্র রাজত্বও দিয়ে দেয় তবুও আমরা নিবৃত্ত হব না। কিন্তু সে যদি মুসলমান হয়ে যায় এবং আল্লাহর বিধান কার্যকরী করার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে সে আমাদের ভাই হিসাবে গণ্য হবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহে যে রাজ্য আমাদের দখলে এসেছে তাও আমরা তাকে দিয়ে দিব। এই বক্তব্য ও তৎসঙ্গে রঞ্জিৎ সিংহকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে একটি চিঠি হাকীম আযীমুদ্দীনকে দিয়ে দেওয়া হয়।

দ্বীনতুরা ও এলার্ডের আগমন ঃ

ঠিক এ সময় দ্বীনতুরা ও এলার্ড ১২ হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে বাৎসরিক কর আদায়ের জন্য পেশোয়ারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। তারা সংবাদ পাঠায় যে রঞ্জিৎ সিং-এর প্রস্তাবের উপর আলোচনার জন্য মুজাহিদ বাহিনী থেকে কোন একজন বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি যেন আগমন করে। সাইয়্যিদ সাহেব অনেক ভেবে চিন্তে মাওঃ খায়রুদ্দীন ও হাজী বাহাদুর শাহকে এর জন্য মনোনীত করেন।

দ্বীনতুরা ও এলার্ডের সঙ্গে আলোচনা কালে মাওঃ খায়রুদ্দীন যে বিচক্ষণতা, দৃঢ়তা ও অনমনীয়তার পরিচয় দেন তাতে তারা নির্বাক হয়ে যায়। সকল বিষয়ে মাওঃ খায়রুদ্দীন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জবাব দেন। অবশেষে দ্বীনতুরা সুকৌশলে সাইয়্যিদ সাহেব থেকে একটি ঘোড়া উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণের প্রস্তাব পেশ করে। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, কোন উপায়ে একটি ঘোড়া লাভ করতে পারলে সে একথা প্রচার করে বেড়াবে যে, সাইয়্যিদ সাহেব বাৎসরিক কর হিসাবে মহারাজকে ঘোড়া প্রদান করেছেন। খায়রুদ্দীন সাহেব তার এই দূরভিসন্ধির কথা আঁচ করতে পেরে সাফ জবাব দেন যে, একটি ঘোড়া তো দূরের কথা আমরা আপনাকে একটি গাঁধাও দিতে প্রস্তুত নই।

পাঞ্জতারে আক্রমন ঃ

খায়রুদ্দীন সাহেবের এই অনমনীয়তার কারণে তারাও ক্ষীপ্ত হয়ে উঠে। সুতরাং পরদিনই তারা আমীর খান ও খড়ক সিংহের সাথে পরামর্শ করে পাঞ্জতারে

আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে রাত্রেই সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত করে। মাওঃ খায়রুদ্দীন ওয়াযীর সিংহের মাধ্যমে এ সংবাদ জানতে পেরে তৎক্ষনাৎ সংবাদ দিয়ে পাঞ্জতারে একজন দূত পাঠিয়ে দেন যে, আগামী কাল শিখ সৈন্যরা পাঞ্জতার আক্রমণ করবে।

রাতের এক প্রহর বাকী থাকতে শিখ সৈন্যরা গিয়ে যায়দায় অবস্থান গ্রহণ করে। পাঞ্জতার থেকে এস্থানটি ছিল ছয় ক্রোশ দূরে। পর দিন সূর্যাস্তের সময় শিখ বাহি-নীতে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে আজ রাতে মুজাহিদ বাহিনী শিখদের উপর আক্রমণ করবে। এতে শিখ বাহিনীতে আতংক ছড়িয়ে পড়ে এবং সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। সাইয়্যিদ সাহেব মাওঃ খায়রুদ্দীনের এহেন ভূমিকার জন্য খুব প্রশংসা করেন।

কাযী হাব্বানের অভিযান ঃ

আম্বে অবস্থান কালে কাযী হাব্বান সাহেব একদিন সাইয়্যিদ সাহেবকে বললেন, আমরা এখানে কর্মহীন বেকার বসে আছি; অথচ জানতে পারলাম সামাহ অঞ্চলে বিদ্রোহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। হযরত যদি আমাকে এক দল সৈন্য দিয়ে সে এলাকায় প্রেরণ করেন তাহলে আমি সেখানকার বিদ্রোহ নির্মূল করার জন্য কাজ করতে পারি এবং সে এলাকা থেকে উশর ইত্যাদি আদায় করতে পারি। এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে কাযী হাব্বান সাহেবকে প্রধান করে সামাহ অঞ্চলের দিকে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হয়। মাওঃ ইসমাঈলকেও তাদের সঙ্গে যেতে বলা হয়।

এই বাহিনী পাঞ্জতারে পৌছালে ফাতাহ খান পাঞ্জতারীর পরার্শে শিখদের উৎপীড়নে আপন এলাকা থেকে বিতাড়িত খানদেরকে একত্রিত করা হয়। সমবেত খান ও স্থানীয় উলামায়ে কিরামের নিকট ফাতাহ খান এ মর্মে আলোচনা পেশ করেন যে, কাযী সাহেব চাচ্ছেন শিখরা যে যে এলাকায় মুসলমানদের ভূমি ছিনিয়ে নিয়েছে তা যুদ্ধ করে দখল করে দিবেন। তবে এ ব্যাপারে তোমাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। তারা সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করার আশ্বাস ব্যক্ত করে। অতঃপর ফাতাহ খান বললেন যে, তোমরা যদি আপন আপন অঞ্চলের অধিকার ফিরে পাও তাহলে উশর প্রদান করবে। এতেও তারা সম্মত হয়। কাযী সাহেব আলেম উলামাদেরকে নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে আঞ্চলিক শাসক ও আলেমদেরকে এ বিষয়টি বুঝানোর জন্য অনুরোধ জানান।

হান্ড দুর্গ ইতিপূর্বে শিখরা পুনঃদখল করে নিয়েছিল, কাযী সাহেব তাও পুনরায় অধিকার করে এর হিফাযতের দায়িত্ব স্থানীয় শাসকদের হাতে অর্পণ করেন। এভাবে আশপাশের বহু এলাকা শিখদের আওতা থেকে মুক্ত করে উশর প্রদান ও আনুগত্যের পুনঃঅঙ্গিকারের ভিত্তিতে স্থানীয় প্রশাসকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তৃতীতে.৪র্থ দিবসে স্থানীয় খানদের একত্রিত করে তাদের থেকে উশর প্রদান ও আনুগত্যের পুনঃ অঙ্গিকার গ্রহণ করতে গেলে অন্যান্য খানরা উপস্থিত

হলেও হুতীর আহমদ খান উপস্থিত হয়নি। তবে সে লোক মারফত সংবাদ পাঠায় যে ৮ দিন পর সে এসে দেখা করবে। ইতিমধ্যে সে সৈন্য সংগ্রহের জন্য পেশোয়ার রওয়ানা হয়ে যায়। কাযী সাহেব এ সংবাদ জানতে পেরে সৈন্য বাহিনীকে হুতী অভিযানের নির্দেশ দেন। উভয় বাহিনীতে তুমুল যুদ্ধ হয়। মাওঃ মাযহার আলী, রিসালাদার আব্দুল হামিদ খান ও মাওঃ ইসমাঈলের ত্রিমুখী আক্রমণের মুখে তাদের বাহিনী ছত্র ভঙ্গ হয়ে যায় এবং লোকজন পলায়ন করে মারদানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

হুতীর দখল গ্রহণ করে মাওঃ ইসমাঈল ও কাযী হাব্বান সাহেব মারদান চলে যান। মারদান দুর্গ দখল করতে গিয়ে কাযী হাব্বান শহীদ হন। মাওঃ ইসমাঈল রাহ. অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করে দুর্গটি দখল করতে সক্ষম হন। দুর্গে অবস্থানকারী আহমদ খান অনন্যোপায় হয়ে সন্ধির প্রস্তাব করে। মাওঃ ইসমাঈল রাসূল খানকে নিরাপত্তা দেন। কিন্তু আহমদ খানকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়নি। নিরাপত্তা পেয়ে রাসূল খান বেরিয়ে এলে তার কাছ থেকে আনুগত্যের পুনঃ অঙ্গিকার গ্রহণ করে মারদান ও হুতী তার হাতে অর্পণ করা হয়।

সুলতান মুহাম্মদ খানের হুমকি ঃ

নিহত ইয়ার মুহাম্মদের ভাই সুলতান মুহাম্মদ খান সামাহ অঞ্চলের খানদের সাথে দেখা করে তাদেরকে এ মর্মে শাসিয়ে যায় যে, তোমাদের এলাকায় আমার ভাই ইয়ার মুহাম্মদ নিহত হয়েছে, তাছাড়া মারদান ও হুতীও তোমরা সহযোগিতা করে মুজাহিদদের হাতে তুলে দিয়েছ, এর খেশারত অবশ্যই তোমাদেরকে দিতে হবে। আমরা এর প্রতিশোধ নিতে সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসছি। এ সংবাদ জানতে পেরে রিসালাদার আব্দুল হামীদ খান, ফাতাহ্ খানসহ স্থানীয় খানদের সাথে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, 'এ মুহূর্তে সাইয়্যিদ সাহেবের এখানে আগমন জরুরী'। সুতরাং এ মর্মে একটি চিঠি তাঁর নিকট প্রেরণ করা হউক যে, দুররানী সৈন্যরা আমাদের দিকে আসছে, আমরা সবাই মিলে পরামর্শ করেছি যে, আপনি এখানে তাশরীফ আনবেন এবং আমরা আপনার বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে তাদের মুকাবেলায় অগ্রসর হব।

জবাবে তিনি রিসালাদার সাহেবকে লিখলেন, আপনি আপনার বাহিনী নিয়ে আমানযাই এর গড়ে তাবু ফেলুন, তাতে স্থানীয় লোকদের সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি পাবে। আর ফাতাহ খান যেন স্থানীয় খানদের শান্তনা দিয়ে আশ্বস্ত করে রাখে। আমরা অতিসত্ত্বর আসছি। ছতররাই ও আম্বের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেই তিনি পাঞ্জতারে এসে পৌঁছেন এবং অবস্থার পর্যালোচনার জন্য স্থানীয় খানদের পরামর্শ করেন। দুররানীরা উৎমানযাই-এ এসে তাবু ফেলে ছিল। কিন্তু তারা যখন জানতে পারল যে, সাইয়্যিদ সাহেব আমানযাই গড়ে অবস্থান নিয়েছেন তখন তারা হুতীতে অবস্থান নেয়। এ সংবাদ পেয়ে সাইয়্যিদ সাহেবও তার অবস্থান পরিবর্তন করে তুরুতে এসে তাবু ফেললেন।

তুরুর মওঃ আব্দুর রহমানের মাধ্যমে সুলতান মুহাম্মদ খানকে তিনি বারবার বুঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, "আমরা জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এদেশে এসেছি। লাহোরের কাফির শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য; মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছাই আমাদের নেই। তোমরা আমাদের ভাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তোমরা মুসলমান হয়েও মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক না রেখে কাফির ও বিদ্রোহীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছ। আমাদের সাথে যুদ্ধ না করে স্বদেশে ফিরে যাও। আমরাও মুসলমানদের সথে যুদ্ধ করতে চাই না। কিন্তু যদি তোমরা একথা না মান তাহলে জেনে রেখো যে, তোমরা দ্বীন দুনিয়া উভয় স্থানেই ক্ষতিগ্রস্থ হবে"। কিন্তু সুলতান মুহাম্মদ খান অত্যন্ত দৃষ্টতাপূর্ণভাবে এর জবাব প্রদান করে। তারপরও তিনি তাঁর নিকট মওলভী সাহেবকে পাঠিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সে পূর্বের চেয়ে আরো দৃষ্টতাপূর্ণ জবাব দিয়ে বলে যে, পুনঃর্বার যদি তোমরা এ ধরনের কোন প্রস্তাব নিয়ে আস তাহলে তোমাদের কান কেটে দেওয়া হবে। অগত্যা সাইয়্যিদ সাহেব যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং মাওঃ ইসমাইলকে আম্ব থেকে এখানে চলে আসার নির্দেশ দিয়ে লোক পাঠান।

মায়ার এর যুদ্ধ ঃ

তুরু ও হুতীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত মায়ার অঞ্চলের পূর্ব দিকে একটি ছোট নদী ছিল। মোল্লা লাল মুহাম্মদ কান্দাহারী ও কুতুবউদ্দীনের মাধ্যমে সে নদী নিজেদের আয়ত্বে রাখার বন্দোবস্ত করা হল, কেননা সে স্থান যুদ্ধের পজিশনের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সারা রাত সৈন্য বাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষমান ছিল। সকালে ফজরের নামাযান্তে সাইয়্যিদ সাহেব একাগ্রচিত্তে দু'আ করে ফারেগ হওয়া মাত্রই একজন সংবাদ বাহক এসে জানাল যে, মোল্লা লাল মুহাম্মদ জানিয়েছেন, দুররানী সৈন্যরা ডঙ্কা বাজাচ্ছে, সুতরাং সাইয়্যিদ সাহেব যেন সতর্ক থাকেন। এ সংবাদ শুনে তিনি আপন সেনাবাহিনীকেও ডংকা বাজানোর নির্দেশ দিলেন এবং সৈন্যবাহিনীসহ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সকলেই ময়দানে গিয়ে সমবেত হলেন। সুলতান মুহাম্মদ খান-এর সঙ্গে ছিল তার ভাই পীর মুহাম্মদ খান, সাইয়্যিদ মুহাম্মদ খান ও ভ্রাতুস্পুত্র হাবীবুল্লাহ খান। তারাও তাদের বাহিনী নিয়ে মায়ার-এর নদীটির কাছেই এসে অবস্থান নিয়েছিল। রাত্র বেলায় এই চার সরদার কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে শপথ করল যে, সাইয়্যিদ সাহেবের সাথে যুদ্ধে আমরা কেউ কোন অবস্থাতেই পিছপা হব না এবং সকল সৈন্যদের থেকেও কুরআন স্পর্শ করে এই অঙ্গিকার নেওয়া হল। এরপর সৈন্যদলকে চারটি দলে বিভক্ত করে তাঁরা ময়দানে অবতরণ করেন।

সাইয়্যিদ সাহেবের বাহিনী নালা পার হয়ে উপরে গিয়ে ব্যুহ রচনা করে। সাইয়্যিদ সাহেব নিজে সৈন্যবাহিনীকে বিন্যস্ত করে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন, দুই দলে

লড়াই চলতে থাকে, শত্রু পক্ষ যুদ্ধে সাইয়্যিদ সাহেবকে হত্যা করে ফেলার পরিকল্পনা নিয়ে বেশ কয়েকটি টর্নেডো অভিযান পরিচালনা করে, কিন্তু মুজাহিদদের রণকৌশলের কাছে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। এক সময় মুজাহিদদের তীব্র আক্রমণ ও তোপের গোলার মুখে দুররানী সৈন্যরা পিছু হটতে শুরু করে। মুজাহিদরা তাদের কয়েকটি তোপ দখল করে নেয়। সে সব তোপ থেকেও গোলা বর্ষণ করা হয়। ফলে দুররানী সৈন্যরা পিছু হটে পলায়ন করে। যুদ্ধ শেষে মুজাহিদরা মায়ার এর দক্ষিণ দিকে একটি পুকুরের পাড়ে এসে সমবেত হয়। প্রচণ্ড তৃষ্ণার কারণে পুকুরের গরম পানিই তারা পান করতে শুরু করেন। এ দেখে স্থানীয় লোকেরা মাটির খরায় করে পানি এনে তাদেরকে পরিবেশন করে। শত্রুদের থেকে পুনঃ আক্রমণের আশংকার জন্যই তারা এখানে অপেক্ষা করছিলেন। সূর্য যখন অস্ত যেতে শুরু করল এবং সংবাদ নিয়ে জানা গেল যে শত্রু সৈন্যরা অনেক দূর চলে গেছে তখন তারা মায়ার এর দুর্গে ফিরে গেলেন। এ যুদ্ধে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি শহীদ হয় এবং বহু লোক আহত হয়।

পেশোয়ার আক্রমণের প্রস্তুতি ঃ

মায়ার এর যুদ্ধের পর তিনি স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে একত্রিত করে পেশোয়ার যাওয়ার পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন। তারা সকলেই এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তিনি গোটা বাহিনীকে নিয়ে তুরু থেকে মারদানের পথে রওয়ানা হলেন। মারদানে দুররানীরা যে সব অস্ত্রশস্ত্র ফেলে রেখে গিয়ে ছিল তা কব্জা করার জন্য মাওঃ ইসমাঈল কে পাঠানো হয়। সামান্য যুদ্ধের পর তিনি মারদান দুর্গের দখল নিতে সক্ষম হন।

সাইয়্যিদ সাহেব মারদানে দুই রাত অতিবাহিত করে ৬/৭ হাজার লোকের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে পেশোয়ারের পথে রওয়ানা হয়ে চরসাদ্দায় গিয়ে পৌঁছেন। সেখান থেকে পেশোয়ার ১৫/১৬ মাইল দূরে ছিল, পথে ছিল একটি নদী। নদী পার হওয়ার জন্য তারা তংগীর দিকে অগ্রসর হন এবং পায়ে হেটে নদী পার হয়ে তারা মাটাতে উপনীত হন। মাটা থেকে শবকদর গিয়ে ছাউনী ফেলেন। শবকদর থেকে তারা রওয়ানা হয়ে মায়চানাই এর ঘাটে অন্য একটি নদী পার হয়ে রীযী নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন। রীযীতে অবস্থানকালেই সুলতান মুহাম্মদ খান ক্ষমা চেয়ে আরবার ফয়জুল্লাহ খানকে সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর নিকট প্রেরণ করে। সে এই মর্মে আর্জি পেশ করে যে, আপনাদের মুকাবিলা করে আমরা গুরুতর অপরাধ করেছি। আমরা সে অপরাধের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং এই এলাকায় যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনা বাতিল করুন। উত্তরে তিনি তার অতীতের বিশ্বাস ঘাতকতার দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরে বললেন যে, এজন্য তাকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। আর সেজন্যই আমরা তার পিছু ধাওয়া করেছি। তবু যদি সে দৃঢ়ভাবে মুনাফেকী না করার অঙ্গিকার করে তাহলে আমরা তার ব্যাপারে বিবেচনা করব। পরদিন ফয়জুল্লাহ খান এসে জানালেন যে, আমি তাকে দৃঢ় অঙ্গিকারে আবদ্ধ করেছি, সে আর বিশ্বাস ঘাতকতা করবে না।

সাইয়্যিদ সাহেব বললেন আমরা আজ পেশোয়ারে প্রবেশ করব। তাকে গিয়ে বলেন, সে যেন নিজ স্থানেই অবস্থান করে, নড়াচড়া করতে চেষ্টা না করে। এ সংবাদ তাকে জানিয়ে আপনি চলে আসবেন। আমরা আপনাকে নিয়েই পেশোয়ারের দিকে রওয়ানা হব।

বিনাযুদ্ধে পেশোয়ার দখল ঃ

এদিকে তিনি সেনাবাহিনীতে ঘোষণা করে দিলেন যে, আজ আমাদের বাহিনী পেশোয়ারে প্রবেশ করবে। আরবাব জুম্মা খানকে ৬০/৭০ জন সৈন্যসহ যোহরের পরই পেশোয়ার বাজারে এ মর্মে ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হল যে, সাইয়্যিদ সাহেবের বাহিনী অদ্য এখানে আক্রমণ করবে। সুতরাং মাল সম্পদের হিফাজতের জন্য সকল দোকান পাট যেন বন্ধ রাখা হয়। আসরের পর যাত্রার ডঙ্কা বেজে উঠল। মাগরিবের পর এই বিশাল বাহিনী পেশোয়ার বাজারে প্রবেশ করে। শহরের জনগণ মুজাহিদদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় এবং তারা স্থানে স্থানে গাজীদের জন্য পানি ও শরবত প্রস্তুত করে রেখে দেয়। জনসাধারণ সাইয়্যিদ সাহেব ও মুজাহিদ বাহিনীর কল্যাণ কামনা করে দু'আ করতে থাকে। ফজরের নামাযের পর তিনি সকল দোকান পাট খোলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। মুজাহিদ বাহিনীর আগমন সংবাদে পেশোয়ারের পতিতালয়সমূহ, ভাঙ মদের দোকানগুলো পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। অপর দিকে সাইয়্যিদ সাহেব এ ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ জারি করেন যে, সৈন্যবাহিনীর কেউ যেন পেশোয়ারের বাগিচার একটি ফলও স্পর্শ না করে। এদিকে সৈন্যবাহিনীতে চরম খাদ্য সংকট দেখা দেয়। স্থানীয়ভাবে তাদের আহার্য্যের ব্যবস্থা হতে হতে প্রায় তিন দিন লেগে গেল। এই তিন দিন মুজাহিদরা অনাহারেই ছিলেন। কিন্তু কেউ কোন বাগানের ফল ছুয়েছে এরূপ কোন ঘটনার সংবাদও পাওয়া যায় নি।

সুলতান মুহাম্মদ খানের আত্মসর্ম্পণ ও তার হাতে পেশোয়ার সমর্পণ ঃ

মুজাহিদরা পেশোয়ার দখল করে নেওয়ার কারণে দুররানী বাহিনী হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। উপায়ন্তর না দেখে সুলতান মুহাম্মদ খান আরবাব ফয়জুল্লাহ খানের মাধ্যমে সাইয়্যিদ সাহেবের নিকট বার বার আনুগত্য ও ইতা'আতের পয়গাম পাঠাতে থাকে।

একদিন ইশার নামাযের পর সাইয়্যিদ সাহেব সুলতান মুহাম্মদ খানের সন্ধির পয়গামের ব্যাপারে পরামর্শের জন্য মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃবৃন্দ সমেত এক রুদ্ধদার কক্ষে মিলিত হন। আলোচনা পর্যালোচনার পর তিনি এ মর্মে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করলেন যে, সুলতান মুহাম্মদের সন্ধির প্রস্তাব মেনে নিয়ে পেশোয়ার তার হাতেই পুনঃ সমর্পণ করা হবে। এ সংবাদ অনেকেই স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। শহরে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে গোটাশহরে দুঃশ্চিন্তার ছায়া নেমে আসে।

শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ব্যবসায়ী মহল ও সাধারণ মানুষ পৃথক পৃথকভাবে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করে। কিন্তু তাঁর একটিই জবাব ছিল যে, আমরা কারো রাজ্য ছিনিয়ে নিতে আসিনি। আল্লাহর আইন অনুসারে জিহাদ ফী সাবীলিল্লার দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে এসেছি। সুলতান মুহাম্মদ খান যেহেতু তাওবা করেছে সুতরাং তার তাওবা গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য।

ইতিমধ্যেই ফয়জুল্লাহ খান সংবাদ নিয়ে আসেন যে, সুলতান মুহাম্মদ খান আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চায়। এ ব্যাপারে পরামর্শ হলে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা মতামত দেন যে, সরদার আগে মাওঃ ইসমাঈলের সাথেই সাক্ষাত করুক। দুই একবার সাক্ষাত ঘটলেই তার মনোভাব বুঝা যাবে। ফলে এরূপই সিদ্ধান্ত হয় যে, সুলতান মুহাম্মদ খানকে প্রথমে মাওঃ ইসমাঈলে সাথে সাক্ষাত করতে হবে। অতপর সাইয়্যিদ সাহেব তার সাথে দেখা করবেন কিনা তা বিবেচনা করা হবে।

সিদ্ধান্ত মুতাবেক সুলতান মুহাম্মদ খান হাযারখানী গড়ের পাশে একটি মাঠে এসে সাক্ষাতে মিলিত হয়। সে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কথোপকথন করে এবং মাওঃ ইসমাঈলের হাতে হাত রেখে সাইয়্যিদ সাহেবের আনুগত্যের বায়'আত ও দ্বীনের খিদমাত, জিহাদ ও মুজাহিদদের সাথে অংশ গ্রহণের বায়'আত গ্রহণ করে। পর দিন আসরের পর মাওঃ ইসমাঈল ও সুলতান মুহাম্মাদের মাঝে পুনঃ সাক্ষাতকার অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর সে এ মর্মে আব্দার জানায় যে, আপনার সাথে তো সাক্ষাত হল, এবার সাইয়্যিদ সাহেবের সাথে দেখা করার একান্ত আরজু এবং তা তিনি যখন যেখানে যেভাবে বলবেন। তিনি স্মরণ করলেই আমি তাঁর দরবারে গিয়ে হাযির হব। পরবর্তীতে আরবাব ফয়জুল্লাহ খান সুলতান মুহাম্মদের সাক্ষাতের পয়গাম নিয়ে আসলে তিনি সকলের সাথে পরামর্শ করে এ মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে হাযারখানী মাঠে দুই নেতার সাক্ষাত অনুষ্ঠিত হবে। তবে দু'দলই আপন আপন সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে আসবে।

পরামর্শ অনুসারে আয়োজন হয় এবং হাযারখানী মাঠে দুই নেতা পরস্পরে সাক্ষাতে মিলিত হন। আলোচনা কালে সাইয়্যিদ সাহেব কাবুল থেকে মায়ারের যুদ্ধ পর্যন্ত সব ঘটনা তার সম্মুখে পুনঃ ব্যক্ত করেন এবং সেই শুরু থেকে সুলতান মুহাম্মদ খান ও তার ভাইয়ের বায়'আত গ্রহণ ও বন্ধুত্বের অঙ্গিকার এবং তার পর বারংবার এই অঙ্গিকার ভঙ্গ করে গাদ্দারীর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে তিনি বলেন যে, অথচ আমি তোমার ও তোমার ভাইয়ের বিদ্রোহের কারণ কিছুই জানতে পারলাম না।

বিদ্রোহের কারণ; ভারতীয় বিদ্'আতী আলেমদের চিঠি ঃ

সুলতান মুহাম্মদ খান বিনয়ের সাথে ভারতীয় কতিপয় আলেমের লেখা একটি চিঠি পেশ করে বললেন যে, বিরোধিতার মূল কারণ হল এই চিঠি। দেখাগেল

সেই চিঠিতে কতিপয় ভারতীয় আলেম এমর্মে সীমান্তের নেতৃবৃন্দকে সতর্ক করেছে যে, সাইয়্যিদ আহমদ নামে যে ব্যক্তি তোমাদের অঞ্চলে জিহাদ ফী সাবীলিল্লার নামে কাজ করে যাচ্ছে সে মূলতঃ প্রতারক, আমাদের ও তোমাদের দ্বীন ধর্মের বিরোধী। সে মুলতঃ ইংরেজদের প্রেরিত দূত। সে তোমাদেরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে একদিন তোমাদের দেশও ছিনিয়ে নিতে পারে। তাদেরকে যে কোন উপায়ে তোমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত কর। এ ব্যাপারে গাফলতি করলে তোমাদেরকে শেষে পস্তাতে হবে।

এচিঠি নিয়ে তিনি মাওঃ ইসমাইলকে দিলেন এবং ভালভাবে সংরক্ষণ করতে বললেন। তিনি সুলতান মুহাম্মদ খানকে লক্ষ্য করে বললেন, এই মিথ্যা অভিযোগনামাটি পাওয়ার পর তোমাদের উচিৎ ছিল এ ব্যাপারে আমাদের সাথে মত বিনিময় করা। আমাদের জানালে আমরা হয়ত এসন্দেহ নিরসন করতে পারতাম। যাক সবই আল্লাহর ইচ্ছা। হয়ত এর মাঝেও তিনি কোন কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

পেশোয়ার থেকে পাঞ্জতার প্রত্যাবর্তন ঃ

পরে সরদার সুলতান মুহাম্মদের অনুরোধে মাওঃ মাযহার আলী আযীমাবাদীকে সেখানকার কাযী নিয়োগ করা হয় এবং তার দায়িত্বে সেখানকার সকল শরয়ী বিষয় সমপর্ণ করে তিনি পেশোয়ার থেকে পাঞ্জতারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন, হাশত নগর, মারদান হয়ে আমানযাই গড়ে এসে পৌঁছলে সেখানকার খান বাহাদুররা এসে উপস্থিত হয়। অঙ্গিকার ভঙ্গ ও অবিশ্বস্থতা প্রদর্শনের জন্য তিনি তাদেরকে ভৎসনা করেন। তারা কাকুতি মিনতি করে পুনরায় আনুগত্যের ওয়াদাবদ্ধ হয় এবং উশর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়।

মীর আলম খান বাজাউড়ীর পক্ষ থেকে এমর্মে সংবাদ প্রেরণ করা হয় যে, আপনি পেশোয়ার দখল করেছেন শুনে আমরা আনন্দিত। অনুগ্রহ করে আপনি এখানে তাশরীফ আনলে আমরাও শরীয়তের বিধি-বিধান কবুল করে সুন্নতে নববীর আঙ্গিকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রস্তুত।

সংস্কার মূলক পদক্ষেপ ঃ

পরামর্শের পর তিনি নিজে না গিয়ে মাওঃ ইসমাঈলকে বাজাউড়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু সোয়াতবাসী তাঁর বাজাউড় পৌছার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মূলতঃ আলম খানের সাথে মিলিত হয়ে অত্র এলাকায় কুরআন সুন্নার বিধান কার্যকর করা হলে তা পালন করা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে এই আশংকায়ই তারা মাওলানার বাজাউড় যাওয়ার পথে বাধা দিচ্ছিল। মাওলানা তাদেরকে বুঝতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি সাইয়্যিদ সাহেবের কাছে ফিরে আসেন। এই এলাকায় অবস্থান কালে তিনি বিধবা বিবাহ ও মেয়ে বিয়ে

দিয়ে স্বামী পক্ষ থেকে পনের টাকা গ্রহণ করার মত একটি স্থানীয় কুসংস্কারের উচ্ছেদ করেন। কারণ এ সকল কুসংস্কারের কারণে মানুষের বৈবাহিক জীবনে যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তা ক্রমান্বয়ে নৈতিক ধ্বংস ডেকে আনে।

কাযীদের বাড়াবাড়ি ও তার প্রতিকার ঃ

ডাগাই মৌজায় অবস্থান কালে মাওঃ খায়রুদ্দীন সাইয়্যিদ সাহেবকে জানান যে, ছতরবাই থেকে আসার পথে যে বস্তিতেই আমরা অবতরণ করেছি সেখানকার লোকেরাই কাযীদের বাড়াবাড়ি, অতিরিক্ত কর ও জরিমানা আদায়ের অভিযোগ করেছে।

এ সংবাদ শুনে তিনি এ জটিলতার তড়িৎ নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরদিনই মাওঃ রমযান সাহেবকে কাযীউল কুজাত (প্রধান বিচারপতি) নিয়োগ করে বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োজিত কাযীদের কর্মতৎপরতার বিষয়ে পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দেন। সোয়াতের সীমান্তবর্তী এলাকা লুন্ডখুর ও কাটলঙ অঞ্চলের প্রশাসকরা এসে তার ইমামতের প্রতি আনুগত্য ব্যক্ত করে একজন বিচক্ষণ আলেমকে সে এলাকায় শরয়ী আহকাম কার্যকর করার জন্য নিয়োগের আবদার জানায়। মাওঃ খায়রুদ্দীনকেই এ কাজের জন্য অধিকযোগ্য মনে করে কিছু সৈন্য সহ তাঁকে সে অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে সে এলাকায় শরয়ী বিধান কার্যকর করতে শুরু করেন।

শরয়ী কাযীদের পাইকারী হত্যা ঃ

পেশোয়ার থেকে সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর পাঞ্জতারে ফিরে আসার অল্প কয়দিন পরই সামার গোটা অঞ্চল ও পেশোয়ারে অতর্কিত বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এবং সে সব এলাকায় নিয়োজিত ইসলামী হুকুমাতের কাযী, মুহতাসিব ও অন্যান্য কর্মচারীদেরকে একযোগে পাইকারীভাবে হত্যা করে ফেলা হয়।

গোপন সূত্রে সাইয়্যিদ সাহেব ইতিপূর্বে এ ধরনের একটি বিদ্রোহের আবাস পেলেও তিনি তা বিশ্বাস করেননি। তিনি মনে করেছিলেন এগুলো স্থানীয় রেশারেশীর ফলে ছড়ানো ভুয়া খবর হবে হয়ত। শায়খ হাসান আলী নামে জনৈক ব্যক্তি স্থানীয় এক ইমামের মারফত এলাকার খানদের বিদ্রোহের পরিকল্পনা ও মুজাহিদদেরকে হত্যা করে ফেলার অভিপ্রায়ের সংবাদ সম্পর্কে অবগত হতে পেরে সাইয়্যিদ সাহেবকে এ মর্মে অবহিত করেন। কিন্তু সব শুনে সাইয়্যিদ সাহেব বলেন এ সংবাদ ভুয়া বলে মনে হচ্ছে। মানুষ আমাদের ও তাদের মাঝে ফাটল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এগুলো ছড়াচ্ছে। এ ঘটনার দুই বা তিন দিন পর ইমামুদ্দিন নামে জনৈক লোক পেশোয়ার থেকে এসে এ মর্মে সংবাদ দেয় যে, সরদার পীর মুহাম্মদ মওলভী মাজহার আলীকে তার বাড়ীতে দাওয়াত করে নিয়ে সঙ্গী সাথী সমেত হত্যা করে ফেলেছে। সেই সঙ্গে আরবাব ফয়জুল্লাহ খানকেও তারা শহীদ করে ফেলেছে।

এ সংবাদ শুনে সাইয়্যিদ সাহেব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে পরামর্শ করেন এবং সামার গোটা অঞ্চলে যে সব মুজাহিদ নিয়োজিত ছিল তাদেরকে জরুরী তলব পাঠিয়ে পাঞ্জতারে ডেকে আনতে বললেন। কাযীউল কুযাত মওঃ রমযান আলী তখন শিওয়াহ মওজায় অবস্থান করছিলেন। সাইয়্যিদ সাহেব মাওঃ ইসমাঈলকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, দ্রুত তার নিকট গিয়ে এ সংবাদ জানিয়ে তাদেরকে কালবিলম্ব না করে যে কাজ যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় ফেলে রেখেই পাঞ্জতারে চলে আসতে বলবে। কিন্তু মুজাহিদরা মনে করল যে, সম্ভবত তিনি মুজাহিদদেরকে সমবেত করে পুনঃ পেশোয়ারের দিকে অভিযান করবেন, তাই কেউ কেউ পরদিন আবার কেউ কেউ রাত্রের শেষ প্রহরে রওয়ানার সিদ্ধান্ত নিল। তারা স্থানীয় পরিচিতিজনদের থেকে এই বলে বিদায় নিল যে, সাইয়্যিদ সাহেব আমাদেরকে জরুরী কাজে তলব করেছেন; তাই চলে যেতে হচ্ছে। স্থানীয় বিদ্রোহীরা এ সংবাদ জানতে পেরে বুঝতে পারল যে, শিকার হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং দু'চার দিন পরে তাঁদের পরিকল্পনা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত থাকলেও তারা তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সে রাতেই সর্বত্র এক যুগে মুজাহিদদের উপর আক্রমণ চালায় এবং নৃশংসভাবে তাদেরকে হত্যা করে ফেলে। স্থানীয় আলেম উলামাদের অনেকেই এমনকি হিন্দু নাগরিকরা পর্যন্ত এরূপ নৃশংসভাবে এই আল্লাহর রাহে নিবেদিত নিষ্পাপ মুজাহিদদেরকে হত্যা করতে বারণ করেছিল। কিন্তু পাষণ্ডরা কিছুতেই নিরস্ত হয়নি। যেখানে যাকে পেয়েছে নির্বিচারে বধ করছে। অসহায় মুজাহিদরা বুঝে উঠার আগেই তাদের জীবন প্রদীপকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শত শত মুজাহিদ হয়েছে তাদের বলির শিকার।

বিদ্রোহের কারণ ঃ

কেন এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল, তার কারণ হিসাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১। স্থানীয় সর্দার ও নেতৃবৃন্দের ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের হীন লালসাই তাদেরকে মূলতঃ এই শরীয়তী শাসন ব্যবস্থার প্রতি রুষ্ঠ করে তুলেছিল। কেননা স্থানীয় নেতৃবৃন্দ শরীয়তের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে যথেচ্ছা জনগণকে শোষণ করতে পারত। যেভাবে ইচ্ছা কর নির্ধারণ করতে পারত। কিন্তু শরীয়তী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদের এই স্বেচ্ছাচারিতার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে তাদের কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগে। তারা পরিষ্কার বুঝতে পারে যে, শরয়ী ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠত হলে তাদের ক্ষমতা ও মুনাফা লোটার পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে।

২। প্রথম দিকে তারা মনে করেছিল যে, শরীয়তী শাসন ব্যবস্থার অর্থহল নামায, রোযা উশর, জিযিয়া ইত্যাকার বিধি-বিধান। যে কারণে তারা এটা মেনে নিয়েছিল এবং যার যতটুকু ইচ্ছা উশর আদায় করত। কিন্তু পরে যখন শাসন

ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং তাদের থেকে পূর্ণ উশর আদায় করা হয় এবং তাদের পারিবারিক ও সামাজিক কুসংস্কারগুলো সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয় তখন তারা তাদের বংশ পরমস্পরায় চলে আসা কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। উপরন্তু জ্ঞান দৈন্যতা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে দীর্ঘ বন্ধ্যাত্বের কারণে তারা তাদের নিজেদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ক্রিয়া-কর্মগুলোকে শরীয়তের আলোকে পুনঃ মুল্যায়ন না করেই সেগুলোকে ধর্মীয় অনুশাসন ধরে নিয়ে এর সংস্কার প্রয়াসকে ধর্মের সাথে বিরোধীতা ও ধর্মদ্রোহীতা হিসাবে গণ্য করেছে। ফলে তারা এই কুসংস্কার মুক্ত ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থাকেই ধর্মদ্রোহী শাসন ব্যবস্থা বলে গণ্য করতে শুরু করে।

৩। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও আলেম উলামারা বিত্ত-সম্পদ, জাঁক-জমক ও পদমর্যাদার প্রতি মোহাবিষ্ট ছিল। আত্মপূঁজা ও আত্মবিলাসিতা তাদের অন্তরে বাসা বেঁধে ফেলে ছিল। ফলে ধর্মীয় সফলতা, সামষ্টিক কল্যাণ ও পারলৌকিক সফলতার জন্য আত্মপূজা ও প্রবৃত্তির অনুসরণের পুরানো অভ্যাসকে কুরবানী করা ও সেগুলোকে পরিহার করা ছিল তাদের জন্য দুষ্কর। স্বার্থপূঁজার যে সব দুঃখজনক ঘটনা দ্বারা মুসলমানদের ইতিহাস বারবার কলংকৃত হয়েছে, ব্যক্তি স্বার্থের বেদীমূলে সামষ্টিক কল্যাণ ও ফসলতার সর্বনাশ করা হয়েছে, বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য কতিপয় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর নিকৃষ্ট স্বার্থ চিন্তার পদমূলে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে আফগান ও সীমান্ত অঞ্চলে। তাছাড়া এই আফগানরা কোন দিনই অধীনস্থ ও অনুগত থাকাকে পছন্দ করে না, যে কারণে শরীয়তের কঠোর নিয়মনীতি মেনে চলা তাদের জন্য কষ্টকর বলে মনে হয়েছিল।

৪। সামাহ অঞ্চলে 'নিযুক্ত কর্মচারীদের থেকে কিছু বাড়াবাড়ির আচরণও সংঘটিত হয়েছিল, যার অনেকগুলো সম্পর্কে সাইয়্যিদ সাহেব জানামাত্রই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা হয়ত সাইয়্যিদ সাহেবের গোচরিভূত করা হয়নি। ফলে তার প্রতিকারও হয়নি। এগুলোও জনমনে ক্ষোভের আগুনকে উস্কে দিয়েছিল।

৫। ভারতীয় বিদ'আতী আলমেদের পক্ষ থেকে সাইয়্যিদ সাহেবকে ওয়াহাবী, লা-মাজহাবী, ইংরেজদের চর আখ্যা দিয়ে এবং সীমান্ত অঞ্চলের মানুষকে তার প্রপাগান্ডা থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ খয়রাত করে প্রেরিত একটি চিঠি তাদেরকে সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. ও তাঁর মিশন সম্পর্কে বিভ্রান্তির মাঝে ফেলে দিয়েছিল। যে কারণে তারা মুজাহিদ বাহিনীকে নিজেদের ধর্মীয় শুত্রু মনে করে তাদেরকে বধকরার পক্ষে ধর্মীয় ও নৈতিক যুক্তি খুঁজে পেয়েছিল। বরং এই হত্যাযজ্ঞকে তারা পরম করণীয় কর্তব্য জ্ঞান করেই এহেন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

তাছাড়া শরীয়তের বিধি-বিধানের উপর সাইয়্যিদ সাহেবের অনড় অবিচল থাকার বিষয়টিকে অনেকেই তাঁর একগুয়েমী ও রুক্ষতা বলে মনে করেছিল।

এই সামগ্রিক কারণগুলোই একত্রিত হয়ে বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করে এবং এই গণহত্যা সংগঠিত হয়। বিদ্রোহীরা এতটাই দুঃসাহস দেখায় যে, তারা পাঞ্জতরের উপর আক্রমণ করতেও উদ্ধত হয়।

হিজরতের সিদ্ধান্ত ঃ

এমতাবস্থায় সাইয়্যিদ সাহেব মাও. ইসমাইলসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করেন। পরামর্শ সভায় ফাতাহ খানকে মৌলিক ইন্ধনদাতা হিসাবে আখ্যায়িত করেন। অনেকেই সামাহ অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে বিদ্রোহীদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু সাইয়্যিদ সাহেব কোন মতামতকেই সমর্থন করলেন না। বরং তিনি ফাতাহ খানের মাধ্যমে স্থানীয় উলামা, মাশায়েখ ও নেতৃবৃন্দের এক সমাবেশ আহ্বান করে তাদের এহেন আচরণের কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। অনেক তদন্তের পর এ সম্পর্কে তথ্য উদঘাটিত হল যে, কতিপয় ভারতীয় আলেম উলামা ও পেশোয়ারের দুররানীদের পক্ষ থেকে প্রেরিত একটি চিঠিই তাদেরকে এহেন জঘন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছে। তারা সে চিঠিটি এনে দেখায়। সাইয়্যিদ সাহেব দেখলেন যে, এ চিঠিটি ঐ চিঠির হুবহু নকল, যা হাযারখানী ময়দানে সরদার সুলতান মুহাম্মদ তাঁকে দেখিয়েছিল। এতদ্দর্শনে তিনি অবাক হয়ে যান এবং সুলতান মুহাম্মদের প্রতি তিনি কি কি অনুগ্রহ ও আচরণ করেছেন তা উপস্থিতদের সম্মুখে সবিস্তারে উল্লেখ করেন। হাযারখানীতে এ চিঠি দেখানোর পর তিনি তাকে যে জবাব দিয়েছিলেন তাও ব্যক্ত করেন যে, এগুলো ভারতের স্বার্থন্বেষী কবর পূঁজারী বিদ্'আতী আলেমদের কান্ড। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে তার আন্দোলনের প্রভাবে কত মানুষ ইসলাহ ও সংশোধন হয়েছে তাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। সে জবাবে তৃপ্ত হয়েই সুলতান মুহাম্মদ খান তার হাতে পুনঃ বায়'আত করতঃ ফিরে গিয়েছিল। এসব কিছু উল্লেখ করার পর তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে বললেন– এত কিছুর পর আবার সেই অপবাদনামাকে পুঁজি করে সেই দাগাবাজ মুনাফিক জনগণকে গোলযোগ সৃষ্টিতে উস্কানী দিয়েছে ও উৎসাহ যুগিয়েছে এবং আমাদের শতশত মুসলিম মুজাহিদ ভাইকে এমন অসহায় অবস্থায় অজ্ঞাতসারে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। এখন এর ব্যাপারে আমাদের আর কি বলার আছে? আল্লাহই এর প্রতিকার করবেন।

অতঃপর তিনি বললেন যে, এখন এই পরিবেশে এসব লোকের মাঝে অবস্থান করা মোটেই সমীচীন নয়। তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ কর। আমরা এখান থেকে হিজরত করব এবং আল্লাহ পাক যে দিকে নিয়ে যায় সেদিকেই চলে যাব। কিন্তু এই বিশ্বাস ঘাতকদের মাঝে আর এক মুহূর্তও নয়।

হিজরতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের খরব জানতে পেরে মাও. খায়রুদ্দীন তার খিদমতে উপস্থিত হয়ে সে দেশে থেকেই জিহাদী কার্যক্রম আঞ্জাম দেওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ জানান এবং সেখানে থাকার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরে বললেন যে,

এখানকার লোকজন সম্পর্কে আপনার যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তাতে কে ভাল কে মন্দ, কে মুনাফিক কে নিষ্ঠাবান তা সহজেই নির্ণয় করা আপনার পক্ষে সম্ভব । কিন্তু নতুন জায়গায় গিয়ে এইটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করতেও অনেক সময় লাগবে। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু আমি এখানে অবস্থানের কোন পথ দেখতে পাচ্ছিনা। কেননা এখানে নিষ্ঠাবান ও সৎলোকের চেয়ে ফিৎনাপছন্দ হাঙ্গামাবাজ লোকের সংখ্যা অনেক বেশি। তাদের হিদায়াত ও সংশোধনের ব্যাপারে আমার আর কোন আশা নেই। একবার তাদের প্রতারণার শিকার হওয়ার পর আবার তাদের মাঝেই অবস্থান করা সতর্কতার পরিপন্থী। কেননা রাসূল সা. বলেছেন, মুমিন এক গর্ত থেকে দুইবার দংশন খায় না। অতএব এখন এখান থেকে হিজরত করাই সমীচীন।

চারজন প্রখ্যাত সর্দার পূর্ব থেকেই সাইয়্যিদ সাহেবকে সামাহ থেকে হিজরত করে তাদের এলাকায় চলে আসার আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন এবং তিনি হিজরত করে চলে আসলে তারা তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতারও আশ্বাস দিয়ে আসছিলেন। এদের একজন হলেন খাখাবুম্বা রাজ্যের সরদার সুলতান যবরদস্ত খান, দ্বিতীয়জন ছিলেন সোয়াতের সর্দার নাসির খান, তৃতীয়জন ছিলেন পিখলাই-এর সরদার হাবীবুল্লাহ খান আর চতুর্থজন ছিলেন আগ্রাউরের সর্দার আব্দুল গফুর খান। মনে হয় সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. প্রথমত সোয়াতকে টার্গেট করে সফরের পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করেন নি।

হিজরতের পথ ঃ

তিনি আপন বাহিনীকে হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন এবং কোন পথে হিজরত করবেন তা স্থির করে ফাতাহ খানকে ডেকে বললেন যে, আমরা ঈমানের ঝান্ডা বুকে নিয়ে মীনাই, টোপেই ও খব্বল হয়ে বেরিয়ে যেতে চাই। কেননা পথটি সমতল তাই কামানগুলো বহনের জন্য সুবিধাজনক। তুমি এসব এলাকার খানদেরকে জানিয়ে দাও যে, তারা যেন আমাদের যাওয়ার পথে কোন অসুবিধা সৃষ্টি না করে। কিন্তু কয়দিন পর ফাতাহ খান জানায় যে, এসব এলাকার শাসকদের মনপুতঃ নয় যে, আপনি এ পাথে গমন করেন। বস্তুতঃ এ সকল এলাকায়ও পাইকারীভাবে মুজাহিদদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। তাই তারা এই আশংকায় এ পথে মুজাহিদ বাহিনীর যাওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হয়নি যে, যদি মুজাহিদরা এসব এলাকায় আক্রমণ করে বসে। অতএব তিনি দুর্গম পাহাড়িয়া পথে নদী ও পাহাড়ের চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে কাংগলাই নগরী ও বুর্দেরীর মনজিল অতিক্রম করে কাবুলের পথে রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হিজরতের এ সফর শুরু করার পূর্বে তিনি মুজাহিদবাহিনীর সদস্যদেরকে এ মর্মে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে, যাদের ইচ্ছা আপন সুবিধা মত চলে যেতে পার। কারণ আমাদের এ সফর হবে জীবন জিন্দেগীর ফায়সালার সফর। তাছাড়া পথ হবে অত্যন্ত দুর্গম ও কষ্টকর। পথে খানাপিনার কষ্টও হবে সীমাহীন। আর যারা কষ্ট

সহ্য করেও আমাদের সঙ্গে যেতে চাও তারা মালামাল হালকা করে ফেল এবং প্রস্তুতি গ্রহণ কর। কিন্তু কেউই তার সঙ্গ ছেড়ে চলে যেতে সম্মত হয়নি। সফরের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ১২৪৬ হিজরীর রজব মাসের কোন একদিন আল্লাহর রাহে নিবেদিত এই বিশাল বাহিনী পাঞ্জতার ছেড়ে জীবন জিন্দেগী খোদার রাহে উৎসর্গ করণের অদম্য আবেগ নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। পথে পথে স্থানীয় খানদের অনেকেই এসে তাঁর সাথে দেখা করে এবং সফর মুলতবী করে তাঁকে আবার পাঞ্জতারে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানায়। কিন্তু সবাইকে তিনি আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন এবং এই বলে বিদায় দেন যে, সে সময় অনেক আগেই পার হয়ে গেছে।

বুর্চেরী থেকে রওয়ানা হয়ে তিনি পিওয়াড় পাহাড় ডিঙ্গিয়ে কর্ন নামক মৌজায় অবস্থান গ্রহণ করেন। ফাতাহ খান পাঞ্জতারী এ পর্যন্ত তার সঙ্গে ছিল। এখান থেকে সে ফিরে যায়। কর্ণ থেকে যাত্রা করে সিন্ধু নদ পার হয়ে কাবুলে পৌছে তিনি দু'রাকাআত শুকরানা নামায আদায় করেন এবং বলেন, আল্লাহ পাক আমাদেরকে নেকড়ের পাঞ্জা থেকে নিরাপদে বের করে এনেছেন। তোমাদেরকে আমি এখন বলছি যে, সামাহ অঞ্চলের সকল হাঙ্গামা ও রক্ত পাতের মূলে ছিল এই ফাতাহ খান। কিন্তু তাকে যে আমি খিলাফত দিয়েছি তা কেবল পরিস্থিতি সামলানোর প্রয়োজনেই। অবশ্য এই বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের পর অনেকেই শহীদদের বদলা নেওয়ার জন্য আমার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছিল; কিন্তু আমি এ ব্যাপারে অনুমতি দেই নি। কারণ সেটা তখন খুবই ঝুকিপূর্ণ ছিল। তাছাড়া আমরা গোটা ব্যাপারটাই পরওয়ার দিগারের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছিলাম।

নাসির খানের শাসনাধীন এলাকায় পৌছলে তুষারপাতের সময় ঘনিয়ে আসে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করলে তারা তুষারপাতের এ সময়টুকু তাঁদেরকে রাজদোয়ারী মওজায় অবস্থানের প্রস্তাব দেয়। রাজদুয়ারীতে অবস্থান কালে সা'আদাত খানের পুত্র হাবীবুল্লাহ খান তার সাথে সাক্ষাত করতে আসে। বালাকোট ও মুজাফফরাবাদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল তার গড় যা শিখরা জোর করে দখল করে নিয়ে তাকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছিল। নাসির খানের সাথে তার পূর্ব থেকে শত্রুতা ছিল। সাক্ষাত করতে আসলে তিনি তাদের দু'জনকে বুঝিয়ে দু'জনের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দেন। অতঃপর জিহাদ ফী সাবীলিল্লার কার্যক্রম শুরু করার পথ উদ্ভাবনের জন্য দু'জনকেই অনুপ্রাণীত করেন। তিনি তাদেরকে স্থানীয় গ্রাম ও বস্তিগুলো থেকে টাকার বিনিময়ে মুজাহিদদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা করে দিতে বলেন। এই দুই নেতার ব্যবস্থাপনায় পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও বস্তিগুলো থেকে মুজাহিদদের জন্য খাদ্যশস্য আসতে শুরু করে।

আবার জিহাদের আয়োজন ঃ

একদিন তিনি নাসির খান ও হাবীবুল্লাহ খানসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে ডেকে একত্রিত করে বললেন যে, আমরা তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জিহাদ ফী সাবীলিল্লার মহান কার্য সম্পাদনের জন্য পাঞ্জতার ছেড়ে তোমাদের এলাকায় এসেছি। অনেক দিন তোমাদের মেহমানদারী গ্রহণ করে কাটিয়ে দিলাম। এখন এমন কোন পথ বের কর যাতে জিহাদের কাজ আরম্ভ করা যায়। এভাবে বেকার বসে কাটালেতো আমাদের অভ্যাসটাই বদলে যাবে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করে তারা এমর্মে সিদ্ধান্ত করলেন যে, রাজস্ব আদায়ের জন্য শিখদের আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং যে সব উপত্যকা দিয়ে তারা প্রবেশ করতে পারে বলে সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলোর মুখে মুজাহিদ বাহিনীকে নিয়োগ করা হউক। তাতে উপত্যকার অভ্যন্তরের জনগণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। যেখানে শিখরা তাদের থেকে বলপূর্বক দ্বিগুণ ত্রিগুণ রাজস্ব আদায় করে থাকে সেখানে মুজাহিদ বাহিনী তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে এনে যদি উশর নির্ধারণ করে তাহলে তারা হৃষ্টচিত্তেই সাইয়্যিদ সাহেবের আনুগত্য করতে সম্মত হবে এবং তাকে সহযোগিতা করতেও প্রস্তুত হবে। পরে যখন শিখদের বাহিনী এসে পৌঁছবে তখন অত্র এলাকার সকল মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে সাইয়্যিদ সাহেবের নেতৃত্বে তাদের মুকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। এ প্রস্তাব সমর্থন করে তিনি বলেন- তবে উশর নির্ধারণ করার বিষয়টি তোমাদের জিম্মায় থাকবে। মানুষ যাতে বিরাগ ভাজন না হয়ে যায় সে দিকে লক্ষ্য রেখে উশর নির্ধারণের বিষয়টি তোমরা আঞ্জাম দিবে। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দিন মাওঃ ইসমাইলকে অধিনায়ক করে উপত্যকাসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয়। তিনি নিজের কাছে ৫০/৬০ জন মুজাহিদ রেখে বাকীদেরকে ভুগাড়মাঙ্গের দিকে রওয়ানা করে দেন। আর নিজে এই গুটিকয়জন সৈনিক নিয়ে সুচন মৌজায় প্রবেশ করেন।

বালাকোট ও মুজাফফরাবাদের দিকে মুজাহিদ বাহিনীর গমনের নেপথ্য কাহিনী ঃ সে সময় পিখলী ও কাগান উপত্যকার জনগণ ও নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক অবস্থা শিখদের উপর্যপরি আক্রমণ, সীমাহীন জুলুম ও নির্যাতনের কারণে এবং ক্ষমতা নিয়ে নিজেদের মধ্যকার আত্মকলহ ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণে একেবারেই নাজুক ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অনেকেই প্রতিপক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রাজ্যহারা অবস্থায় নির্বাসিত জীবন যাপন করছিল। এদের মাঝে সুলতান যবরদস্ত খান ছিলেন একজন। আপন চাচাত ভাই সুলতান নজফ খান শিখদের সহযোগিতা নিয়ে তাঁকে মুজাফফরাবাদ গড় থেকে উচ্ছেদ করে তা দখল করে নেয়। নজফ খান ঘুড়িওয়ানা নামে অন্য একজন সম্রাট আপন রাজ্য হারিয়ে কুহে দিরারায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। রাজা মুজাফফর খান আপন ভ্রাতা দিরারার শাসন কর্তা মনসুর খানের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। হাববিুল্লাহ খান শিখদের ভয়ে

আপন গড় ছেড়ে বালাকোটে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সাইয়্যিদ সাহেবের অত্র এলাকায় আগমনের সংবাদ পেয়ে সকলেই তাঁর নিকট সাহায্য কামনা করে আবেদন জানায়। সাইয়্যিদ সাহেবও চিন্তা করে দেখলেন যে, এ সকল ক্ষুদ্র শক্তিগুলোকে সহযোগিতা করে আপন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারলে সকলের সমন্বয়ে একটি বিরাট সামরিক শক্তি গড়ে তোলা সম্ভব। তাছাড়া এ সকল সম্রাটদের শাসিত অঞ্চল কাশ্মীর যাওয়ার পথেই পড়ে। সুতরাং এদের সাহায্য সহযোগিতা ও সান্তনা প্রদান করতে পারলে কাশ্মীরের পথ যেমন নিরাপদ হবে তেমনি তা দখল করাও সহজ হবে। এসব কিছু চিন্তা করেই তিনি তাদেরকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু এ সকল নেতৃবৃন্দের সাথে সমঝোতা রক্ষা করা ও কাশ্মীরের পথে অভিযান পরিচালনার করার জন্য বালাকোট ছিল একটি গুরুত্বপুর্ণ স্থান। এ কারণেই তিনি মাওঃ খায়রুদ্দীন ও মাওঃ ইসমাইল রাহ. কে বালাকোট অভিমুখে প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেন।

বালাকোট কাগান উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে পাহাড়ী একটি অঞ্চল। দু'টি পাহাড় কাগান উপত্যকার উত্তর দক্ষিণে বিদ্যমান। পাহাড় দু'টি পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে সমান্তরাল দেয়ালের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল সমতল। পূর্বদিকে কালুখানের সুউচ্চ টিলা ও পশ্চিম দিকে মাটিকোট টিলা অবস্থিত। সেটিও খুব উঁচু টিলা। এ টিলার উত্তর পার্শে মাটিকোট গ্রাম। দক্ষিণের পাহাড় ও পশ্চিমের টিলার মাঝ দিয়ে একটি পুরানো সুরু পথ গিয়ে মাটিকোটে পৌঁছেছে। এপথ দিয়েই মূলতঃ কাগান উপত্যকায় প্রবেশ করা যায়। তাছাড়া দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সমতল ভূমি দিয়ে একটি নদী বয়ে গেছে, যার নাম কুনহার নদী। এই নদীর উৎস মুখ দিয়েও এই উপত্যকায় প্রবেশ করা যায়। একারণে কাগান উপত্যকা সামরিক দিকে থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও সুরক্ষিত। এই কাগান উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে পাহাড় পরিবেষ্টিত একটি জনবসতিপূর্ণ টিলার নাম বালাকোট। সামরিক দিক থেকে এ স্থানটি অত্যান্ত গুরুত্বপুর্ণ। কেননা এই টিলার উত্তরে তিনটি সুউচ্চ টিলা রয়েছে। এই টিলাগুলো মিলে একটি প্রাচীরের আকার ধারণ করেছে, যে প্রাচীরটি তার উত্তর দিককে সুরক্ষিত করে রেখেছে। এর পশ্চিম পার্শ্বে রয়েছে সিতবন টিলা। দক্ষিণ দিকে কুনহার উপত্যকা। এই চতুঃসীমানার ঠিক মাঝখানেই বালাকোট অবস্থিত। এই টিলার উত্তর-পশ্চিম দিক ক্রমশঃ নীচের দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। তার উপর জনবসতি গড়ে উঠেছে। ফলে টিলার উপর থেকে চতুপার্শের অবস্থানগুলো সহজে লক্ষ্য রাখা যায়। এ কারণেই স্থানটি যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট সুবিধাজনক।

বালাকোট অভিমুখে মাও. খায়রুদ্দীন ঃ

আমীরুল মুমেনীনের নির্দেশ পেয়ে মাও. খায়রুদ্দীন রওয়ানা হয়ে যান। বরফাবৃত্ত পাহাড়ী পথ অতিকষ্টে অতিক্রম করে রাতের শেষ প্রহরে গিয়ে তিনি বালাকোটে

পৌঁছেন। আপন রাজ্য থেকে বিতাড়িত রাজন্যবর্গ ইতিমধ্যেই কুনহার নদীর অপর প্রান্তে এসে জড়ো হয়। তারা মাওঃ খায়রুদ্দীনকে নদীর উপারে ডেকে নিয়ে এ মর্মে পরামর্শ দেয় যে, মুজাফফরাবাদের শাসন কর্তা সুলতান নযফ খান সের সিংহের সাথে বর্তমানে পেশোয়ারে রয়েছেন; তাই মুজাফফরাবাদ বর্তমানে অরক্ষিত; সুতরাং এটাই সুযোগ। বলতে গেলে মুকাবেলাই হবে না, আর হলেও তার জন্য আমরাই যথেষ্ট। মুজাহিদ বাহিনী আমাদের সঙ্গে থাকবে শুধু বরকতের জন্য। আপনি সম্মত হলে আমরা আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরী করতে পারি। তড়িঘড়ি এহেন প্রস্তাব মাওঃ খায়রুদ্দীনের মনোপুতঃ হয়নি। সুতরাং তিনি এই বলে জবাব দেন যে, আমার সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আমি আমীরুল মু'মিনীনের আজ্ঞাবহ মাত্র। আপনাপরা বরং তাঁর কাছে হাযির হয়ে এ প্রস্তাব পেশ করুন। এতে তারা নানাহ ধরনের অসুবিধার কথা বলে পাশ কাটিয়ে যায়।

বালাকোটে মাও. ইসমাইল ও মুজাফফরাবাদের অভিযান ঃ

মাও. ইসমাইলও সুচন থেকে রওয়ানা হয়ে প্রথমে ভুগাড়মাঙ্গে পৌঁছেন। ভুগাড়মাঙ্গ থেকে রওয়ানা হয়ে একটি গ্রামে যাত্রা বিরতি করলে সেখানকার লোকেরা পরামর্শ দেয় যে, বালাকোটে পৌঁছতে হলে এক মুহুর্তও বিলম্ব করা উচিত হবে না। কেননা অতিরিক্ত বরফ পাতের ফলে বালাকোটের পথ বন্ধ হয়ে গেলে তাদেরকে অতিরিক্ত এক মাস এখানে অপেক্ষা করতে হবে। তুষারপাত শুরুই হয়ে গিয়েছিল, ফলে অতিকষ্টে পাহাড়ী গোয়ালাদের সহযোগিতায় বরফের উপর দিয়ে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তাঁরা কোন মতে গিয়ে বালাকোটে পৌঁছলেন। মাওঃ ইসমাইল বালাকোট পৌঁছলেই পিখলী ও কাগানের রইস সুলতান যবরদস্ত খান ও তার সাথী সঙ্গী অন্যান্য রাজন্যবর্গ মাওঃ ইসমাইলের খিদমতে হাযির হয়ে মুজাফফরাবাদ অভিযানের পূর্ব প্রস্তাবটি পুনরায় তাঁর কাছে পেশ করলে তিনি এই শর্তে তাতে সম্মত হন যে, মুজাহিদদের একটি খন্ড দল মাত্র এই অভিযানে তাদের সঙ্গে যাবে।

মাওঃ খায়রুদ্দীন এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একমত হতে পারছিলেন না। কেননা তিনি এটাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় বলে মনে করছিলেন। তাই তিনি বললেন, যবরদস্ত খানের যদি সৈন্যদের নিয়ে যাওয়ার এতই খাহেশ হয় তাহলে সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় সামান যোগাড় করার জন্য তাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে বলুন। মাওঃ ইসমাইল বললেন, এখন সে টাকা কোথায় পাবে? তবে সে ওয়াদা করেছে মুজাফফরাবাদ পৌঁছার পর সমস্ত রসদ ও সামান সে যোগাড় করে দেব। মাওঃ খায়রুদ্দীন বললেন এগুলো তার বাহানা মাত্র। তাই তিনি এই দলের সঙ্গে যেতে রাজী হলেন না। অগ্যতা মুন্সী গাওছ মুহাম্মদকে সরদার নিযুক্ত করে মুজাফফরাবাদের দিকে বাহিনী প্রেরণ করা হয়। এ বাহিনী মুজাফফরাবাদের নদীর দ্বারে গিয়ে পৌঁছতেই শিখদের খবর হয়ে যায়। তারা নদী পারাপারের সকল পথ বন্ধ করে দেয়। এমনকি নৌকাগুলোও ডুবিয়ে দেয়। এ নদী কখনই

হেঁটে পারাপারের যোগ্য ছিল না। কিন্তু মুজাহিদ বাহিনী আল্লাহর নাম নিয়ে নদীতে নেমে পড়ে এবং হাঁটু পানি ভেঙ্গে নদী পার হয়ে যায়। মাওলানা খায়রুদ্দীন সামগ্রিক অবস্থার কথা জানিয়ে সাইয়্যিদ সাহেবকে একটি চিঠি লিখেন। জবাবে সাইয়্যিদ সাহেব লিখেন যে, মাওলানা ইসমাইল তাড়াহুড়া করেছেন বটে, তবে আপনার সেখানে যাওয়া প্রয়োজন। চিঠি পেয়ে তিনি মুজাফফরাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। সুলতান যবরদস্ত খান আপন বাড়ীঘর ও বাজারের দখল পাওয়ার পর শিখদের সঙ্গে আতাত করতে চেষ্টা করে। মুজাহিদরা এ সংবাদ জানতে পেরে তাকে ভর্ৎসনা করে ও গালমন্দ দিতে শুরু করে। মাওলানা ইসমাইলও রসদ এবং গোলাবারুদের দাবী জানাতে শুরু করে। ইতিমধ্যেই মুজাহিদরা শিখদের গড় আক্রমণ করে গড়ের মুখের ছাউনীটি দখল করে ফেলে। অবশ্য উভয় পক্ষে তুমুল গোলাগুলি হয়। মাওলানা ইসমাইল যবরদস্ত খানকে এই মর্মে হুশিয়ার করে দেন যে, এই মুহূর্তে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্যথায় পরে পস্তাতে হবে। এ জন্য রসদ, অস্ত্র-শস্ত্র ও প্রয়োজনীয় সামান উপকরণ সরবরাহ করা তোমার দায়িত্ব। সুতরাং অনতিবিলম্বে তা সরবরাহ কর। কিন্তু যবরদস্ত খান গড়িমশি করতে থাকে। যবরদস্ত খানের এহেন বেপরোয়া মনোভাবের কথা সাইয়্যিদ সাহেবকে লিখে জানানো হলে তিনি উত্তরে লিখেন যে, আপনি চলে আসলে যদি সুলতান নাশোখ হয় তাহলে আপনি ওখানেই থাকুন। ফলে মাওলানা ইসমাইল প্রায় এক মাস মুজাফফরাবাদে অবস্থান করেন। ইতিমধ্যেই সংবাদ পাওয়া যায় যে, শের সিংহ সুলতান নযফ খানের সঙ্গে বালাকোট উপত্যকায় এসে গেছে এবং হাবিবুল্লাহ গড়ে অবস্থান গ্রহণ করেছে। যবরদস্ত খান এ সংবাদ পেয়ে মাওলানা খায়রুদ্দীনের নিকট এসে হাহুতাশ শুরু করে। মাওলানা বলেন তোমাকে আগেই সতর্ক করা হয়েছে, এ চিত্রটা আমার মস্তিষ্কে প্রথম থেকেই ছিল। কিন্তু যে নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য টাকা-পয়সা ব্যয় করতে চায়না তার রাজ্য কি করে রক্ষা পাবে। যাই হউক, এখনও সময় আছে। দৃঢ় মনোবল ও সাহসকিতা নিয়ে কাজ করলে শেষ রক্ষা হতে পারে। কেননা নদীটি একটি প্রাকৃতিক বাধা। এটি অতর্কিত পাড় হয়ে আসা অসম্ভব। আবার এদিকটায় পাহাড়ী দেওয়াল রয়েছে। সুতরাং আশংকাজনক স্থানগুলো আমাদের দায়িত্বে ছেড়ে দাও, আর যেখানে ঝুঁকি কম সেখানে তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে থাক। সবাই এ পরামর্শ পছন্দ করল এবং এরূপই সিদ্ধান্ত হল। কিন্তু প্রভাতে দেখা গেল যবরদস্ত খান যে পথে নগর থেকে পলায়ন করা যাবে সেই পথের মাথায় আপন সামানাদি বেঁধেছেদে রেখে দিয়েছে। আর প্রভাতে মাওলানাকে ডেকে বলল, ব্যাস চলুন। মাওলানা বললেন কোন দিকে? সে বলল এই পাহাড়েই। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে মাওলানা মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন। কিন্তু পথে যবরদস্ত খানের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যেদিকে পারল পালাতে শুরু করল। মাওলানা আপন বাহিনীকে পালাতে নিষেধ করলেন এবং শিখদের মুকাবেলায় রুখে দাঁড়াতে বললেন। মুজাহিদরা রুখে দাঁড়িয়েছে একথা বুঝতে পেরে শিখরা মুজাফফরাবাদের দিকে চলে যায় এবং সেখানকার ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট শুরু করে।

সেখান থেকে মাওলানা খায়রুদ্দীন বাহিনী নিয়ে বালাকোটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। তবে হাবিবুল্লাহ গড়ের পাশ দিয়ে যে রাস্তা বালাকোটের দিকে গিয়েছিল তা শিখদের দ্বারা অবরুদ্ধ থাকায় তাকে কাগান উপত্যকার পাহাড়ী দুর্গম পথ ধরেই অগ্রসর হতে হয়েছিল। সাইয়্যিদ সাহেব সংবাদ পেয়ে গোয়ালাদের একটি দলকে বরফ কেটে পথ তৈরি করে দেওয়ার জন্য পাঠান। পথে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। পরে সুস্থ হয়ে যখন বালাকোটে পৌছান তখন সেখানে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

কাশ্মীর আক্রমণের পরিকল্পনা ঃ

মাওলানা ইসমাইল রাহ. বালাকোটে অবস্থানরত অবস্থায় কাশ্মীরের একটি প্রতিনিধি দল মাওলানার সাথে দেখা করে এ মর্মে আবেদন পেশ করে যে, বালাকোটে মুসলিম বাহিনীর আগমনে আমরা অত্যন্ত খুশী হয়েছি। এখান থেকে কাশ্মীর মাত্র তিন মনজিলের পথ। আমরা দু'আ করছি যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলিম বাহিনীকে সত্বর আমাদের দেশে নিয়ে আসুন, যাতে আমরাও কাফিরদের জোর-জুলুমের হাত থেকে নাজাত পাই এবং আমীরুল মুমেনীনের নেতৃত্বাধীন ইসলামী হুকুমতের ছত্রচ্ছায়ায় স্বাধীনভাবে ইসলামী বিধি-বিধান ও কুরআন সুন্নার অনুসরণ করে চলতে পারি। এ প্রেক্ষিতে মাওলানা ইসমাইল কাশ্মীর অভিযানের অভিপ্রায়ের কথা সুচনে সাইয়্যিদ সাহেবকে জানান। সাইয়্যিদ সাহেব সুচনের সরদার হাসান আলী খান ও হাবীবুল্লাহ খানের সঙ্গে পরামর্শ করলে তাঁরা বললেন যে, আপনি কাশ্মীর যেতে ইচ্ছা করলে অনায়াসে যেতে পারবেন। কিন্তু যদি এখানকার শিখ বাহিনীকে পরাস্ত করে না যান, তাহলে আপনাদের চলে যাওয়ার পর শিখরা এ অঞ্চলের জনগণের উপর এই অভিযোগ এনে সীমাহীন নির্যাতন চালাবে যে, তোরাই পথ দেখিয়ে মুজাহিদ বাহিনীকে এখানে নিয়ে এসেছিস এবং কাশ্মীরে পৌছার পথ তৈরি করে দিয়েছিস। আর যুদ্ধ করে শিখদের পরাস্ত করে কাশ্মীরের দিকে অভিযান করলে আমরাও আপনাদের সঙ্গে যেতে পারব। মুসলমানরা নির্যাতিত হবে না। একথা শুনে তিনি কাশ্মীর অভিযান আপাততঃ মুলতবী রাখতে নির্দেশ দেন। আমীর হিসাবে তাঁর নির্দেশ মেনে নিলেও মাওলানা ইসমাঈলের কাছে এ সিদ্ধান্ত মনোপুতঃ হয়নি।

বালাকোটে শেরসিং এর বাহিনী ঃ

শেরসিং গড় থেকে প্রথমে মুজাফফরাবাদের দিকে রওয়ানা হয়। মুজাফফরাবাদ থেকে পুনঃ গড়ে প্রত্যাবর্তন করে বালাকোটে যাওয়ার রাস্তা তালাশ করে। এ জন্য সে বাহিনীও প্রস্তুত করতে থাকে। ইতিমধ্যে দূত মারফত মাওলানা ইসমাইল জানতে পারলেন যে, শের সিং ভুগাড়মাঙ্গ উপত্যকা অভিমুখে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে। তিনি সাইয়্যিদ সাহেবকে পত্র মারফত এ সংবাদ জানিয়ে বলেন যে, যেহেতু আপনি সেদিকে আছেন সুতরাং সে সেদিকে যেতে পারে। তবে যদি যুদ্ধের আভাস পান তাহলে দূত পাঠিয়ে দ্রুত আমাদেরকে সংবাদ দিবেন, যাতে আমরা আমাদের বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধে শরীক হতে পারি। কিন্তু শের সিং এই পরিকল্পনা ত্যাগ করে গড়ে ফিরে আসে। মাওলানা ইসমাইল

অন্যান্যদের সাথে পরামর্শ করে রাতের বেলায় শিখদের গড়ে একটি অতর্কিত হামলার পরিকল্পনা তৈরি করেন। ইতিমধ্যে সুচনে চলে আসার জন্য সাইয়্যিদ সাহেব তার কাছে জরুরি তলবনামা পাঠান। অগত্যা আক্রমণের পরিকল্পনা ত্যাগ করে তিনি সুচনে গিয়ে উপস্থিত হন।

সুচনে উশরের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ইবাদাত, দু'আ ও মিশকাত শরীফের দরস ও সামরিক কসরতের মাঝে সময় কাটতে থাকে।

বালাকোটের পথে সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. ঃ

১২৪৬ হিজরীর জিলকদ মাসের মাঝামাঝি সময় বালাকোটের দায়িত্বশীল হাবীবুল্লাহ খানের পক্ষ থেকে এ মর্মে পত্র আসে যে, শের সিং তার বাহিনী নিয়ে বালাকোট থেকে আড়াই ক্রোশ দূরে কুনহার নদীর দক্ষিণ পাড়ে এসে তাঁবু ফেলেছে বলে জানা গেছে। সুতরাং আপনি আপনার বাহিনী নিয়ে অতিসত্ত্বর বালাকোটে চলে আসুন।

এ চিঠি পেয়ে সাইয়্যিদ সাহেব বালাকোটের পথে রওয়ানা হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেন। যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণের পর ১২৪৬ হিজরীর ৫ই জিলহজ্জ মুজাহিদদের সঙ্গে নিয়ে তিনি বালাকোটের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। পাহাড়ী পথ মাড়িয়ে আল্লাহর রাহের এই মুসাফিররা এগিয়ে চললেন।

কুমরে কুহে সৈয়দ সাহেবের রাত্রি যাপন ও আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমানদারীঃ

কুমরে কুহের একটি সমতল ভূমিতে পৌঁছে আমীরুল মুমেনীন থেমে যান। মাওলানা ইসমাইল তাঁর বাহিনী নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সাইয়্যিদ সাহেব তাঁর কাছে এ মর্মে সংবাদ পাঠিয়ে দেন যে, আমার মন চাচ্ছে আজ রাত এই উপত্যকায় অবস্থান করতে, সুতরাং আমি থেমে গেলাম। আগামী কাল ইনশাআল্লাহ আমরা আপনার বাহিনীর সাথে এসে মিলিত হব। সৈনিকরা বলাবলি করছিল যে, 'আমাদের শীত বস্ত্র ও আসবাবপত্র সবই মাওলানা ইসমাইলের বাহিনীর সঙ্গে চলে গেছে। এখানে প্রচন্ড শীত পড়বে, তাছাড়া আমরা সারাদিন না খেয়ে আছি। এখানে খাবার ব্যবস্থাই বা হবে কি ভাবে?' তাদের এসব কথাবার্তা শুনে তিনি বললেন, ভাইয়েরা আমার! আমাদের প্রতিপালক আমার সঙ্গে যথাযোগ্য মেহমানদারীর ওয়াদা করেছেন। অনেকদিন যাবৎ আমরা শুধুমাত্র তাঁর মেহমান হওয়ার সুযোগ পাইনি। আজ সে সুযোগ এসেছে। মাগরিবের পর তিনি মর্মস্পর্শী এক ওয়াজ করেন ও বিনয়াবনত হয়ে রোনাযারীর সাথে দু'আ করেন। ইশার নামাযের পর তিনি জঙ্গলের দিকে বেরিয়ে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে নিদ্রা যাওয়ার জন্য বিশ্রাম নেন। ইতিমধ্যেই দেখা গেল পাহাড়ী পথ বেয়ে মালামাল নিয়ে কারা যেন আসছে। জিজ্ঞাসা করা হল, তোমরা কারা? তারা বলল, আমরা সাইয়্যিদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই। রাতের বেলায় তাঁর আগমন সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তাই আসতে দেরী হয়ে গেল। একথা শুনে তিনি বললেন, তাদের আসতে দাও। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য তাঁর নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন।

সেই রাতে একবার তিনি প্রকৃতির ডাকে বাইরে যান। তখন ঐ পাহাড়ী উপত্যকা থেকে বিরাট একটি আওয়াজ হয়, যেন বিরাট বোমা ফুটেছে। এতে সকলেই আতংকিত হয়। এদিকে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেল অথচ সাইয়্যিদ সাহেব জঙ্গল থেকে ফিরছেন না। অনেকেই তাঁর তালাশে বেরিয়ে পড়ল। দীর্ঘক্ষণ পর তিনি ফিরে আসলে বাহিনীতে স্বস্তি ফিরে আসল। দেরীর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "হাঁ, আমিও বুঝতে পেরেছি, অনেক দেরী হয়ে গেছে। ওখানে বসতে বসতে আমার পা দু'টো নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল"। এরপর তিনি আর কিছু বললেন না। কিন্তু দেখা গেল, ক্রমশই তাঁর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। জিহাদের ব্যাপারে তিনি যে সব আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করতেন এর পর থেকে সব কিছু বন্ধ করে দিলেন।

বালাকোটে প্রবেশ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি ঃ

পরদিন ফজরের পর তারা রওয়ানা হলেন। মাওলানা ইসমাইল পূর্বেই পৌঁছে গিয়েছিলেন। ফজরের পর লোকজনসহ তিনি সাইয়্যিদ সাহেবের ইসতিকবালে আসেন। যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে তাঁকে বালাকোটে নিয়ে যাওয়া হয়। বসতির সরদার ওয়ালেস খান তার নিজের বাড়ী হযরতের জন্য খালি করে দেয়। হযরত সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন। বালাকোটে পৌঁছেই বালাকোটের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি জোরদার করেন এবং যে যে পথে শিখদের আগমনের সম্ভাবনা ছিল সব দিকেই পাহারা মোতায়েন করেন।

বালাকোটই লাহোর বালাকোটই জান্নাত ঃ

মোল্লা লাল মোহাম্মদকে মাটিকোটের সেই পাহাড়ী সরু পথটির পাহারায় নিয়োগ করা হয়েছিল। পরে তাকে পরিবর্তন করে মির্জা আহমদ বেগকে সেখানে মুতায়েন করা হয়। শের সিংহের বাহিনী কুনহার নদীর পূর্ব-দক্ষিণ দিকে বালাকোট থেকে দুই-আড়াই ক্রোশ দূরে অবস্থান নিয়েছিল। সাইয়্যিদ সাহেব কুনহার নদীর উপর দিয়ে দক্ষিণ পূর্বদিকের এলাকায় গমনের জন্য গাছ দিয়ে একটি পুল তৈরি করিয়ে ছিলেন। শিখরাও পশ্চিমে আসার জন্য একটি পুল নির্মাণ করেছিল। কাঠের পুল নির্মাণের দুই একদিন পরই গুপ্তচর এসে সংবাদ দিল যে, শিখ বাহিনী নদী পার হয়ে এদিকে না এসে অন্যদিকে যেন চলে যাচ্ছে। কিন্তু তার পর দিন যোহরের পরই মাটিকোট পাহাড়ের উপর গুলির আওয়াজ শোনা গেল। গোয়ালাদের লোকজন চিৎকার করে বলতে লাগল যে, শিখ বাহিনী এসে গেছে।

সাইয়্যিদ সাহেব সে দিকে কিছু সৈন্য আহমদ বেগের সহযোগিতার জন্য পাঠালেন এবং বলে দিলেন যে, সেই পাহাড়ে তাদেরকে বাধা না দিয়ে আহমদ বেগ যেন তাঁর বাহিনী নিয়ে নিচে নেমে আসে। দিনের মাত্র দেড় ঘন্টা বাকী, এ সময় সুলতান নযফ খানের কাছে থেকে একটি চিঠি আসে। চিঠিতে সে সাইয়্যিদ সাহেবকে যে পরামর্শ দেয় তা নিয়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। কেউ বলেন, এটি ষড়যন্ত্রমূলক; আর কেউ বলেন, পরামর্শ যথার্থ ও

স্বার্থহীন। সুতরাং তার পরামর্শ অনুসারে শিখদের তোপখানা আক্রমণ করা হউক। এসব শুনে তিনি বললেন, এখন কাফিরদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করা আমার ইচ্ছা নয়। আমি এই বালাকোটের পাদদেশেই তাদের সাথে লড়তে চাই। এই ময়দানই লাহোর এই ময়দানই জান্নাত। মনে রেখো জান্নাত এত মূল্যবান সামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত যে, সমগ্র দুনিয়ার রাজত্বও তার সামনে তুচ্ছ। সুতরাং তিনি সকল স্থান থেকে পাহারারত মুজাহিদদেরকে তলব করে তাঁর কাছে নিয়ে আসলেন এবং তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজ রাতে সকলেই পরিপূর্ণ ইখলাছের সাথে আল্লাহর দরবারে তাওবা ইস্তিগফার করে নিজের গুনাহ খাতার জন্য একাগ্রচিত্তে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। এই রাতটুকুই তো সময় আছে। কাল ভোরে তো কাফিরদের সঙ্গে আমাদের মুকাবিলাই হবে। আমাদের মাঝে কে জীবিত থাকবে, কে শাহাদত বরণ করবে তা আল্লাহই ভাল জানেন। মুকাবেলার সকল সম্ভাব্য ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হয়। ফজরের নামাযের পর সবাইকে প্রস্তুত হতে বলে তিনি নিজের আস্তানায় চলে যান। কিছুক্ষণ পর অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে আসেন এবং মসজিদের দিকে রওয়ানা হন। এ সময় শিখ বাহিনী মাটিকোটের দিক দিয়ে নিচে অবতরণ করছিল। লোকেরা সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, ওদেরকে অবতরণ করতে দাও। শিখ বাহিনী কামান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করে। এ সময় অন্য এক জগতের আকর্ষণে তিনি যেন উদাস হয়ে উঠেন। তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যা যেখানে যেভাবে আছে সেখানে সেভাবেই থাকতে দাও।

এক সময় তিনি মুজাহিদদের থেকে সরে গিয়ে মসজিদের দরজা জানালা বন্ধ করে দু'আ করতে শুরু করেন। কিন্তু কতক্ষণ পর পর দরজা খুলে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাস করছিলেন, কে আমাকে ডাকল, অথচ কেউ তাকে ডাকেনি। তিনবার এরূপ জিজ্ঞাসা করার পর তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে দ্রুত ময়দানের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন। তখন বৃষ্টির মত গোলাগুলি চলছে। তিনি ডালুতে অবস্থিত অন্য একটি মসজিদে প্রবেশ করে বন্দুক ও কুরাবিনদারী সৈনিকদেরকে একত্রিত করে তাঁর আগে আগে চলতে বলে তিনি ব্যাঘ্রের ন্যায় ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আর তখনই উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

বালাকোটের শাহাদত গাহ ঃ

উভয় পক্ষে ভীষণ গোলাগুলি শুরু হয়। দুপক্ষের কামানগুলো গর্জে উঠে। আমিরুল মু'মেনীন এই গুলাগুলির মাঝেই সম্মুখে এগিয়ে যান। সামনে একটি ধান ক্ষেতের মাঝখানে অবস্থিত একটি পাথরকে আড়াল করে তিনি বসে যান। গোলাগুলির ধুয়ায় চারদিকের পরিবেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। লড়াই চলাকালে হঠাৎ ময়দানে রব উঠে আমিরুল মু'মেনীন নেই। সৈনিকেরা যুদ্ধ রেখে আমিরুল মু'মেনীনের খুঁজে এদিক সেদিক ছুটতে থাকে। চতুর্দিকে এক চরম হতাশা ছেয়ে যায়। সৈনিকরা মনোবল হারিয়ে ফেলে। যুদ্ধের গতি পাল্টে যায়। বহু মুজাহিদ লড়াইয়ের ময়দানেই শাহাদত বরণ করেন। অবশিষ্ট মুজাহিদরা ছত্রভঙ্গ হয়ে

পড়ে। বিজয় শিখদের পক্ষে চলে যায়। কিন্তু মুজাহিদদের এই আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। তাদের কুরবানী স্বাধীনতার চেতনাকে করেছে বেগবান। যুগে যুগে যুগিয়েছে স্বাধীনতার চেতনা। বালাকোটের রণাঙ্গণে বেঁচে যাওয়া মুজাহিদরা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে স্বাধীনতার আন্দোলনকে করেছে সক্রিয় ও গতিশীল। বালাকোটের আত্মত্যাগই আমাদেরকে পরবর্তী সময়ে আন্দোলন ও সংগ্রামের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

হাজী শরীয়তুল্লার আন্দোলন

হযরত শাহ আব্দুল আযীয রাহ.-এর 'দারুল হরব" ঘোষণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলাদেশ অঞ্চলে যারা আন্দোলন মুখর হয়ে উঠেছিলেন, হাজী শরীয়তুল্লাহ রাহ. ছিলেন তাদের অন্যতম। নীলকর সাহেবদের দ্বারা নিগৃহীত ও নির্যাতিত দেশবাসীর কাছে তিনি ছিলেন মুক্তির স্বপ্নপুরুষ। হিন্দু জমিদারদের দ্বারা উৎপীড়িত মুসলমানদের কাছে তিনি ছিলেন ত্রাণকর্তা স্বরূপ।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান শরীয়তপুর জিলার মাদারীপুরের অন্তর্গত শামাইল নামক গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। আট বৎসর বয়সে পিতা আব্দুল জলীল তালুকদার মারা গেলে তিনি চাচা আযীম উদ্দীনের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। ১৮ বৎসর বয়সে হজ্জ করতে গিয়ে দীর্ঘ ২০ বৎসর কাল আরব জাহানে অবস্থান করতঃ শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। অতপর ১৮১৮ সালে দেশে ফিরে স্বদেশের মানুষের হিদায়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে পূর্ণ ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন, নির্যাতিত মানুষের মাঝে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রতকরণ, পরাধীনতার অক্টোপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতার মন্ত্রে মুসলমানদেরকে উজ্জীবিত করণই ছিল তার মিশনের মূল উদ্দেশ্য।

এ সময় বঙ্গদেশীয় অঞ্চলে হিন্দু সভ্যতার প্রভাবে কবর পূজা, পীরকে সিজদা করাসহ বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এ সকল বিদ'আত ও কুসংস্কার উচ্ছেদ করতঃ বিশুদ্ধ ইসলামী চিন্তাধারা পুনঃ প্রতিষ্ঠার মানসে তিনি, গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে মানুষকে বুঝাতে থাকেন। ইসলামের যে সকল ফরজ বিধান মানুষ ছেড়ে দিয়েছিল সেগুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে তিনি অধিক গুরুত্বারোপ করতেন। এজন্য তাঁর আন্দোলন ফরায়েজী আন্দোলন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাছাড়া ইংরেজদের হাতে নিগৃহীত মানুষের মুক্তি এবং ইংরেজদের তল্পীবাহক হিন্দু জমিদারদের দ্বারা উৎপীড়িত মানুষের মুক্তির চিন্তাও তাকে দারুণভাবে বিচলিত করে। ইংরেজদের চক্রান্তের শিকার এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থার বিষয়টি তাঁকে দারুণভাবে বিচলিত করে তুলেছিল। তিনি মনে করতেন যে, ইংরেজদের অধীনতা স্বীকার করে নিয়ে এদেশের মুসলমানদের জন্য সত্যিকারের ইসলামী জীবনাদর্শের অনুসরণ সম্ভব হবে না। একারণে শাহ আব্দুল

আযীয রাহ. ও সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর আন্দোলনের ধারা অনুসরণ করে তিনি বঙ্গ দেশকে 'দারুল হরব' বা শত্রু কবলিত দেশ বলে ঘোষণা দেন। যেহেতু দারুল হরবে জুমা ও ঈদের নামায আদায়ের বিধান নেই; একারণে তিনি এদেশে ঈদ ও জুমার নামায বিধি সম্মত নয় বলে ফতওয়া প্রদান করেন।

হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন বঙ্গের মুসলিম জাগরণের অগ্রপথিক। তাঁর আদর্শ ও চিন্তা চেতনার প্রভাবে সারাদেশে একটি ধর্মীয় জাগরণ সৃষ্টি হয়। তাঁর অবিচলতা ও অবিরাম কর্মতৎপরতার ফলে সারা দেশে ধীরে ধীরে আত্ম-সচেতনতা জাগরিত হয় এবং দলে দলে লোক তাঁর আন্দোলনে এসে শরীক হতে থাকে। সারা দেশের মানুষকে এই নতুন চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করার মানসে তিনি ঢাকা, বরিশাল, পাবনা ও ময়মনসিংহসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করেন এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন।

তাঁর আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট ব্যাপক গণজাগরণ ইংরেজ নীলকর সাহেবদের জন্য ও তাদের পোষ্য জমিদার শ্রেণীর জন্য বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তারা এ আন্দোলনকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং মুসলমানদেরকে নানাভাবে হয়রানী করতে শুরু করে। যোগেশচন্দ্র বলেন 'জমিদার ও নীলকরের অত্যাচারে মুসলমানদের জীবন অতিষ্ঠ ও দুর্বিষহ হয়ে উঠে।' জেমস ওয়াইজ লিখেছেন যে, জমিদাররা প্রজাদের উপর নানারকম অবৈধ কর বসাতে শুরু করে। এমনকি দুর্গাপূজা, কালীপূজা ইত্যাদি হিন্দু উৎসবের জন্যও মুসলমানদের কর দিতে হত। এহেন পরিস্থিতিতে হাজী শরীয়তুল্লাহ জমিদার ও নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আন্দোলন শুরু করেন। পূর্ববঙ্গের কৃষকরা দলে দলে তাঁর আন্দোলনে যোগ দিতে থাকে। ক্রমে হাজী শরীয়তুল্লাহ হিন্দু জমিদার ও নীলকর কুঠিয়ালদের জন্য ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ান।

১৮৩১ সালে ঢাকার নয়াবাড়ী নামক স্থানে প্রচারাভিযান চালানোকালে হিন্দু জমিদারদের সাথে তাঁর ভীষণ সংঘাত বেধে যায়। কতিপয় মুসলমান হিন্দু জমিদারদের পক্ষ অবলম্বন করে তাঁর প্রচারকার্যে বাধা দান করলে তিনি দারুণভাবে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে স্বগ্রামে ফিরে যান।

তাঁর অব্যাহত কর্মতৎপরতার ফলে সারাদেশের মুসলমানদের মাঝে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়। ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল ফরায়েজীদের সাংগঠনিক তৎপরতার আওতায় চলে আসে।

১৮৪০ সালে এই সমাজ সংস্কারক মর্দেমুজাহিদ ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র মুহসিন উদ্দীন দুদু মিয়া এ আন্দোলনের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন। ফরায়েজী আন্দোলনের অগ্রগতি ও সাংগঠনিক কর্ম তৎপরতায় তিনি তাঁর পিতাকেও ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিলেন।

দুদু মিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কর্মতৎপরতা ঃ

১৮১৯ খ্রীঃ মাদারীপুর মহকুমার মুলফতগঞ্জ থানায় তাঁর জন্ম হয়। পিতা হাজী শরীয়তুল্লার গৃহেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ১২ বৎসর বয়সে দুদু মিয়াকে মক্কা শরীফ প্রেরণ করা হয়।

মক্কা যাওয়ার সময় বেশ কিছু দিন তিনি কলকাতায় অবস্থান করেন। এ সময় সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ রাহ. এর অন্যতম শিষ্য হাজী নেছার উদ্দীন ওরফে তিতুমীরের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর সাহচর্যে দুদু মিয়া সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর আদর্শিক চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হন। মূলতঃ সে চেতনার ভিত্তিতেই তিনি তাঁর পরবর্তী জীবনের সংগ্রামী অবকাঠামো তৈরি করে ছিলেন। একারণে দাওয়াত, তালকীন ও ইরশাদের পাশাপাশি জিহাদী তৎপরতা তাঁর জীবনের অন্যতম কাজ হয়ে দাঁড়ায়। মক্কায় ৫ বৎসর অবস্থান করে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করার পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরেও তিনি তাঁর পিতার নিকট উচ্চতর জ্ঞানচর্চা করেন।

কর্মজীবন ঃ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর ফরায়েজীগণ তাঁকে নিজেদের নেতা নিযুক্ত করেন। তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণের পর থেকেই ফারায়েজী আন্দোলনে নতুন গতির সঞ্চার হয়। ইংরেজদের মদদপুষ্ট হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার থেকে মুসলমান কৃষকদের রক্ষা করার জন্য তিনি এক বিশাল লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। মুসলমান প্রজাদের উপর আরোপিত বিভিন্ন বেআইনী পৌত্তলিক কর প্রদানের ব্যাপারে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং এ ভিত্তিতে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস গ্রহণ করেন। ১৮৪১ ও ১৮৪২ খ্রীঃ তিনি কানাইপুর ও ফরিদপুরের জমিদারদের বিরুদ্ধে দুটি যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। কানাইপুরের জমিদার তাঁর বিশাল লাঠিয়াল বাহিনীর ভয়ে ভীত হয়ে আক্রমণের পূর্বেই এই মর্মে সন্ধিবদ্ধ হয় যে, ফরায়েজীদের উপর সে কোনরূপ অত্যাচার করবেনা এবং তাদের থেকে কোনরূপ বেআইনী করও আদায় করবে না।

ফরিদপুরের জমিদারের বিরুদ্ধে অভিযানকালে ফরায়েজীরা জমিদার বাড়ী আক্রমণ করতঃ জমিদার মদন ঘোষকে হত্যা করে ফেলে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকার ১১৭ জন ফরায়েজীকে গ্রেফতার করে। তন্মধ্যে ২২ জনকে ৭ বৎসর করে সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়। অবশ্য দুদুমিয়ার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কোন অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

দুদু মিয়ার প্রথম দিককার এসব বিজয় রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কারণ তাঁর এই বিজয় অত্যাচারে জর্জরিত কিংকর্তব্যবিমূঢ় কৃষক শ্রেণী ও সাধারণ মানুষের কাছে তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। মানুষ তাঁকে ত্রাণকর্তা রূপে ভাবতে শুরু করে এবং দলে দলে তাঁর আন্দোলনে এসে যোগ দিতে থাকে। যে সব মুসলমান এতদিন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল

তারাও ক্রমান্বয়ে এ আন্দোলনে এসে শরীক হতে শুরু করে।

অত্যাচারী জমিদাররা তাঁকে আতংক মনে করে ইংরেজ সরকার ও নীলকর সাহেবদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেয়। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা চাপানো হয়। কিন্তু তিনি সব ষড়যন্ত্র কাটিয়ে উঠেন এবং দীর্ঘ ১০ বৎসর দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কারের কাজ চালিয়ে যান। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ চলাকালে ইংরেজ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে দীর্ঘ দুই বৎসর কলকাতার জেলে আটক করে রাখে। অতঃপর জেল থেকে মুক্তি লাভ করে দেশে ফিরলে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। ১৮৬০ সালে মুক্তি লাভের পর তিনি ঢাকার বংশালে বসবাস করতে শুরু করেন। ১৮৬২ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর এখানেই তিনি ইনতিকাল করেন।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর তিন পুত্র গিয়াস উদ্দীন হায়দার, আব্দুল গাফুর ওরফে নয়া মিয়া ও সাঈদ উদ্দীন আহমদ পর্যায়ক্রমে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৮৬০ সালে সাঈদ নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৬৯ সালে তাঁর মৃত্যুর পর মুহসিন উদ্দীন দুদুমিয়া এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ৮ই আগস্ট ১৯৯৭ সালে তিনিও মৃত্যু বরণ করেন।

নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের আন্দোলন

সাইয়্যেদ আহমাদ রাহ.-এর আন্দোলনের বঙ্গদেশীয় অঞ্চলে আর একজন প্রতাপশালী নেতা ছিলেন শহীদ তিতুমীর রাহ.।

১৭৮২ খ্রীঃ পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার চাঁদপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা হাসান আলী ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত কৃষক। বাল্যকাল থেকে তিতুমীর ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ ও ইবাদতগুজার ব্যক্তি। শারীরিক কসরত, কুস্তি ও লাঠি খেলায়ও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল ।

মুসলমানদের উপর হিন্দু জমিদার ও নীলকর সাহেবদের সীমাহীন উৎপীড়ন তাঁকে ভীষণভাবে ক্ষেপিয়ে তোলে। জমিদারদের অত্যাচার এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, কৃষ্ণদেব নামে জনৈক জমিদার মুসলমানদের দাড়ির উপর শতকরা আড়াই টাকা হারে কর বসিয়ে দিতেও দ্বিধা করেনি।

এহেন অবস্থা দৃষ্টে তিতুমীর মুসলমানদেরকে এ কর দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার জন্য পরামর্শ দেন এবং তাদেরকে জমিদারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এক বিরাট বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এতে জমিদাররা তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠে। গোবর ডাঙ্গায় জমিদার কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও পুর্ণিয়ার জমিদার কৃষ্ণরায় তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তিতুমীরের বাহিনীর নিকট তারা শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মক্কায় হজ্জ করতে যান, সেখানে তিনি সাইয়্যিদ আহমদ

শহীদ রাহ. এর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করতঃ তাঁর কাছ থেকে জিহাদী চেতনার দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ৫ বৎসর মক্কা নগরীতে অবস্থান করতঃ দ্বীনি ইলম ও রুহানিয়্যাতের ক্ষেত্রে পূর্ণ কামালিয়্যাত অর্জন করে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি পূর্ণ উদ্যমে দ্বীনি দাওয়াত ও ইরশাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। একই সঙ্গে তিনি ধর্মীয় সংস্কার কার্যেও মনোযোগ দেন। তিনি আল্লাহর সিফাত ও গুণাবলীর মারিফাত অর্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন; তিনি বলতেন, "আল্লাহর গুণাবলী কোন অবস্থাতেই মানুষের জন্য প্রয়োগ করা চলবেনা।" তাছাড়া হিন্দু সভ্যতার সংস্পর্শে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার কারণে এদেশের মুসলমানদের মাঝে বহু ধরনের হিন্দুয়ানী প্রথার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, এমনকি বিভিন্ন ধরনের হিন্দুয়ানী উৎসব পালনের প্রথাও মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত ছিল, তিনি কঠোরভাবে এগুলোর বিরোধিতা করেন। তিনি প্রচার করে বেড়াতেন, যে সব উৎসবের অনুমোদন কুরআন-সুন্নায় নেই সেগুলো পালন করা বৈধ নয়।

তিতুমীরের প্রচারাভিযানের ফলে দলে দলে লোক তাঁকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। তিনি তাদেরকে স্বাধীনতার পক্ষে উজ্জীবিত করতে থাকেন। মুসলমানদের ঈমান ও আমলের হিফাযতের জন্য একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন তীব্রভাবে। সেই কাঙ্খিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তিনি উঠে পড়ে লেগে যান। দলে দলে লোক তাঁর সেই চেতনাকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ হয়। সেই লক্ষ্যে জিহাদী কর্মতৎপরতা পরিচালনার জন্য তিনি কলকাতার অদূরে নারিকেল বাড়িয়ায় একটি মজবুত বাঁশের কিল্লা নির্মাণ করেছিলেন। স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে তিনি অসাধারণ সামরিক নৈপূণ্য প্রদর্শন করেন। চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও ফরিদপুর জেলার বেশ কিছু জমিদারকে পরাস্ত করে তিনি তাদের জমিদারী দখল করে নেন এবং অধিকৃত অঞ্চলসমূহ নিয়ে তিনি একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। মিসকীন খাকে প্রধান মন্ত্রী ও গোলাম মাসুদ খাঁকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল। জমিদার ও নীলকর সাহেবরা তার ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে তাঁকে দমন করার জন্য ইংরেজ সরকারের সহযোগিতা গ্রহণ করে। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে কলকাতা থেকে একদল ইংরেজ সৈন্য তাঁকে দমন করতে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তারা তিতুমীরের বাহিনীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। সেনাপতি আলেকজান্ডার পলায়ন করে আত্মরক্ষা করে। তাতে তৎকালীন বড় লার্ট বেন্টিঙ্ক ক্ষুব্ধ হন এবং লেফট্যানেন্ট কর্নেল স্টুয়ার্ডের নেতৃত্বে ১৮৩১ সালে একটি শক্তিশালী বাহিনী তিতুমীরের মুকাবেলায় প্রেরণ করেন। তাদের সঙ্গে বেশ কয়েকটি কামানসহ প্রচুর গোলা-বারুদ ছিল। তিতুমীর তাঁর বাহিনীসহ একমাত্র অস্ত্র বাঁশের লাঠি নিয়ে ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যান।

ইংরেজদের কামানের গোলায় তাঁর বাঁশের কিল্লা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তিতুমীর যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন। এযুদ্ধের অপরাধে তার বাহিনীর ১৪০ জন উর্ধ্বতন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়, সেনাপতি মাসুদ খাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তিতুমীরের মৃত্যুর পর তার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

হযরত কেরামত আলী জৈনপুরী রাহ. ঃ সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর বঙ্গদেশীয় আরেক খলীফা ছিলেন কেরামত আলী জৈনপুরী রাহ. (১৮০০-১৮৭৩)। তিনি সাইয়্যিদ আহমাদ রাহ. এর সংস্কারকমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নে বঙ্গদেশীয় অঞ্চলে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রেখে ছিলেন। জিহাদের ময়দানে তাঁর কোন ভুমিকা না থাকলেও আত্মসংশোধন, বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদাহ বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার সম্প্রসারণে এবং দাওয়াত ও ইসলাহের ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি সারা দেশে সফর করে মানুষকে বিশুদ্ধ দ্বীনের দীক্ষা দান করেছেন এবং শিরক্, বিদ'আত ও কুসংস্কার দূরীভূত করার চেষ্টা করেছেন।

এছাড়াও মাওলানা নুর মোহাম্মদ নিযামপুরী (মৃত্যু-১৮৫৫) মাওলানা ইমাম উদ্দীন হাজীপুরী (নোয়াখালী, মৃত্যু- ১৮৫৫) এ দু'জনও সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ রাহ. এর অন্যতম খলীফা ছিলেন– যারা বালাকোটের যুদ্ধের পর স্বদেশে ফিরে এসে দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সূফী সদর উদ্দীন যশোহরী, সূফী ফতেহ আলী, মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক ফুরফুরা, মাওলানা নিসার উদ্দীন শর্ষীণা প্রমুখ মনিষীগণ নুর মুহাম্মদ নিযামপুরীর সিলসীলারই অনুসারী ব্যক্তিবর্গ– যারা দ্বীনের প্রচার ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

মূলতঃ শাহ আব্দুল আযীয রাহ. ও সৈয়দ আহমদ রাহ. এর চেতনার উত্তরাধিকারীরা সারা দেশে বিশুদ্ধ দ্বীনি চেতনা সম্প্রসারণ ও স্বাধীনতার পক্ষে গণজাগরণ সৃষ্টির জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে গেছেন। যে যেখানে যেভাবে সুযোগ পেয়েছেন কাজ করেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলেই সারা দেশে যে গণবিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠেছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৮৫৭-এর সিপাহী বিপ্লবের মাঝ দিয়ে।

সিপাহী বিপ্লব ও তার পর

বস্তুতঃ বালাকোটের যুদ্ধে হযরত সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. ও হযরত ইসমাঈল রাহ. শাহাদত বরণ করার পর এ আন্দোলনের কর্মী বাহিনী সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনটি কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর একটি কেন্দ্র ছিল দিল্লীতে। এটিই ছিল মূলকেন্দ্র। এ কেন্দ্রের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত শাহ ইসহাক রাহ.। তিনি হিজরত করে মক্কায় চলে যাওয়ার সময় হযরত শাহ আব্দুল গণী রাহ.এর উপর এ দায়িত্বভার অর্পণ করে যান। হযরত আব্দুল গণী রাহ. ইন্তেকালের পর এই দায়িত্ব বর্তায় হযরত মাওলানা মামলুক আলী রাহ.এর

উপর। মাওলানা মামলুক আলী থেকে এ দায়িত্ব প্রাপ্ত হন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহ.। তাঁদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে উত্তর ও মধ্য ভারতে ইংরেজ বিরোধী চেতনা ও আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে এবং সর্বত্র ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ বিতাড়নের জন্য যুদ্ধ ও শাহাদত বরণের তীব্র আকাংখা ও আবেগ আন্দোলিত হতে থাকে। অন্য একটি কেন্দ্র ছিল পাটনায়। এ কেন্দ্রের নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা এনায়েত আলী, মাওলানা বেলায়েত আলী ও মাওলানা ফারহাত আলীর ন্যায় স্বাধীনতাকামী বলিষ্ঠ প্রত্যয়ী তিন মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলে দক্ষিণ ভারতের গোটা অঞ্চলে স্বাধীনতার চেতনা সম্প্রসারিত হয়।

আর একটি কেন্দ্র ছিল আফগান সীমান্ত অঞ্চলে। সাইয়্যিদ আহমদ শহীদের প্রভাবে সিত্তানা অঞ্চলে যে চেতনা সম্প্রসারিত হয়েছিল, তাই ক্রমান্বয়ে ঘনিভূত হয়ে সিত্তানাকে কেন্দ্র করে এই তৃতীয় কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল। এর নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা বেলায়েত আলী, মাওলানা ফয়েজ আলী, ইয়াহইয়া আলী ও আকবর আলী নামের খ্যাতনামা আত্মত্যাগী মুজাহিদবৃন্দ। এদের প্রচেষ্টায় আফগানিস্তান, সীমান্ত অঞ্চল, সিন্ধু ও বেলুচ প্রভৃতি অঞ্চলে স্বাধীনতার চেতনা দানা বেঁধে উঠেছিল। এভাবেই এ সকল উলামায়ে কিরামের প্রচেষ্টায় সারা দেশের আনাচে-কানাচে কোম্পানীর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ চরম রূপ ধারণ করে। গোপনে গোপনে সারা দেশে চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি চলতে থাকে। সেনাবাহিনীতেও এ চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। গোপনে গোপনে তারাও বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিতে থাকে। দেশীয় সৈনিক ও বৃটিশ সৈনিকদের সাথে ইংরেজ সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণও বৃটিশ সরকারের প্রতি এ দেশীয় সৈনিকদেরকে রুষ্ট করে তুলে। বৃটিশ সৈনিকদের যে হারে বেতন দেওয়া হত সে তুলনায় এদেশীয় সৈনিকদের বেতনের হার ছিল খুবই কম। তাছাড়া এদেশীয় সৈনিকদেরকে বৃটিশ সরকারের ইচ্ছামত বহিঃরাষ্ট্রের যে কোন স্থানে প্রেরণের বাধ্যতামূলক আইন তাদের জন্য এক দুর্বিসহ যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কারণ যেখানেই যুদ্ধ শুরু হত সেখানেই রণাঙ্গণে অগ্রে পাঠানো হতো ভারতীয়দেরকে, বৃটিশদেরকে রাখা হত পিছনে। ফলে হতাহত যারা হত তাদের অধিকাংশই হত ভারতীয়। তাছাড়া দূরদেশ থেকে বাড়ী আসতে যেতে বেতনের পয়সায় কুলিয়ে উঠত না। ফলে তারা চরম অর্থ সংকটের মাঝে দুর্বিসহ জীবন যাপন করছিল। তদুপরি এদেশের উপর ইংরেজদের ধর্মীয় আগ্রাসন, রাজনৈতিক নির্যাতন ও সামাজিক নিপীড়নের নির্মম ও স্বেচ্ছাচারী কর্মকাণ্ডও সেনাবাহিনীকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। সিপাহী জনতার এই সঞ্চিত ক্ষোভই ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের আকারে নিস্ফোরিত হয়। পূর্বথেকেই সারাদেশের সিপাহী জনতার অন্তরে ইংরেজ বিরোধী চরম ক্ষোভ সঞ্চিত ছিল, এহেন মুহুর্তে ইংরেজ সরকার এনফিল্ড রাইফেলে ব্যবহারের জন্য এক ধরনের নতুন টোটা প্রবর্তন করে। জানা যায় যে, এই টোটায় গরু ও শুকুরের চর্বি মিশ্রিত ছিল। মুসলমানদের কাছে শুকর হারাম, আর হিন্দুদের কাছে গরু হল দেবতা। ফলে পশ্চিম বঙ্গের বরাকপুরের সেনানিবাসে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের সৈনিকরা এই টোটা ব্যবহার করতে অসম্মতি জানায়। এ নিয়ে উত্তপ্ততার এক পর্যায়ে ইংরেজ অফিসাররা এদেশীয় সৈনিকদের সকলকেই নিরস্ত্র করে ফেলার কু-মতলবে অস্ত্র জমা

দেওয়ার নির্দেশ দিলে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহ ক্রমান্বয়ে সারা দেশের সেনানিবাস ও স্বাধীনতাকামীদের প্রধান প্রধান কেন্দ্র দিল্লী, মিরাঠ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, রায়বেরলী ও ঝাঁসীসহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তার সাথে সারাদেশের আলেম উলামা ও স্বাধীনতাকামী মানুষ একাত্ম হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গোটা দেশের আনাচে-কানাচে দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এই যুদ্ধ। ১৮৫৭ সালের ইংরেজ বিরোধী এই যুদ্ধের নেতৃত্বে দেওয়া হয় মূলতঃ দু'টি কেন্দ্র থেকে। এর একটি ছিল দিল্লীর সন্নিকটে থানা ভবনে; যার নেতৃত্বে ছিলেন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহ. রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী রাহ. ও কাসেম নানুতুবী রাহ.। তাঁরা ১৮৫৭ সালের যুদ্ধের সময় সে অঞ্চলে একটি স্বাধীন সরকারের ঘোষণাও দিয়ে ফেলেছিলেন। হাজী সাহেবকে আমীর, রশীদ আহমদ রাহ. কে প্রধান বিচারপতি, নানুতুবী রাহ. কে প্রধান সেনাপতি করে এ সরকারের অবকাঠামো ঘোষণা করা হয়। অবশ্য পরে ইংরেজ সরকারে বলিষ্ঠ সশস্ত্র হস্তক্ষেপের ফলে এই ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যায়। অপর একটি কেন্দ্র ছিল আম্বালায়; যার নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা জাফর থানেশ্বরী ও মাওলানা ইয়াহইয়া আলী। এছাড়াও তখন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়। কানপুরে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদের অন্যতম খলীফা মাওলানা আযীমুল্লাহ খানের নেতৃত্বে স্বাধীন সরকারের ঘোষণা দেওয়া হয়। এই গণবিদ্রোহের সময় অযোধ্যায় আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন সাবেক অযোধ্যারাজের স্ত্রী বেগম হযরত মহল ও আমান উল্লাহ খান। বেরলীতে নেতৃত্ব দেন হাফেজ রহমত খানের বংশোদ্ভূত খান বাহাদুর খান। খান বাহাদুর খান নিজেকে দিল্লীর সম্রাটের স্থানীয় প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা পাগল জনতা দিল্লী দখল করে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারত সম্রাট বলে ঘোষণাও দিয়ে ফেলেছিল।

কিন্তু ইংরেজদের বিশাল সৈন্যবাহিনী, অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র ও দেশীয় বিশ্বাস-ঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে এ অভ্যুত্থান সফল হয়নি। ক্রমান্বয়ে সব এলাকাই আবর ইংরেজ সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। গণমানুষের রক্তের বন্যার উপর দিয়ে ইংরেজ সরকার পুনঃ তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে নেয়।

কেন এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং কারা এই বিদ্রোহকে উস্কে দিয়েছিল এ সম্পর্কে ইংরেজ সরকার কোম্পানীর নিকট রিপোর্ট চাইলে ডঃ উইলিয়াম লিওর এ মর্মে রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে, ১৮৫৭ সালের গণবিদ্রোহ মূলতঃ ছিল মুসলমানদের আন্দোলন, আর তার নেতৃত্ব দিয়েছে আলেম সমাজ। সুতরাং এ বিদ্রোহ নির্মূল করতে হলে মুসলমানদের জিহাদী চেতনাকে দমন করতে হবে। আর সে চেতনার মূলমন্ত্র আল-কুরআন ও তাঁর বাহক আলেম উলামাদেরকে নির্মূল করে ফেলতে হবে।

এ রিপোর্টের ভিত্তিতে শুরু হয় আলেম উলামা নিধনের মহোৎসব। ইতিহাসের সবচেয়ে লোমহর্ষক নির্যাতনের শিকার হয় উপমহাদেশের আলেম উলামাগণ। সে সময় প্রায় অর্ধ লক্ষের চেয়ে বেশি আলেম উলামাকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়। আন্দমান, মালটা, সাইপ্রাস ও কালাপানিতে দ্বীপান্তর করা হয় হাজার হাজার আলেম উলামাকে। তাঁদের সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, ঘর-বাড়ি আগুন

দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ধর্মীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। আলেম উলামা নিধনের এই যে অভিযান শুরু হয়, তার ফলে নেতৃত্ব দেওয়ার মত কোন আলেমতো দূরের কথা দাফন-কাফন করার মত ন্যূনতম জ্ঞানের অধিকারী কোন আলেমও অবশিষ্ট থাকেনি। আলেম উলামাদের জীবন হয়ে উঠে দুর্বিসহ। রাজনৈতিক ময়দানে নেমে আসে এক ভয়াল নৈঃশব্দের অবস্থা। কাজেই স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য নতুন লোক তৈরীর পরিকল্পনার ভিত্তিতে শুরু করা হয় একাডেমিক আন্দোলন। প্রতিষ্ঠা করা হয় দারুল উলূম দেওবন্দ।

ইংরেজদের আগ্রাসনের ফলে মুসলমানরা যে ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল

সুদীর্ঘ সাতশত বছর রাষ্ট্র পরিচালনার পর মুসলিম নেতৃবৃন্দ যখন পারস্পরিক আত্মকলহ এবং বিলাসিতায় লিপ্ত হয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলা প্রদর্শন করে তখন সুযোগ সন্ধানী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বেনিয়ারা বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং মুসলমানদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। যে কারণে মুসলমানদেরকেই তারা তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ মনে করত। তাই মুসলমানদের ক্ষতি ও ধ্বংস সাধনের যাবতীয় প্রয়াস তারা গ্রহণ করেছিল। মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের এমন কোন হীনপন্থা ছিলনা যা তারা অবলম্বন করেনি। তারা ক্ষমতার মসনদকে নিষ্কন্টক করার স্বার্থে বিভিন্ন দিক থেকে মুসলমানদের উপর আগ্রাসন চালায় এবং তাদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ফলে এ উপমহাদেশের মুসলমানগণ অবর্ণনীয় এবং অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ইংরেজ কর্তৃক মুসলমানদের উপর আগ্রাসন এবং নির্যাতনের দিকগুলি ছিল নিম্নরূপঃ

১. রাজনৈতিক আগ্রাসন ও নিপীড়ন।
২. অর্থনৈতিক আগ্রাসন।
৩. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন।
৪. পারস্পরিক কলহ সৃষ্টি এবং হক পন্থীদের অবদমিত করার বিভিন্ন কৌশল।

১. রাজনৈতিক আগ্রাসন ও নিপীড়ন ঃ

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরেজরা মুসলমানদেরকেই তাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী এবং স্থায়ী শত্রু মনে করত। কারণ তাদের হাতেই ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কা ছিল তাদের সর্বাধিক। অন্যদিকে মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব দানকারী উলামা-ই-কিরামের সংগ্রামী তৎপরতার কথাও ইংরেজরা আঁচ করতে পেরেছিল। ফলে উলামা-ই-কিরামই তাদের কোপানলে নিপতিত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। মুসলমানদের কোন রাজনৈতিক তৎপরতা যাতে দানা বাঁধতে না পারে এ ব্যাপারে তারা খুবই সজাগ ছিল। আলেম উলামাদেরকে বিশেষ করে নেতৃস্থানীয়

ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন অজুহাতে হত্যা, দেশান্তর, জেলে প্রেরণ, তাদের সহায় সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ এবং বিভিন্নভাবে তাদেরকে হয়রানি করণে তারা ছিল সদা তৎপর। স্বাধীনতা যুদ্ধের ১৪ বছর পূর্বে ভারতের গভর্ণর জেনারেল বলেছিলেন, 'মূলতঃ মুসলমানরাই যে আমাদের একমাত্র শত্রু এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা যায় না।' তাই ইংরেজরা ক্ষমতারোহণের পর থেকেই সাধারণ মুসলমান এবং আলেম সমাজের উপর চালাতে থাকে অকথ্য নির্যাতন। এক্ষেত্রে ইংরেজদের অত্যাচারকে আমরা দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

ক. আলেম সমাজের উপর নির্যাতন ঃ

ইংরেজদের নিকট একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ছিল যে, মূলতঃ আলেম সমাজই মুসলমানদের শক্তি ও প্রেরণার মূল উৎস এবং ইংরেজ বিরোধী চেতনা ছড়ানোর ক্ষেত্রে তাঁরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। ফলে তারা আলেমদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষেপা ছিল, বিশেষ করে ১৮০৩ সালে ইংরেজ কর্তৃক দিল্লী দখল হওয়ার পর, শাহ আব্দুল আযীয রাহ. ভারতকে দারুল হারব (শত্রু কবলিত দেশ) বলে ঘোষণা দিলে সারাদেশে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তাতে তারা বিচলিত হয়ে পড়ে। এরপর থেকেই তারা আলেম সমাজকে অবদমিত করার জন্য অত্যাচার ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয় এবং উলামায়ে কেরামকে জব্দ করার ব্যাপারে কোন অপকৌশল অবলম্বন করতে বাদ রাখেনি। দেশীয় মীর জাফরদের যোগসাজশে আলেম সমাজের আন্দোলনকে বিভিন্ন সময় চরমভাবে ব্যাহত করেছে। তারা মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয রহ.-এর গায়ে টিকটিকির প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। ফলে তিনি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর চার ভাইকে দেশান্তর করা হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর আলেম ও উলামাদের উপর ইংরেজদের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে যায়, কেননা তারা আলেমদেরকেই এ আন্দোলনের জন্য দায়ী মনে করত। যে কারণে আলেম উলামারাই তাদের ক্রোধানলে বেশি নিপতিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রপথিক, হাজী ইমদাদুল্লাহ রাহ. এবং তাঁর একান্ত শিষ্য মাওলানা কাসেম নানুতুবী রাহ. এবং মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী রাহ. এর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয় এবং তাঁদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ফলে হাজী সাহেব কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন। অতঃপর হিজরত করে মক্কা শরীফে চলে যান। মাওলানা নানুতুবী রাহ. দেশে আত্মগোপন করে থাকাকেই উত্তম মনে করেন। মাওলানা গাংগুহী রাহ. কে রামপুর থেকে বন্দী করে তিন দিন সাহারানপুরের জেলের এক অন্ধকার কুঠুরিতে রাখা হয়। তারপর তাঁকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর খোলা তরবারীর নিচে পায়ে হাঁটিয়ে তাঁকে মুজাফফর নগর নেওয়া হয়। সেখানে ৬ মাস বন্দী জীবন যাপন করেন। মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তিনি ফাঁসির হাত থেকে বেঁচে যান। যদিও হত্যা করাই ছিল ইংরেজদের আন্তরিক

আকাঙ্খা। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে দু'লাখ মুসলমান শাহাদত বরণ করেছিল। তাদের মাঝে উলামা-ই-কিরামের সংখ্যা ছিল ৫১,৫০০। ইংরেজরা আলিমদের উপর এতই ক্ষেপা ছিল যে, তারা যেখানেই কোন দাড়ীওয়ালা, টুপি ও লম্বা জামাওয়ালা লোক দেখতে পেত, তার উপরই পাগলা কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলাত। এডওয়ার্ড টমাস বলেন, শুধু দিল্লীতেই ৫০০ আলিমকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। অনুরূপভাবে শায়খুল হিন্দ রাহ. এর রেশমী রুমাল আন্দোলন এবং বৃটিশ বিরোধী গোপন কূটনৈতিক, সামরিক এবং আন্তর্জাতিক তৎপরতা, তুর্কী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আনোয়ার পাশার সাথে তুর্কী -ভারত গোপন চুক্তি এবং খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে ইংরেজরা ছিল আতংকিত। তাই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হযরত শায়খুল হিন্দু এবং তাঁর চার সাথী, হোসাইন আহমদ মদনী, মাওলানা ওযায়ের গুল, মাওলানা হাকিম সুনরাত হুসাইন, মৌলভী ওয়াহীদ আহমদকে সাড়ে তিন বছর মাল্টায় বন্দী করে রাখা হয়। এছাড়াও বহু আলেমকে তারা মাল্টায়, আন্দামানে, সাইপ্রাসে নির্বাসন দেয়। সেই নির্বাসিত জীবনে তাঁদের উপর যে অকথ্য নির্যাতন চালানো হয় সে এক হৃদয় বিদারক করুণ কাহিনী, সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। এভাবে আলেম সমাজকে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সমূলে উৎখাত করার জন্য অত্যাচার ও নির্যাতনের বিভিন্ন কৌশল তারা অবলম্বন করে।

খ. সাধারণ মুসলমানদের উপর নির্যাতন ঃ

আগেই বলা হয়েছে ইংরেজরা একমাত্র মুসলমানদেরকেই তাদের মূল শত্রু মনে করত। ফলে বিভিন্ন সময় তারা মুসলমানদের উপর বিভিন্ন কৌশলে নির্যাতন চালাত। বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ ব্যর্থ হওয়ার পর ভারতবর্ষের মানুষের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের যে বিভীষিকা নেমে আসে, মুসলমানগণই ছিল সে জুলুম ও অত্যাচারের মূল শিকার। কারণ স্বাধীনতা আন্দোলন মূলতঃ মুসলমানরাই করেছিল। মুলমানদের প্রতি তাদের অত্যাচার এতই নির্মম ছিল যে নিষ্পাপ শিশুরাও তাদের হাত থেকে রক্ষা পেতনা। ১৮৫৭ সালের ১৮ই নভেম্বর দিল্লীর জামে মসজিদের আঙ্গিনায় এক দিনেই তারা ২৭ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। পাষণ্ড ইংরেজরা মুসলমানদের যখন হত্যা করত, তখন শুকরের চামড়ার মধ্যে পুরে সেলাই করে দিত এবং হত্যার পূর্বে শুকরের চর্বি গায়ে মাখিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিত। লেফটেন্যান্ট মাগুজী লিখেছেন– একজন মুসলিম সিপাহীর মুখমণ্ডল সংগীনের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করা হয়, অতঃপর তাকে অল্প আগুনে ভুনা করা হয়। জ্বলন্ত মানুষের দুর্গন্ধে আমার মাথা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।। খাজা হাসান নিজামী লিখেছেন– হাজার হাজার মুসলিম নারী ইংজেদের পৈশাচিক নির্যাতনের ভয়ে নিজেদের কূপে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করেছে। অনেক পুরুষতো নিজের স্ত্রীকে হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করেছে। এসব

ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন ইংরেজরা নিজেদেরকে সভ্য জাতি বলে আস্ফালন করত। লন্ডন টাইমস এর সংবাদদাতা মিঃ রাসেল ইংরেজদের অত্যাচার ও নির্যাতনের আরো অসংখ্য ঘটনা উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ তখন দিল্লীর অলিগলি হত্যাকাণ্ডের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল, আর ঘর-বাড়ী রূপান্তরিত হয়েছিল জেলখানায়। প্রতিদিন হুগলী নদীর স্রোতে হাজার হাজার মুসলমানের লাশ ভেসে যেত। আর নরপিশাচ ইংরেজরা মনোরম উদ্যানে বসে মুসলমানের লাশ দেখে আনন্দ উপভোগ করত।

২. অর্থনৈতিক আগ্রাসন ঃ

যেহেতু বৃটিশ সরকার একমাত্র মুসলমানদেরকেই তাদের প্রতিপক্ষ বলে ধরে নিয়েছিল এবং স্বাধীনতার ইন্ধন তারাই যুগাচ্ছে বলে মনে করত, এ কারণে বৃটিশ চিন্তাবিদরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, ভারতে তাদের সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী করতে হলে স্বাধীনতাকামী মুসলমানদেরকে আর্থিক দিক থেকে পঙ্গু করে রাখতে হবে। সুতরাং তারা মুসলমানদেরকে কাঙ্গালে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। একদিকে তারা সাধারণ মানুষ থেকে কঠোর শ্রম আদায় করে বিনিময়ে নামে মাত্র পারিশ্রমিক দিত, অন্যদিকে তাদের ঘাড়ে করের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে লুটপাট করার পথ প্রশস্ত করেছিল । লুটপাট ও দস্যুবৃত্তি ছিল তাদের নেশা। তাই এজন্য তারা নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করত। এক্ষেত্রে তারা যে জঘন্যতম কৌশল অবলম্বন করেছিল তা ছিল দেশীয় রাজ্যে নতুন নতুন নবাব নিয়োগ করা। অভিলাষী নতুন নবাবরা ইংরেজদের মনঃতুষ্টির জন্য তার ধন ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিত, যখন ইংরেজরা বুঝতে পারে যে, তাদের ধনভাণ্ডার তারা সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলতে পেরেছে তখন তাদেরকে পদচ্যুত করে নতুন নবাব নিয়োগ করত। এভাবে তারা নবাবদের নিকট থেকে এত পরিমাণে অর্থ আদায় করত যে, সেই অর্থের চাপ গিয়ে পড়ত সাধারণ মানুষের উপর। নবাবরা সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের উপর অধিক হারে করের বোঝা চাপিয়ে দিত। এভাবে দেশ সম্পূর্ণরূপ দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর মীর জাফরকে নবাব বানিয়ে তার নিকট থেকে ১ কোটি ২৩ লাখ ৮ হাজার ৫শত ৭৫ পাউন্ড গ্রহণ করে। অতঃপর তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে মীর কাশিমকে নিয়োগ করে তার নিকট থেকে ২ লাখ ২ শত ৬৯ পাউন্ড আদায় করে। এভাবে মাত্র ৯ বছরে শুধুমাত্র বাংলার নবাবদের নিকট হতে ২ কোটি ৭১ লাখ ৬৯ হাজার ৬শত ৬৫ পাউন্ড লুট করে। তাছাড়া অন্যভাবে যে সম্পদ তারা আহরণ করেছিল তার পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ২৮ লাখ ৭০ হাজার ৮শত ৩৩ পাউন্ড। ১৭৭২ সালে হাউস অফ কমনস-এর এক অধিবেশনে তারা এ অর্থ প্রাপ্তির স্বীকৃতি প্রদান করে। সুতরাং দুই শত বৎসরে তারা সারা ভারতবর্ষ থেকে কি পরিমাণ সম্পদ লুট করেছিল তা অনুমান করা যায়। ইংরেজদের অর্থনৈতিক আগ্রাসনের ফলে মুসলমানদের যে অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে স্যার সৈয়দ আহমদ বলেন– "দৈনিক দেড় আনা অথবা আধাসের শস্যের বিনিময়ে একজন ভারতীয়

স্বেচ্ছায় স্বীয় গর্দান কর্তন করাতে প্রস্তুত ছিল।" তাছাড়া ব্যবসার ক্ষেত্রে তারা শোষণের যে অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছিল, সে ইতিহাস তো সকলেরই জানা। ক্রমান্বয়ে দেশীয় শিল্পসমূহকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়। সে স্থলে তাদের দেশের পণ্যসমূহ এদেশে বাজারজাত করা হয়। এদেশে থেকে শিল্পের কাঁচামাল তারা স্বল্প মূল্যে ইংল্যান্ডে নিয়ে যেত এবং তার দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য এদেশের বাজারে চড়া মূল্যে বিক্রি করা হত। কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য কৃষকদেরকে নির্যাতনের মাধ্যমে বাধ্য করা হত, অথচ কৃষককে তার ন্যায্যমূল্য দেওয়া হত না। ফলে কৃষিভিত্তিক এদেশের অর্থনীতি চরমভাবে ভেঙ্গে পড়ে। এ ছাড়া সুদ ভিত্তিক দাদন ব্যবসার মাধ্যমে, কামার, কুমার, তাঁতী, জেলেসহ সকল শ্রেণীর মানুষকে তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে দেউলিয়া করে ছেড়েছিল। মুসলমানদেরকে জমিদারী থেকে উচেছদ করে তাদেরকে নিঃস্ব করা হয়েছিল। উচ্চ পদস্থ সরকারী পদগুলো থেকে মুসলমান কর্মকর্তাদেরকে অপসারিত করা হত এবং নতুন লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে এমন সব নতুন নতুন শর্তারোপ করা হত যাতে মুসলমানদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এভাবে সরকারী চাকুরীর সুযোগ সুবিধা থেকে মুসলমানদেরকে বঞ্চিত করে তাদেরকে বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্বের চরম পর্যায়ে ঠেলে দেওয়া হয়।

ডব্লিউ, এস ব্লিন্ট বলেন– "আমরা যদি লুটপাটের এ ধারাকে অব্যাহত রাখি তা হলে এমন এক সময় আসবে যখন ভারতীয়রা বাধ্য হয়ে একে অপরকে ভক্ষণ করবে"। স্যার জনসুর বলেন– 'ইংরেজদের নিষ্পেষণ নীতি দেশ ও দেশবাসীকে এতই কাঙ্গালে পরিণত করেছে, যার নজীর খুজে পাওয়া দুস্কর।'

৩. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ঃ

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের সাথে সাথে ইংরেজরা মুসলিম জাতিসত্তাকে সমূলে বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে এবং এ উদ্দেশ্যে তারা মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আগ্রাসন চালাতে থাকে। তারা এমন সব অপকৌশল অবলম্বন করে ছিল যা দেখে স্বয়ং ইবলিশ পর্যন্ত বিস্ময়ে হতবাক হতে বাধ্য। পর্যালোচনার সুবিধার জন্য এক্ষেত্রে তাদের আগ্রাসনসমূহকে চারটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। যথাঃ

(ক) ধর্মীয় শিক্ষার মূলোৎপাটন। (খ) ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টা। (গ) মসজিদকে গির্জায় রূপান্তরিত করণের চেষ্টা। (ঘ) পারস্পরিক আত্মকলহ সৃষ্টি এবং হক পন্থীদের অবদমিত করার পায়তাঁরা।

ক. ধর্মীয় শিক্ষার মূলোৎপাটন ঃ

মূলতঃ শিক্ষাই জাতি মেরুদণ্ড। যে জাতি তাদের আদর্শ শিক্ষা হতে বঞ্চিত, তারা জাতি হিসাবে মৃত। সেকালে ভারত বর্ষের মুসলিম জাতি তাদের ধর্ম ভিত্তিক আদর্শ শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। তৎকালীন মুসলিম সরকারসমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে।

ইংরেজরা ভালভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, মুসলমানরা সহজে নতী স্বীকার করার মত নয়। তাই এ দেশে তাদের ক্ষমতার মসনদকে সুদৃঢ় করতে হলে মুসলিম জাতির জাতিসত্বাবোধ ও আদর্শিক চেতনাকে হত্যা করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। তারা ভালভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, মুসলমানদের নিজস্ব শিক্ষা ও সংস্কৃতিই তাদের চেতনার উৎস বিন্দু। সুতরাং তার ধ্বংস সাধনকেই তারা তাদের প্রধান টার্গেট হিসাবে নির্ধারণ করেছিল ।

তদানিন্তন কালে সরকারী জায়গীরের আয় ও রাষ্ট্রীয় অনুদানের উপর ভিত্তি করেই পরিচালিত হত মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো। ইংরেজরা ক্ষমতা লাভের পর রাষ্ট্রীয় অনুদানগুলো বন্ধ করে দেয় এবং ভূমি সংস্কারের নামে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত সকল জায়গীরকে বাতিল করে দেয়। অর্থাভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে। জন-অনুদানের উপর ভিত্তি করে যে গুটি কতক প্রতিষ্ঠান তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, সেগুলোকেও নানাভাবে হয়রানি করা হয়। ফলে এদেশে ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতা বিরাজ করতে থাকে। যেখানে এ দেশের প্রতি ঘরে ঘরেই কেউ না কেউ একজন আলেম ছিল- যারা চেতনার আলো বিলাতো, সেখানে গ্রামকে গ্রাম খুঁজেও জানাযার নামায পড়াবার জন্য একজন আলেম পাওয়া যেতনা।

মুসলিম শিক্ষার এই করুণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তদস্থলে তারা ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটায়। সে প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলিম সন্তানদের চেতনাকে প্রভাবিত করা হত ভিন্ন খাতে এবং একই সঙ্গে তাদেরকে এমন এক জীবনবোধ ও চেতনার সাথে পরিচিত করে তোলা হত, যা ছিল ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিপন্থী। মুসলমানদের লেবাস পোষাককে ব্যঙ্গ করার জন্য খানসামা ও দারোয়ানের পোষাক নির্ধারণ করা হয়েছিল পায়জামা, পাঞ্জাবী ও পাগড়ী। ইসলামী জীবনবোধ ও চর্চাকে সেকেলে বলে ব্যঙ্গ করা হত। এভাবে ক্রমান্বয়ে তারা ইসলামী জীবন ধারার স্থলে পাশ্চাত্য জীবন ধারার সাথে পরিচিত করে তোলতে চেয়েছিল মুসলমানদেরকে। দীর্ঘদিন শিক্ষার চর্চা না থাকার ফলে নতুন প্রজন্মের অশিক্ষিত মুসলিম সমাজের অনেকেই নিজেদের জীবনধারাকে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিল। ক্রমান্বয়ে ইসলামী চেতনায় উজ্জিবীত এদেশের মুসলমানরা তাদের জীবন ধারা ভিন্ন আরেক খাতে প্রবাহিত করতে শুরু করেছে দেখেই আলেম উলামা যারা ছিলেন, তারা ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে লেখাপড়া করা হারাম বলে ফতওয়া দিয়েছিলেন।

ইংরেজ আগ্রাসনের পূর্বে শুধু রাজধানী দিল্লীতেই ১০০০ মাদ্রাসা ছিল। প্রফেসর মার্ক মিলস বলেন- 'বৃটিশ শাসনের পূর্বে শুধু বাংলাদেশেই আশি হাজার মাদ্রাসা ছিল।' সিন্ধুর প্রসিদ্ধ ঠাট্টানগরী সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন হেমিলটন বলেন- 'এ শহরে নানা প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার চার শত প্রতিষ্ঠান ছিল'। ইংরেজরা বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম আমলের প্রতিষ্ঠিত কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্বিচারে ধ্বংস করে দেয় এবং সেস্থলে তাদের ধ্যান-ধারণা পুষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করে। যাতে কেউ নামে মুসলমান হলেও চিন্তা-চেতনায় ইংরেজ হতে বাধ্য হয়। এ সম্পর্কে ইংল্যান্ডের লর্ড ম্যাকলে পরিস্কার ভাষায় বলেছিলেন– "ভারতীয়দের জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য হল এমন এক যুব সম্প্রদায় সৃষ্টি করা, যারা রঙ ও বংশের দিক থেকে ভারতীয় হলেও মন ও মস্কিস্কের দিক থেকে হবে সম্পূর্ণ বিলাতী (খ্রীষ্টান)"। এক সময় মুসলমানদের চাপের মুখে তারা আলিয়া মাদ্রাসা নামে কলিকাতায় যে মাদ্রাসা গড়ে তুলেছিল তা ছিল নিছক প্রহসন। মজার কথা হল মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য তারা যে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেছিল দীর্ঘকাল যাবত ২৬ জন খ্রীষ্টান তার অধ্যক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সুতরাং এব্যবস্থায় মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার আনুকূল্য কতটা অর্জিত হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ইংরেজদের প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করলে আদর্শিক বিচ্যুতির শিকার হয়ে মুসলমান সন্তানেরা বিভ্রান্ত হবে, বিনষ্ট হবে তাদের ধর্মীয় অনুভূতি-এই আশঙ্কায় মুসলমানরা তাদের সন্তানদেরকে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠানোর ঘোর বিরোধী ছিলেন। ফলে মুসলমানগণ জাগতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রে এক অপুরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

খ. ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টা ঃ

ঘাতক ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা শুধু ক্ষমতা কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। ক্রমশঃ তারা এদেশের মানুষকে খ্রীষ্টান বানানোর জন্য বিভিন্ন রকম অপকৌশল অবলম্বন করে। দারিদ্র এবং অসহায়ত্বের শিকার-এ জাতিকে চাকুরী এবং সুন্দরী যুবতীর প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করা হত। বিশেষ করে ১৮৩৭ সালের দুর্ভিক্ষে যে সব শিশু এতিম হয়েছিল, লালন-পালনের নামে তাদেরকে খ্রীষ্টান বানানো হয়েছিল। এদেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পাদ্রীদেরকে এদেশে আমদানী করা হয়। যারা বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে খ্রীষ্টান ধর্মের মহত্ব ও ইসলামের অসারতা জনসম্মুখে তুলে ধরত। ইংরেজ অফিসারগণ খ্রীষ্টান প্রাদীদেরকে কর্মচারীদের বাস ভবনে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য কড়া নির্দেশ দিত এবং কার্যত তাই হত। ইংরেজদের বক্তব্য ছিল, আমাদের গভর্নমেন্টের ইচ্ছা, দেশে প্রচলিত সকল ধর্ম ও রীতি-নীতি বিলুপ্ত করে সকলকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে তারা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে ছিল।

গ. মসজিদকে গির্জায় রূপান্তরিত করণের চেষ্টা ঃ

ইংরেজরা একদিকে যেমন বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে খ্রীষ্টান বানানোর চেষ্টা চালিয়েছে, অন্যদিকে তাদের প্রিয় ইবাদত খানা মসজিদকে গির্জা বানানোর চেষ্টা করেছে। দিল্লীর জামে মসজিদকে গির্জায় রূপান্তরিত করার জন্য তারা চেষ্টার কোন ক্রুটি করেনি। জোরপূর্বক সর্বত্র তারা তাদের প্রচার কার্য

চালাত এবং মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হত। সে সময় বহু মসজিদকে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দির ও গির্জায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল। বাবরী মসজিদকেও তারা সে সময় মন্দিরে পরিণত করেছিল।

ঘ. পারস্পারিক আত্মকলহ সৃষ্টি এবং হক পন্থীদের অবদমিত করার পায়তারাঃ ইংরেজদের অকথ্য নির্যাতনের ফলে ভারতবর্ষে মুসলমানদের মাঝে মারাত্মক বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠেছিল। মুসলমানদের এই ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ভেঙ্গে দেওয়ার মানসে ইংরেজরা এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করে। আর তা হল পারস্পারিক কলহ সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের শক্তিকে ভিন্নখাতে পরিচালিত করার অপচেষ্টা এবং হক পন্থীদেরকে অবদমিত করার জন্য মানুষের সামনে তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার অশুভ পায়তারা। এজন্য তারা বিভিন্ন দল ও ফিরকার জন্ম দেয়। এগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য হল– (ক) রেজাখানী বেরলভী সম্প্রদায় সৃষ্টি ও হকপন্থীদেরকে ওয়াহাবী বলে আখ্যায়িত করা।

(খ) কাদিয়ানী সম্প্রদায় সৃষ্টি ও তাদের মাধ্যমে ইংরেজ বিরোধী জিহাদী তৎপরতা বন্ধের অপপ্রয়াস।

ক. সাইয়্যিদ আহমদ বেরলভী রাহ. যখন হজ্ব থেকে ফিরে এসে তার জিহাদী তৎপরতা শুরু করলেন এবং দেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলোকে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষে একত্রিত করতে লাগলেন, তখন ধূর্ত ইংরেজরা সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এবং তাঁর সাথী-সঙ্গী শ্রদ্ধেয় উলামায়ে কিরামকে ওয়াহাবী মতালবলম্বী ও আবদুল ওয়াহহাব নজদীর অনুসারী হিসাবে আখ্যায়িত করে। ফলে সাধারণ জনগণ তাদের ব্যাপারে বিভ্রান্তির শিকার হয়। ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি বুঝতে না পেরে একদল লোক তাঁদের ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে শুরু করে। কারণ হল, আব্দুল ওয়াহাব নজদীর অনুসারীরা ইসলামের কতিপয় বিষয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করার কারণে এদেশীয় মুসলমানদের নিকট তারা আগে থেকেই সমালোচিত ছিল। যখন প্রচার করা হল এই সব আলেম উলামা ওয়াহাবী তখন মানুষ তাঁদের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন হয়ে উঠল। আর এ কাজের জন্য তারা আহমদ রেজা খান বেরলভী ও তার দলকে ক্রয় করে নেয়। বেরলভী সম্প্রদায় মূলতঃ মুসলমানদের মধ্য থেকে বাছাই করা স্বার্থন্বেষী এবং তোষামোদী লোকের সমন্বয়ে গঠিত একটি ফিরকা, যার নেতা ছিল মৌঃ আহমদ রেজা খান বেরলভী। এরা নিজেকে একমাত্র রাসূল প্রেমিক বলে দাবী করত এবং স্বদেশী আলেমদের বিরুদ্ধে ছিল অত্যন্ত তৎপর। উলামা-ই-কিরাম যখন শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন এরা তাঁদের মুকাবিলায় মেতে উঠেছিল। এরাই ইংরেজদের প্ররোচণায় হক পন্থী উলামায়ে কিরামকে ওয়াহাবী বলে প্রচারণা চালাতে থাকে। মৌলভী আহমদ রেজা খান তো হিন্দুস্থানকে 'দারুল ইসলাম' বলে ফতওয়াও দিয়েছিল।

খ. ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যে বিষয়টি ইংরেজদের অস্থির করে রেখেছিল তা হল ইসলামের জিহাদ নীতি। ফলে জিহাদকে চিরতরে বন্ধ করার জন্য ইংরেজরা

নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদার গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে ব্যবহার করে। যদিও প্রাচ্যবিদদের একটি দল আগে থেকেই জিহাদের বিরুদ্ধে প্রচারণায় তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, তবুও এক্ষেত্রে গোলাম আহমদের তৎপরতাই ছিল বেশী ফলপ্রশু। তার নিজের ভাষ্য মতে "ইংরেজ সরকার আমার দ্বারা যে উপকার লাভ করেছে তা হল, প্রায় পঞ্চাশ হাজার পুস্তক-পুস্তিকা ছাপিয়ে আমি দেশ-বিদেশে প্রচার করেছি। মূলতঃ এ সমস্ত বইয়ের বিষয়বস্তু ছিল ইংরেজদের স্বপক্ষে এবং জিহাদের বিপক্ষে"। জিহাদের বিরুদ্ধে রচিত এই সমস্ত বই ইংরেজরা আরবী, উর্দূ, ফার্সীসহ বিভিন্ন ভাষায় ছাপিয়ে সকল মুসলিম দেশে প্রচার করে। ফলে লাখ লাখ মানুষ জিহাদের ধারণা ত্যাগ করে- যা বেকুব মোল্লাদের প্রচেষ্টায় তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়েছিল। এভাবেই তারা জিহাদ বন্ধ করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল।

তাছাড়া দীর্ঘ দেড় সহস্রাব্দ যাবৎ ধর্মীয় স্বকীয়তাবোধ নিয়ে সহঅবস্থানে অভ্যস্থ হিন্দু মুসলমানদের যৌথ প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম ইংরেজ সরকারের ক্ষমতার মসনদকে টলিয়ে দিতে পারে ভেবে এ দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মাঝে ধর্মীয় বিদ্বেষ উস্কিয়ে দিয়ে আত্মঘাতী সংঘর্ষে জড়িয়ে দেওয়ার হীন তৎপরতা চালাতে তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। 'আত্মকলহ বাধিয়ে দাও এবং নির্বিঘ্নে শাসন কর' এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে বিদ্বেষ উস্কিয়ে দেওয়ার হেন পন্থা নেই যা তারা অবলম্বন করেনি।

সে ছিল এদেশের মানুষের জন্য এক চরম দুর্দিন। ১৮৫৭ এর স্বাধীনতা আন্দোলন আপাতঃ ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার কারণে মুসলমানরা সামরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। এক দিকে ইংরেজদের উৎপীড়নে দিশেহারা মানুষ, অপর দিকে তাদের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের মুখে সম্মুখ-সমরে সফলতার সম্ভবনা ছিল সুদূর পরাহত। তাছাড়া গণচেতনা সৃষ্টির জন্য চাই চেতনা সমৃদ্ধ প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী। এ দিকে দেশ তখন আলেম উলামা শূন্য বললেই চলে। অথচ ব্যাপক গণ-জাগরণ ছাড়া স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল করার দুসরা কোন পথ খোলা ছিল না। তাই মুসলমানরা তাদের রণকৌশল পরিবর্তন করলেন এবং দেশ ব্যাপী গণ-জাগরণ সৃষ্টি ও আদর্শিক চেতনাকে সম্প্রসারিত করার মহৎ লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে শিক্ষা মিশনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার পথ তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এ উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলূম দেওবন্দ সহ অপরাপর দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

তৃতীয় অধ্যায়
দারুল উলূম দেওবন্দ কখন কোথায় কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ

মানুষের রাহনুমায়ীর জন্য সর্বশেষ ঐশী দিক নির্দেশনা হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছিল আল-কুরআন। আখেরী রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ধারায় তারই রূপায়ণ হয়েছিল যথার্থভাবে। আর সে আলোকেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন হযরত সাহাবায়ে কিরামের সুমহান জামা'আতকে। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়ে গিয়েছেন যে, সত্যপন্থী, হক ও হক্কানিয়াতের অনুসারী, নাজাতপ্রাপ্ত জামা'আত হবে তারাই; যারা ঈমান ও আমল, ব্যক্তিক ও সামাজিক, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রে 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' অর্থাৎ আমি ও আমার সাহাবীরা যে পথে চলছে সে পথে নিজেদেরকে পরিচালিত করবে এবং সে পথকেই দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করবে। ইসলামে সে জামা'আতই পরিচিতি লাভ করেছে "আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত" নামে।

হযরত সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে অদ্যাবধি এক জামা'আত কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী'র পথকে অনুসরণ করে আসছে। এই মহান ধারার উত্তরাধিকারী আইম্মা, মুজাদ্দেদীন, ফুকাহা, মুহাদ্দেসীন ও সুলাহায়ে উম্মত অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে নিরলস সাধনা, সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে এই দ্বীনের হিফাজত ও ইশা'আত করে গিয়েছেন। সকল প্রতিকূলতার মুখেও হক ও হক্কানিয়াতের পতাকাকে সমুন্নত রাখার জন্য তারা জীবন বাজী রেখে সংগ্রাম করে গেছেন। দারুল উলূম দেওবন্দ মূলতঃ সে ধারারই উত্তরাধিকারী।

ভারতে ইসলাম এসেছে দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রা. এর যুগেই। সেই থেকে নিয়েই 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী'র কেতনধারী এক জামা'আতের নিরলস প্রচেষ্টায় হিন্দু প্রধান ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হয়। মুসলিম শিক্ষা-সভ্যতা ও কৃষ্টি-কালচার এদেশের মানুষের নিজস্ব সভ্যতা ও কৃষ্টি-কালচারে পরিণত হয়। এই সুদীর্ঘ পথে মুসলিম মনীষী ও উলামায়ে কিরামকে সমূহ প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে অনেক কণ্টকময় পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। মুকাবেলা করতে হয়েছে অনেক জটিলতার। কখনো মনে হয়েছে যে, আর বুঝি সামলানো সম্ভব হবে না। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনকে টিকিয়ে রাখার জন্য বারে বারেই খুলে দিয়েছেন তাঁর নুসরতের দ্বার। রহমতের বারি সিঞ্চন করে সহজ করে তুলেছেন উম্মতের চলার পথকে।

মোগল সম্রাট আকবরের যুগে তার মূর্খতার সুযোগ নিয়ে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যখন ক্ষমতা লোভী সম্রাটের ছত্রছায়ায় নিজেদের কুটিল চানক্য মূর্তিকে আড়াল করে

হিন্দুয়ানী দর্শন উপাদানে গঠিত দ্বীনে ইলাহীর নামে নিঃশেষ করে দিতে চাইল ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলাম ও মুসলিম উম্মাকে, তখন সেই ধারারই উত্তরাধিকারী এক মর্দে মু'মিন আল্লাহর উপর পরম ভরসা নিয়ে বলিষ্ঠ ঈমানী চেতনায় এগিয়ে এলেন এবং ছিন্ন করে দিলেন তাদের সব ষড়যন্ত্রের জাল। ইতিহাস তাঁকে মুজাদ্দিদে আলফেসানী হিসাবে চিনে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভোগবাদী বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের উপর ভিত্তি করে বাতিল যখন নিজেকে দাঁড় করাতে চাইল তখন এর মোকাবেলায় হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. নববী সুন্নাহর আলোকে ইসলামের সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক সকল বিধি বিধানকে বিশ্লেষণ করে পেশ করলেন ইসলামী জীবন বোধ ও আন্দোলনের এক নতুন রূপরেখা এবং নব্য বাতিলকে রোখার কার্যকরী কর্মসূচী। সেই চেতনায় সমৃদ্ধ 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসাহাবী' –আমি ও আমার সাহাবীরা যে পথে প্রতিষ্ঠিত– এর আলোয় গড়া আহলে-সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সংগ্রামী ধারার উত্তরাধিকার বহন করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঐতিহাসিক দারুল উলূম দেওবন্দ। ভারতীয় মুসলমানদের এক নাজুক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতা এবং সংস্কৃতির চরম অবক্ষয়ের এক ঘনায়মান অমানিশা এ ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামী প্রাতিষ্ঠানিক ধারাটির সূচনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে ছিল।

শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট ইউরোপের পুঁজিবাদী বুর্জোয়া গোষ্ঠী কাঁচামাল আহরণ ও নয়া বাজারের তালাশে পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং যে কোন মূল্যে সাম্রাজ্য বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনে আদাজল খেয়ে লেগে যায়। ভাসকোদাগামার নেতৃত্বে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরী বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের রাস্তা আবিস্কারের পর সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সামনে এক নয়া দিগন্ত খুলে যায়। দলে দলে তারা এই উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে এসে ভীড় জমাতে থাকে এবং গণবিচ্ছিন্ন ও অপরিনামদর্শী তৎকালীন রাজন্যবর্গের খেয়ালী বদান্যতায় বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন করতে থাকে। ইংরেজ বেনিয়া গোষ্ঠীও এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। শেষে একদিন ছলে বলে কলে কৌশলে এবং বিশ্বাস ঘাতকতার যোগসাজশে তারা এই উপমহাদেশকে গ্রাস করে নেয়। এর ফলে এ উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুন এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে যে মারাত্মক ধ্বংস নেমে আসে সে ইতিহাস সবারই জানা। উপমহাদেশের সূর্যসন্তান বিপ্লবী চিন্তা নায়ক শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. আগত বস্তুবাদী দর্শনের বিধ্বংসী সায়লাবের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে অনুমান করতে পেরে 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী'-এর আদর্শিক আঙ্গিক অক্ষুন্ন ও সমুন্নত রাখার তাকিদে কুরআন সুন্নাহ ও আকাবিরে উম্মার জীবনাদর্শের নিক্তিতে যাচাই করে এক নতুন আঙ্গিকে পেশ করেছিলেন ইসলামী জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার অভিনব দর্শন ও

অবকাঠামো এবং সর্বত্র দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য মুসলিম উম্মাহকে উপহার দিয়েছিলেন একটি বেগবান ও কার্যকরী কর্মসূচী।

দিল্লীতে তখন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র ওয়ালি উল্লাহী দর্শন ও কর্মসূচীর কেন্দ্রীয় নায়ক শাহ আব্দুল আযীয রাহ. পিতৃপ্রদত্ত কর্মসূচীর আলোকে নয়া বিপ্লবের জন্য লোক গড়ে চলেছেন। তিনি যখন দেখলেন দেশ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের করতলগত, তারা দিল্লীর গণবিচ্ছিন্ন, অসহায়, নামে মাত্র ক্ষমতাসীন সম্রাট থেকে এই মর্মে ফরমান আদায় করে নিয়েছেন যে, এখন থেকে বাদশাহ সালামতের রাজ্যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীরই হুকুম চলবে। সেই দিন তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ফতওয়া ঘোষণা করলেন, "ভারত এখন দারুল হরব" (শত্রু কবলিত এলাকা) সুতরাং প্রতিটি ভারতবাসীর কর্তব্য হলো একে স্বাধীন করা। দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল এই ফতওয়ার ঘোষণা। শাহ ইসমাঈল শহীদ ও সাইয়্যিদ আহমাদ শহীদ রাহ.এর নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী দলে দলে জমায়েত হতে লাগলো উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাহাড়ের পাদদেশে সিত্তানা দুর্গে। ইংরেজদের হীন চক্রান্ত, জগৎশেঠ, মীরজাফর ও রায়দুর্লভদের প্রেতাত্মাদের বিশ্বাস ঘাতকতায় ঐতিহাসিক বালাকোট প্রান্তরে রক্তাক্ষরে লিখা হল মুক্তিপাগল স্বাধীনতাকামী মুজাহিদীনদের নাম। কিন্তু আন্দোলন চলতে থাকে এবং ১৮৫৭ সনে এসে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতাকামী আলিমদের নেতৃত্বে তা স্বাধীনতা আন্দোলন (তথা সিপাহী বিদ্রোহ) নামে সর্বব্যপীয়া রূপ পরিগ্রহ করে। এক পর্যায়ে উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জিলার থানা ভবনকে কেন্দ্র করে একটি স্বাধীন এলাকার সৃষ্টি হয়। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ.-এর ভাব শিষ্য হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুজাহিরে মক্কী রাহ. কে আমীরুল মুমিনীন, কাসেম নানুতবী রাহ. কে প্রধান সেনাপতি ও হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহ. কে এর প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু কিছু সংখ্যক পদলেহী দেশীয় রাজন্যবর্গের বিশ্বাস ঘাতকতায় ১৮৫৭ সালের মহান স্বাধীনতা আন্দোলন আপাত ব্যর্থ হয়। সাথে সাথে স্বাধীন থানা ভবন সরকারেরও পতন ঘটে। হাফেজ যামেন রাহ. শহীদ হন। অপরাপর নেতৃবৃন্দ আত্মগোপন করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে লোমহর্ষক নির্যাতনের শিকার হয় এই উপমহাদেশবাসী। লাখো লাখো আলেমকে প্রকাশ্যে জবাই করে শহীদ করা হয়। সন্ত্রাস ও ভীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং স্বাধীনতাকামী মুক্তিপাগল দেশবাসীর মনোবলকে ভেঙ্গে দেওয়ার মানসে দিনের পর দিন শহীদানদের লাশ গাছে লটকিয়ে রাখা হয়। শেরশাহী গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের কোন একটি বৃক্ষ ছিল না যেখানে শহীদানদের লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়নি। আলিম কাউকে দেখলেই নির্বিচারে হত্যা করা হত। যেখানে এই অবস্থা ছিল যে, কোন মুসলিম ঘর আলিম ছাড়া ছিল না, সেখানে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে গ্রামকে গ্রাম খুঁজেও একজন আলিম পাওয়া যেত না। এমনকি দাফন কাফন করার মত লোক পাওয়াও কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। হতাশার ঘন অমানিশা ছেয়ে ফেলল এই উপ-মহাদেশকে।

অপর দিকে বেনিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা স্বাধীনতাকামী মানুষের উপর নির্যাতন চালানোর সাথে সাথে একদল পদলেহী খুশামুদে গোষ্ঠী তৈরীরও প্রয়াস চালায়, যারা সাম্রাজ্যবাদী শাসনকেই দেশবাসীর জন্য কল্যাণকর বলে প্রচারণা চালাতে থাকে। স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বদানকারী আলিমদের থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তারা একদল ভণ্ড নবী ও ভাড়াটে মৌলভি খরিদ করে নেয় এবং তাদের মাধ্যমে সংগ্রামী আলিম সমাজের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার ও কুৎসা রটনার প্রয়াসে মেতে উঠে। তাদেরকে রাসূল বিদ্বেষী, ওয়াহাবী ও কাফির বলে আখ্যা দেওয়া হয় এবং এ মর্মে ফতওয়া খরিদ করে তা সাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। এতদসঙ্গে দেশবাসীকে আত্মকলহে জড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের গণজোয়ারকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে ক্ষমতার টলটলায়মান আসনকে টিকিয়ে রাখার মানসে তারা বিভেদ সৃষ্টির কুটিল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং উপমহাদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠ সচেতন দুটো সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার আগুন উস্কে দেয়। যে আগুনে আজও পুড়ছে এদেশের শান্তিকামী নিরীহ মানুষ। এছাড়াও তারা খ্রীষ্টান মিশনারীদের মাধ্যমে দেশবাসীকে ধর্মান্তরিত করার এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী স্বামী দিয়ানন্দজীর শুদ্ধি আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার প্রয়াস চালায়। ভূমিনীতিতে পাঁচসালা ও দশসালা বন্দোবস্ত নীতি প্রবর্তন করে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যতঃ পঙ্গু করে দেয় এবং হিন্দুদেরকে জমিদারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করে স্বাধীনতা সংগ্রামের বলিষ্ঠ শক্তি মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া করে দেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অবশ্য বিশ্বাস ঘাতক গোষ্ঠী নবাব, নাইট, রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর, রায় সাহেব, খান সাহেব, ইত্যাদি উপাধিতে পুরস্কৃত হয়। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল যে, এদেশের স্বাধীনতা বুঝি ফিরে আসবে না আর কোন দিন। শিক্ষা সংস্কৃতি ধর্ম সব যাবে ধ্বংস হয়ে। উপমহাদেশের জন্য সে ছিল এক চরম দুর্যোগের দিন।

এদিকে স্বাধীন থানা ভবন সরকারের পতনের পর আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহ. কোনক্রমে আত্মগোপন করে মক্কা শরীফে হিজরত করে যেতে সক্ষম হন। সেখান থেকে তিনি তাঁর অনুসারীদের পুনরায় সংগঠিত করার প্রয়াস নেন। কিছু দিন পরে সাধারণ ক্ষমার সুবাদে হযরত কাসিম নানুতুবী ও হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রাহ. এরও মুক্তভাবে কর্মক্ষেত্রে নেমে আসার সুযোগ হয়। আবার নতুন করে পরামর্শ চলে। কোন পথে আসবে দেশের নিরীহ নির্যাতিত মানুষের কাঙ্খিত স্বাধীনতা, মুক্তি হবে সহজতর।

স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর থাকার ফলে এবং সংগ্রাম ও যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত থাকার কারণে দীর্ঘদিন শিক্ষার প্রতি ফিরে তাকানোর সুযোগ হয়নি মুসলমানদের। তদুপরি ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে

মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি। এমনকি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও পৃষ্টপোষকতার অভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তদস্থলে চাপিয়ে দেয়া বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে বিভ্রান্ত হতে শুরু করে মুসলিম যুবমানস। ফলে ভবিষ্যত বংশধরেরা বিভ্রান্ত হয়ে হারাতে পারে হিদায়াতের পথ এবং বিজাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি দখল করে নিতে পারে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্থান। তা হলে যে বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যত হয়ে পড়বে আরো সঙ্গিন। অপর দিকে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতেন যারা, স্বাধীনতার সঞ্জীবনী চেতনা বিলাতেন যে আলেম সমাজ; ইংরেজদের নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়ে তাদের অনেকেই শাহাদত বরণ করেন, ফলে নেতৃত্বের জন্য আত্মসচেতন বলিষ্ট প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বের অভাব অনুভূত হয় তীব্রভাবে। এমতাবস্থায় দীর্ঘ চিন্তা ভাবনা ও পরামর্শের পর আপাততঃ সশস্ত্র সংগ্রামের ধারা স্থগিত রেখে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের বলিষ্ঠ চেতনায় উজ্জীবিত ও দীনি চেতনায় উদ্দীপ্ত একদল আত্মত্যাগী সিপাহ সালার তৈরির মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে, দ্বীনি ইলম ও ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুনের সংরক্ষণ ও প্রচার প্রসারের সুমহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর ইঙ্গিতে, কাসেম নানুতবী রাহ. এর নেতৃত্বে এবং আযাদী আন্দোলনের অগ্রসেনানী যুগশ্রেষ্ঠ বুজুর্গানেদীনের হাত ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে, মুতাবিক ১৫ই মুহাররাম ১২৮৩ হিজরীতে ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ সাহারানপুর জিলার দেওবন্দ নামক বস্তিতে, ঐতিহাসিক সাত্তা মসজিদের প্রাঙ্গনে, ছোট্ট একটি ডালিম গাছের ছায়ায়, একান্ত ইলহামীভাবে বর্তমান পৃথিবীর ইসলামী শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্র বলে পরিচিত ঐতিহাসিক দারুল উলূমের গোড়া পত্তন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, মোগল আমলে প্রতিটি নগরে গঞ্জে হাজার হাজার ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মিশর থেকে প্রকাশিত 'সুবহুল আশা' গ্রন্থের বর্ণনানুসারে রাজধানীর শহর দিল্লীতেই এক হাজার মাদ্রাসা ছিল। প্রফেসর মার্কমিলসের বর্ণনানুসারে বৃটিশ শাসনের পূর্বে শুধু বাংলাদেশেই ছিল ৮০ হাজার মাদ্রাসা। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কূট ষড়যন্ত্রের ফলে এই সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়েছিল। শুধুমাত্র দিল্লীর রহিমিয়্যার মত মাত্র দু'চারটি প্রতিষ্ঠান স্ব-উদ্যোগে টিকে থাকলেও ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর এগুলোকেও বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে ভারতে মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষার আর কোন প্রতিষ্ঠানই অবশিষ্ট থাকল না। এ বিষয়টি তদানিন্তন কালের জ্ঞানানুরাগী সকল আলেম উলামাদেরকেই ভাবিয়ে তুলেছিল নিঃসন্দেহে। ভারতে ইসলামী শিক্ষার ধারাকে টিকিয়ে রাখার বিকল্প কি পন্থা অবলম্বন করা যায় এই চিন্তা তখন সকলের ভাবনার জগৎকেই সম্ভবত আন্দোলিত করেছিল।

যেভাবে সূচনা হল ঃ

দেওবন্দ ছিল হযরত নানুতুবী রাহ. এর শ্বশুরালয়। সেখানে গেলে তিনি সাত্তা মসজিদেই নামায আদায় করতেন। হাজী আবেদ হুসাইন রাহ. ছিলেন সাত্তা মসজিদের ইমাম। মাও. যুলফিকার আলী ও মাও. ফজলুর রহমানও অত্র এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। এইসব ব্যক্তিবর্গ নামাযান্তে হাজী আবেদ হুসাইনের হুজরায় প্রায়ই সমবেত হতেন। দেশের এহেন পরিস্থিতি তাঁদেরকেও ভাবিয়ে তুলেছিল ভীষণভাবে। তাঁরা সবচেয়ে বেশী ভাবতেন ইসলামী শিক্ষার ভবিষ্যত নিয়ে। অশিক্ষার অন্ধকারে, গোমরাহীর অতলে হারিয়ে যাবে কি মুসলিম মিল্লাতের নতুন প্রজন্ম? কিন্তু বিকল্প কোন পথ কেউ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। দীর্ঘ ৬/৭ বৎসর এভাবেই কেটে গেল।

একদিন সাত্তা মসজিদের ইমাম হাজী আবেদ হুসাইন ফজরের নামাযান্তে ইশরাকের নামাজের অপেক্ষায় মসজিদে মুরাকাবারত ছিলেন। হঠাৎ তিনি ধ্যানমগ্নতা ছেড়ে দিয়ে নিজের কাঁধের রুমালের চার কোণ একত্রিত করে একটি থলি বানালেন এবং তাতে নিজের পক্ষ থেকে তিন টাকা রাখলেন। অতঃপর তা নিয়ে তিনি রওনা হয়ে গেলেন মাও. মাহতাব আলীর কাছে। তিনি সোৎসাহে ৬ টাকা দিলেন এবং দু'আ করলেন। মাওলানা ফজলুর রহমান দিলেন ১২টাকা, হাজী ফজলুল হক দিলেন ৬টাকা। সেখান থেকে উঠে তিনি গেলেন মাও. জুলফিকার আলীর নিকট; জ্ঞানানুরাগী এই ব্যক্তিটি দিলেন ১২টাকা। সেখান থেকে উঠে এই দরবেশ সম্রাট "আবুল বারাকাত" মহল্লার দিকে রওয়ানা হলেন। এভাবে দুইশত টাকা জমা হয়ে গেল এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনশত টাকা জমা হয়ে গেল। এভাবেই বিষয়টি লোকমুখে চর্চা হতে হতে বেশ টাকা জমে যায়। জনগণের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে তিনি মিরাঠে কর্মরত হযরত নানুতুবী রাহ. এর নিকট এই মর্মে পত্র লিখেন যে, আমরা মাদ্রাসার কাজ শুরু করে দিয়েছি; আপনি অনতিবিলম্বে চলে আসুন। চিঠি পেয়ে হযরত নানুতুবী রাহ. মোল্লা মাহমুদকে শিক্ষক নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দিলেন, এবং তাঁর মাধ্যমে মাদ্রাসার কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে চিঠি লিখে দিলেন। এভাবেই গণচাঁদার উপর ভিত্তি করে শিক্ষাধারাকে সচল ও সজীব রাখার যে নতুন পদ্ধতির সূচনা হয় তা জাতির ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত করে।

সরকারী অনুদান ছাড়াই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এবং ইসলামী তাহজীব ও তামাদ্দুনকে টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি নিজেদের হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের যে অভিনব ধারার সূচনা করলেন এই সকল মনীষীরা তা জাতির ইতিহাসকে এক নতুন ধারায় পরিচালিত করে।

আকাবিরে সিত্তা বা প্রতিষ্ঠাতা ছয় মনীষীর নাম

নাম	জন্ম তারিখ	প্রতিষ্ঠাকালে বয়স	মৃত্যুর তারিখ
১। মাও. যুলফিকার আলী	১৮১৯ইং / ১২৩৭ হিঃ	৪৫ বৎসর	১৯০৪ ইং/ ১৩২২ হিঃ
২। মাও. ফজলুর রহমান	১৮২৯ইং /১২৪৭ হিঃ	৩৫ বৎসর	১৯০৭ইং / ১৩২৫ হিঃ
৩। মাও. কাসিম নানুতুবী	১৮৩২ইং /১২৪৮ হিঃ	৩৪ বৎসর	১৮৮০ইং /১২৯৭ হিঃ
৪। মাও. ইয়াকুব নানুতুবী	১৮৩৩ইং /১২৪৯হিঃ	৩৩ বৎসর	১৮৮৪ইং/১৩০২ হিঃ
৫। হাজী আবেদ হুসাইন	১৮৩৪ইং / ১২৫০ হিঃ	৩২ বৎসর	১৯১২ইং/ ১৩২৮ হিঃ
৬। মাও. রফী উদ্দীন	১৮৩৬ইং /১২৫২ হিঃ	৩০ বৎসর	১৮৯০ ইং /১৩০৬ হিঃ

মহান প্রতিষ্ঠাতারা বুঝেছিলেন যে, আদর্শ সচেতন একদল কর্মী তৈরি করে তাদের মাধ্যমে আন্দোলনের স্রোতকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া সহজ হবে নিঃসন্দেহে। তাই চরম অর্থনৈতিক দৈন্যের মাঝেও কোনরূপ সরকারী সহযোগিতা ছাড়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে এবং মুসলিম জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত দানের উপর ভিত্তি করে তাঁরা নতুন আঙ্গিকে গড়ে তুললেন এ প্রতিষ্ঠানটিকে। সেদিন থেকে শুরু হল আযাদী আন্দোলনের আরেক নয়া অধ্যায়। পাঠদানের পাশাপাশি আযাদীর দীক্ষাও চলতে থাকল। একটি সর্বজনীন ঐক্যের প্রক্রিয়াকে সামনে রেখে তৈরি করা হল এর তালীম ও তরবিয়তের অবকাঠামো। ফলে অল্প দিনেই এর সুনাম সুখ্যাতি ও আবেদন ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। অল্প দিনেই তৈরি হয়ে গেল এক নতুন জিহাদী কাফেলা। সুসংগঠিত হয়ে আবার তারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন নয়া জিহাদে। দীর্ঘ সংগ্রাম ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে এ দেশের মজলুম মানুষ ফিরে পেল তাদের বহুদিনের কাঙ্খিত স্বাধীনতা। ইসলামী শিক্ষার ময়দানে হল এক নতুন দিগন্তের অভ্যুদ্বয়। যার ফলশ্রুতিতে আজ গড়ে উঠেছে এ উমহাদেশ সহ পৃথিবীর আনাচে কানাচে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখান থেকে প্রতিনিয়ত বিলানো হচ্ছে ইলমে দ্বীনের শারাবান তাহুরা।

দারুল উলূমের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং এ প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি

হিজরী ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের সামনে দুটি মৌলিক সমস্যা বিদ্যমান ছিল। এর একটি হল রাজনৈতিক আগ্রাসন, আর অপরটি হল ধর্মীয় জটিলতা।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের ফলে এদেশের মানুষকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি চরম দুর্ভোগ ও নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হয়েছিল এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কি চরম দেউলিয়াত্ব ও অসহায়ত্বের শিকার হতে হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত চিত্র আমরা ইতিপূর্বে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই চরম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট-কালে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও বেশ কিছু সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। সমস্যাগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. ইংরেজরা তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা সুসংহত করার জন্য তাদের তাঁবেদার কর্মচারী তৈরির মানসে এবং এদেশের মানুষের মনমস্তিষ্ককে তাদের ইউরোপীয় ধ্যান ধারণার ছাঁচে গড়ে তোলার মানসে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এদেশের ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর তারা মারাত্মকভাবে হস্তক্ষেপ শুরু করে। স্মর্তব্য যে, ইংরেজদের আগমনের পূর্বে এদেশে শিক্ষা বলতে ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষাই ছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান প্রত্যেক ধর্মেরই একটি আলাদা শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। অবশ্য মুসলমানরা দীর্ঘ ৭০০ বৎসর ক্ষমতায় থাকা কালে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল– যার আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। ইংরেজরা এসে ক্রমান্বয়ে এই শিক্ষাব্যবস্থাকে কৌশলে পঙ্গু করে দেওয়ার প্রয়াস গ্রহণ করে। তারা ভাল করেই বুঝেছিল যে, ঘোষণার মাধ্যমে এই শিক্ষাব্যবস্থাকে বাতিল করতে গেলে গণবিদ্রোহ ঠেকানো কঠিন হবে। তাই তারা ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দকৃত জায়গীরগুলি বাতিল করে দিয়ে এবং প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস ওয়াকফ্ সম্পত্তিগুলো বাজেয়াপ্ত করে প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের পথ রুদ্ধ করে দেয়। মুসলিম শাসকদের আমলে প্রতিষ্ঠানগুলোকে যে রাষ্ট্রীয় অর্থানুকূল্য প্রদান করা হত তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে। এই সুযোগে তারা তাদের স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে। ফলে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। এসকল প্রতিকূলতার মাঝে মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক তেমন কোন সুব্যবস্থাই অবশিষ্ট ছিল না।

২. ইংরেজদের আগমনের পূর্ব থেকেই এদেশে ধর্মীয় শিক্ষার বিভিন্ন কেন্দ্র ছিল, একেক কেন্দ্র একেক বিষয়ের শিক্ষার জন্য প্রখ্যাত ছিল। কোনটি মানতিকের জন্য বিখ্যাত ছিল, কোনটি ফিকাহ– উসূলে ফিকাহ-এর জন্য

বিখ্যাত ছিল; আবার কোনটি হয়ত কালাম শাস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু যারা যে বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতেন তারা সে বিষয়কে এতটাই গুরুত্বের সাথে তুলে ধরতেন যে, অন্য সব বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ম্লান হয়ে পড়ত। হতে হতে বিষয়টি এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল যে, যিনি মানতিক ভাল জানতেন, তিনি মানতিক জানেন না অথচ অন্যসব বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য রাখেন এমন কোন ব্যক্তিকে আলেমই মনে করতেন না। অনুরূপভাবে কালাম শাস্ত্রবিদ ফিকাহবিদকে আলেম মনে করতেন না। এভাবে এক বিষয়ের পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাথে অন্য বিষয়ের পণ্ডিত ব্যক্তিদের এক ধরনের বিদ্বেষ ও বৈরিতা সৃষ্টি হত। এ বৈরিতা ধর্মীয় শিক্ষিতদের মাঝে একটি আত্মঘাতী পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিল।

৩. হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলীসহ বিভিন্ন মাজহাবের লোক বাস করত এদেশে। যদিও এসকল মাহজাবের সবগুলিই সহীহ ও বিশুদ্ধ মত ও পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এক মাজহাবের অনুসারীরা অন্য মাজহাবের উপর নিজের মাজহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য তর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। এই তর্কযুদ্ধে যুক্তি প্রমাণ ও বাচন ভঙ্গি এমন পর্যায়ে চলে যেত যে, যেন প্রত্যেকেই মনে করত আমার নিজের মাজহাবই মাজহাব অন্যগুলো মাজহাব হওয়ার যোগ্যই নয়। এই বাড়াবাড়ি থেকে মাজহাবে মাজহাবে বিদ্বেষ ও বৈরিতার জন্ম নিত। যা আত্মঘাতি কলহ, ঝগড়া বিবাদ ও মারামারি-কাটাকাটি পর্যন্ত গড়াত।

৪. অনুরূপভাবে এদেশে চারটি আধ্যাত্মিক ধারা দীর্ঘদিন যাবৎ চলে আসছিল, যথা– চিশতিয়া, কাদরিয়্যাহ, নকশবন্দীয়া ও সোহ্‌রাওয়ারদিয়্যাহ। এই সবগুলো ধারাই মূলতঃ বিশুদ্ধ মত-পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এগুলোর মাঝে মৌলিক আক্বীদাগত কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু এক তরীকার অনুসারীরা নিজের তরীকার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে অন্য তরীকাকে তুচ্ছ করার পরিণতিতে এই ধারাসমূহের অনুসারীদের মাঝেও বিদ্বেষ ও বৈরিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়– যা ধর্মীয় অঙ্গনকে জটিল করে রেখেছিল।

৫. এছাড়া এ সময় সঠিক ধর্মীয় শিক্ষার পরিবেশ না থাকায় অশিক্ষার সুযোগে নানা ধরনের আক্বীদাগত বিভ্রান্তি ও কুসংস্কারের শিকার হয়েছিল এদেশের মুসলমান। প্রত্যেক দলই নিজের মতকে সঠিক বলে দাবী করত; ফলে সাধারণ মানুষের জন্য সঠিক দ্বীন ও কুসংস্কারের মাঝে পার্থক্য সূচীত করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। বরং বিদ'আতীরা নিজেদেরকে আশেকে রাসূল বলে উল্লেখ করে মিলাদ কিয়ামের কুসংস্কারকে সমাজে ছড়াতে থাকে, আর হক্কানী আলেমদেরকে রাসূল বিদ্বেষী বলে অপপ্রচার চালাতে থাকে। ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় এসকল কুসংস্কারাচ্ছন্নরা সমাজে বিভিন্ন ধরনের

বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির প্রয়াসে লিপ্ত হয়। ইংরেজঁরা তাদের তল্পী বহনের জন্য গোলাম আহমদকে মিথ্যা নবীর দাবীদার বানিয়ে ধর্মীয় অঙ্গনে একটি নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল।

৬. এদেশের মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার জন্য খ্রীস্টান প্রাদ্রীদেরকে আমদানী করা হয়। তারা ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের যুক্তি তর্কের আশ্রয় নেয় এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। আরিয়া সমাজও এ সময় খ্রীস্টান পাদ্রীদের ন্যায় ইসলাম ধর্মের উপর আক্রমণ চালাতে উদ্যত হয় এবং তারা বিভিন্ন বিষয়ে চ্যালেঞ্জ দিয়ে ইসলামের অসারতা প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়।

৭. সময়ের সবচেয়ে নাজুক বিষয় ছিল এই যে, তখন যারা ইলমের চর্চা করতেন তারা রুহানিয়্যাত থেকে দূরে থাকতেন, আর যারা রুহানিয়্যাত অর্জনে ব্রতী হতেন তারা জ্ঞানসাধনার জগৎকে ভুলেই যেতেন। এভাবে ইলম ও আধ্যাত্মিকতা দুটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল। এতে ইলম ও আমলের সমন্বয় সম্ভব হচ্ছিল না।

৮. এ সময় ইংরেজী সভ্যতার ব্যাপক চর্চার ফলে মানুষ প্রবৃত্তির প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। ফলে প্রবৃত্তি পূজার ধ্বংসাত্মক সায়লাবে ইসলামী অনুশাসনের অনুবর্তিতার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ আমলী ও চারিত্রিক ক্ষেত্রে দারুণ অবক্ষয়ের শিকারে পরিণত হয়।

মূলতঃ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিরাজমান এই সমস্যাগুলোকে সামনে রেখেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দারুল উলূম দেওবন্দ। সুতরাং বলা যায় যে, এসকল সমস্যা নিরসনের চিন্তা ভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য উদ্দেশ্যে। যেহেতু ইংরেজদের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের মুখে সম্মুখ সমরে বিজয়ের সম্ভাবনা ছিল সুদূর পরাহত। তাই একাডেমিক পন্থায় তাদেরকে প্রতিহত করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। শুরু হয় শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে আযাদীর দীক্ষার নয়া সংগ্রাম।

দারুল উলূমের কাদীম দস্তুরে আসাসীতে (মূল গঠনতন্ত্রে) যে লক্ষ্য উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে তা থেকে আমরা আমাদের দাবীর স্বপক্ষে সমর্থন পাই।

মূল গঠনতন্ত্রে বর্ণিত লক্ষ্য উদ্দেশ্যসমূহের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

১. এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে সামগ্রিকতা সৃষ্টি এবং একটি ব্যাপকতর শিক্ষা সিলেবাসের মাধ্যমে শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন করে তোলা। শিক্ষার ব্যাপক প্রচার প্রসারের ব্যবস্থা করণের মাধ্যমে দ্বীনের খিদমত করা।

২. আ'মাল ও আখলাকের প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জীবনে ইসলামী ভাবাদর্শের বাস্তব প্রতিফলন ঘটানো।

৩. ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সমাজের চাহিদার নিরিখে যুগ সম্মত কর্মপন্থা অবলম্বন এবং খায়রুল কুরুনের (সাহাবীগণের যুগের) ন্যায় আখলাকী ও আমলী চেতনা সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া।

৪. সরকারী প্রভাব মুক্ত থেকে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও চিন্তা-চেতনার স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখা।

৫. দ্বীনি শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে এধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা, এবং সেগুলোকে দারুল উলূমের সাথে সংশ্লিষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

দারুল উলূমের সুদীর্ঘ কালের মুহতামিম হাকীমুল উম্মাহ হযরত মাও. কারী তাইয়্যিব রাহ. দারুল উলূমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নিম্নোক্ত শিরোনামে তা উল্লেখ করেছেন।

১. মাজহাবিয়্যত অর্থাৎ মাজহাব ও আদর্শের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা।

২. দায়েম আযাদী বা সামগ্রিক ও চিরস্থায়ী স্বাধীনতা অর্জন।

৩. মেহনত পছন্দী ও সাদেগী বা পরিশ্রমী ও লৌকিকতা বিবর্জিত সহজ সরল জীবনধারা অবলম্বনের অভ্যাস গঠন।

৪. আখলাক ও বুলন্দ কিরদার বা আত্মিক ও নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ও এক্ষেত্রে অনুপম নমুনা তৈরী।

৫. ইনহিমাকে ইলমী বা শিক্ষাদীক্ষায় আত্মমগ্নতার পরিবেশ গড়ে তোলা। কারী তাইয়্যিব রাহ. নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে এই পাঁচটি শিরোনামের মাঝ দিয়ে দারুল উলূমের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের অতিসূক্ষ্ম ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর এই ব্যাখ্যার মাঝ দিয়ে দারুল উলূমের একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

বস্তুতঃ দারুল উলূম তার শিক্ষার্থীদের মাঝে এক দিকে যেমন দ্বীনী ইলমের ক্ষেত্রে গভীর পাণ্ডিত্য সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করেছে তেমনি প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আমেলে শরীয়ত ও হামেলে দ্বীন হিসাবে গড়ে তোলার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। স্বদেশের স্বাধীনতার চেতনায় অনুপ্রাণিত করে দেওয়া হয়েছে প্রতিটি শিক্ষার্থীর অন্তরকে। যাতে জিহাদ বিস-সাইফের পরিবর্তে তারা তাদের চারিত্রিক ও আদর্শিক চেতনার শাণিত তরবারীকে কাজে লাগিয়ে দ্বীনের হিফাযত করতে ও স্বদেশের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়, যেন মসি হয়ে উঠে অসির চেয়ে ক্ষুরধার, বক্তৃতার প্রতিটি বাক্য যেন হয়ে উঠে বুলেটের চেয়ে বেগবান, তাদের

আখলাক ও আমল দেখে শত্রুও যেন কাবু হয়ে যায়, তাদের আত্মশক্তি ও রুহানিয়্যাতের দ্বারা শত্রু হয়ে পড়ে পরাভূত। দারুল উলূম থেকে ফারেগ উলামায়ে কিরামের মাঝে আমরা এরই বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাই। শিক্ষা ও গবেষণার ময়দানে তাঁরা একেক জন ছিলেন জ্ঞানের সাগরতুল্য বিদগ্ধ গবেষক, রচনায় ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁদের কেউ কেউ হয়ে উঠেছিলেন দক্ষ কলম সৈনিক, রাজনীতির ময়দানে ছিলেন প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ; সকল প্রকার কুপ্রথা ও রুসুমাতের বিরুদ্ধে তাঁরা ছিলেন খড়গহস্ত, অন্যায়ের প্রতিবাদে তাঁরা ছিলেন বজ্রকণ্ঠ, স্বদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁরা ছিলেন আপোষহীন। অন্যদিকে তাক্ওয়া ও খোদাভীরুতায় ছিলেন তাঁরা 'বে-মেছাল' ও 'বে-নজির'। আল্লাহর দরবারে বিনয়াবনত ও খাওফে ইলাহীর তাড়নায় সদা ভীত ও প্রকম্পিত। সুন্নতে নববীর অনুসরণ ছিল তাঁদের কর্মের চেতনা, আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসা ছিল তাঁদের আত্মশক্তির উৎস।

অবশ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সামান্য মত ও পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। আকাবিরদের অনেকেই মনে করতেন যে, দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার একমাত্র লক্ষ্য ছিল দ্বীনি ইলমের মৃতপ্রায় ধারার পুনরুজ্জীবন দান। যেমনঃ হযরত ইয়াকুব নানুতুবী রাহ. ১৩০১ হিজরী সালে দারুল উলূমের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী জলসায় বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছেন যে, "এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র ইলমে দ্বীন শিক্ষা ও চর্চার জন্য হয়েছে।"

পক্ষান্তরে দারুল উলূমের প্রথম ছাত্র হয়রত শায়খুল হিন্দ রাহ. এর বক্তব্য হল- 'মাদ্রাসা আমার সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমি খুব ভালভাবেই জানি যে, হযরত উস্তাদে মুহতারাম (নানুতুবী রাহ.) কোন উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ সালের ব্যর্থতার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল'।

এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, দ্বীনি তা'লীমের পাশাপাশি একটি বিরাট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পিছনে বলিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। বিষয়টি একটি বিস্তৃত আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। আমরা সেদিকে না গিয়েও একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, এ প্রতিষ্ঠানের সর্বজনীনতা একথাই দাবী করে যে, দ্বীনি তা'লীমের সাথে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের সমন্বয় সাধন করে একটি সামগ্রিকতা সৃষ্টিই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল। এ প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী কর্মতৎপরতা দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়।

দারুল উলূমের প্রাতিষ্ঠানিক ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি

কারী তাইয়্যিব রাহ. দারুল উলূমের প্রাতিষ্ঠানিক ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গিকে 'তারীখে দারুল উলূম'-গ্রন্থের শুরুতে তাঁর লিখিত দীর্ঘ ভূমিকায় দু'টি মৌলিক শিরোনামের অধীনে আলোচনা করেছেন। শিরোনাম দুটি হল–

১. মারকাযিয়্যাত বা সামগ্রিকতা ও সর্বজনীনতা সৃষ্টি এবং এক কেন্দ্রে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস।

২. মাসলাকে ই'তেদাল বা নিরপেক্ষ ও ভারসাম্যপূর্ণ সঠিক ইসলামী মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা।

এ দু'টি বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি যে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন তাঁর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

মাযহাবসমূহের মাঝে বিরাজমান বৈষম্য নিরসন ও সকল মাযহাবের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে উদার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পর্যালোচনা এবং সকল হকপন্থী মাযহাবের স্বীকৃতি প্রদান করার উদার নীতি অবলম্বন করা হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানে। যা মূলতঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহর অনুসৃত নীতি ছিল। আর সামগ্রিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচলিত সকল প্রয়োজনীয় সাবজেক্ট ও বিষয়ের সমাহার ঘটানো হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সিলেবাসে, এবং প্রত্যেকটি বিষয়কে যথা মর্যাদায় মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ভারসাম্য সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল হকপন্থী মাসলাকের আক্বীদাহ-বিশ্বাসের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানে। এক্ষেত্রে এতটাই উদারতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে যাতে হকপন্থী কোন একটি ফিরকাও এর আক্বীদাহ-বিশ্বাসের গণ্ডি বহির্ভূত না থেকে যায়।

শিক্ষার সাথে আধ্যাত্মিকতার এবং শরীয়তের সাথে তরীকতেরও সমন্বয় ঘটানো হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানে। মূলতঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. এর ফিকর ও ইলমী ধারা শাহ আব্দুল আযীয, শাহ ইসহাক ও শাহ আব্দুল গণী রাহ.-এর মাধ্যমে আপতিত হয়েছিল হযরত নানুতুবী রাহ. এর উপর। আর আধ্যাত্ম ধারাটি শাহ আব্দুর রহীম বেলায়েতী ও সাইয়্যিদ আহমদ বেরলভী রাহ. এর পারস্পরিক তাওয়াজ্জুহ বিনিময়ের ফলে মিশ্রিত হয়ে প্রতিফলিত হয় হযরত নূর মুহাম্মদ জানজানবী রাহ. এর উপর, তাত্থেকে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রাহ.-এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় হযরত নানুতুবী রাহ.-এর উপর। হযরত নানুতুবী রাহ. এই ইলমী ও আধ্যাত্ম ধারার রস বিশোষণ করে তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন দারুল উলূমের উপর। ফলে দারুল উলূম ইলম ও আমলের সমন্বিত মারকায রূপে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের সকল বিশুদ্ধ ধারাসমূহকে সমন্বিত করে প্রতিফলিত করা হয়েছে দারুল উলূমে। চিশতিয়া, কাদরিয়্যাহ, নকশবন্দিয়া ও সোহরাওয়ারদিয়্যাহ-এ সকল মাসলাকের মিশ্রণের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্ম ধারার প্রবর্তন করা হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানে।

বিশেষ করে এদেশে তরীকতের লাইনে চিশতিয়া ও নকশবন্দিয়া এ দুটি ধারাই ব্যাপকভাবে অনুসরণ করা হত। চিশতিয়া তরীকার কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন

হযরত শাহ আব্দুর রহীম বেলায়েতী রাহ.। আর নকশবন্দিয়া তরীকার এক কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন হয়রত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ রাহ.। এ দুজনই ছিলেন সমসাময়িক। প্রত্যেক তরীকারই একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সে হিসাবে চিশতিয়া তরীকার বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে হযরত আব্দুর রহীম রাহ. এর মাঝে ঐশী প্রেমের সরব দাহন, যন্ত্রনা, আক্ষেপ ও হুতাশন এবং উচ্চস্বরে ক্রন্দনের হাল বিদ্যমান থাকত। পক্ষান্তরে নকশবন্দিয়া তরীকার বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ রাহ. এর মাঝে আত্মসংবরণ, গভীর ধ্যানমগ্নতা, সম্ভরিত আবেগ ও নীরবে সমর্পণের হাল বিদ্যমান থাকত। কিন্তু একবার জিহাদের সফরে বুরনীর জামে মসজিদে আব্দুর রহীম বেলায়েতী রাহ. এর সাথে তাঁর মুলাকাত হয়। উভয়ে একটি রুদ্ধ কক্ষে একত্রিত হয়ে পারস্পরিক তাওয়াজ্জুহ বিনিময় করলে একের উপর অন্যের প্রভাব পড়ে। ফলে হযরত সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. উচ্চস্বরে কাঁদতে কাঁদতে কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন, আর আব্দুর রহীম বেলায়েতী রাহ. নীরব, আত্মসম্ভরিত অবস্থায় গভীর ধ্যানমগ্নতা নিয়ে বেরিয়ে আসেন। এভাবে উভয় ধারার মিশ্রিত রূপ বিভিন্ন আধ্যাত্মিক মনীষীর আধ্যাত্ম রঙ বিশোষণ করে দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতার উপর প্রতিফলিত হয়।

এ কারণেই দারুল উলূমের অনুসারীদের মাঝে আধ্যাত্ম ধারার সামগ্রিকতার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কেননা এখানে সাবের কালিয়ারী ও আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহীর মাধ্যমে সাবেরী ও কুদসী (ধৈর্য ও পবিত্রতার) প্রভাবের প্রতিফলন ঘটেছে, অন্যদিকে আব্দুর রহীম ও ইমদাদুল্লাহর মাধ্যমে রহমতী ও ইমদাদী আভার স্ফুরণ ঘটেছে, মুজাদ্দিদে আলফে সানীর ইত্তিবায়ে সুন্নাতের জযবার প্রতিফলন ঘটেছে, সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর প্রভাবে জিহাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে, শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ.-এর প্রভাবে জ্ঞান-সাধনা এবং তত্ত্ব ও রহস্য জ্ঞান আহরণের চেতনার প্রভাব পড়েছে। এভাবে দারুল উলূম সকল ক্ষেত্রের সামগ্রিকতা নিয়েই বিকশিত হয়েছে। এ কারণেই দারুল উলূমের অনুসারীদের মাঝে একটি সামগ্রিকতার রঙ পরিলক্ষিত হয়। কারী তাইয়্যিব রাহ. এই ভারসাম্যপূর্ণ আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টিকে অতি সংক্ষেপে অত্যন্ত গোছালো ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, – "দারুল উলূম ধর্ম হিসাবে ইসলামের আনুসারী, ফিরকাগত দিক থেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী, মাজহাবগত দিক থেকে হানাফী মাজহাবের অনুসারী, আধ্যাত্মধারায় সূফীবাদের অনুসারী, আক্বীদাগত দিক থেকে আবুল হাসান আশ'আরী ও ইমাম মাতুরিদীর অনুসারী, আধ্যাত্মিক মতপথের প্রশ্নে চিশতিয়া ধারার বরং বলতে গেলে সকল ধারার সমন্বিত রূপের অনুসারী, চিন্তধারার দিক থেকে শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.-এর চিন্তাধারার অনুসারী, চিন্তা চেতনা ও আদর্শিক মূলনীতিগত দিক থেকে কাসিম নানুতুবী রাহ. এর এবং আনুষাঙ্গিক বিষয়াদী ও মাস'আলা মাসাইলের ক্ষেত্রে রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহ. এর অনুসারী, নিসবত হিসাবে দেওবন্দী"।

এই ব্যাপক লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও ভারসাম্যপূর্ণ সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে যাওয়ার ফলে, অতি অল্প দিনেই প্রতিষ্ঠানটি সর্বজন সমাদৃত হয়ে উঠে এবং একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। হকপন্থী এমন কোন দল বা ফিরকাহ নেই যারা এ প্রতিষ্ঠানের আদর্শিক গণ্ডির আওতায় একীভূত হতে পারে না। ফলে অঘোষিতভাবেই একথা স্বীকৃত হয়ে যায় যে, দারুল উলূম "মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী"- (আমি ও আমার সাহাবীগণ যে মত ও পথের উপর প্রতিষ্ঠিত) এর কেতনধারী একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। কেননা সর্বযুগের সর্বজন স্বীকৃত সহীহ মতাদর্শের ছায়াপথ অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল এ প্রতিষ্ঠানের আদর্শিক অবকাঠামো। এ কারণেই মনে করা হয় যে, দারুল উলূম দেওবন্দ ও তার অনুসারীগণ সম্মিলিতভাবে এ যুগের মুজাদ্দিদের ভূমিকা আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠান ও তার আদর্শিক চেতনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠানগুলোই এই উপমহাদেশে এবং উপমহাদেশের বাইরেও দ্বীনের সঠিক রাহমানুয়ীর দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে।

দারুল উলূম দেওবন্দের

নেসাবে তা'লীম ও নেযামে তা'লীম

নেসাবে তা'লীম ও নেযামে তা'লীমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ

বস্তুতঃ ইসলামে শিক্ষাধারার সূচনা হয় 'দারে আরকাম' থেকেই। মসজিদে নববীর চত্তরের শিক্ষার্থীরা "আহলে সুফফা" নামে ইতিহাসে পরিচিত। সে সময় নবী কারীম সা. ছিলেন শিক্ষক আর হযরত সাহাবায়ে কিরাম রা. ছিলেন তাঁর ছাত্র। তখন প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির জ্ঞান আহরণের অতিপ্রাচীন ধারা তখন পর্যন্ত বলবৎ ছিল। অবশ্য ইসলামী চিন্তাচেতনা ও কুরআনের শিক্ষাকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নবী সা. বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষক প্রেরণ করেছিলেন এর বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। রাসূল সা. এর ইন্তিকালের পর সাহাবায়ে কিরাম কুরআন ও হাদীসের ইলম নিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। মদীনার বাইরে অবস্থানকারী এসব জ্ঞান বিতরণকারী সাহাবাগণের পরিসংখ্যান উল্লেখ করতে গিয়ে হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী উল্লেখ করেছেন যে, মক্কায় এ ধরনের শিক্ষক ছিলেন ২৬ জন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ছিলেন তাঁদের সকলের মাঝে শীর্ষস্থানীয়। সিরিয়ায় ছিলেন ৩৪ জন, মিসরে ১৬ জন, খোরাসানে ৬ জন, জাজিরায় ৩ জন। কুফায় বসবাসরত সাহাবীদের মাঝে হযরত আলী রা., ইবনে মসউদ রা., আবু মূসা আশয়ারী রা., সাদ ইবনে আবি ওয়াককাস রা., সালমান ফারসী রা.এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাহাবাগণের যুগেই ইসলামী শিক্ষা পৃথিবীর বহু দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় ভারতেও ইসলামী শিক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটে। যে সব সাহাবীগণ ভারতে এসে ছিলেন তাদের মাঝে (১) আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ উতবান (২) আশইয়াম বিন

আমর তামিমী, (৩) ছোহার বিন আল-আবাদী, (৪) সোহাইল বিন্ আদী, (৫) হাকাম বিন্ আবুল'আস ছকফী, (৬) উবায়দুল্লাহ বিন মা'মার তামিমী ও (৭) আব্দুর রহমান বিন্ সামুরাহ রা. এর নাম ইতিহাস ধরে রেখেছে। তবে এসময় শিক্ষার বিষয়বস্তু ছিল কুরআন হাদীস ও আহলে কিতাবদের কিছু কিছু বিষয়। কিন্তু উমাইয়াদের শাসনামলে (৪১হিঃ থেকে ১৩০ হিঃ পর্যন্ত) হাদীস সংকলন ও যাচাই বাছাইয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে 'রিজাল শাস্ত্র' পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। আবার কুরআনকে বিশুদ্ধভাবে পাঠের প্রয়োজনের ভিত্তিতে ইলমে ক্বিরাত ও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এসময় বহিঃর্বিশ্বে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার ফলে অনারবদেরকে আরবী ভাষা শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কেননা ইসলামের মৌলিক বিষয় কুরআন ও সুন্নাহ আরবী ভাষাতেই ছিল। ফলে আরবী ভাষার নিয়ম নীতি শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এভাবে ইলমে নাহু পাঠ্যসূচীর অন্ত র্ভুক্তির বিষয়টিও প্রাথমিকভাবে এ সময়েই শুরু হয়।

তাবেঈনদের যুগ পর্যন্ত পাঠ্যসূচীতে এসব বিষয়ই অন্তর্ভূক্ত থাকে এবং মসজিদে নববীর অনুকরণে মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাই সর্বত্র প্রচলিত হয়ে পড়ে। যেখানেই কোন মসজিদ গড়ে উঠত সে মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি পাঠশালাও গড়ে উঠত। মসজিদ ভিত্তিক এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে শিক্ষা দ্রুত সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ ঘটে।

কেননা যেখানেই মুসলিম বসতি গড়ে উঠত, ইবাদতের প্রয়োজনে সেখানেই মসজিদ গড়ে উঠত অনিবার্যভাবে। তার সাথে সাথে গড়ে উঠত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

তবে তাবেঈনদের যুগে এসে কুরআন সুন্নাহ ও সাহাবীদের কর্মময় জীবনাদর্শের আলোকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক বিষয়াসয়ের ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে বৃদ্ধিপায়। ফলে ফিকাহ শাস্ত্রের বিকাশ ঘটে এবং ইলমে ফিকাহ ইসলামী শিক্ষা সিলেবাসের অন্ত র্ভুক্ত হয়ে পড়ে। ক্রমান্বয়ে ফিকাহ শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যই ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়।

আব্বাসী খলিফাদের শাসনামলে বিশেষ করে বাদশাহ মা'মুনুর রশীদের আমলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের দর্শন ও সাহিত্য আরবীতে অনুদিত হয়। এবং ঐসব দর্শনের আলোকে ইসলামী জীবনাদর্শকে মূল্যায়নের প্রবণতা দেখা দেয়। ফলে সেই সব দর্শনের আলোকে ইসলামী আকীদাহ বিশ্বাস, বিধি-বিধানের উপর নানা ধরনের নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে শুরু করে। এসব প্রশ্ন নিরসনের প্রয়োজনে যুক্তি ও দর্শনের আলোকে ইসলামী আক্বীদাহ বিশ্বাসকে নতুন করে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। একারণে যুক্তি ও দর্শন শিক্ষা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এভাবে ইলমে কালাম নামে একটি নতুন বিষয়ের উদ্ভব ঘটে এবং তর্কশাস্ত্র ও ইলমে কালাম ইসলামী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

এ সময় অনারবীয়দের মাঝে কুরআন ও হাদীস চর্চার প্রবণতা দেখা দিলে আরবী সাহিত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায় এবং সাহিত্যে প্রজ্ঞা অর্জনের প্রয়োজনে 'সরফ' ও 'বালাগাত' শিক্ষারও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে এগুলোও ইসলামী শিক্ষা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

বাদশাহ মা'মুনের যুগে বিভিন্ন দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাহার ইসলামী দুনিয়ায় ঘটার ফলে ভূগোল, জ্যামিতি, সৌরবিজ্ঞান, রসায়ন, বস্তুবিজ্ঞান, গণিত ও চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষাদীক্ষাও ইসলামী শিক্ষার সাথে অনেকখানি ঐচ্ছিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। তবে আব্বাসী খিলাফতের প্রথমার্ধ পর্যন্ত হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনই ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের মানদণ্ড বলে বিবেচিত হয়।

আব্বাসী খিলাফতের শেষার্ধের দিকে এসে শিক্ষা ধারা একটি নতুন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। শিক্ষা তখন বিষয়ের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একেক অঞ্চলে একেক বিষয়ের শিক্ষা অধিক গুরুত্ব লাভ করে। ফলে একেক অঞ্চল একেক বিষয়ের শিক্ষার জন্য প্রখ্যাত হয়ে পড়ে। যেমন– সিরিয়া ও মিশর হাদীস, তাফসীর ও রিজাল শাস্ত্রের জন্য প্রখ্যাত ছিল। স্পেন আরবী সাহিত্য ও ইতিহাসের জন্য প্রখ্যাত ছিল; ইরান ও ইরাক দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র ও চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ের জন্য সুখ্যাত ছিল। খোরাসান ও মাওয়ারাউন নহর ফিকাহ, উসূল ও তাসাউফের জন্য বিখ্যাত ছিল।

৪০০ হিজরী পর্যন্ত মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা মসজিদ ভিত্তিকই ছিল। সর্বপ্রথম মিশরের শাসনকর্তা বাদশাহ হাকেম-বি-আমরিল্লাহ (৩৮৫ হিঃ -৪১১হিঃ) মসজিদ থেকে পৃথক করে শিক্ষাদীক্ষার জন্য একটি আলাদা গৃহ নির্মাণ করেছিলেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তা টিকে থাকেনি। পরবর্তীতে আফগান শাসক সুলতান মাহমুদ ৪১০ হিজরী সালে রাজধানী গজনীতে একটি সুবিশাল মসজিদ নির্মাণ করে মসজিদ সংলগ্ন স্থানে শিক্ষাদীক্ষার জন্য একটি পৃথক গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। ঐতিহাসিকরা এটিকেই মসজিদ থেকে আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রথম মাদ্রাসা বলে মনে করেন। অবশ্য অনেকেই বাদশাহ নিযামুল মুলক তুসী (মৃতু ৪৮৫হিঃ /১০৯২ইং) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের মাদ্রাসায়ে নেযামিয়্যাহকে সর্বপ্রথম মাদ্রাসা বলে উল্লেখ করেছেন। পরে সুলতান মাহমুদের অনুকরণে দেশের আমীর উমারাগণ ও পরবর্তী সম্রাটগণ ব্যাপক হারে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতে মুসলমানদের আগমন দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রা. এর যুগেই শুরু হয়। সাগর পাড়ের অঞ্চলসমূহে আরব বণিকরা এসে ক্রমান্বয়ে আবাদী গড়ে তোলেন। দক্ষিণ ভারতে আহমদাবাদ, সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে এবং উত্তর ভারতের মালাবার, গুজরাট ইত্যাদি অঞ্চলে মুসলমান বণিকরা ব্যবসায়ী আবাস গড়ে তোলার সাথে সাথে মসজিদ ও মসজিদ ভিত্তিক

শিক্ষাদীক্ষারও ব্যাপক প্রচলন ঘটিয়ে ছিলেন। বাংলাদেশের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, কারুমন্ডল ইত্যাদি অঞ্চলেও আরব বণিকরা ব্যাপক হারে আবাদী গড়ে তুলে ছিলেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরী শতকের পর্যটকদের বর্ণনা থেকে তখনকার শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে অনেকটা অনুমান করা যায়। হিজরী চতুর্থ শতকের প্রখ্যাত পর্যটক 'ইবনে হাওকাল' উল্লেখ করেছেন যে, সাধারণতঃ মসজিদগুলোতে আলেম উলামা ও ফিকাহবিদরা ব্যাপকহারে বসবাস করতেন। তাদের থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য এত ব্যাপকহারে শিক্ষার্থীদের সমাগম হত যে, যে কোন মসজিদে গেলেই দলে দলে শিক্ষার্থীদের আনাগোনা নজরে পড়ত।

তবে নিয়মতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ভারতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা শুরু হয় সাতশত হিজরীর শুরুর দিকে বাদশাহ কুতুবুদ্দীন আইবেকের শাসনামলে (৬০২ হিঃ- ৬০৬ হিঃ / ১২০৫ইং -১২০৯ইং)। মুলতানের শাসনকর্তা নাসের উদ্দীন কুবাচা মুলতানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কাজী মিনহাজুস সিরাজ ছিলেন তার পরিচালক।

আটশত হিজরীর দিকে ভারতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ব্যাপক হয়ে পড়ে। আল্লামা মাকরেজীর বর্ণনানুসারে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের আমলে (৭২৫হিঃ- ৭৫২হিঃ/১৩২৪ইং-১৩৫১ইং) শুধুমাত্র দিল্লীতেই এক হাজার মাদ্রাসা ছিল। ফিরোজ শাহ তুঘলক (৭৫২হিঃ-৭৯০হিঃ) বহু পুরাতন মাদ্রাসা সংস্কার করেন এবং তিনি অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনাসহ বহু নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ফিরোজশাহ মহিলাদের জন্যও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইবনে বতুতা উত্তর ভারতের হনুর নামক স্থানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন যে, এখানকার রমণীরা সাধারণতঃ হাফিজা হয়ে থাকে। আমি সেই শহরে ১৩টি মহিলা মাদ্রাসা দেখতে পেয়েছি।

তাছাড়া বিজাপুর, গুজরাট ও পূর্বাঞ্চলী শাসকরাও ব্যাপকহারে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লোদী সম্রাটদের আমলেও ব্যাপকহারে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাদশাহ হুমায়ূন, আকবর, জাহাঙ্গীর, আওরঙ্গজেবের আমলে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি এত ব্যাপক রূপ লাভ করে যে, কোন বন্দর নগর এমন ছিল না যেখানে মাদ্রাসা ছিল না। এমনকি এ সময় শুধু বাংলাদেশেই ৮০ হাজার মাদ্রাসা ছিল। তখন পর্যন্ত মাদ্রাসাসমূহের ব্যয়ভার সরকারই বহন করতেন। অবশ্য ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ, এলাকার জনগণ এসকল প্রতিষ্ঠানে নিজেদের অর্থানোকূল্য প্রদান করতে পারাকে নিজেদের সৌভাগ্য বলে মনে করতেন।

তৎকালের শিক্ষা সিলেবাস ঃ

শুরুর দিকে ইসলামী শিক্ষা সিলেবাসে কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত ছিল সে সম্পর্কে একটু আগেই আলোচনা করা হয়েছে। হিজরী সপ্তম শতক থেকে নবম শতক পর্যন্ত পাঠ্যসূচীতে যেসব বিষয়াসয় অন্তর্ভুক্ত ছিল তা ছিল নিম্নরূপঃ

*ইলমে নাহুতে	ঃ মিসবাহ, কাফিয়া, লুব্বুল আলবাব, ইরশাদ ইত্যাদি।
*ইলমে ফিকাহতে	ঃ হিদায়াহ।
*উসুলে ফিকাহতে	ঃ মানার, শরহে মানার, উসূলে বজদবী।
*তাফসীরে	ঃ মাদারেক, বায়যাভী, কাশশাফ।
*হাদীস শাস্ত্রে	ঃ মাশারেকুল আনওয়ার, মাসাবিহুস সুন্নাহ।
*আরবী সাহিত্যে	ঃ মাকামাত।
*মানতিক শাস্ত্রে	ঃ শরহে শামসিয়্যাহ।
*কালাম শাস্ত্রে	ঃ সাহাইফ, তামহীদে আবু শুকুর সালেমী।
*তাসাউফে	ঃ আওয়ারিফ, নকদুন নুসূস, লুম'আত ইত্যাদি।

নবম শতক থেকে একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নেসাব তা'লীমে তেমন কোন রদবদল হয়নি। তবে শায়খ আব্দুল্লাহ ও শায়খ আযীযুল্লাহ প্রমুখ মনীষীগণ কাজী ইযদুদ্দীন প্রণীত 'মাতালে', মাওয়াকেফ, মিফতাহুল উলূম প্রভৃতি গ্রন্থকে নিসাবের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং মীর সাইয়্যিদ শরীফ ও আল্লামা সাককাকীর শাগরিদগণ 'মাতালে', 'মাওয়াকেফ', 'মুতাওয়াল', 'মুখতাসার', 'তালবীহ', 'শরহে আকাইদ', 'শরহে বিকায়াহ', 'শরহে জামী' ইত্যাদি কিতাবকেও নেসারের অন্তর্ভূক্ত করেন। এসময় শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী ও তদীয় পুত্র নূরুল হক দেহলভী রাহ. হাদীস শাস্ত্রের ব্যাপক প্রচলনের চেষ্টা করলেও তাদের উদ্যোগ তেমন একটা সফল হয়নি।

হিজরী দ্বাদশ শতকের শুরুর দিকে মীর ফতহুল্লাহ ইরানের সিরাজ নগরী থেকে দিল্লীতে আসলে সম্রাট আকবর তাকে 'ইযদুল মুলক' খেতাবে ভূষিত করেন। তিনি মুহাক্কিক দাওয়ানী, মীর সদরুদ্দীন ও মীর গিয়াস উদ্দিন প্রমুখ মণীষীগণের মাধ্যমে মা'কুলাত (ন্যায় শাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্র)-এর ব্যাপক প্রচলন ঘটান। এ সময় ইরানের সাথে সম্রাট হুমায়ুন ও আকবরের সুসম্পর্কের সুবাদে ইরানী আলেম উলামাদের গুরুত্ব রাজ দরবারে যথেষ্ঠ বৃদ্ধি পায়। ফলে ইরানীদের ফিলোসফী প্রধান শিক্ষাধারার গভীর ছাপ ভারতীয় শিক্ষাধারায় পড়ে। এবং ভারতীয় শিক্ষাধারা অনেকটা ইরানী ধাঁচে গড়ে উঠতে শুরু করে।

এ যুগের শেষের দিকে শাহ ওয়ালী উল্লাহ ইসলামী চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে ছিলেন তার প্রভাবে সকল ক্ষেত্রেই সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। ফলে তিনি হজ্জ থেকে ফিরে এসে শিক্ষা- সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তিনি ফিলোসফী প্রধান শিক্ষাধারাকে পরিবর্তন করে দ্বীনিয়্যাত ও শরীয়তমুখী শিক্ষা ধারা প্রবর্তনের প্রয়াস গ্রহণ করেন। তাই তিনি সিহাহ সিত্তাকে শিক্ষা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এবং শিক্ষাকে আদর্শিক জাগরণ ও চিন্তা চেতনা পুনর্গঠনের একটি নতুন ধারায় প্রবাহিত করেন।

এ সময়ের আরেকজন প্রখ্যাত আলেম ছিলেন মোল্লা নিযাম উদ্দিন সাহলাভী। বাদশাহ আওরঙ্গজেব লাক্ষ্ণৌতে 'ফিরিঙ্গি মহল' নামে একটি বিশাল বাড়ী তাঁকে দিয়েছিলেন। তিনি সেখানে একটি বিরাট মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি তাঁর সেই প্রতিষ্ঠানের জন্য তৎকালে প্রচলিত নেসাবের সংস্কার করেন। তবে সেখানেও হাদীস তাফসীরের বিষয়কে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। জালালাইন, মিশকাত ও বায়যাভী শরীফের মাঝেই নেসাব সীমাবদ্ধ ছিল। সেই নেসাবে আরবী সাহিত্য ছিল অবহেলিত। তবে সেখানে ছাত্রদের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুন্দর ছিল । যে কারণে ছাত্রদের মাঝে লেখাপড়ায় গভীরভাবে মনোনিবেশ ও গভীর জ্ঞান আহরণের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পায়। ফলে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ঠ সুফল বয়ে এনেছিল।

ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তিনটি স্থান ইসলামী শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়।

(১) দিল্লী (২) লৌক্ষ্ণো (৩) খায়রাবাদ। তবে দিল্লীতে হাদীস ও তাফসীরের প্রাধান্য দেওয়া হত; লাক্ষ্ণৌতে ফিকাহ্ ও উসূলে ফিকাহ এবং খায়রাবাদে মানতিক ও ফিলোসফির প্রাধান্য দেওয়া হত।

এ সময় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারী জায়গীরের উপর ভিত্তি করেই চলত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিষয় ভিত্তিক পাঠদানের নিয়ম প্রচলিত ছিল, ক্লাশ ভিত্তিক পাঠদানের তেমন সুব্যবস্থা ছিল না। প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষক ভিত্তিক ছিল অর্থাৎ একজন শিক্ষকই সকল ছাত্রকে সব বিষয়ে পাঠদান করতেন। পরে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন হলেও শ্রেণী বিন্যাসের বিষয়টি তেমন নিয়মতান্ত্রিক ছিল না। কোথায়ও কোথায়ও পরীক্ষাই নেওয়া হত না। লেখাপড়া সমাপ্ত হলে ছাত্র উস্তাদের দু'আ নিয়ে চলে যেত। কিন্তু সনদ প্রদানেরও তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। ব্যক্তি কেন্দ্রিক যেসব প্রতিষ্ঠান ছিল অর্থাৎ এক শিক্ষককে কেন্দ্র করে যে সব গুরুগৃহ জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠত, সেখানে ছাত্রদেরকেই থাকা খাওয়া ও কিতাবাদীর ব্যবস্থা করতে হত। আর সরকারী জায়গীরের উপর ভিত্তি করে যেসব প্রতিষ্ঠান চলত সেখানে থাকা খাওয়া ও কিতাবাদীর ব্যবস্থা জায়গীরের আয় থেকে করা হত। এই ছিল দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার পূর্বকালের শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচীর মোটামুটি অবস্থা ও ইতিহাস।

দারুল উলূমের পাঠ্যসূচী বা নেসাবে তা'লীম ঃ

দারুল উলূম দেওবন্দ যেহেতু একটি সংস্কারমূলক সর্বজনীন শিক্ষাধারা প্রবর্তনের মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, একারণে তার পাঠ্যসূচীতে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছিল। তদানীন্তন ভারতে প্রচলিত ইসলামী শিক্ষার যে কয়টি খণ্ডধারা প্রচলিত ছিল, সেগুলোর সমন্বয় সাধন করতঃ

প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে একটি নতুন ধাঁচের শিক্ষা সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছিল এ প্রতিষ্ঠানের জন্য। শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. এর প্রবর্তিত সিলেবাসকে প্রাধান্য দিয়ে অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করে এবং মাও. নিযাম উদ্দীন সাহলাভী কর্তৃক প্রণীত সিলেবাসকে এর সাথে সমন্বিত করে; মা'কুলাত (ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্র) এবং প্রয়োজনীয় আধুনিক বিষয়াসয়ের সংমিশ্রন ঘটিয়ে এমন একটি যুগোপযোগী সিলেবাস তৈরি করা হয়েছিল, যাদ্বারা দল মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষই সমানভাবে উপকৃত হতে পারে।

ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রেরিত গোয়েন্দা রিপোর্টার 'জন পামর' তার রিপোর্টে দাবী করে বলেছেন যে, আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, যদি কোন অমুসলিমও এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করে তাহলেও সে যথার্থভাবেই উপকৃত হবে। আরবী উর্দূ, ইংরেজি, ফারসী, এই চারটি ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। আরবী ফারসী ভাষার উচ্চতর ব্যাকরণের জ্ঞান দান করা হত। জ্যামিতি, অংক, ভূগোল, প্রাচীন বিজ্ঞান, দর্শনসহ বর্তমানে কওমী মাদ্রাসার নেসাবভুক্ত সকল কিতাবাদিই সেখানে পড়ানো হত। শিক্ষা সিলেবাস এতটাই ব্যাপক ছিল যে, হিন্দু ছেলেরাও সে প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করত বলে তারিখে দারুল উলূমে উল্লেখ রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে মক্তব থেকে শুরু হলেও অল্প দিনেই এটি একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি শিক্ষাগারে পরিণত হয়। সম্ভবত ১২৮৯ হিজরীতেই দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়ে যায়। দারুল উলূমের প্রথম ছাত্র মাও. মাহমূদুল হাসান এ বৎসরই ফারেগ হন।

ক্রমান্বয়ে হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, আরবী সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ফুনুনাতের ক্লাশ চালু করা হয়। এর শিক্ষা সিলেবাসটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে, পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞান আহরণের সাথে সাথে একজন শিক্ষার্থীর মেধাও বিকাশিত হতে পারে এবং যে কোন বিষয় অধ্যয়ন ও অনুধাবনের যোগ্যতা তার মাঝে সৃষ্টি হতে পারে। হযরত কারী তাইয়্যিব রাহ. এর ভাষায় "এ নেবাসটি এ জন্য তৈরি করা হয়নি যে, দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান এ থেকে আহরণ করা হবে বরং এ নেসাবটি এ জন্য তৈরি করা হয়েছে যাতে সকল বিষয়ের জ্ঞান আহরণের যোগ্যতা ছাত্রদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায়"।

মাযহাব নিয়ে বাড়াবাড়ি ও বিদ্বেষের পুরাতন ধারাকে পরিহার করে সকল হকপন্থী মাযহাবের স্বীকৃতি দান করতঃ হানাফী মাযহাবকে প্রাধান্য দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পাঠদান প্রক্রিয়া চালু করার ফলে সকল মাযহাব ও ফিরকার লোকদের জন্য এ প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপক ও সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে কাজ করে যাওয়ার ফলে অতি অল্পদিনেই প্রতিষ্ঠানটি সর্বজন প্রিয় হয়ে উঠে এবং একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়।

দারুল উলূমের নেজামে তা'লীম বা শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও দারুল উলূমে প্রাচীন প্রথাসমূহের যথেষ্ঠ সংস্কার সাধন করা হয় এবং একটি অত্যাধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। নিম্নে তার কতিপয় বিশেষ দিকের উল্লেখ করা গেল।

১. জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অনুদানের উপর ভিত্তিক করে একটি নতুন ধারার শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন দান করা হয়। যার ফলে সকল প্রকার সরকারী প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষা তার নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হওয়ার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হয়।

২. বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে শিক্ষা আয়-উপার্জনের পন্থা বলে যে ধারণা জন্ম নিয়েছিল তার বিপরীতে কেবল জ্ঞান আহরণের জন্য এবং ব্যক্তিক উৎকর্ষ ও নৈতিক উন্নতির জন্য শিক্ষা অর্জন করতে হবে এরূপ একটি দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার মহত্মকে তুলে ধরা এবং শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যকে একটি সুন্দরখাতে প্রবাহিত করার জন্য এ প্রতিষ্ঠানে একটি ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা হয় অর্থাৎ এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মাঝে এ চেতনাকে বদ্ধমূল করে দেওয়া হয় যে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল সঠিক জ্ঞান আহরণ করতঃ সে নিরিখে নিজের জীবনকে গড়ে তোলা এবং মহান প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে নিজেকে পরিচালিত করে তার সন্তুষ্টি লাভ করা। সনদ, সার্টিফিকেট, চাকুরী-বাকুরী আদৌ শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। ফলে এ ধারার প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকাংশেই দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত থেকেছে।

৩. সর্বশ্রেণীর ও সকল বয়সের মানুষই যাতে এ প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করতে পারে এ ধরনের একটি ব্যাপক ব্যবস্থা এ প্রতিষ্ঠানে রাখা হয় এবং সকল মত ও পথের অনুসারীরাই যাতে এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করতে পারে এতটুকু উদার ব্যবস্থা রাখা হয়।

৪. ছাত্রদেরকে ক্লাস ভিত্তিক পাঠদানের পাশাপাশি পরীক্ষা গ্রহণের কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে প্রতিযোগিতামূলক লেখাপড়ার দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং অল্প সময়ে অনেক ছাত্রকে শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৫. সনদ প্রদানের ধারা প্রবর্তন করা হয়। এতে ছাত্রদের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধিপায় ও শিক্ষার একটি মান সূচিত হয়। তাছাড়া সমাজও প্রকৃত আলেমদেরকে সনাক্ত করতে সামর্থ হয়।

৬. ছাত্রদের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতামূলক লেখাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কৃতি ছাত্রদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা হয়।

৭. সিলেবাসে দ্বীনী বিষয়াসূরে প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ এবং পঠিত ও অর্জিত বিষয়ের উপর আমল করার ব্যাপারে নিয়মিত তরবিয়্যত ও প্রশিক্ষণ দান

করা হয় এবং আমল আখলাকের প্রতি অধিক গুরুত্ব দানের ফলে আদর্শবান, বা-আমল, দীনদার, নৈতিক মানোত্তীর্ণ শিক্ষার্থী তৈরির পথ সুগম হয়।

৮. পাঠ্যাবস্থায় অর্থনৈতিক চাপ যাতে ছাত্রকে বিব্রত না করে এবং তার অধ্যয়ন তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে, তাছাড়া গরীব অসহায় ছাত্ররা যাতে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয়ে যায় এজন্য ছাত্রদের যাবতীয় ব্যায়ভার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বহন করার এক অভিনব পন্থা ও এ প্রতিষ্ঠানে চালু করা হয়।

৯. জীবিকার প্রয়োজনে শিক্ষা সমাপনের পর এ প্রতিষ্ঠানের সনদ প্রাপ্তরা যাতে আদর্শ বিক্রি করতে বাধ্য না হয়ে পড়ে এবং জীবন সমস্যায় হাবুডুবু না খায় এজন্য উপযোগী কারীগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও এ প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়।

১০. সামর্থবানরা যাতে উচ্চতর গবেষণামূলক শিক্ষা লাভে ব্রতী হতে পারে; এবং গবেষণার মাধ্যমে যুগ-সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে পারে এজন্য উচ্চতর গবেষণামূলক শিক্ষার সুব্যবস্থা করা হয়।

মূলতঃ সময়ের প্রেক্ষিতে এগুলো ছিল অভিনব প্রয়াস। আর এরূপ একটি শিক্ষাব্যবস্থা ও সুষ্ঠু পরিচালনানীতি অবলম্বনের ফলে অতি অল্প দিনে এ শিক্ষা ধারা ভারত বর্ষের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। এমন কি এশিয়া মহাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে বর্তমানে ইউরোপ আমেরিকাতেও এ শিক্ষা ধারার অনুকরণে গড়ে উঠেছে হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান। যেখান থেকে খালেছ দ্বীনী শিক্ষা লাভ করছে অসংখ্য তালিবে ইলম। যারা সারা দুনিয়ায় নিঃস্বার্থভাবে সহীহ দ্বীনের তরজমান হিসাবে খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে।

উসূলে হাশতগানাহ্ ও
বর্তমান প্রেক্ষাপটে তার কার্যকরিতা

উসূলে হাশতগানাহ-এর রচয়িতা ঃ

মহান শিক্ষা-সাধক ও সংস্কারক কাসেমুল উলূম ওয়াল খায়রাত হযরত কাসেম নানুতুবী রাহ. পরাধীন ভারতে ধ্বসে পড়া ইসলামী শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার মহান লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে গণ-চাঁদার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। সময় ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে সে ধারাকে সুশৃঙ্খলভাবে টিকিয়ে রাখা এবং তার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এ সকল দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ করে দারুল উলূম দেওবন্দের জন্য তিনি তাঁর বিদগ্ধ চিন্তার আলোকে কতিপয় মূলনীতি প্রবর্তন করেছিলেন। ইতিহাসে এই মূলনীতিগুলোই 'উসূলে হাশত গানাহ' বা 'মূলনীতি অষ্টক' নামে পরিচিত। রচয়িতা তাঁর দূরদর্শীতা ও বিচক্ষণতার আলোকে এবং সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয় অনুদানের প্রাচীন ধারার পরিবর্তে গণ-চাঁদার বিষয়টির প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। সেই নীতিমালায় তিনি একথাও উল্লেখ করেছেন যে, যে কোন দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের জন্য মৌলিকভাবে এসকল নীতিমালাকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করতে হবে।

মূলনীতি অষ্টক ঃ

১. যথাসম্ভব মাদ্রাসার কর্মচারী ও কর্মকর্তাদেরকে অধিক হারে চাঁদা আদায়ের বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজেও এর জন্য চেষ্টা করতে হবে, অন্যের মাধ্যমেও চেষ্টা করাতে হবে। মাদ্রাসার হিতাকাঙ্খীদেরও এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

২. যেভাবেই হোক মাদ্রাসার ছাত্রদের খানা চালু রাখতে হবে বরং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে মাদ্রাসার হিতাকাঙ্খী ও কল্যাণকামীদের সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

৩. মাদ্রাসার উপদেষ্টাগণকে মাদ্রাসার উন্নতি, অগ্রগতি এবং সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার দিকে সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার একগুঁয়েমী যাতে কারো মাঝে সৃষ্টি না হয় এদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। আল্লাহ না করুন যদি এমন অবস্থা দেখা দেয় যে, উপদেষ্টাগণ স্ব-মতের বিরোধিতা কিংবা অন্যের মতামতের সমর্থন করার বিষয়টি সহনশীলভাবে গ্রহণ করতে না পারেন; তাহলে এ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিমূল নড়বড়ে হয়ে পড়বে। আর যথাসম্ভব মুক্ত মনে পরামর্শ দিতে হবে এবং তার অগ্রপশ্চাতে মাদ্রাসার শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টি লক্ষণীয় হতে হবে। স্বমত প্রতিষ্ঠার মনোবৃত্তি না থাকতে হবে। এ জন্য পরামর্শ দাতাকে মতামত প্রকাশের

ক্ষেত্রে তার মতামত গ্রহণীয় হওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই আশাবাদী না হতে হবে। পক্ষান্তরে শ্রোতাদেরকে মুক্তমন ও সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তা শ্রবণ করতে হবে। অর্থাৎ এরূপ মনোবৃত্তি রাখতে হবে যে, যদি অন্যের মত যুক্তিযুক্ত ও বোধগম্য হয়, তাহলে নিজের মতের বিপরীত হলেও তা গ্রহণ করে নেওয়া হবে। আর মুহতামিম বা পরিচালকের জন্য পরামর্শ সাপেক্ষে সম্পাদনীয় বিষয়ে উপদেষ্টাগণের সাথে পরামর্শ করে নেওয়া অবশ্যই জরুরী হবে। তবে মুহতামিম নিয়মিত উপদেষ্টাদের থেকেও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন কিংবা তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত এমন কোন বিদগ্ধ জ্ঞানী আলেম থেকেও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন যিনি সকল দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের জন্য হিতাকাঙ্খী ও কল্যাণকামী। তবে যদি ঘটনাক্রমে উপদেষ্টা পরিষদের সকল সদস্যদের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ না হয় এবং প্রয়োজন মাফিক উপদেষ্টা পরিষদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যের সাথে পরামর্শ ক্রমে কাজ করে ফেলা হয়, তাহলে কেবল এজন্য অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত হবে না যে 'আমার সাথে পরামর্শ করা হল না কেন'? কিন্তু যদি মুহতামিম কারো সঙ্গেই পরামর্শ না করেন তাহলে অবশ্যই উপদেষ্টা পরিষদ আপত্তি করতে পারবে।

৪. মাদ্রাসার সকল মুদাররিসীনকে অবশ্যই সমমনা ও একই চিন্তাচেতনার অনুসারী হতে হবে। সমকালীন (দুনিয়াদার) আলেমদের ন্যায় নিজ স্বার্থ প্রতিষ্ঠা ও অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত না হতে হবে। আল্লাহ না করুন যদি কখনো এরূপ অবস্থা দেখা দেয়, তাহলে মাদ্রাসার জন্য এটি মোটেই শুভ ও কল্যাণকর হবে না।

৫. পূর্ব থেকে যে পাঠ্যসূচী নির্ধারিত রয়েছে কিংবা পরবর্তীতে পরামর্শের ভিত্তিতে যে পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করা হবে তা যাতে সমাপ্ত হয়; এই ভিত্তিতেই পাঠদান করতে হবে। অন্যথায় এ প্রতিষ্ঠান সুপ্রতিষ্ঠিতই হবে না, আর যদি হয়ও তবু তা ফায়দা জনক হবে না।

৬. এ প্রতিষ্ঠানের জন্য যতদিন পর্যন্ত কোন স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হবে; ততদিন পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার শর্তে তা এমনিভাবেই চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু যদি স্থায়ী আয়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যেমন কোন জায়গীর লাভ, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, মিল ফ্যাক্টরী গড়ে তোলা, কিংবা বিশ্বস্ত কোন আমীর উমরার অনুদানের অঙ্গিকার ইত্যাদি- তাহলে এরূপ মনে হচ্ছে যে আল্লাহর প্রতি ভয় ও আশার দোদুল্যমান অবস্থা; যা মূলতঃ আল্লাহ অভিমুখী হওয়ার মূল পুঁজি, তাই হাত ছাড়া হয়ে যাবে এবং গায়েবী সাহায্যের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। তদুপরি প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও কর্মচারীগণের মাঝে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও কলহ বিবাদ দেখা দিবে। বস্তুতঃ আয়-আমদানী ও গৃহাদি নির্মাণের বিষয়ে অনেকটাই অনাড়ম্বরতা ও উপায় উপকরণহীন অবস্থা বহাল রাখার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

৭. সরকার ও আমীর উমরাদের সংশ্লিষ্টতাও এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে বলে মনে হচ্ছে।

৮. যথা সম্ভব এমন ব্যক্তিদের চাঁদাই প্রতিষ্ঠানের জন্য অধিক বরকতময় হবে বলে মনে হচ্ছে; যাদের চাঁদাদানের মাধ্যমে সুখ্যাতি লাভের প্রত্যাশা থাকবে না। বস্তুতঃ চাঁদা দাতাগণের নেক নিয়ত প্রতিষ্ঠানের জন্য অধিক স্থায়ীত্বের কারণ হবে বলে মনে হয়।

হজরত মাও. কারী তাইয়্যিব রাহ. এই আটটি মূলনীতির অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন, যা 'আজাদীয়ে হিন্দ কা খামোশ রাহনূমা" (ভারত স্বাধীনতার নীরব পথ প্রদর্শক) নামে একটি পৃথক পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

আজ থেকে নিয়ে শত বৎসর পূর্বে পরাধীন ভারতের মুসলিম ও ইসলামী শিক্ষার ধ্বংস সাধনে তৎপর সরকারের মুকাবেলায় নিষ্কণ্টকভাবে ইসলামী শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার এবং পরাধীনতার গ্লানিতে মুসলিম জাতির মৃত চেতনাকে পুনঃ জাগরিত করার এই যে নীরব কর্মকাণ্ড হযরত নানুতুবী রাহ. শুরু করেছিলেন এবং ইংরেজ সরকারের শ্যেন দৃষ্টির মাঝেও প্রতিষ্ঠানগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য তিনি যে মূলনীতিগুলো পেশ করেছিলেন, তাকে হয়ত তাঁর অসাধারণ দূরদর্শীতা বলতে হবে, নচেৎ তাকে ইলহামী বিষয় বলতে হবে। এই নীতিমালার মাঝে সময়ের প্রেক্ষাপটে যে অসীম দূরদর্শীতা ও দার্শনিক বিচক্ষণতা সন্নিহিত রয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে গেলে মোটা একটি পুস্তিকা হয়ে যাবে। খিলাফত আন্দোলনের তৎপরতা চলা কালে মাও. মুহাম্মদ আলী জাওহার দারুল উলূমে এসেছিলেন। তিনি এই 'উসূলে হাশতগানাহ' পড়ে চোখ দিয়ে পানি ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তির সাথে এসব মূলনীতির কিইবা সম্পর্ক, এগুলোত নিরেট ইলহাম ও মারিফাতের প্রস্রবণ থেকে উৎসারিত চিন্তা। আশ্চর্যের বিষয় যে, শত বৎসর পর অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে আমরা এসে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি; এই বুজুর্গ শত বৎসর পূর্বেই তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে তার কার্যকরিতা ঃ

পরাধীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর রোষানলে পড়ে লয়প্রাপ্ত ইসলামী শিক্ষাধারাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য হযরত নানুতুবী রাহ. কর্তৃক প্রণীত; দিক নির্দেশনামূলক এই নীতিমালা যে মৃতসঞ্জিবনীবৎ ছিল একথা বলাই বাহুল্য। আর এ নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলো ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের সঠিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা বিস্তার, তাহযীব ও তামাদ্দুনের সংরক্ষণ, কুসংস্কার উচ্ছেদ, দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে দ্বীনি পরিবেশ গঠন, আযাদী আন্দোলনের পটভূমি তৈরী, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যে অসামান্য অবদান রেখেছে, তার খতিয়ান তৈরী করলেই এসব নীতিমালার সুফল সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তবু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এসকল নীতিমালা পরাধীনতার অক্টোপাশে বন্দীদশার শিকার হয়ে অর্থনৈতিক দৈন্য ও এক চরম অসহায় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রচনা করা হয়েছিল। কালের প্রেক্ষিতে তার তাৎপর্য যত গভীরই হোক এবং তার ফলাফল যত ব্যাপক ও বিস্তৃতই হোক; সর্বকালেই যে সেগুলো তেমনি আবেদনশীল থাকবে তা নাও হতে পারে। পরাধীনতার আতঙ্কময় পরিস্থিতিতে যা নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে; স্বাধীন মুক্ত জীবনও তা অপরিবর্তনীয় রূপে আঁকড়ে থাকতেই হবে এমন কোন কথা নয়।

সুতরাং আজকের পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে সেগুলো পুনঃমূল্যায়ন করে দেখতে দোষ কি? বরং যুগ ও পরিবেশের পরিবর্তনের নিরিখে সে সকল ধারার কার্যকারিতা কতটুকু অবশিষ্ট আছে এবং বর্তমানের চাহিদার আলোকে আমাদের শিক্ষাধারার জন্য সেগুলো কতটুকু উপযোগী তা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখাই সময়ের দাবী।

সরকারী অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার কারণে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থনৈতিক দৈন্যের শিকার হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বললেই চলে, তাছাড়া সরকারী অনুদানে পরিচালিত আলিয়া মাদ্রাসাসমূহের উপর সরকারী হস্তেক্ষেপের ফলে সেগুলো দ্বারা ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশের সম্ভাবনা ছিল খুবই ক্ষীণ। ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী পরপর ২৬ জন খ্রীস্টান প্রিন্সিপাল যেখানে আলিয়া মাদ্রাসার পরিচালনায় থেকেছেন, সেখানে একেশ্বরবাদী মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি ও পরাধীন জাতির মাঝে স্বাধীনতার চেতনা উজ্জীবিত করার জন্য তা কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে তা ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন রাখে না। এমতাবস্থায় মুসলমানদের স্বকীয় শিক্ষাধারাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে সরকারী অনুদান গ্রহণ করার কোন অর্থ হয় না। আবার শিক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে জাতিকে অশিক্ষা ও কুশিক্ষার অন্ধকারে হারিয়ে যেতেও দেওয়া যায় না। একারণেই সে মূলনীতিতে গণ-চাঁদার বিষয়টির উপর অধিক গুরুত্বারোধ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ একই কারণে সরকার ও আমীর উমরাদের অংশ গ্রহণকেও প্রতিষ্ঠানের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া গণজাগরণ সৃষ্টির জন্য গণসংযোগ ছিল একান্ত অপরিহার্য; একারনেও জনগণের চাঁদার উপর গুরুত্ব দেওয়া ছিল সময়ের দাবী। এ পন্থায় সরকারের দৃষ্টি এড়িয়ে জনগণের সাথে যোগাযোগ করা ছিল একটি নিরাপদ উপায়। কিন্তু গণ-চাঁদার এই ধারাকে চিরদিন অবিকল অব্যাহত রাখতে হবে এর কোন অর্থ নেই। এদেশে বহু স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সরকারের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হচ্ছে। এমনকি ইউনিভার্সিটিগুলো স্বায়ত্ব শাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়েও সরকারি অর্থানুকূল্য পাচ্ছে। অথচ স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে আমরা কেন পাব না এই অর্থনৈতিক সুবিধা? সরকার তার মত চাপিয়ে দেবে এই ভয়ে আমরা আমাদের প্রাপ্য নাগরিক অধিকারটুকুর দাবি জানাতেও নারাজ।

কেন? ইউনিভার্সিটির শিক্ষা সিলেবাস ও তার প্রশাসনিক নীতিতে কি সরকার হস্ত ক্ষেপ করতে পারে? আমরা হয়তো তাও জানি না।

মুসলিম বিদ্বেষী সাম্রাব্যবাদী শাসক গোষ্ঠী মুসলমানদেরকে সকল দিক থেকে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য সব ধরনের চেষ্টা চালাতে মোটেও কার্পণ্য করেনি। মুসলমানদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া ছিল তখন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অচল করে দেওয়ার দূরভিসন্ধিতেই তারা ইতিপূর্বে সকল ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল। সুতরাং এমতাবস্থায় মাদ্রাসার জন্য কোন স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করার অর্থ ছিল ইংরেজদের কোপ দৃষ্টিতে নিপতিত হওয়া। অর্থলিপ্সু ইংরেজরা স্থায়ী আয়ের উৎসের সন্ধান পেলে তা বাজেয়াপ্ত করতে কালবিলম্ব করবে না। ফলে আবার বন্ধ হয়ে যাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। সম্ভবত স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করতে নিষেধ করার পেছনে এটিও একটি কারণ ছিল। অবশ্য তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ-এর যে বিষয়টি সে ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে তা আংশিক স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করার পরও বহাল তবিয়তে বিদ্যমান থাকে। তাছাড়া স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থীও নয়। আজকের যুগ-মানসিকতার আলোকে একান্ত সাহায্য নির্ভর হওয়ার অর্থ; মানুষের দৃষ্টিতে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বকে হালকা করে দেওয়া। তদুপরি তখন মানুষ যতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ সকল প্রতিষ্ঠানে দান করার জন্য আগ্রহী ছিল; বর্তমানে সে অবস্থা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে বরং এখন আলেম উলামাদের যথেষ্ট লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করেই চাঁদা আদায়ের জন্য ধনীদের দ্বারস্থ হতে হয়। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানও দিন দিন বাড়ছে, ফলে চাঁদার চাপও বাড়ছে। আরও অনেক ধরনের স্বার্থান্বেষী চাঁদাবাজও সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে। ফলে চাঁদার বিষয়টি ক্রমান্বয়েই স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়ে ফেলছে। আমাদের তাওয়াক্কুলও বস্তুবাদী সভ্যতার চাপে আগের তুলনায় অনেক খানি হ্রাস পেয়েছে। এমতাবস্থায় কিছু স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করে, আর কিছুটা তাওয়াক্কুলের জন্য রেখে দিলে (যদি তা শরীয়তের পরিপন্থী না হয়) ঐ মূলনীতিরও কিছুটা রক্ষা হল, আর আমরাও লাঞ্ছনার হাত থেকে অনেকটা রেহাই পেলাম। ইসলামী শিক্ষাও হয়ত এ পন্থায় অনেকখানি গুরুত্ববহ হয়ে উঠবে। ধনবানদের দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়ে তাদেরকে অনুদানের ভিত্তিতে পরিচালনা কমিটির অন্তর্ভুক্ত করে ক্রমান্বয়ে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি, তাও ভেবে দেখা উচিৎ নয় কি? এতে কি আট মূলনীতির একটি ধারা লঙ্ঘিত হচ্ছে না? যারা চাঁদা দিয়ে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় কিংবা সুনাম সুখ্যাতি কুঁড়াতে চায় এমন লোকের চাঁদা কি আমরা গ্রহণ করছি না? এধরনের ব্যক্তিদের চাঁদা গ্রহণ না করার কথাও কিন্তু সেই মূলনীতিতে উল্লেখ রয়েছে। তাহলে আংশিক স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে দোষ কি?

তবে সেই মূলনীতিগুলোতে কিছু কিছু ধারা এমনও রয়েছে যা আগের চেয়ে এখন

আরও বেশি ফলপ্রসূ প্রমাণিত হবে। যেমন ছাত্রদের আবাসিক সুবিধা, আহার্যের ব্যবস্থা, শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ এগুলো আগের তুলনায় এখন আরো বেশী প্রয়োজন। সিলেবাস পূর্ণ করার যে ধারাটি রয়েছে তার গুরুত্ব এখনও সমানভাবে বিদ্যমান। কিন্তু যেখানে সে ধারাতেই উল্লেখ রয়েছে যে, বর্তমানে যে সিলেবাস নির্ধারিত রয়েছে কিংবা পরে পরামর্শক্রমে যে সিলেবাস নির্ধারণ করা হবে তা অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু যুগ চাহিদার প্রশ্নে সিলেবাস নবায়নের বিষয়টি নিয়ে আমরা আদৌ কি কোন চিন্তা করছি? অথচ এ বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন এখন অনেক বেশী।

যদিও এ সিলেবাসের উদ্দেশ্যের কথা ক্বারী তাইয়্যিব রাহ. এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, 'এর উদ্দেশ্য ছাত্রদের মাঝে জ্ঞান আহরণের যোগ্যতা সৃষ্টি করা, সব বিষয়ের জ্ঞান দান করা নয়।' তবু সময়ের প্রয়োজনে যদি কোন পরিবর্তনের বা সংযোজনের প্রয়োজন হয়; তাহলে তা নিয়ে আমাদের ভাবতে অসুবিধা কোথায়? আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, হযরত নানুতুবী রাহ. পূর্বপ্রচলিত সিলেবাসে সময়ের চাহিদা অনুসারে সংস্কার করেই দারুল উলূমের নেসাব তৈরি করেছিলেন। আর সময়ের চাহিদা পূরণ করে নেসাব তৈরি করেই তিনি ইতিহাসের সফল ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

তাই বলতে হয়, আমরা সময় ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ সকল মূলনীতির সবগুলোই পুর্ণাঙ্গভাবে মানতে পারছি না। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তা লঙ্ঘিত হয়েই যাচ্ছে। অত:এব সুস্থির চিন্তার আলোকে এগুলোর কার্যকারিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতঃ একটি সুস্পষ্ট গতিপথ নির্ধারণ করা উচিৎ বলে আমরা মনে করি।

চতুর্থ অধ্যায়

উলামায়ে দেওবন্দের অবদান

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই শিক্ষাধারাকে অনুসরণ করে ইসলামী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল, তা কেবলমাত্র শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং উপমহাদেশের মুসলিম উম্মার জীবন ধারার সামগ্রিক দিক তথা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক, এবং সুস্থ চিন্তাভাবনার বিকাশ, দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা তাঁদের অবদানের দিকগুলোকে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি মৌলিক শিরোনামের অধীনে আলোচনা করছি। তাঁদের অবদানগুলোর মৌলিক দিক বিচারে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

১. ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে তাঁদের অবদান।
২. ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান
৩. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান।
৪. সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান।
৫. ইসলামের প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান।
৬. বাতিল ও কুসংস্কার প্রতিরোধে তাঁদের অবদান।

১. ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে তাঁদের অবদান ঃ

ক. অভিনব শিক্ষাধারার প্রবর্তন ঃ

প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা ধর্মীয় শিক্ষার অতি প্রাচীন ধারার সংস্কার করতঃ তদস্থলে একটি আধুনিক, সর্বজনীন ও সংস্কার মূলক শিক্ষাধারার প্রবর্তন করেছেন উলামায়ে দেওবন্দ। যে শিক্ষাধারায় শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য রাখা হয়েছে শিক্ষার্থীর নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ, আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শ সম্পর্কে অবগতি লাভ, শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়া, হক ও বাতিলের পার্থক্য নিরূপণ এবং আহরিত জ্ঞানের আলোকে নিজের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পুনর্গঠনের মাধ্যমে নিজেকে সুশীল, পরিমার্জিত ও আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে পরকালীন সফলতা লাভ করা। এ শিক্ষা ধারায় শিক্ষাকে আয়-উপার্জনের উপায় হিসাবে চিন্তা করার কোনই অবকাশ রাখা হয়নি, যে কারণে শিক্ষার্থীরা নৈতিক উৎকর্ষ লাভেই একান্তভাবে ব্রতী হয় এবং আহরিত জ্ঞানের আলোকে নিজের জীবন গঠনের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। ফলে এ শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক মানোত্তীর্ণ আদর্শ মানুষ তৈরি করা সম্ভব হয়। অবশ্য প্রয়োজনীয় পার্থিব

জ্ঞান যাতে একজন শিক্ষার্থী আহরণ করতে পারে তার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে এ শিক্ষা ধারায়; যাতে একজন শিক্ষার্থী নিজ জীবনের নিত্য দিনের প্রয়োজনগুলো অনায়াসেই মিটাতে পারে। তবে শিক্ষাকে অর্থ উপার্জনের উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করার পর্যায়ে পার্থিব জ্ঞান আহরণের ব্যবস্থা এ শিক্ষা ধারায় নেই। যে কারণে অনেকেই এ শিক্ষা ধারাকে অথর্ব বলে মনে করেন। আসলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক চিন্তাই এহেন ধ্যান-ধারণার মূলে কাজ করে। যারা শিক্ষাকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অর্জন করেন, ব্যবসায়ী উপায় বলে মনে করেন তারাই মূলতঃ এ শিক্ষাকে অর্থহীন বলে মন্তব্য করেন।

খ. যুগসম্মত সিলেবাস প্রবর্তন ঃ

এ শিক্ষা ধারার জন্য এমন একটি যুগসম্মত ও সামগ্রিক সিলেবাসও তৈরি করা হয়েছে, যে সিলেবাস অধ্যয়ন করলে একজন শিক্ষার্থীর মেধা এভাবে বিকশিত হয় যে, তার জন্য যে কোন অজানা বিষয়ের জ্ঞান আহরণের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। তাছাড়া এ শিক্ষাধারার জন্য নির্বাচিত সিলেবাস এতটাই সর্বজনীন করে তৈরি করা হয়েছে যে, মুসলিম মিল্লাতের যে কোন মাজহাব ও ফিরকার লোকের জন্যই এ সিলেবাসের আওতায় অধ্যয়ন ও জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব।

গ. শিক্ষা সম্প্রসারণ ঃ

এ শিক্ষাধারার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও উলামায়ে দেওবন্দের তৎপরতা প্রশংসনীয়। মাত্র একশত বৎসরের স্বল্প সময়ে এ শিক্ষাধারা উপ-মহাদেশের আনাচে কানাচে এমনকি উপমহাদেশের বাইরে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। সরকারী সাহায্য সহযোগিতা ও কোন রূপ পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই যে এ ব্যাপক শিক্ষা মিশন এত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এটা তাদের কর্মতৎপরতার এক জ্বলন্ত স্বাক্ষর। বলতে গেলে উলামায়ে দেওবন্দ এ শিক্ষার বিস্তার ও সম্প্রসারণের বিষয়টিকে একটি আন্দোলন হিসাবেই গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে এ ধারার প্রায় ৫,০০০ পাঁচ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে; তাছাড়া প্রতিটি গ্রামে গ্রামে ও মসজিদে মসজিদে গড়ে উঠা মক্তবের সংখ্যা ৬০ হাজারেরও অধিক হবে। এগুলোও তাঁদের অবদানেরই ফসল। শিক্ষা বিস্তারকে সহজতর করার জন্য পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহকে সহজ ও সুবিন্যস্ত করণের জন্য তাঁরা অসংখ্য পাঠ্যপুস্তক, ভাষ্যগ্রন্থ ও টিকা রচনা করেছেন।

ঘ. সংস্কৃতির বিকাশ ও লালন ঃ

শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশেও তাঁদের অবদান অপরিসীম। বহুজাতি ও ধর্মের মানুষের আবাসভূমি এই ভারতবর্ষ। বিভিন্ন সংস্কৃতির ভাবধারায় গড়ে উঠেছিল এখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবন। এই বহুবিধ সংস্কৃতির মাঝে ইসলামী সংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করার পিছনে উলামায়ে দেওবন্দের অবদানই সবচেয়ে বেশী। বিশেষ করে হিন্দু সংস্কৃতির

প্রভাব থেকে মুসলমানদের রক্ষার জন্য তারা ইসলামের সাংস্কৃতিক জীবনের রূপরেখা ওয়াজ-নসীহত, পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির পুর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটিয়ে তারা সমাজকে এই সংস্কৃতির প্রতি নিরব আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তারা সমাজকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে রাসূল সা. এর কর্মময় জীবনই হল ইসলামী সংস্কৃতির উৎস। সুতরাং সুন্নাতে নববীর অনুসরণের মাধ্যমে যে সাংস্কৃতিক ভাবধারা প্রতিমূর্ত হয় মুলতঃ তাই বিশুদ্ধ ও নির্মল সংস্কৃতি এবং এর বাস্তবায়নের মাঝেই নিহিত রয়েছে পরকালীন সফলতা। একারণে দেওবন্দী ভাবধারার প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা জীবনেই সুন্নতে নববীর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের প্রশিক্ষণ ও অনুপ্রেরণা দেওয়া হয় এবং তা মেনে চলার জন্য জোর তাকিদ করা হয়। ফলে এ সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্তদের মাঝ থেকে এমন বহু মনীষী গড়ে উঠেছেন যাদের প্রত্যেকেই ছিলেন ইসলামী সংস্কৃতির জীবন্ত প্রতীক।

তাছাড়া হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার মানসে যে আগ্রাসী তৎপরতা চালানো হয়, উলামায়ে দেওবন্দ তার যথোপযুক্ত মুকাবেলা করেন। উগ্রপন্থী হিন্দুরা শুদ্ধি আন্দোলনের নামে যে সংগঠন গড়ে তোলে তার উস্কানীতে হিন্দুরা মসজিদের অবমাননা করার দুঃসাহস দেখাতে শুরু করে, তারা মসজিদের সামনে দিয়ে পূজার মূর্তি বহন করে নেওয়ার সময় উচ্চরবে গান বাদ্য বাজাতে বাজাতে জয়ধ্বনি দিয়ে যেত, আবার মুসলমানদের গরু কুরবানী করতে বাধা প্রদান করা হত। এ ছাড়াও মুসলমানদের উপর নানা ধরনের নিগ্রহ চালানো হত। এহেন প্রেক্ষিতে উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে উত্তেজনা ক্রমেই চরমে পৌছাতে থাকে। এ সময় হিন্দু নেতৃবৃন্দ এর প্রতিবিধানে কোন সন্তোষজনক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। উলামায়ে দেওবন্দ দ্বীনের হিফাযতের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং মুসলমানদেরকে অপপ্রচারে কান না দিয়ে ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে পরিস্থিতির মুকাবেলা করার জন্য আহ্বান জানান। এ সময় ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা জন সমক্ষে তুলে ধরার জন্য বহু বই পুস্তক ছাপিয়ে ছাড়া হয়। ১৯২৯ খ্রীঃ সারদা এ্যাক্টের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ (যা মুলতঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ) নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে ওলামায়ে দেওবন্দ এর তীব্র বিরোধিতা করে এবং আইন অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম উম্মাহকে সঠিক দিক নির্দেশনা দান উলামায়ে দেওবন্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যে কারণে যখনই ইসলামী শরীয়ত বিরোধী, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিরোধী কোন কিছু পরিলক্ষিত হয়েছে তখনই উলামায়ে দেওবন্দ তা প্রতিহত করতঃ সঠিক ইসলামী মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। দেশে বিদেশে ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার প্রসার, এদেশীয় ভাষাসমূহে ইসলামী ভাবধারা সৃষ্টি, জন-জীবনে ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতির বাস্তবায়নে তাঁদের অবদান অবিস্মরণীয়।

২. ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান ঃ

দারুল উলূম প্রতিষ্ঠাত্তোর কালে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা হয়। এক্ষেত্রে তাঁদের অবদানগুলোকে নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত করা যায়।

ক. হাদীস শাস্ত্রে তাঁদের অবদান।
খ. তাফসীর শাস্ত্রে তাঁদের অবদান।
গ. ফিকাহ্ শাস্ত্রে তাঁদের অবদান।
ঘ. দর্শন ও আকাইদ শাস্ত্রে তাঁদের অবদান।
ঙ. সীরাত ও ইতিহাস শাস্ত্রে তাঁদের অবদান।
চ. তাসাউফ ও মনস্তত্বে তাঁদের অবদান।
ছ. ভাষা ও সাহিত্যে তাঁদের অবদান।

ক. হাদীস শাস্ত্রে তাঁদের অবদান ঃ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাদশাহ আকবরের আমলে ইরানী আলেমদের প্রভাবে এদেশের শিক্ষা ধারায় গ্রীকদর্শন ও তর্কশাস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে কুরআন সুন্নাহর পরিবর্তে ঐ সকল বিষয় তখন অধিক গুরুত্বের সাথে পড়ানো হত। এতে শিক্ষার্থীরা কুরআন ও হাদীসের বিশুদ্ধ ইলম থেকে বঞ্চিত থেকে যেত। দারুল উলূম দেওবন্দ তার শিক্ষাধারায় কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান আহরণকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। এর ফলে হাদীস শাস্ত্র ও তাফসীর যথা মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। এ শিক্ষাধারায় হাদীস শাস্ত্রের প্রাজ্ঞতাকে যোগ্যতার মানদণ্ড হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যে কারণে শিক্ষার্থীরা হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করে, ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে হাদীস শাস্ত্রে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা হয়। হাদীস শাস্ত্রের প্রয়োজনে রিজাল শাস্ত্রের গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়। এ দেশীয় মুহাদ্দিসগণের গবেষণার ফলে হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বহু নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়। বহু খ্যাতনামা মুহাদ্দিস তৈরী হয়। যারা এ শাস্ত্রে আসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। এ সকল মুহাদ্দিসগণের প্রচেষ্টায় হাদীস শাস্ত্রে বহু মৌলিক গ্রন্থ সংকলিত হয়, ভাষ্যগ্রন্থ ও টিকা রচিত হয়।

তাঁদের রচিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থ ঃ তরজমানুস্‌সুন্নাহ, বাদরে আলম মিরাঠী কৃত, মা'আরিফুল হাদীস, মাও. মঞ্জুর নু'মানী কৃত, যাদুত্ তালেবীন মাও. আশেকে ইলাহী বুলন্দশহরী কৃত।

তাছাড়া অনেকেই আপন যাওক অনুসারে চল্লিশ হাদীসের সংকলন তৈরি করেছেন।

টিকা ও ভাষ্যগ্রন্থ ঃ বুখারী শরীফের টিকা, হযরত কাসিম নানুতুবী কৃত যা এখন পর্যন্ত বুখারী শরীফের সাথে মুদ্রিত হয়ে থাকে। হযরত মাও. হায়াত সাম্ভলী রহ.

কৃত আবুদাউদ শরীফের টিকা। ভাষ্যগ্রন্থের মাঝে লামিউদ্দারারী, কাউকাবুদ্দুররী, ফয়জুল বারী, বজলুল মজহুদ, আনওয়ারুল বারী, ফতহুল মুলহীম, ফজলুল বারী, মা'আরিফুস সুনান, আওজাযুল মাসালিক, তা'লীকুস, সাবীহ, আমানিউল আহবার, এ'লাউস সুনান, আল আবওয়াব ওয়াত তারাজিম, তাকরীরে তিরমিযী, তানজীমুল আশতাত, মা'আরিফে মদনী, ঈযাহুল বুখারী, আমানিউল হাজাহ্, তাকমিলায়ে ফতহুল মুলহীম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও ছোট বড় অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে যার সংখ্যা প্রায় শতাধিক হবে।

হাদীস সংকলন, হাদীস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস ও হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা ইত্যাদি বিষয়ের উপরও উলামায়ে দেওবন্দের রচিত বহু গ্রন্থ রয়েছে, তন্মধ্যে মানাজির আহসান গিলানী কৃত 'তাদবীনে হাদীস', আব্দুর রশীদ নো'মানী কৃত 'মা তামুসসু ইলাইহিল হাজাজ', মুফতি আমীমুল ইহসান কৃত তারিখে তাদবীনে হাদীস, মালিবাগ জামিয়ার গবেষণা বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'হাদীস শাস্ত্র ও তার ক্রমবিকাশ' মালিবাগ জামিয়ার কৃতি ছাত্র মাও. আব্দুল মতিন রচিত 'আদ দুরারুস সামীনাহ' অধম কর্তৃক রচিত 'হাদীস অধ্যায়নের মূলনীতি' ইত্যাদি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া হাদীসের ইনডেক্স জাতীয় গ্রন্থও উলামায়ে দেওবন্দ কর্তৃক রচিত হয়েছে, মাও. হাবীবুল্লাহ মুখতার রচিত 'আল-ইমামুত তিরমিযী' এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

খ. ইলমে তাফসীরে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান ঃ

আল-কুরআন হল ইসলামের মূলমন্ত্র, আর এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকেই তাফসীর বলা হয়। কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আলোকেই প্রতি যুগে উদ্ভূত নতুন সমস্যার ইসলামী সমাধান খুঁজে বের করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের যে ধারা চলে আসছিল তা অব্যাহত থাকলেও ভারতবর্ষে এধারার সূচনা হয় অনেক পরে। বস্তুত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. প্রণীত ফতহুর রহমান, তরজমায়ে শায়খুল হিন্দ (টিকা আকারে সংক্ষিপ্ত তাফসীরসহ)। ইদ্রিস কান্দলভী প্রণীত মা'আরিফুল কুরআন, মুফতী শফী প্রণীত মা'আরিফুল কুরআন, আল্লামা কাশমিরী প্রণীত মুশকিলাতুল কুরআন, হযরত থানভী রহ. প্রণীত বায়ানুল কুরআন, মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী প্রণীত তরজমা, (টিকা আকারে সংক্ষিপ্ত তাফসীরসহ) মাওলানা আবু তাহের বর্ধমাণী প্রণীত তাফসীরুল কুরআন বাংলা, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী প্রণীত তাফসীরে হক্কানী বাংলা, এ ছাড়াও আরো বহু তফসীর গ্রন্থ রয়েছে। এছাড়া প্রাচীন বৃহৎ তাফসীর গ্রন্থগুলো বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুদিত হয়েছে। বাংলাদেশ ইসলামী ফাউন্ডেশন আলেম উলামাদের সহযোগিতায় এ সকল তাফসীর গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। এগুলোর মাঝে তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে তাবারী, আহকামুল কুরআন, মা'আরিফুল কুরআন, তাফসীরে মাজহারী, তাফসীরে আশরাফীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাফসীর বুঝার জন্য উসূলে তাফসীর এবং বহু সহযোগী গ্রন্থও তারা তৈরী করেছেন। তাফসীর আওর মুফাসসেরীন, কাসাসুল কুরআন, আরদুল কুরআন, লুগাতুল কুরআন, উলূমে কুরআন, এ'যাযুল কুরআন, কুরআন আপসে কিয়া কাহতা হ্যাঁয়, আল কুরআনের নিষিদ্ধ বিষয়, ব্যবহারিক জীবনে আল কুরআন, আশ্চর্য্য এই কুরআনসহ অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা এ বিষয়ে রচিত হয়েছে।

তাছাড়া বিভ্রান্ত চিন্তার অধিকারীদের দ্বারা রচিত তাফসীরসমূহের জবাবেও বহু গ্রন্থ তাঁরা প্রণয়ন করেছেন। অনেকেই বিভ্রান্ত তাফসীরের মুকাবেলায় তাফসীর গ্রন্থই প্রণয়ন করেছেন। যেমন ছানাউল্লাহ অমৃতসরী প্রণীত 'তাফসীরে সানায়ী' কাদিয়ানীদের রদ্দে রচিত, স্যার সৈয়দ ও আব্দুল্লাহ চক্রাবলীর রদ্দে হযরত বিন্নৌরী রচনা করেছেন 'ইয়াতিমাতুল বায়ান' হযরত থানবী রহ. এর রচিত 'ইসলাহে তরজমা ও তাফসীর' 'আত তাফসীর ফিত্ তাফসীর' এ ধরনেরই দু'টি গ্রন্থ।

গ. ফিকাহ্ শাস্ত্রে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান ঃ

আইম্মাদের ফিকহী ইখতিলাফের উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষে বিভিন্ন মাজহাবের অনুসারীদের মাঝে পারস্পরিক যে বিদ্বেষ ও বৈরিতা সৃষ্টি হয়েছিল, উলামায়ে দেওবন্দ তাদের অনুসৃত উদার নীতি দ্বারা এই বৈরিতা নিরসনের বলিষ্ঠ প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। যেহেতু ইসলামী শরীয়তের ব্যবহারিক বিধান হল ফিকাহ শাস্ত্র, এ কারণে দেওবন্দী শিক্ষা সিলেবাসে ফিকাহ্ শাস্ত্রের উপর সমধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সমাজে ফিকাহ-এর মাসআলা মাসাইলের ব্যাপক প্রচার প্রসারের জন্য স্থানীয় ভাষায় বহু ফিকাহ গ্রন্থ উলামায়ে দেওবন্দ কর্তৃক রচিত হয়। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতসহ শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ের উপর পৃথক পৃথক বহু পুস্তক প্রণয়ন করা হয়। বিতর্কিত বিষয়সমূহের উপর যুক্তিপ্রমাণসহ নাতিদীর্ঘ পুস্তক প্রণয়ন করা হয়। তাছাড়া সমকালীন ও আধুনিক সমস্যাসমূহের ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার জন্য গবেষণামূলক বহু পুস্তক পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়। পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ফিকাহ গ্রন্থ, একাধিক ভাষ্যগ্রন্থ ও টীকাও রচনা করা হয়।

ফিকাহ্ শাস্ত্রে তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহ ঃ (১) আলকাওলুল কাবীর, (২) ইজাবাতুল আযান বাইনা-ইয়াদাইল খতীব, (৩) তানকীহুল মাকাল ফী তাসহীহিল ইসতিকবাল, (৪) জাওয়াহিরুল ফিকহ্ (৫) আল হিলাতুন নাজিয়্যাহ লিল্ হালীলাতুল আযিয়্যাহ, (৬) আলাতে জাদীদাহ কি শরয়ী মাসাইল, (৭) তাসবীর কি শরয়ী আহকাম, (৮) নিকাহ আওর তালাক, (৯) বেহেশতী জিওর, (১০) তা'লীমুল ইসলাম (১১) মাসাইলে মা'আরিফুল কুরআন ইত্যাদি ছাড়াও তাঁরা বহু ফিকাহ গ্রন্থ তৈরি করেছেন। উসূলে ফিকাহ্ ও ফরাইজ শাস্ত্রেও তাঁদের বহু গ্রন্থ ও ভাষ্যগ্রন্থ রয়েছে।

তাছাড়া মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার শরীয়ত সম্মত জবাবদানের জন্য পৃথকভাবে 'দারুল ইফতা' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করা তাদের

অবদানসমূহের অন্যতম এক অবদান। দারুল উলূম দেওবন্দের সূচনালগ্ন থেকেই ফতওয়া বিভাগ চালু করা হয়। তার অনুকরণে বর্তমান প্রতিটি দ্বীনি মাদ্রাসাতেই একটি করে ফতওয়া বিভাগ রয়েছে, সেখান থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ তাদের দৈনন্দিন সমস্যার শরীয়ত সম্মত সমাধান পেয়ে থাকে। শুধুমাত্র দারুল উলূম দেওবন্দের ফতওয়া বিভাগ থেকে ১৩৩০ হিঃ থেকে ১৩৯০ হিঃ পর্যন্ত সময়ে যে ফতওয়া দেওয়া হয় তার সংখ্যা ছিল ৪,১৫,৮৫৭। প্রদত্ত এই সব ফতওয়া পরবর্তীতে অধ্যায়ের নিরিখে বিন্যস্ত করে ফতওয়ার গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। এ ধরনের সংকলনের মাঝে (১) এমদাদুল ফতওয়া, (২) আযীযুল ফতওয়া, (৩) ফতওয়ায়ে দারুল উলূম, (৪) ফতওয়ায়ে রশিদিয়্যাহ, (৫) আহসানুল ফতওয়া, (৬) কিফায়াতুল মুফতী, (৭)ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়্যাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ফতওয়ার উপর প্রশিক্ষণের জন্য দারুল উলূমসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ক্লাশ চালু করা হয়। দাওয়ায়ে হাদীস ফারেগ হয়ে ছাত্ররা সেখানে ফতওয়ার উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ করে। এরাই পরবর্তীতে দেশবরেণ্য মুফতী হিসাবে সারাদেশে এই মহৎ খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে থাকে। দারুল উলূমের ফতওয়া বিভাগ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুফতীদের মাঝে হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান উসমানী রাহ., মাওলানা এ'জায আলী রাহ., মুফতী কিফায়েত উল্লাহ রাহ. , মুফতী মাহমুদ রাহ. (পাকিস্তান), মুফতী শফী রাহ., সাইয়্যিদ মাহদী হাসান রাহ., মুফতি তাজুল ইসলাম রাহ. মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ রাহ. মুফতী আ'মীমুল ইহসান, মুফতী মুহীউদ্দিন, মুফতী মাহমুদুল হাছান গাঙ্গুহী প্রমূখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাদের প্রত্যেকেই উপমহাদেশ ও উপমহাদেশের বাইরে ব্যাপকভাবে দ্বীনের খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একাধিক মুফতী রয়েছেন।

ঘ. ইলমে কালামে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান ঃ

ইসলামী আক্বীদাহ্ বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রীক দার্শনিক ও তাঁদের অনুগামীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের প্রেক্ষিতেই বাদশাহ মা'মুনুর রশীদের যুগে - ১৯৮ হিজরী থেকে ২১৮ হিজরী- ইলমে কালামের সূচনা হয়। দার্শনিকদের যুক্তির ধাঁধাঁয় পড়ে অনেক মুসলিম চিন্তাবিদও বিভ্রান্ত হন। ইসলামের যে সকল বিষয় তাঁদের স্থুল যুক্তিতে বোধগম্য মনে হয়নি সেগুলোকে তাঁরা অস্বীকার করার কিংবা অপব্যাখ্যার প্রয়াস পান। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তাঁদের যুক্তির ফাঁক ফোকরগুলো চিহ্নিত করে ইসলামী আক্বীদাহসমূহের চিরন্তনতা তুলে ধরার জন্য উলামায়ে হক্কের পক্ষ থেকে যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় তাই মুলতঃ ইলমে কালামের সূচনা করে। পরবর্তীতে এ ধারা অব্যাহত থাকে এবং যারাই ইসলামের কোন স্বীকৃত আক্বীদাহ বিশ্বাসের যৌক্তিকতা কিংবা বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠিয়েছে, কিংবা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে; কুরআন

সুন্নাহ ও বস্তুনিষ্ঠ যুক্তির আলোকে তার জবাব দিয়েছেন সমকালীন উলামায়ে কিরাম। ফলে এ বিষয়টি পৃথক একটি সাবজেক্টের রূপ ধারণ করেছে। উলামায়ে দেওবন্দের এ শাস্ত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। বস্তুতঃ দার্শনিকগণ ছিলেন যুক্তিসর্বস্ববাদের বিশ্বাসী। আর ওলামায়ে হক্ক ছিলেন কুরআন সুন্নাহর অনুসারী। কুরআন সুন্নাহকে মূল হিসাবে গ্রহণ করে বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিকে খন্ডন করার জন্য প্রয়োজনীয় যুক্তির আশ্রয় তারা নিয়েছেন বটে; তবে তারা যুক্তিকে কখনই সত্য উদঘাটনের মানদণ্ড মনে করেননি। উলামায়ে দেওবন্দও এই নীতি অনুসরণ করে সমকালীন যুগে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

ইলমে কালামের যে সব বিষয় প্রাচীন দর্শন ও যুক্তির উপর ভিত্তিশীল ছিল সেগুলোকে উলামায়ে দেওবন্দ আধুনিক যুক্তির আলোকে উপস্থাপন করেছেন, তা ছাড়া যুগের পরিবর্তনের ফলে ইসলামী আক্বীদাহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে সব নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এবং বিভিন্ন বাতিল ফিরকাহ উদ্ভব হওয়ার কারণে তাদের যে সব বিভ্রান্তি প্রকাশ পেয়েছে; সেগুলোর যুগ সম্মত জবাব ও ব্যাখ্যা দান করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞান এবং তার উপর ভিত্তিশীল জীবন-দর্শনগুলোর সাথে ইসলামের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য এবং সংঘাতপূর্ণ বিষয়সমূহ নিরূপণ করতঃ তারও যুগ-সম্মত ও যুক্তিযুক্ত জবাব কুরআন সুন্নাহর আলোকে প্রদান করেছেন। এ কাজ অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আক্বীদাহ ও বিশ্বাসের প্রাচীন ও আধুনিক বিষয়সমূহকে সমন্বিত করতঃ আধুনিক যুক্তির আলোকে নতুন করে সেগুলো উপস্থাপন করে বহু বই-পুস্তকও তাঁরা প্রণয়ন করেছেন। এগুলোর মাঝে আদদীনুল্ কাইয়্যিম, ইলমুল্ কালাম, দ্বীন ও শরীয়ত, ইখতিলাফে উম্মত আওর সীরাতে মুস্তাকীম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নব উদ্ভূত আধুনিক সমস্যাসমূহের প্রত্যেকটির উপর তাঁরা যে পৃথক পৃথক পুস্তক প্রণয়ন করেছেন এ ধরনের পুস্তকের সংখ্যাও অনেক। পাঠ্যপুস্তকসমূহের বহু টিকা ও ভাষ্যগ্রন্থও তাঁদের দ্বারা প্রাণীত হয়েছে। জনগণকে সচেতন করার জন্য বক্তৃতা, বিবৃতির মাধ্যমেও তাঁরা দ্বীনের সঠিক ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এভাবে তাঁরা দ্বীনে হানীফকে আক্বীদাহ্গত বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ঙ. সীরাত ও ইতিহাস শাস্ত্রে তাঁদের অবদান ঃ

মূলতঃ ইতিহাস হল অতীতের ফেলে আসা পৃথিবীর চিন্তা-চেতনা, ধর্ম-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আদর্শ ও মননশীলতার সঠিক চিত্ররূপ। অতীতের ইতিহাস ভবিষ্যতের গতিপথ নির্ধারণ করে, মানুষকে কর্মের প্রেরণা যোগায় অতি নীরবে সঙ্গোপনে। ইতিহাসের বিভ্রান্তি যেমন বিভ্রান্ত বিশ্বাসের জন্ম দেয়, তেমনি ভবিষ্যতের জন্য ডেকে আনে অশুভ পরিণতি। এ কারণে ইতিহাসের নির্ভুল উপস্থাপনা একান্ত অপরিহার্য।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী কিংবা ইসলাম সম্পর্কে না ওয়াকিফ কিছু ঐতিহাসিক ইসলামের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে বহু বিভ্রান্তি কর তথ্য উপস্থাপন করেছেন তাদের রচিত গ্রন্থে। এর ফলে ইসলামের ইতিহাস যে বিকৃতির শিকার হয়েছিল তার বিরুদ্ধে উপ-মহাদেশীয় পরিসরে সর্বপ্রথম উলামায়ে দেওবন্দই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং বিভ্রান্তিগুলোর অপনোদন করেন। যদিও ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়নকে তাঁরা তাঁদের কর্মসূচীর আওতায় আনেন নি, কিন্তু যেখানেই বিভ্রান্তি ঘটেছে সেখানেই তাঁরা কলম ধরেছেন বলিষ্ঠ হাতে। মনীষীগণের জীবনীগ্রন্থ ইতিহাস হিসাবে গণ্য না হলেও ইতিহাসের উপাত্ত বটে। যেহেতু মনীষী বুজুর্গদের জীবন ইতিহাস মানুষের মনের খোরাক যোগায় এবং আত্মশক্তিকে সচেতন ও বলিষ্ঠ করে এবং তাঁদের অনুপম আদর্শ অনুসরণের প্রেরণা যোগায়, মানুষের মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে সমুন্নত করে; এ কারণে বুজুর্গানের জীবন ইতিহাস ধরে রাখার বিষয়টিকে উলামায়ে দেওবন্দ অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বলতে গেলে এ ক্ষেত্রে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান সর্বজন স্বীকৃত। গ্রন্থকারদের জীবনী সংরক্ষণ করতে গিয়েও এক বিরাট ঐতিহাসিক উপাত্ত গড়ে উঠেছে। এছাড়া উলামায়ে কিরামের ত্যাগ, কুরবানী, সংগ্রাম, আন্দোলন ও কৃতিত্বের ঘটনাবহুল কাহিনীতে উপমহাদেশের ইতিহাস সমুজ্জ্বল। ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বলে রাজকীয়ভাবে লিখিত ইতিহাসে এগুলো স্থান না পেলেও ওলামায়ে দেওবন্দের প্রচেষ্টায় তা সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়েছে। এভাবে চলমান ইতিহাসের ধারার পাশাপাশি ধর্ম, কৃষ্টি, সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক ধারার সূচনা হয়েছে।

ইতিহাস ও সীরাত শাস্ত্রে তাঁদের লিখিত গ্রন্থসমূহ ঃ সীরাতুননবী সুলায়মান নদভী কৃত, সীরাতে মুস্তফা ইদ্রিস কান্ধলভী; হায়াতুস সাহাবা মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী; তারিখে খোলাফায়ে রাশেদাহ, তারীখে দাওয়াত ও আযীমত, আবুল হাসান নদভী; তারীখে ইসলাম, আকবর শাহ্ নজীবাবাদী' সীরাতে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ, উলাময়ে হিন্দ কা শানদার মাযী, আসীরানে মাল্টা, উলামায়ে হক আওর উনকে মুজাহাদানা কারনামে মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া। এছাড়া শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক এবং মনীষীদের জীবনীর উপর অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা প্রণীত হয়েছে।

চ. তাসাউফ ও মনস্তত্ত্বে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান ঃ

তাসাউফ হল মানুষের আত্মাকে কলুষমুক্ত, বিশুদ্ধ ও নির্মল করার একটি প্রক্রিয়া। মানবাত্মার জটিল ব্যাধিগুলোই মানুষকে পাপাচার ও পংকলিতার দিকে নিয়ে যায়, পক্ষান্তরে একটি সুস্থ সমাজ বিকাশের পূর্বশর্ত হল বিশুদ্ধ ও নির্মল আত্মশক্তি সমৃদ্ধ মানুষ। তাই সুস্থ ও পরিমার্জিত জীবনোধ ও সুস্থ সমাজের জন্য তাসাউফের দীক্ষা গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। এ প্রক্রিয়ায় একজন মানুষকে উন্নত বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ও প্রকৃষ্টতর মানুষের নমুনা রূপে গড়ে তোলা সম্ভব। এক্ষেত্রেও উলামায়ে দেওবন্দের অবদান অপরিসীম।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপমহাদেশে আধ্যাত্মধারাসমূহের মাঝে যে বৈরিতা সৃষ্টি হয়েছিল উলামায়ে দেওবন্দের প্রচেষ্টায় সেই বৈরিতা ও মতানৈক্যের নিসরণ হয়ে একটি সুস্থ ও সমন্বিত আধ্যাত্মিক ধারার বিকাশ ঘটে। ফলে আধ্যাত্মিক ধারায় একটি যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা হয়। আত্মশুদ্ধির দীক্ষা দানের জন্য উলামায়ে দেওবন্দকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবেই মনস্তত্ব তথা মনের গতিবিধির উপর গবেষণায় ব্রতী হতে হয়। এভাবে মনস্তত্ত্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়ে উঠে।

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মানুষকে খোদা-মুখী করার জন্য তাঁরা বিভিন্ন প্রয়াস গ্রহণ করেন। যথাঃ খানকাহ্ তৈরি ও খানকায় রেখে উচ্চতর আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ দান করতঃ বিকশিত আত্মশক্তি সম্পন্ন মানুষ তৈরি, ওয়াজ নসীহত, দেশ বিদেশে ভ্রমণ করে মানুষকে এ বিষয়ে দীক্ষাদান; পুস্তকাদী প্রণয়ন ও তার ব্যাপক প্রচার।

তাঁদের রচিত এ বিষয়ের পুস্তকাদির মাঝে দ্বীন ও শরীয়ত, শরীয়ত ও তরীকত, কসদুস সাবীল, ফালসাফায়ে আখলাক, গীবত কিয়া হ্যায়, ইসলাম কে নেযামে ইফফত ও ইসমত, কাশকূলে মারেফাত, রুহকি বিমারিয়া আওর উনকে ইলাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও এ বিষয়ে তাঁদের বহু পুস্তক-পুস্তিকা রয়েছে। তাসাউফের দীক্ষা প্রাপ্ত অসংখ্য পীর মাশায়েখ ও বুজুর্গানেদ্বীন উপমহাদেশে ও তার বাইরে মানুষকে খোদামুখী করার কাজে নিরত রয়েছেন। যাদের এক এক জন এক একটি নক্ষত্রের ন্যায় গোটা দেশের মানুষের অন্তরকে আলোকোদ্ভাসিত করার সুমহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে গেছেন ও যাচ্ছেন। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, হুসাইন আহমদ মাদানী, মাওলানা আতহার আলী, পীরজী হুযুর, হাফেজ্জী হুযুর, শামসুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা গোলাম গওস হাজারভী, আব্দুল্লাহ দরখাস্তীসহ এ ধরনের বহু ব্যক্তিত্ব এ ধারারই উজ্জ্বল নক্ষত্র।

ছ. ভাষা ও সাহিত্যে তাঁদের অবদান ঃ

আরবী ভাষায় তাঁদের অবদান ঃ কুরআন ও হাদীস হল ইসলামী শরীয়তের মূল ভিত্তি। আর এ ভিত্তিদ্বয়ের ভাষা হল আরবী। সুতরাং ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান আহরণ করতে হলে উৎসের মূল ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ অবশ্যই অপরিহার্য। যেহেতু কুরআন সুন্নাহর বস্তুনিষ্ঠ গভীর জ্ঞান আহরণ করাই হল দেওবন্দী শিক্ষাধারার মুল লক্ষ্য, এ কারণে আরবীর ন্যায় একটি কঠিন বিদেশী ভাষাকে অত্র অঞ্চলের মানুষের জন্য সহজ ও বোধগম্য করে তোলার ক্ষেত্রে উলামায়ে দেওবন্দ অসামান্য শ্রম ও সাধনা ব্যয় করেছেন। এতদুদ্দেশ্যে আরবী ভাষার নাহু, সরফ ও বালাগাতের উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত পাঠদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নাহু, সরফ ও বালাগাতকে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য আরবী ভাষায় এবং এ দেশীয় ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। যেহেতু কুরআন হাদীস ও

এতদসংক্রান্ত তথ্যগ্রন্থগুলো প্রাচীন আরবী ভাষায় রচিত, একারণে আরবীর প্রাচীন সাহিত্য-রূপকে ধরে রাখা অপরিহার্য্য ছিল, তাই প্রাচীন আরবী সাহিত্য-গ্রন্থগুলো সংরক্ষণ ও তার পাঠদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এ শিক্ষা ধারায়। দিওয়ানে আলী, দিওয়ানে হাসসান ইবনে সাবিত, দিওয়ানে হামাসাহ, সাবয়ে মু'আল্লাকা, মাকামাতে হারীরী ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ অদ্যাবধি পাঠ্যসুচীর অন্তর্ভুক্ত করে রাখা হয়েছে এ উদ্দেশ্যেই। এছাড়াও নতুন নতুন বহু আরবী সাহিত্যের কিতাব প্রণয়ন করা হয়েছে। নাফহাতুল আরব, কাসাসুন নাবিয়্যিন, আত-তরীক ইলাল ইনশা, আততরীক ইলাল আরাবিয়্যাহ, বাকুরাতুল আদব, রওয়াতুল আদব, মু'আল্লিমুল আরাবী ইত্যাদি সাহিত্যগ্রন্থ ছাড়াও ছোট বড় অনেক গ্রন্থ তাঁরা রচনা করেছেন।

আরবী ভাষাকে সহজবোধ্য করার জন্য এ দেশীয় ভাষায় বহু আরবী অভিধান তৈরি করা হয়েছে। মিসবাহুল লুগাহ, আল কামুসুল জাদীদ, আল কাওসার, আল মানার ইত্যাদি তাঁদের রচিত অভিধান গ্রন্থগুলোর অন্যতম।

এছাড়াও আরবী ভাষায় অনেক মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকাও তাঁদের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হচ্ছে। আল-কিফাহ্, আস-সুবহুল জাদীদ, আল কলম ইত্যাদি তাঁদের দ্বারা প্রকাশিত আরবী সাহিত্য পত্রিকা।

কালের পরিবর্তনে আরবী ভাষায় যে পরিবর্তন সূচীত হয়েছে তাতে আরবী সাহিত্য একটি নতুন ধাঁচে প্রবাহিত হচ্ছে। এই আধুনিক আরবী সম্পর্কেও যাতে ছাত্ররা জ্ঞান লাভ করতে পারে তারও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ফারসী ভাষায় তাঁদের অবদান ঃ এককালে ফারসী ভাষায় ইসলামের বিস্তর চর্চা হয়েছিল, ফলে সেই ভাষায় বিরাট ইসলামী জ্ঞান-ভাণ্ডার তৈরি হয়েছিল। সেই জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য দেওবন্দী শিক্ষাধারায় ফারসী ভাষার উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং ফারসী ভাষার নিয়ম-কানুনের উপর অনেক বই-পুস্তকও প্রণীত হয়।

স্থানীয় ভাষাসমূহের চর্চায়ও তাঁদের অবদান একেবারে খাট করে দেখার নয়। বিশেষ করে উর্দূ সাহিত্য উলামায়ে কিরামের হাতেই সমৃদ্ধি লাভ করে। ইসলামী আদর্শের বাহন হিসাবে উর্দূ ভাষা ব্যাপকভাবে চর্চিত হয় এবং ইসলামী পরিভাষা দ্বারা এ ভাষাটি যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে। ভাষাকে হিন্দুয়ানী প্রভাব থেকে মুক্ত করে ইসলামী ভাবধারায় প্রবাহিত করার পিছনে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান একচ্ছত্র বলা চলে।

বর্তমানে বাংলা ভাষাভাষী উলামায়ে কিরামও মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেছেন। এ ভাষায়ও বিশাল ইসলামী জ্ঞান-ভাণ্ডার তৈরি হচ্ছে। এ ক্ষেত্রেও ওলামায়ে দেওবন্দ পিছিয়ে নেই বলা চলে।

৩. উলামায়ে দেওবন্দের রাজনৈতিক অবদান

ভূমিকা ঃ শাহ ওয়ালীউল্লাহ রাহ. নতুন সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে যে অভিনব কর্মসূচী প্রদান করেছিলেন, মূলতঃ সে কর্মসূচীর আলোকেই তৈরি হয়েছিল পরবর্তী ভারতীয় উলামা-ই-কিরামের রাজনৈতিক আন্দোলনের বুনিয়াদ। শাহ ওয়ালীউল্লাহ রাহ.এর চেতনার উত্তরসূরী উলামায়ে কিরামের রাজনৈতিক অবদানকে মোটামুটি ৪টি স্তরে বিভক্ত করা যায়ঃ

১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ থেকে ঐতিহাসিক বালাকোর্ট পর্যন্ত।
২. বালাকোট থেকে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত।
৩. দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা পর্যন্ত।
৪. ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত।

প্রথম পর্যায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন পর্যায়ক্রমে শাহ ওয়ালীউল্লাহ, শাহ আব্দুল আযীয ও সাইয়্যিদ আহমদ বেরলভী রাহ.। যার সংক্ষিপ্ত চিত্রায়ন ইতিপূর্বে করা হয়েছে। বালাকোটের ময়দানে হযরত সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. ও হযরত ইসমাইল রাহ. শাহাদত বরণ করার পর এ আন্দোলন মোটামুটি তিনটি কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এর একটি কেন্দ্র ছিল দিল্লীতে, যার নেতৃত্বে ছিলেন শাহ ইসহাক রাহ., তাঁর হিজরতের পর হযরত আবদুল গণী রাহ. তার পরে মাওলানা মামলুক আলী রাহ. ও তারপর হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহ.। অপর একটি কেন্দ্র ছিল পাটনায়, যার নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলী ও ফারহাত আলী রাহ.। আর অন্য একটি কেন্দ্র সিত্তানা দুর্গকে কেন্দ্রকরে গড়ে উঠেছিল, তার নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা বেলায়েত আলী, মাওলানা ফয়েজ আলী, ইয়াহইয়া আলী ও আকবর আলী প্রমূখ উলামায়ে কিরাম।

এ সকল কেন্দ্র থেকে সারাদেশে ইংরেজ বিরোধী গণজাগরণ সৃষ্টির অব্যাহত প্রচেষ্টা চলতে থাকে। ফলে সারাদেশেই কোম্পানীর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ দানা বাধতে থাকে। সে চেতনার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশেও ব্যাপক সাড়া জাগে, হাজী শরীয়ত উল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন (যা পরে দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ইংরেজ বিরোধী গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়) সাইয়্যিদ আহমদ রাহ.এর অপর খলীফা হাজী নেছার আলী উরফে তিতুমীর-এর আন্দোলনসহ ছোটবড় বহু আন্দোলন বাংলাদেশী অঞ্চলে গড়ে উঠে এবং ইংরেজ বিরোধী কর্মতৎপরতায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।

এভাবেই সারাদেশের আনাচে-কানাচে আলেম-উলামাদের উদ্যোগে কোম্পানীর শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ চরম রূপ ধারণ করে। গোপনে গোপনে সারাদেশে চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি চলতে থাকে। সেনাবাহিনীতেও এ চেতনা সম্প্রসারিত হয়। দেশীয় সৈন্য এবং বৃটিশ সৈন্যদের মাঝে বৈষম্যমূলক আচরণ ও দেশীয় সৈনিকদের অর্থনৈতিক দূরাবস্থা এবং তাদেরকে বৃটিশের ইচ্ছামত

বহিঃরাষ্ট্রে প্রেরণের বাধ্যতামূলক আইনসহ ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক অনাচার সেনাবাহিনীকে ক্ষেপিয়ে তোলে। ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতাকামী আলেম সমাজের নেতৃত্বে সেই চেতনা সিপাহী জনতার গণবিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। পশ্চিমবঙ্গের বরাকপুরে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে এনফিল্ড রাইফেলে শূকর ও গরুর চর্বি মিশ্রিত টোটা ব্যবহারে অসম্মতি জ্ঞাপনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেনাবাহিনীতে যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তা ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীদের প্রধান প্রধান কেন্দ্র- দিল্লী, মিরাঠ, লক্ষ্মৌ, কানপুর, বেরলী ও ঝাঁসীসহ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তার সাথে এদেশের স্বাধীনতাকামী জনতা একাত্ম হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারা দেশের আনাচে-কানাচে দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে এ যুদ্ধ। এ সময় সেই আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব দেওয়া হয় দু'টি কেন্দ্র থেকে। এর একটি ছিল দিল্লীর সন্নিকটে থানা ভবনে আর অপরটি ছিল আম্বালায়। দিল্লী কেন্দ্রিক অঞ্চলের নেতৃত্বে ছিলেন ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহ., রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রাহ., মাওলানা কাসিম নানুতুবী রাহ.। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় সে অঞ্চলে তাঁরা একটি স্বাধীন সরকারের ঘোষণাও দিয়ে ফেলেছিলেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ রাহ.-কে আমীর, রশীদ আহমাদ রাহ. কে প্রধান বিচারপতি; নানুতুবী রাহ. কে প্রধান সেনাপতি করে এ সরকারের অবকাঠামো ঘোষণা করা হয়। অপর কেন্দ্রটি ছিল আম্বালায় যার নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা জা'ফর থানেশ্বরী ও মাওলানা ইয়াহইয়া আলী। তছাড়া কানপুরেও স্বাধীন সরকারের ঘোষণা দেওয়া হয়। সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর অন্যতম খলীফা আযীমুল্লাহ খান ও নানা সাহেব এর নেতৃত্ব দেন। অযোধ্যায় এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সাবেক অযোধ্যারাজের স্ত্রী বেগম হযরত মহল ও আমান উল্লাহ। বেরলীতে নেতৃত্বে দেন হাফেজ রহমত খানের বংশধর খান বাহাদুর খান। খান বাহাদুর খান নিজেকে দিল্লীর সম্রাটের স্থানীয় প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেন। স্বাধীনতাকামীরা দিল্লী দখল করে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারত সম্রাট বলে ঘোষণা দেয়। পাটনা ও সিত্তানায়ও তখন পর্যন্ত পুরাতন কেন্দ্রগুলি বিদ্যমান ছিল। সেখান থেকেও স্বাধীনতার চেতনা অব্যাহতভাবে বিতরণ করা হতে থাকে।

১৮৫৭ সালে কোম্পানীর শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে যে গণবিদ্রোহ দেখা দেয় তার কারণ কি ছিল সে সম্পর্কে ইংল্যান্ড সরকার কোম্পানীর কাছে রিপোর্ট চাইলে ডঃ উইলিয়াম লিওর এ মর্মে রিপোর্ট প্রদান করেছিলেন যে, "১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের গণ-বিদ্রোহ মূলতঃ ছিল মুসলমানদের আন্দোলন, আর তার নেতৃত্ব দিয়েছিল আলেম সমাজ। সুতরাং এ বিদ্রোহকে নির্মূল করতে হলে মুসলমানদের জিহাদী চেতনাকে বিলুপ্ত করতে হবে; আর সে চেতনার মূলমন্ত্র আল-কুরআন ও তার বাহক উলামা সমাজকে নির্মূল করে ফেলতে হবে।"

এ রিপোর্টের ভিত্তিতে শুরু হয় আলেম উলামা নিধনের মহোৎসব। ইতিহাসের সবচেয়ে লোমহর্ষক নির্যাতনের শিকার হয় এ উপমহাদেশের আলেম উলামারা। সে সময় প্রায় অর্ধলক্ষের চেয়ে বেশী আলেম উলামাকে ফাঁসী দিয়ে শহীদ করা

হয়। আন্দামান, মালটা, সাইপ্রাস, কালাপানিতে দ্বীপান্তর করা হয় হাজার হাজার আলেম উলামাকে।

এ বিদ্রোহের নেতৃত্বদানের অপরাধে মাওলানা জাফর থানেশ্বরী, মাওলানা ইয়াহইয়া আলী ও মাওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী প্রমূখ আলেমদেরকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয়। আম্বালা জেল থেকে তাদের লাহোর জেলে পাঠানো হয়, সেখান থেকে মুলতান কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে তাদের ফাঁসির হুকুম কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফাঁসির হুকুমকে তাঁরা অম্লান বদনে মেনে নিয়ে রাতদিন জেলের প্রকোষ্ঠে বসে যে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করেন তাতে ইংরেজ জেলার বিস্মিত হয় এবং তাদের নিকট এর কারণ জানতে চাইলে তারা জানায় 'শাহাদাতই আমাদের চূড়ান্ত কাংখিত ও কাম্যবস্তু, তাই যেহেতু পেয়ে গেলাম সুতরাং আনন্দ করব না কেন"? ফলে তাদের ফাঁসির হুকুম মওকুফ করে তাদেরকে দ্বীপান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্বাসিত জীবনে তাদের উপর যে অকথ্য নির্যাতন চালানো হয় তা ইতিহাসের পাঠক মাত্রকেই স্তম্ভিত করে।

১৮৫৭ এর ব্যাপক গণ-বিদ্রোহের রিপোর্টের ভিত্তিতেই ১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক ফরমান বলে কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে সরাসরি বৃটিশ সরকার এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করে এবং বৃটেন তার ক্ষমতাকে সুসংহ করার জন্য নতুন তৎপরতায় লিপ্ত হয়। দমন নীতিকে আরো বলিষ্ঠ ও জোরালো করা হয়।

শায়খুল হিন্দ রাহ. এর রাজনৈতিক তৎপরতা

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর আলেম উলামাদের নির্মূল করার যে অভিযান শুরু হয়, তার ফলে নেতৃত্ব দেওয়ার মত কোন আলেম তো দূরের কথা দাফন-কাফন করার মত ন্যূনতম জ্ঞানের অধিকারী কোন আলেমও অবশিষ্ট থাকেনি।

সুতরাং নেতৃত্বের জন্য নতুন লোক তৈরির পরিকল্পনার ভিত্তিতেই দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-জাগরণ ও চেতনা ছড়ানোর প্রয়াস শুরু হয় একাডেমিক পন্থায়। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পাশাপাশি চলে আযাদীর দীক্ষা।

১৮৫৭ সালের পর থেকে নিয়ে ১৯০৯ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫২ বৎসর কাল আলেম উলামাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক ভয়াল নৈঃশব্দের অবস্থা বিরাজিত থাকে। ইংরেজদের দমননীতির ফলে নিঃশেষ প্রায় আলেম সমাজের যে দু'চারজন জীবিত ছিলেন তারাও মুখ খুলতে সাহস করছিলেন না। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর স্থবিরতার পর এই আন্দোলনের নেতৃত্বে আসেন দারুল উলূমের প্রথম ছাত্র, পরবর্তীতে দারুল উলূমের সদরুল মুদাররেসীন হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান উরফে শায়খুল হিন্দ রাহ.। তারপরে এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তাঁরই যোগ্য শিষ্য হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী উরফে শায়খুল ইসলাম রাহ.। মূলতঃ হযরত শায়খুল হিন্দ রাহ. এর প্রজ্ঞা ও নিরলস কর্ম তৎপরতার ছোঁয়া পেয়ে উলামায়ে হক্কের মৃতপ্রায় রাজনৈতিক অঙ্গন আবার সরব হয়ে উঠে।

শায়খুল হিন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

১৮৫১ ইং সালে তিনি বেরলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মাওলানা জুলফিকার আলী। প্রাথমিক শিক্ষা মিয়াজী মঙ্গোলোরী ও মাওলানা মাহতাব আলীর নিকট অর্জন করেন। অতঃপর দারুল উলূম-এর প্রথম ছাত্র হিসাবে লেখাপড়া শুরু করেন।

১৮৭১ ইংরেজিতে শিক্ষা সমাপনের পর তিনি প্রথম দারুল উলূমের সহকারী শিক্ষকের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। ১৮৭৫ ইংরেজিতে ৪র্থ শিক্ষক হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং ১৮৮৮ সালে সদরুল মুদাররেসীন পদে সমাসীন হয়ে ১৯১৫ পর্যন্ত এ পদ অলংকৃত করে রাখেন।

শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি জাতীয় চেতনাকে শাণিত করে স্বাধীনতার আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য কর্মজীবনের শুরু থেকেই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যেহেতু তিনি শ্যামলীর যুদ্ধের সিপাহসালার কাসিম নানুতুবী রাহ.-এর একনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন, একারণে তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, কাসিম নানুতুবী রাহ. কোন মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে দারুল উলূম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্যই তিনি ১৮৭৮ ইং সালে 'সামারাতুত্ তারবিয়্যাত' নামে দারুল উলূমের প্রাক্তন ছাত্রদেরকে সংগঠিত করার প্রয়াস গ্রহণ করেন।

বিভিন্ন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঃ

মূলত ঃ ১৮৫৭ সালের সিপাহী জনতার এ বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর সারাদেশ আবারও দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়।

১. ইংরেজদের তোষামোদকারী স্বার্থন্বেষী শ্রেণী। যেমন- পাঞ্জাব, হায়দারাবাদ, গোয়ালিয়র ও নেপাল অঞ্চলসহ অন্যান্য স্থান।

২. স্বাধীনতাকামী শক্তি।

স্বাধীনতাকামী শক্তির অবিরাম তৎপরতার বদৌলতেই ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতার পক্ষে আবার জনমত গড়ে উঠতে শুরু করে। এ সময় অনেকগুলো সংগঠন বিভিন্ন নামে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৭৬ ইংরেজিতে 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশান' নামে বাংলাদেশ অঞ্চলে একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৭৮ ইংরেজীতে দেওবন্দ অঞ্চলে গড়ে উঠে 'সমারাতুত্ তারবিয়্যাত' নামে একটি সংগঠন- যা হযরত শায়খুল হিন্দ রাহ. গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৮৪ সালে 'মহাজন সভা' নামে মাদ্রাজে একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৮৫ সালের ২৮ শে ডিসেম্বরে উমেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পোনায় ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে 'কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে কংগ্রেসসহ আরো কিছু কিছু সংগঠন ইংরেজদের স্বার্থানুকূল্যে তাদেরই আর্থিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ক্রমান্বয়ে দানা বাঁধতে থাকা বৃটিশ বিরোধী চাপা ক্ষোভ যাতে বিস্ফোরণোম্মুখ না হয়ে উঠে, সেজন্য তাদের ক্ষোভকে সংযত পর্যায়ে প্রকাশ করার সুযোগ দান

করতঃ ক্ষোভের পরিমাণকে কমিয়ে আনা এবং ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনকে ক্রমান্বয়ে স্তিমিত করে ফেলার উদ্দেশ্যেই ইংরেজরা তাদের অর্থানুকূল্যে এ সংগঠনটিকে গড়ে তুলতে পরোক্ষ ইন্ধন যোগায়।

ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ডিফার্ন তাঁর বন্ধু মিষ্টার হিউমকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাতে তিনি একথাই উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছিলেন– 'শাষক ও শাসিত দু'শ্রেণীর জন্যই এটা ভাল মনে হচ্ছে যে, ভারতের রাজনীতিবিদরা বৎসরে একবার সমবেত হয়ে ইংরেজ গভর্নমেন্টকে তাদের প্রশাসনিক দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে দিবে এবং তা কিভাবে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নিরসন করা যায় এ ব্যাপারে পরামর্শ দান করবে।'

সে সময় কংগ্রেসের যে মৌলিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা থেকেও বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

সে সময় কংগ্রেসের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল মোট তিনটি।

১. ভারতে বসবাসরত বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোকদের সমন্বয়ে একটি সর্বভারতীয় বৃহত্তর জাতীয়তা গড়ে তোলা।

২. এই বৃহত্তর জাতীয়তার আওতাভুক্ত সকল ধর্ম ও জাতির চিন্তা-চেতনা, ধর্মীয়, নৈতিক ও রাজনৈতিক যোগ্যতাসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করা।

৩. ভারতীয়দের স্বার্থ বিরোধী বৃটিশ সরকারের সকল অন্যায় কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সংশোধনী পেশ এবং এর মাধ্যমে বৃটিশ সরকারের সাথে ভারতের ঐক্য ও সৌহার্দকে সমুন্নত রাখা।

কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে ইংরেজ সরকার যে স্বপ্ন দেখেছিল তা মাঠে মারা যায়। কেননা দলটি ক্রমান্বয়ে ইংরেজ বিরোধী তৎপরতায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে শুরু করে, ফলে তারা তাদের পলিসী বদলায় এবং 'বিরোধ বাধিয়ে দাও ও শাসন কর' এই নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা একদিকে হিন্দুদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়; অপরদিকে মুসলমানদের মাঝে হিন্দু ভীতির আতংক ছড়িয়ে দেয় এবং সর্ব ভারতীয় জাতীয়তাকে তাদের ক্ষমতার জন্য হুমকি মনে করে ১৯০৬ সালে হিন্দু ও মুসলমানদের দু'টি পৃথক দল দাঁড় করাতে সক্ষম হয়। এর একটি ছিল 'মুসলিম লীগ', অপরটি ছিল 'হিন্দু মহাজন সভা'। ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় নবাব সলিমুল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে 'সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাছাড়া লর্ড কার্জন ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহকে আসামের সাথে সংযুক্ত করার ঘোষণা দিলে বাংলাদেশ অঞ্চলে 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে একটি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। এর পরিণতিতে ১৯০৮ সালে মুজাফফর নগরে জজ মিঃ কংফোর্ড-এর গাড়ীতে খুদীরাম কর্তৃক বোমা নিক্ষেপিত হয়। এছাড়াও ছোট বড় অনেক সংগঠন তখন গড়ে উঠে।

১৯০৯ সালে শায়খুল হিন্দ রাহ. তাঁর একনিষ্ঠ শিষ্য স্বাধীনচেতা আলেম মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে দেওবন্দে ডেকে এনে দারুল উলূমের ফারেগ ছাত্রদের সমন্বয়ে 'জমিয়তুল আনসার' নামক এক সংগঠন গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। প্রিয় শিক্ষকের নির্দেশে সিন্ধি তাঁর ১৮/১৯ বৎসরের (১৮৯১ ইং- ১৯০৯ইং) শিক্ষকতা, জ্ঞান চর্চা ও আধ্যাত্মিক সাধনার জীবন ছেড়ে দিয়ে, জমিয়তুল আনসারের সেক্রেটারী রূপে সংগঠন ও আন্দোলনমুখর এক নতুন জীবনে প্রবেশ করেন। বাহ্যত এ সংগঠনের উদ্দেশ্য এই ছিল বলে ব্যক্ত করা হত যে, দারুল উলূমের প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠিত করা এবং আলীগড় ও দারুল উলূমের শিক্ষক-ছাত্রদের মাঝে হৃদ্যতার সম্পর্কে সৃষ্টি করা। কিন্তু এ সংগঠনের একটি অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। মূলতঃ মাওলানা মাহমূদ হাসান রাহ. এর একটি সুদূর প্রসারী কর্মসূচী ছিল। তা হল– দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্রদেরকে নিয়ে একটি মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তোলা এবং ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। অবশ্য তিনি তাঁর ছাত্রদের মনমানসিকতাকে এ চেতনার আলোকেই গড়ে তুলেছিলেন। তিনি দারুল উলূমের সদরুল মুদাররিসীন থাকাকালেই প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি লাভ করে এবং বহির্বিশ্বের ছাত্ররা এখানে লেখাপড়া করতে আসে। এ সময় সীমান্ত অঞ্চল ও আফগানিস্তানের বহু ছাত্র তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে এই চেতনা নিয়ে স্বদেশে ফিরে যায়। তাদেরকেও তিনি সীমান্ত এলাকায় কর্মতৎপর করে তোলেন। যেহেতু সীমান্ত অঞ্চল ও আফগানিস্তান সামরিক তৎপরতার জন্য উপযুক্ত স্থান ছিল, তাই সেটিকে বিপ্লবী বাহিনীর কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার একটি পরিকল্পনা ছিল। সেজন্য সীমান্ত অঞ্চলের জনগণের মাঝে জিহাদী চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে তিনি হাজী তুরঙ্গযাই, মাওলানা সাইফুর রহমান, মাওলানা ফজলে রাববী, মাওলানা ফযল মাহমুদ, মাওলানা মুহাম্মদ আকবর প্রমূখ বাগ্মী ব্যক্তিদের সে অঞ্চলে নিযুক্ত করেন। তাঁরা সীমান্ত অঞ্চলে জিহাদী চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করতে সর্বাত্মক প্রয়াস চালান এবং বিক্ষিপ্ত উপজাতীয়দেরকে সুসংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

জমিয়াতুল আনসারের দায়িত্বে সিন্ধী রাহ. দীর্ঘ ৪ বৎসর (১৯০৯-১৯১৩) নিয়োজিত থাকেন। এ সময় তিনি প্রকাশ্য রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। ফলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের সাথে তাঁর মতানৈক্য দেখা দেয়, সুতরাং তিনি দেওবন্দ ছেড়ে দিল্লীতে চলে যান এবং মাওলানা মাহমূদ হাসান রাহ. এর আন্দোলনের সুদূর প্রসারী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে তাঁরই নির্দেশে দিল্লীর ফতেহপুরী মসজিদে ১৯১৩ সালে 'নাযযারাতুল মা'আরিফ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে কুরআনের প্রশিক্ষণ দান ও কুরআনের জীবনাদর্শের সাথে পরিচিত করে তোলা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে তাদের অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে যে ভুল ধারণা গড়ে উঠেছিল তা দূর করে তাদেরকে আন্দোলনের পক্ষে সহযোগী শক্তি হিসাবে কাজে লাগানো।

এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে মাওলানা মাহমূদ হাসান রাহ.এর সহযোগী ছিলেন হাকীম আজমল খান, নবাব বিকারুল মূলকসহ আরো অনেকেই। এ সময় মাওলানা মাহমূদ হাসান রাহ. সিন্ধীকে দিল্লীর যুবশক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ফলে ডক্টর আনসারী ও তাঁর মাধ্যমে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মাওলানা মুহাম্মদ আলীর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। এভাবে সিন্ধী উচ্চ পর্যায়ের ভারতীয় রাজনীতিবিদদের সাথে পরিচিত হয়ে উঠেন এবং সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন।

শায়খুল হিন্দ রাহ. মূলতঃ কংগ্রেসী রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ভারতকে বৃটিশ আগ্রাসন থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি 'আযাদ হিন্দ মিশন' নামে একটি বিপ্লবী পরিষদ গড়ে তুলেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন এর সর্বাধিনায়ক। এর সদর দফতর ছিল দিল্লীতে। এ পরিষদের মাধ্যমে তিনি ভারতকে স্বাধীন করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণ করেন। একটি চূড়ান্ত বিপ্লবের মাধ্যমে ইংরেজদেরকে এ দেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তিনি মনে করতেন বৃটিশ বেনিয়াদের করালগ্রাস থেকে ভারতবর্ষসহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ মুক্ত হতে না পারলে মুসলমানদের ধর্ম-কর্ম নিয়ে টিকে থাকা সম্ভব হবে না। তাই তিনি ভারতসহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যাতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে তৎপর হয়ে উঠে এজন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি মনে করতেন যে, ভারত উপমহাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারলে আফগানিস্তান, তুরস্ক, ইরান, হিজায, মিশর সিরিয়াসহ অপরাপর মুসলিম দেশগুলোও পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হবে। এই ব্যাপক চিন্তাধারার আলোকেই তিনি তাঁর মিশনকে পরিচালিত করেন। তিনি আরো মনে করতেন যে বিশ্বের বুকে মুসলিম নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আযাদীর সংগ্রামে মুসলমানদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে এবং প্রয়োজনে বুকের তাজা খুন ঢেলে দিয়ে মুসলিম প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এছাড়া এদেশের স্বাধীনতা ও মুসলিম বিশ্বের মুক্তির বিকল্প কোন পথ নেই। এজন্যই তিনি নিজেকে কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেও মুসলিম বিশ্বকে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে তৎপর করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং অপরাপর মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে গোপন সামরিক অভ্যুত্থানের চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি তুর্কী ও আফগান সরকারের সাথে এই ঐক্যমত্যে উপনীত হন যে, তুরস্কের বাহিনী নির্ধারিত সময়ে আফগানিস্তানের মধ্যদিয়ে এসে বৃটিশ-ভারতে আক্রমণ করবে এবং একই সময় ভারতবাসীও একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। এভাবে বৃটিশদেরকে উৎখাত করে তুর্কী বাহিনী বিপ্লবী সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে স্বদেশে ফিরে যাবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও শায়খুল হিন্দের কর্মতৎপরতা ঃ

বৃটিশ নৌসেনারা তুরস্কের দু'টি জাহাজ অন্যায়ভাবে আটক করলে এ নিয়ে বিশ্বব্যাপী যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাই মুলতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি করে। এ যুদ্ধ ১৯১৪ সালে শুরু হয় এবং ১৯১৮ সাল নাগাদ চলতে থাকে। গোটা বিশ্ব তখন দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডের মিত্রশক্তি হিসাবে ছিল ফ্রান্স, ইটালি, রাশিয়া, বেলজিয়াম, সার্ভিয়া, মন্টেনিগ্রো ও জাপান। অপর দিকে কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে তাদের বিপরীতে ছিল জার্মান, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও তুরস্ক।

এ যুদ্ধের অনেক পূর্ব থেকেই জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্ররা এবং অন্যান্য দেশে অবস্থানরত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদেরকে উৎখাত করার জন্য জার্মান সরকারের সাথে একটি আঁতাত গড়ে তোলে। এই আঁতাতে তুরস্কও শরীক ছিল। এ সময় ১৯০৫ সালে বার্লিনে জার্মান সরকারের পররাষ্ট্র দফতরের অধীনে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি' বা আঞ্জুমানে ইনকিলাবে হিন্দ নামে একটি পার্টি গঠিত হয়। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হরদয়াল তখন অবস্থান করতেন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখান থেকে তিনি বার্লিনে আসলে তারই উদ্যোগে উক্ত পার্টি কর্তৃক রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও বরকত উল্লাহসহ কতিপয় তুর্কী ও জার্মান পদস্থ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি মিশন আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে প্রেরণ করা হয়। মিশনের উদ্দেশ্য ছিল আফগান সরকারের মনোভাবকে বৃটিশ বিরোধী করে তোলা, কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষ হয়ে মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য আফগান সরকারকে উদ্বুদ্ধ করা এবং তুরস্কের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ভারত আক্রমণের ব্যাপারে আফগান সরকারের অনুমোদন লাভ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে (১৯১৪ইং) শায়খুল হিন্দ রাহ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দলের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির একটি মিটিং দেওবন্দে শায়খুল হিন্দ রাহ. এর বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এ মিটিংয়ে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ১৯১৭ ইং সালের ১৯ শে ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব পরিকল্পিত গণঅভ্যুত্থান ঘটানো হবে। কমিটি এ মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে তা শায়খুল হিন্দ রাহ. এর নিকট হস্তান্ত র করে এবং ইতিপূর্বে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে শায়খুল হিন্দ রাহ. তুর্কী ও আফগান সরকারদ্বয়ের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন, মুখোমুখি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা চূড়ান্ত করার দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পিত হয়।

ইতিমধ্যেই দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন সূচীত হয়। বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্যোগে উপ-মহাদেশের বাইরে বিভিন্ন স্থানে স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামের জোর তৎপরতা শুরু হয়। এতে ইংরেজ সরকার সতকর্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং ভারতের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ও দলের কর্মীদেরকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। তারা একে একে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মাওলানা শওকত আলী প্রমূখ ব্যক্তিবর্গকেও গ্রেফতার করতে আরম্ভ

করে। এ সময় মাওলানা সিন্ধীও এই ধরপাকড়ের আওতায় পড়বেন এই অনুমান করে শায়খুল হিন্দ রাহ. সিন্ধীকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে, তুমি কাবুলের পথ ধর আর আমি হিজাযের পথে রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি। দু'জনেই দু'টি বৃহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১৯১৫ সালে দু'দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

শায়খুল হিন্দ রাহ. এর উদ্দেশ্য ছিল হিজাযের পথে তুরস্কে পৌছা এবং তুরস্ক কর্তৃক ভারত আক্রমণের চুক্তিকে চূড়ান্ত করা। তার উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে কাবুলে প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল; কাবুল সরকারকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করা। তাছাড়া আফগানিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শায়খুল হিন্দ রাহ.এর ছাত্র ও ভক্তদেরকে সংগঠিত করে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করা। আফগানিরা ছিল স্বাধীনচেতা, যুদ্ধপ্রিয় জাতি। কিন্তু উপজাতীয় অঞ্চলসমূহ ছিল বিচ্ছিন্নতার শিকার। বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে এদেরকে সংগঠিত করতে পারলে ইংরেজ বিতাড়নে একটি বলিষ্ঠ শক্তি হিসাবে তাদেরকে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। এতদুভয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য শায়খুল হিন্দ রাহ. সিন্ধীকেই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করেছিলেন।

কাবুলের পথে উবায়দুল্লাহ সিন্ধি ঃ

উস্তাদের নির্দেশানুসারে সিন্ধী রাহ. আব্দুল্লাহ, ফাতেহ্ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ আলী এই তিন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে বিনা পাসপোর্টে বেলুচিস্তান ও ইয়াগিস্তান হয়ে কাবুলের পথে যাত্রা করেন। ১৯১৫ সালের ১৫ই আগস্ট তিনি আফগান সীমান্তে পৌছেন। পরে মাওলানা মনসুর আনসারী উরফে মুহাম্মদ মিয়াকেও কাবুলে প্রেরণ করা হয়। এ সময় স্বাধীনতাকামী বহু ভারতীয় ব্যক্তিকে তিনি কাবুলে অবস্থারনত দেখতে পান। কাবুলে পৌছে তিনি আফগান বাদশাহ হাবীবুল্লাহ খান, মুঈনুস্ সুলতানাত এনায়েত উল্লাহ খান ও নায়েবুস্ সুলতানাত সর্দার নাসরুল্লাহ খানের সাথে দেখা করেন।

বাদশাহ সিন্ধীর কথাবার্তা ও বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ভারত স্বাধীনতার পক্ষে সেখানে কাজ করে যাওয়ার অনুমতি দেন এবং তাঁকে তুর্কী জার্মান মিশনের সাথেও যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে একযোগে কাজ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

তুর্কী-জার্মান মিশনের প্রতিনিধি রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও বরকতুল্লার সাথে পরিচিত হওয়ার পরে সিন্ধী কাবুলে একটি 'অস্থায়ী ভারত সরকার' গঠন করার সিদ্ধান্তে উপনীত হন। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্ট, বরকতুল্লাহকে প্রধানমন্ত্রী ও সিন্ধীকে ভারতমন্ত্রী তথা প্রতিরক্ষামন্ত্রী করে এই অস্থায়ী সরকারের অবকাঠামো ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সিন্ধী তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রেখে অচিরেই অস্থায়ী সরকারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করেন।

এই অস্থায়ী সরকারে কতিপয় তুর্কী ও জার্মানীও ছিল। কিছুকালের মাঝেই জার্মান সদস্যদের সাথে মিশনের কর্মসূচীর ব্যাপারে ভারতীয়দের মতানৈক্য সৃষ্টি হয়।

এই মতানৈক্য নিরসনের জন্য সিন্ধী আফগান সরকারে উপস্থিতিতে মিশনের জন্য অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও যুক্তিযুক্ত একটি কর্মসূচী পেশ করে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তাছাড়া এই অস্থায়ী সরকারে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক গুরুত্ব কতটুকু থাকবে এ নিয়ে মিশনের হিন্দু মুসলমান সদস্যদের মাঝে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিলে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ হিন্দুদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার কারণে হিন্দুদেরকে প্রাধান্য দেওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং তারাই মিশনের প্রতিনিধিত্ব করবে বলে রায় দেন। সিন্ধী এ সময়ও মহেন্দ্র প্রতাপের সাথে একটি গ্রহণযোগ্য সমঝোতায় উপনীত হন, যার ফলে মহেন্দ্র প্রতাপ মুসলমানদেরকে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব প্রদানে সম্মত হতে বাধ্য হন। মাওলানা উবাদুল্লাহ সিন্ধী, মাওলানা আনসারী ও মাওলানা সায়ফুর রহমানের পরামর্শে আফগানিস্তানে অবস্থানরত স্বাধীনতাকামী আলেম উলামা ও নওজোয়ান ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এবং শায়খুল হিন্দ রাহ.-এর সে দেশীয় শিষ্যদের সমন্বয়ে 'জুনুদে রাব্বানী' নামে একটি সশস্ত্র সংগ্রামী বাহিনীও গড়ে তুলেছিলেন, যারা তৃতীয় আফগান যুদ্ধে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল। পরে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠিত হলে এ বাহিনীকে তাদের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

হিজাজের পথে শায়খুল হিন্দ ঃ

এদিকে শায়খুল হিন্দ রাহ. মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রাহ.-কে সঙ্গে নিয়ে ১৯১৫ ইংরেজির ১৮ই সেপ্টেম্বর তুরস্কের উদ্দেশ্যে বোম্বাই থেকে রওয়ানা করে জাহাজে জিদ্দা হয়ে অক্টোবরে গিয়ে মক্কায় পৌছেন। মক্কা-মদীনা তথা হিজায ছিল তখন তুরস্কের শাসনাধীন। মক্কা পৌছে তিনি তুর্কী সরকারে নিযুক্ত হিযাজের গভর্ণর গালিব পাশার সাথে সাক্ষাত করেন এবং নিজের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। এতদসঙ্গে তুরস্কের যুদ্ধমন্ত্রী আনোয়ার পাশার সাথে দেখা করার অভিপ্রায়ের কথাও ব্যক্ত করেন। গালিব পাশা মদীনায় নিযুক্ত তুর্কী গভর্নর বসরী পাশার নামে একটি পত্র দিয়ে শায়খুল হিন্দ রাহ. কে মদীনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন এবং আনোয়ার পাশার সাথে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মদীনার গভর্নর বসরী পাশাকে নির্দেশ দেন।

এ সময় মাওলানা মাহমূদ হাসান রাহ. গালিব পাশার কাছ থেকে আরো দু'টি চিঠি লেখিয়ে নিয়েছিলেন। এর একটি ছিল ভারতবর্ষ ও তৎপার্শ্ববর্তী দেশ যথা আফগানিস্তান ও সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য গালিব পাশার পক্ষ থেকে আহ্বান। যাকে ইতিহাসে 'গালিবনামা' বলে আখ্যায়িত করা হয়। আর অপর পত্রটি ছিল আফগান সরকারের প্রতি যাতে মাওলানা মাহমূদ হাসান রাহ. এর প্রস্তাবনা মাফিক তুর্কী বাহিনী আফগানিস্তানের মাঝ দিয়ে অগ্রসর হয়ে ভারত আক্রমণের পরিকল্পনার প্রতি তুর্কী সরকারের অনুমোদনের কথা উল্লেখ ছিল এবং এ চিঠিতে আফগান সরকারকে এ মর্মে নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়েছিল যে তুর্কী

বাহিনী আফগানিস্তানের কোন অংশে হস্তক্ষেপ করবে না। ইতিহাসে একে 'গালিব চুক্তিনামা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

গালিব পাশার চিঠি নিয়ে শায়খুর হিন্দ রাহ. মদীনায় গেলে মদীনার গভর্নর তাঁকে জানান যে, আনোয়ার পাশা নিজেই রওযা মুবারকের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় আসছেন। অতএব তাঁর তুরস্কে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। যথার্থই কিছুদিনের মাঝে আনোয়ার পাশা মদীনায় আসলে গভর্নর আনোয়ার পাশার সাথে শায়খুল হিন্দের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন। আনোয়ার পাশা তাঁকে বৃটিশের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সহায়তা দানের আশ্বাস দেন। তাঁদের মাঝে এমর্মে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়।

আনোয়ার পাশা থেকেও তিনি তিনটি পত্র লেখিয়ে নিয়েছিলেন। এর একটি ছিল বিপ্লবী সরকার ও তুর্কী সরকারের মাঝে চুক্তি সম্পর্কিত। দ্বিতীয়টি ছিল মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের প্রতি, যাতে মাওলানা মাহমূদ হাসান রাহ.কে সর্বাত্মক সহায়তা দানের জন্য আনোয়ার পাশার পক্ষ থেকে মুসলিম বিশ্বের প্রতি আহ্বান। তৃতীয়টি ছিল আফগান সরকারের প্রতি, যাতে আফগানের সম্মতি থাকলে তুর্কী সরকার ভারত আক্রমণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছিল।

রেশমী রুমাল কাহিনী ঃ

আফগান সরকারকে লেখা আনোয়ার পাশার তৃতীয় চিঠিটির মর্ম এরূপ ছিল যে, 'আফগন সরকারের সম্মতি থাকলে ১৯১৭ ইং সালের ১৯ শে ফেব্রুয়ারি তুর্কী বাহিনী আফগান সীমান্তের মধ্য দিয়ে বৃটিশ-ভারত আক্রমণ করবে এবং সাথে সাথে ভারতের অভ্যন্তরেও বিদ্রোহ ঘটবে'।

কথা ছিল আফগান সরকার কর্তৃক এই চুক্তি অনুমোদিত হলে অনুমোদন পত্রটি মদীনায় অবস্থানরত মাওলানা মাহমূদ হাসান রাহ. এর মাধ্যমে তুর্কী সরকারের হাতে পৌঁছাতে হবে। অনুরূপভাবে তুর্কী সরকারের যুদ্ধের নির্দেশনামাটিও ১৯১৭ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে কাবুলের সদর দফতরে পৌঁছাতে হবে। অতপর কাবুলের সদর দফতর দিল্লীর সদর দফতরকে ১৯১৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারির মধ্যেই এ সংবাদটি সরবরাহ করবে। এসব কিছু চূড়ান্ত হলে ৯ই ফেব্রুয়ারি তুর্কী বাহিনী আফগানিস্তানে অবস্থান গ্রহণ করবে এবং ১৯ শে ফেব্রুয়ারি ভারতে অভিযান শুরু করবে। মাওলানা মাহমূদ রাহ. এ সময় আফগানিস্তানে অবস্থান করবেন।

এই পত্রটি মাওলানা হাদী হাসান হিজায থেকে বহন করে নিয়ে এসে আফগানিস্তানে অবস্থানরত অস্থায়ী ভারত সরকারের কাছে পৌঁছে দেন। কাবুলস্থ ভারতীয় নেতৃবৃন্দ মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর নেতৃত্বে এ চিঠি নিয়ে আফগান বাদশাহ হাবীবুল্লাহর সাথে সাক্ষাত করেন। বাদশাহ নিজে পররাষ্ট্র বিষয়ে ইংরেজদের কাছে নতজানু হওয়ার কারণে স্বতঃফূর্তভাবে তিনি বিষয়টি গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর পুত্র সর্দার ইনায়েত উল্লাহ ও সর্দার আমান উল্লাহ

এবং তাঁর ভ্রাতা ভাবী আফগান সম্রাট নসরুল্লাহ খানসহ সরকারের অপরাপর গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তিবর্গ ও দেশের জনসাধারণের আগ্রহের কারণে তিনি বিষয়টিকে নাকচ করতে পারেননি। অগত্যা পরিস্থিতির চাপে ১৯১৬ইং সালের ২৪ শে জানুয়ারী অস্থায়ী ভারত সরকারের সাথে তিনি এ মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। যে চুক্তির ভাষ্য ছিল এরূপ যে, 'আফগান সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবেন, তুর্কী ফৌজ আফগান সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করবে। আফগান সরকার বৃটিশ সরকারকে এ মর্মে কৈফিয়ত দিবে যে সীমান্তের উপজাতীয়দের বিদ্রোহ আফগান সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল; যে কারণে তুর্কীদেরকে ঠেকানো সম্ভব হয়নি। তবে ব্যক্তিগতভাবে কেউ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাইলে এ ব্যাপারে তার কোনরূপ আপত্তি থাকবে না।'

এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে মাও. সিন্ধী ও আমীর নসরুল্লাহ খান উক্ত চুক্তিনামার বিষয়বস্তু আক্রমণের তারিখসহ আরবীতে রূপান্তর করেন। অতপর একজন দক্ষ কারিগর দ্বারা একটি রেশমী রুমালের গায়ে সেই আরবী ভাষ্য সুতার সাহায্যে অংকিত করে, সেটিকে মক্কায় অবস্থানরত শায়খুল হিন্দ রাহ. এর নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এই অভিনব পন্থা অবলম্বনের মূল হেতু ছিল বৃটিশ বাহিনীর কড়া তল্লাশি এড়ানো এবং তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে খবরটি নির্বিঘ্নে মদীনায় পৌঁছানো।

চুক্তিপত্র রূপী এই রুমালটি বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য শায়খুল হিন্দ রাহ. এর একনিষ্ঠ ভক্ত এবং পূর্ব থেকেই এ কাজে জড়িত নওমুসলিম শায়খ আব্দুল হককে নিযুক্ত করা হয়। তিনি আফগান ও ভারতের মাঝে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। কথা ছিল তিনি এরূমালটি সিন্ধুর শায়খ আব্দুর রহীমের নিকট পৌঁছে দিবেন, এবং শায়খ আব্দুর রহীম হজ্জ করতে গিয়ে তা শায়খুল হিন্দ রাহ. এর হাতে পৌঁছে দিবেন।

শায়খ আব্দুল হক রুমালটি কাবুল থেকে পেশাওয়ার পর্যন্ত বহন করে নিয়ে আসেন, কিন্তু পেশাওয়ারের বৃটিশ গোয়েন্দাদের কড়া তল্লাশী দেখে তিনি রূমালটি নিজে বহন করা সমীচীন মনে করেননি। সুতরাং তিনি তা লোক মারফত শায়খ আব্দুর রহীমের নিকট পৌছানোর ব্যবস্থা করেন। বেশ কয়েক জনের হাত বদল হয়ে পত্রটি শায়খ আব্দুর রহীমের নিকট পৌঁছে।

এদিকে আমীর হাবীবুল্লাহ খান ইংরেজদের থেকে বিরাট অংকের আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে গোপনে এসব তথ্য ইংরেজ সরকারকে সরবরাহ করে। ফলে গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করা হয় এবং ১৯১৬ইং ৯ই জুলাই গোয়েন্দা পুলিশ শায়খ আব্দুর রহীমের বাড়ী থেকে তল্লাশী চালিয়ে রেশমী রুমাল রূপী পত্রটি উদ্ধার করে ফেলে। শায়খ আব্দুর রহীম কোন মতে পুলিশের নজর এড়িয়ে পলায়ন করেন এবং চিরতরে আত্মগোপন করেন। এভাবেই এই গোপন তৎপরতার কথা ইংরেজ সরকারের নিকট ফাঁস হয়ে যায়। ফলে এ আন্দোলনের কর্মী ও নেতাদের গ্রেফতার করা শুরু হয়।

শায়খুল হিন্দ রাহ. এর বৃটিশ বিরোধী তৎপরতা সম্পর্কে ইংরেজ গোয়েন্দারা বেখবর ছিল না। ভারতে থাকাকালেই ইংরেজ গোয়েন্দারা তার প্রতি সন্দিহান ছিল। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তারা তাঁকে গ্রেফতার করতে পারেনি। অবশ্য মাও. আব্দুল হক হক্কানীর নামে প্রচারিত তুর্কী খিলাফতের বিরুদ্ধে একটি ফতওয়ায় দস্তখত না করায় ইংরেজ গোয়েন্দাদের সন্দেহ আরো গাঢ় হয়। এমতাবস্থায় তাঁকে যে কোন সময় বন্দী করা হতে পারে এ আশংকা করেই ডঃ আনসারী ও মাও. আবুল কালাম আযাদ তাকে দেশ ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরে যখন শায়খুল হিন্দ হিজাযের পথে রওয়ানা করলেন তখন ইংরেজ গোয়েন্দারা তাকে পর্যায়ক্রমে বোম্বেতে, এডেনে, জিদ্দায়, বন্দী করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। জাহাজ থেকে আবতরণের পর সি, আই, ডি পুলিশের একটি দল হাজীদের বেশে তাকে অনুসরণ করেছিল। কিন্তু তুর্কী সৈন্যরা তাদেরকে গ্রেফতার করে পুলিশের তত্ত্বাবধানে শায়খুল হিন্দের হজ্জ সমাপন করিয়ে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাকে রক্ষা করেছিলেন।

কিন্তু রেশমী রুমাল ইংরেজ গোয়েন্দাদের হস্তগত হওয়ার পর তাদের আর কোন সন্দেহই থাকেনি। ফলে তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠে। আর পরিস্থিতিও তখন তাদের অনুকূলে চলে যায়।

শায়খুল হিন্দের গ্রেফতারী ঃ

শায়খুল হিন্দ রাহ. যখন হিজাযে পৌছেছিলেন তখন হিজায ছিল তুর্কী খিলাফতের অধীন। মক্কা-মদীনার শাসন ক্ষমতা তুর্কীদের হাতে থাকার কারণে তুর্কী খিলাফত বিশ্ব মুসলিমের অন্তরে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। এই ভালবাসা তুর্কী খিলাফতের জন্য ছিল এক বিরাট শক্তি। সুচতুর ইংরেজরা মক্কা মদীনার শাসন ক্ষমতা থেকে তুর্কীদেরকে উচ্ছেদ করে তাদের প্রতি বিশ্ব মুসলিমের সহানুভূতিকে বিনষ্ট করার হীন উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির মানসে হিজাযে আরব জাতীয়তার ধোঁয়াতুলে তুর্কী খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে উস্কে দিয়েছিল। শরীফ হুসাইন নামে জনৈক ব্যক্তিকে তারা একাজের জন্য হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। বিভিন্ন উপায়ে অরাজকতা ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে তুর্কী খিলাফতের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। ইংরেজরা শরীফ হুসাইনকে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে। ইংরেজদের মদদপুষ্ট হয়ে শরীফ হুসাইন তুর্কী খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মক্কায় তুর্কী বাহিনীর যে কয়েক হাজার সৈন্য ছিল তাদের অধিকাংশই ছিল আরবী। যুদ্ধ শুরু হলে তারা আরব জাতীয়তার শ্লোগানে প্রভাবিত হয়ে শরীফের দলে যোগ দেয়। ফলে তুর্কীদের হিজাযে টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। এভাবে ১৯১৬ইং সালের ১০ই জুন তুর্কী শাসনের অবসান ঘটিয়ে শরীফ হুসাইন হেজাযের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। গালিব পাশা এ সময় তায়েফে ছিলেন এবং শায়খুল হিন্দ ও তাঁর সাথী সঙ্গীরাও

গালিব পাশার সাথে আলাপ আলোচনা চূড়ান্ত করার জন্য তায়েফে অবস্থান করছিলেন। অভ্যূত্থান ঘটলে গালিব পাশাকে সেখানেই বন্দি করা হয়। শায়খুল হিন্দ ও তাঁর সাথীরা কোন মতে পালিয়ে মক্কায় চলে আসেন।

এদিকে ভারতীয় মুসলমানদেরকে তুর্কী খিলাফতের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তোলার মানসে ভারত থেকে খান বাহাদুর মোবারক আলী নামে জনৈক ব্যক্তিকে শরীফ হুসাইনের নিকট এমর্মে একটি চিঠি দিয়ে প্রেরণ করা হয় যে, হেরেমের মুফতীদের দ্বারা তুর্কী খলিফাদের বিরুদ্ধে একটি ফত্ওয়া তৈরি করিয়ে তা যেন ভারত বর্ষে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, কারণ হেরেমের মুফতীদের ফত্ওয়া ভারতীয় মুসলমানদের অন্তরে তুর্কীদের ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাল কাজ করবে। এ ফতওয়া শায়খুল হিন্দ রাহ.-এর নিকটও পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তাতে স্বাক্ষর করেননি। কারণ তিনি ইংরেজদের ডিপ্লোমেসী ভালভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এতে শরীফ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। অপরদিকে রেশমী রুমালের তথ্যের ভিত্তিতে জিদ্দায় কর্মরত ইংরেজ অফিসার কর্নেল ওয়েলসন শরীফের নিকট এমর্মে তারবার্তা পাঠায় যে, মাও. মাহমূদকে বন্দী করে জিদ্দায় পাঠিয়ে দেওয়া হউক। অবস্থা আঁচ করতে পেরে শাইখুল হিন্দ অন্যান্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে আত্মগোপন করেন।

শরীফের পুলিশ শায়খুল হিন্দকে না পেয়ে তার একনিষ্ঠ শিষ্য ও আন্দোলনের বলিষ্ঠ নেতা মাও. উযায়ের গুল ও মাও. ওয়াহীদ আহমদকে গ্রেফতার করে এবং এমর্মে ফরমান জারী করে যে, যদি ২৪ ঘণ্টার মাঝে তাকে উপস্থিত করা না হয় তাহলে তার দুই সাথী উযায়ের গুল ও ওয়াহীদ আহমদকে ফায়ারিং স্কোয়ার্ডে গুলি করে হত্যা করা হবে। এ ঘোষণা শুনে শায়খুল হিন্দ নিজেই এসে পুলিশের হাতে ধরা দেন। তাকে বন্দি করে (ডিসেম্বর ১৯১৬ইং) জিদ্দায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হযরত হুসাইন আহমদ মদনী বৃদ্ধ উস্তাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য লোক মারফত শরীফকে জানান যে, হুসাইন আহমদই মূল অপরাধী তাকে বন্দি করা প্রয়োজন। এ সংবাদের ভিত্তিতে তাকেও বন্দি করে জিদ্দায় প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে শায়খুল হিন্দ মদীনায় যাওয়ার পর তার একনিষ্ট শিষ্য হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহ.-এর বাস ভবনেই অবস্থান করতেন।

গ্রেফতারীর এক মাস পর ১৯১৭ইং ১২ই জানুয়ারী তাদেরকে জিদ্দা থেকে মিশরে প্রেরণ করা হয়। চার দিন পর তারা সুয়েজ প্রণালীতে পৌঁছেন। সেখান থেকে তাদের সশস্ত্র পাহারায় প্রথমে কায়রো এবং সেখান থেকে নীল নদের অপর প্রান্তে অবস্থিত পিরামিডের শহর জীযা'র কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পৌছার পরদিন থেকে শুরু হয় পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সর্ব প্রথম শায়খুল হিন্দ রাহ. কে দু'জন সশস্ত্র পুলিশের পাহারায় ট্রেমওয়ে নগরীতে নিয়ে যাওয়া হয়। এ শহরেই বৃটিশের পশ্চিমাঞ্চলীয় সামরিক হেড কোয়ার্টার অবস্থিত ছিল। তিন জন ইংরেজ অফিসারের উপস্থিততে জবানবন্দী গ্রহণ শুরু হয়।

গোয়োন্দা রিপোর্ট তাদের সম্মুখে ছিল। শায়খুল হিন্দ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় কর্কশ কণ্ঠে তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যান। অনেক দীর্ঘ ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। অবশেষে তারা নিজেরা বলাবলি করে যে, আমাদের নিকট যে রিপোর্ট রয়েছে তাতে ফাঁসী অনিবার্য। কিন্তু রেকর্ড পত্র পর্যাপ্ত না থাকায় আমরা সে নির্দেশ দিতে পারছিনা। এক এক করে সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। শায়খুল হিন্দের সঙ্গে তখন সেখানে ছিলেন হযরত মদনী, মাও. উযায়ের গুল, মাও. ওয়াহীদ আহমদ ও হাকীম নুসরত হুসাইন ফতেহপুরী।

এক মাস সেখানে তাদেরকে ফাঁসির আসামীর ন্যায় অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারী তাদেরকে আসবাব পত্র গুছিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। এবং ১৯১৭ইং ১৭ই ফেব্রুয়ারী আপোষহীন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এ কাফেলাকে ভু-মধ্য সাগরীয় দ্বীপ মাল্টায় নির্বাসনে প্রেরণ করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারী বিকাল চার ঘটিকায় তারা মাল্টার মাটিতে পাদুকাহীন পায়ে অবতরণ করেন।

দীর্ঘ তিন বৎসর চারমাস কাল নির্মম শারীরিক ও মানসিক নর্যাতনের মাঝে মাল্টার অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠে বন্দীজীবন কাটিয়ে ১৯২০ সালের ২০শে মার্চ তারা মাল্টা থেকে ছাড়া পেয়ে স্বদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দীর্ঘ তিন মাস পরে তাদেরকে বোম্বাই বন্দরে পৌঁছানো হয়। বোম্বাইয়ে তখন খিলাফত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। স্বদেশের আযাদীর চেতনা তাদের এতই প্রবল ছিল যে,জাহাজ থেকে নেমেই তারা খিলাফত কনফারেন্সে যোগদান করেন। এ সময়ই তাকে শায়খুল হিন্দ খেতাবে ভূষিত করা হয়।

কাবুলে উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর অবস্থা ঃ

এদিকে ১৯১৭ সালের জুন মাসে বৃটিশ সরকারের নির্দেশে আমীর হাবীবুল্লাহ খান কাবুলে মাও. উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে ও বিপ্লবী দলের অপরাপর নেতৃবৃন্দকে নজর বন্দী করেন এবং অস্থায়ী ভারত সরকারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। উবায়দুল্লাহ সিন্ধীসহ তাদের ২০/২৫ জনকে ছোট্ট একটি কুঠরীতে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। পরে সিন্ধীকে জালালাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়। অবশ্য ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে আমানুল্লাহ খান ক্ষমতায় অধিষ্টিত হয়ে দীর্ঘ ১ বৎসর আট মাস পর সিন্ধীকে কারামুক্ত করে কাবুলে ফিরিয়ে আনেন। এর পর থেকে তিনি তিন বৎসর আটমাস আমান উল্লাহ খানের আস্থাভাজন হিসাবে আমান উল্লাহর সরকারের কল্যাণে কাজ করে যান। এসময় তিনি সেখানে অস্থায়ী ভারত সরকারে বিকল্প হিসাবে কংগ্রেসের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯১৯ সালের মে ও জুনে আমান উল্লাহর সাথে বৃটিশ ভারতের যে যুদ্ধ হয় তাতে সিন্ধীর জুনূদে রব্বানীর লোকেরা যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন । ফলে আমান উল্লাহর বাহিনী জয়ী হয়। কাবুলস্থ বৃটিশ দূত হেমথ্রে বলেছিলেন এ বিজয় আফগান সরকারের নয় বরং এ বিজয় উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর।

সর্বমোট ৭বছর ৭ দিন বাকুলে অবস্থান করার পর আন্তর্জাতিক চাপের মুখে তাকে বাধ্য হয়ে কাবুল ছাড়তে হয়। ১৯২২ সালের ২২ শে অক্টোবর তিনি ভারতের

স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য নতুন ক্ষেত্র তৈরির উদ্দেশ্যে রাশিয়ার পথে যাত্রা করেন । এ ভাবেই তাদের এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। আপত দৃষ্টিতে তাদের আন্দোলনের যবনিকাপাত ঘটলেও মূলতঃ সে আন্দোলনই যুগে যুগে যুগিয়েছে স্বাধীনতার ইন্ধন।

খিলাফত আন্দোলন ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রতিষ্ঠা ঃ

উল্লেখ্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তুরস্কের খিলাফতের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা এবং তুরস্কের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য ভারতবর্ষ থেকে মুজাহিদ প্রেরণ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করে স্বদেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সুমহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাও. মুহাম্মদ আলী জওহরের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় খিলাফত আন্দোলন এবং ভারতীয় মুসলমানদের অধিকারকে নিশ্চিত করা ও বৃটিশ বিতাড়নে উলামায়ে কিরামের তৎপরতাকে বলিষ্ঠ করার মানসে ১৯১৯ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর সর্বভারতীয় উলামাদের সমন্বয়ে গঠিত হয় "জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ"। সে সময় আবুল কালাম আযাদসহ বেশ কিছু আলেম কংগ্রেসেই থেকে যান। কিছু কিছু আলেম খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। তবে ওলামায়ে দেওবন্দের অধিকাংশ লোক জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েই কাজ করে যান। যেহেতু ইংরেজ বিতাড়নের প্রশ্নে সকল দলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন তাই তাদের একদলকে অন্য দলের সাথে সংহতি বজায় রেখে কর্মসূচী গ্রহণ করতে দেখা যায় এবং যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন সভা সমাবেশ করতেও দেখা যায়।

মাল্টা থেকে ফেরার পর শায়খুল হিন্দ রাহ. মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় কয়েক মাস কেটে যায়। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে চির স্বাধীনতাকামী আপোষহীন সংগ্রামী এই আধ্যাত্মিক সাধক স্বদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর থেকে ইন্তিকাল করেন।

শায়খুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মদনী রাহ.

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: শায়খুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মদনী রাহ. ১৮৭৯ ইং মুতাবিক ১২৯৬ হিজরীর ১৯ শে শাওয়াল ভারতের ফয়েজাবাদ জিলার ট্যান্ডায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার মাতা-পিতা উভয়েই হযরত হুসাইন রা. এর বংশধর ছিলেন। তার ১৯তম পূর্ব পুরুষেরা দ্বীনের প্রচার কার্যে ভারত বর্ষে আগমন করেছিল। সুলতানী আমল থেকেই তারা অত্র অঞ্চলের জায়গীরদারী ও জমিদারী লাভ করেছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকেও পরিবারটি বিশেষ সুখ্যাতির অধিকারী ছিল। তার পিতা হাবীবুল্লাহ সাহেব ছিলেন স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ১৪ বৎসর বয়সে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে এসে মীযান জামাতে ভর্তি হন। তখন থেকে শায়খুল হিন্দ রাহ. এর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। ১৩১৫ হিজরীতে দারুল উলূম থেকে শিক্ষা সমপ্ত করে নিজ বাড়িতে ফিরে যান। এ সময় তার পিতা ইংরেজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে

সপরিবারের মদীনা শরীফ হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হযরত মদনী মদিনায় যাওয়ার পূর্বে হযরত গাঙ্গুহীর কাছে বায়'আত হয়েছিলেন। মদীনায় গিয়ে হযরত হাজী ইমাদাদুল্লাহ রাহ. এর সাথে ইসলাহী সম্পর্কে গড়ে তুলেন এবং পরে হযরত গঙ্গুহী রাহ. থেকে খিলাফত লাভ করেন।

মদীনায় পৌঁছে দীর্ঘ ১৮ বৎসর তিনি মসজীদে নববীতে দরসে হাদীসের খিদমতে নিরত থাকেন। হযরত শায়খুল হিন্দ রাহ. মদীনায় পৌঁছলে উস্তাদের খিদমাতে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তখনই তিনি হযরত শায়খুল হিন্দ রাহ. এর সাথে আন্দোলনী তৎপরতায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। স্বেচ্ছায় কারা বরণ করে শায়খুল হিন্দের সঙ্গে তিনিও মিশর হয়ে মাল্টায় নীত হন।

হযরত মদনী রাহ. এর ভারতে প্রত্যাবর্তন ঃ

মাল্টা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর হযরত হুসাইন আহমদ মদনী রাহ. মদীনায় না গিয়ে শায়খুল হিন্দের পরামর্শে তার সঙ্গেই ভারতে চলে আসেন। শরীফ হুসাইনের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বসবাস তাঁর জন্য নিরাপদ মনে করেননি শায়খুল হিন্দ রাহ.। কেননা ইংরেজ গোয়েন্দা রিপোর্টে হযরত মদনী রাহ. কে এ আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তাছাড়াও তুরস্কের পক্ষে মদীনায় আনোয়ার পাশা ও জামাল পাশা কর্তৃক আয়োজিত দু'আর মাহফিলে জ্বালাময়ী জিহাদী বক্তৃতা দানের অপরাধেও তাকে অপরাধী করা হয়। এ ছাড়াও ইংরেজ সরকারের ফাইলে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার বিভিন্ন অভিযোগ ছিল।

শায়খুল হিন্দের আন্দোলন সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য বৃটিশ সরকার একটি কমিটি গঠন করেছিল। সে কমিটি তদন্তের পর এক হাজার পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি রিপোর্ট পেশ করে। সে রিপোর্টে এ আন্দোলনে কার কি ভূমিকা ছিল তাও সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছিল। পরবর্তী ইতিহাসে এটাকে 'রোল্ট কমিটির রিপোর্ট' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

উক্ত রিপোর্টে এও উল্লেখ করা হয় যে, "এ আন্দোলনকে সফল করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সামরিক বাহিনী গঠনের পরিকল্পনাও নেতৃবৃন্দের রয়েছে, যার সদর দফতর মদীনায় কায়েম করা হবে এবং এর প্রধান সেনাপতি থাকবে মাওঃ মাহমূদ হাসান, বিভিন্ন স্থানে এর আঞ্চলিক ঘাঁটি স্থাপনের সিদ্ধান্তও তাদের রয়েছে। প্রস্তাবিত ঘাঁটিসমূহ হচ্ছে কনসটান্টিনোপল, তেহরান এবং কাবুল। মাও. উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে কাবুলের সেনাপতি করার প্রস্তাবও তাদের রয়েছে।"

সুতরাং ইংরেজদের পোষ্যপুত্র শরীফের শাসনাধীন অঞ্চলে অবস্থান হযরত মদনীর জন্য নিরাপদ নয় মনে করেই শায়খুল হিন্দ রাহ. তাকে ভারতে চলে আসার পরামর্শ দেন।

আমরুহায় হযরত মদনী রাহ. এর শিক্ষকতা ঃ

মদীনায় মসজিদে নববীর পাশে বসে হাদীসের দরস দানের বদৌলতে ভারতের মাটিতে পা দেওয়ার সাথে সাথেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁকে হাদীসের শিক্ষক হিসাবে পাওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিল। বোম্বাই-এ সংবর্ধনা দিতে এসে আমরুহা জামে মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসার মুহতামিম মাও. হাফেজ জাহীদ হাসান সাহেব সেখানেই হযরত মদনীকে তাঁর মাদ্রাসায় সদরুল মুদাররেসীন হিসাবে নেওয়ার প্রস্তাব করেন। হযরত শায়খুল হিন্দ এ প্রস্তাব সমর্থন করেন ও সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন। এ দিকে দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত হাফেজ আহমদ সাহেব এ সংবাদ জানতে পেরে শায়খুল হিন্দ রাহ. কে জানালেন যে, দারুল উলূমে হযরত মাদানীকে পূর্ব থেকেই নিয়োগ দানের সিদ্ধান্ত হয়ে আছে। কিন্তু শায়খুল হিন্দ আমরুহায় যাওয়ার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেন। কিছুদিন ইউ, পি, তে সফর ও রাজনৈতিক সভা সমাবেশে অংশগ্রহণ করার পর শাওয়াল মাসে হযরত মদনী রাহ. আমরুহায় গমন করেন এবং নিয়মিত দরস দিতে শুরু করেন। কিন্তু দু' মাস পর অর্থাৎ মুহাররম মাসে শায়খুল হিন্দ রাহ. তাকে দেওবন্দ চলে আসার জন্য সংবাদ পাঠান। কিন্তু আমরুহার মুহতামিম সাহেব অন্য একজন শিক্ষক নিয়োগ করা পর্যন্ত তাকে সেখানে রাখার অনুমতি চাইলে খায়খুল হিন্দ সম্মত হন। কিন্তু ইতিপূর্বে শায়খুল হিন্দ ইংরেজদের সহযোগিতা না করার জন্য যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন, সে ডাকে সাড়া দিয়ে আলীগড়ের ছাত্ররা সরকারী ইউনিভার্সিটি বয়কট করে এবং একটি স্বাধীন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য বিরাট কনফারেন্স আহ্বান করে। হযরত শায়খুল হিন্দ ছিলেন তার সভাপতি। এ সময় শায়খুল হিন্দ হযরত মদনীকে আমরুহা হতে সরাসরি আলীগড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। অগ্যতা তিনি আলীগড়ে চলে যান। সম্মেলন শেষে 'জামিয়া মিল্লিয়া'র উদ্বোধন করতঃ শায়খুল হিন্দ দিল্লীতে ফিরে আসেন। হযরত মদনীও তার সাথে দিল্লী চলে আসেন। ঠিক এহেন মুহূর্তে (১৯২০ সালের নভেম্বরে) মাও. আব্দুল্লাহ মিশরী মাওঃ আবুল কালাম আযাদের পক্ষ থেকে এই বার্তা নিয়ে শায়খুল হিন্দের নিকট আগমন করেন যে, 'কলকাতা আলীয় মাদ্রাসার ছাত্ররাও সরকারী মাদ্রাসা বর্জন করেছে এবং কলকাতার নাখুদা মসজিদে মাও. আব্দুর রাজ্জাক মালিহাবাদীকে প্রধান শিক্ষক করে একটি স্বাধীন কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানে একজন যোগ্য আলেমের প্রয়োজন। সুতরাং একজন যোগ্য ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন।" হযরত শায়খুল হিন্দ হযরত মদনী রাহ. কে সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

এদিকে ১৯২০ সালের ১৯,২০,২১ শে ডিসেম্বর দিল্লীতে হযরত শায়খুল হিন্দকে সভাপতি ঘোষণা করে জমিয়তে উলামার এক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। শারিরীক অসুস্থতার কারণে তিনি তাতে ভাষণ দিতে পারেননি। তবে তার পক্ষ থেকে "অসহযোগ" শিরোনামে একটি লিখিত ভাষণ হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ. পাঠ করে শুনান। হযরত মদনী এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলন শেষে শায়খুল হিন্দের নির্দেশ মুতাবিক মুরাদাবাদের পথে তিনি কলিকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। ট্রেন আমরুহা স্টেশনে পৌঁছলে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য আগত লোকজন তাকে জানায় যে, খলীল আহমদ সাহরানপুরী আমরুহায় অবস্থায় করছেন, তিনি তাকে সেখানে যেতে বলেছেন। অগত্যা তিনি আমরুহায় নেমে যান। খলীল আহমদ সাহারানপুরীর সাথে দেখা করলে তিনি তাকে জানান যে, এখানে শিয়া ও সুন্নীদের মাঝে একটি বাহাসের প্রস্তুতি চলছে। অথচ বিষয়টি সময়ের প্রশ্নে বড়ই নাজুক। কারণ ইংরেজ বিতাড়নের প্রশ্নে সর্বভারতীয় ঐক্যই এখন সময়ের বড় দাবী। এ সময়ে এ ধরনের একটি বিতর্ক কারো নিকট কাংখিত হতে পারে না। সুতরাং কোন একজন জাতীয় পর্যায়ের ব্যক্তির মাধ্যমে এই বাহাস মূলতবী করানোর উদ্দেশ্যেই তিনি তাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছেন।

সুতরাং শহরময় ঘোষণা হয়ে গেল, 'শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানী বক্তৃতা করবেন।' দু' পক্ষের লোকই সমবেত হয়। তিনি দুই আড়াই ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় উপস্থিত জনতার সামনে বিশ্বব্যাপীয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের চিত্র তুলে ধরেন এবং একথা বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, এ মুহূর্তে দলমত নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদ ইংরেজকে তাড়াতে হবে। কেননা ওরা টিকে থাকতে কোন ধর্ম ও মতাদর্শের লোকেরাই নির্বিঘ্নে ধর্মকর্ম পালন করতে পারবে না। কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পবিত্র স্থানই রক্ষা পাবে না। তাই এসময় আমাদের সুসংগঠিত হওয়া প্রয়োজন, এ সময় নিজেদের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করার সময় নয়। তার এ ভাষণে উভয় দল খুশী হয়ে ফিরে যায় এবং বাহাস মুলতবী হয়ে যায়।

সম্মেলন শেষে তিনি কলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন, এ সময় দিল্লী থেকে টেলিগ্রাম আসল যে, শায়খুল হিন্দ রাহ. ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর লাশ জানাযা ও দাফন কাফনের জন্য দেওবন্দে পাঠানো হচ্ছে। অগ্যতা তিনি কলকাতায় না গিয়ে দেওবন্দের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

দাফন কাফন শেষে কয়েকদিন দেওবন্দে অবস্থান করার পর শায়খুল হিন্দের অন্তিম নির্দেশ পালনার্থে তিনি কলকাতার পথে রওয়ানা হয়ে যান। এ সময় হাফেজ আহমদ সাহেব তাকে দেওবন্দের শিক্ষক হিসাবে থেকে যাওয়ার জন্য পুর্ণবার অনুরোধ করেন, কিন্তু শায়খুল হিন্দের নির্দেশ পালন ছিল তার কাছে অনেক বড়।

হযরত মদনী রাহ. এর রাজনৈতিক তৎপরতা ঃ

মাল্টা থেকে ফেরার পর বেশ **কয়েকটি রাজনৈতিক** সম্মেলনে তিনি হযরত শায়খুল হিন্দের সঙ্গে সঙ্গে থেকেছেন। যেমন বোম্বাইয়ের খিলাফত কনফারেন্স, কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় কনফারেন্স এবং দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের কনফারেন্স ইত্যাদি।

কিন্তু শায়খুল হিন্দের অবর্তমানে অঘোষিত ভাবে তিনিই এ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। মুলতঃ কলকাতায় শিক্ষকতার জীবন থেকেই শুরু হয় তাঁর মূল রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা। এ সময় খেলাফত আন্দোলন ছিল তুঙ্গে। অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে সারা দেশে মিটিং মিছিল সভা সমাবেশের হিড়িক পড়ে যায়। এ সময় হযরত মদনী দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সভা সমাবেশে যোগদান করে ইংরেজ বিরোধী তৎপরতা জোরদার করার জন্য জনগণকে অনুপ্রাণিত করেন। ১৯২১ সালে কলকাতার মৌলভী বাজারে অল-ইন্ডিয়া কংগ্রেস, খেলাফত আন্দোলন ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের উদ্যোগে এক বিরাট যৌথ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশে তিনি সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২১ইং সালে সিউহারার বিজনৌরে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ও খিলাফত কনফারেন্সের পৃথক পৃথক সম্মেলন একই মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। জমিয়তের অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন মাও. হাবীবুর রহমান উসমানী (ভাইস প্রিন্সিপাল, দারুল উলূম দেওবন্দ) আর খিলাফত কনফারেন্সের অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন হযরত মদনী রাহ.। এ সম্মেলনে তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য পেশ করেছিলেন।

খিলাফতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার পর এর সময় কাল যে ত্রিশ বৎসরের মাঝে সীমিত নয়, তিনি যুক্তি প্রমাণসহ তা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করেন। তুর্কী খিলাফতের সদিচ্ছার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনার পর তিনি এই বিভ্রান্তির অপনোদন করতে চেষ্টা করেন যে, 'বৃটিশ সরকারের সাথে ভারতীয়দের যে চুক্তি হয়েছে তা লঙ্গণ করা সমীচীন হবে না।' তিনি অকাট্য প্রমাণাদি পেশ করে বলেন যে, মূলতঃ বৃটিশ সরকার ও মুসলমানদের মাঝে কোন চুক্তি নেই, থাকলেও বর্তমানের প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের জন্য তা মানা জরুরী নয়। কেননা বৃটিশরা নিজেরাই সে চুক্তি ভঙ্গ করেছে। মক্কা মদীনা, হিজায, তায়েফ ইত্যাদি অঞ্চলের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ চালিয়েছে, বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করে নিয়েছে, কাজিমীন, নজদ, কারবালা, বাগদাদ ইত্যাদি অঞ্চলের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে, সুতরাং মুসলমানদের জন্য তাদের চুক্তি রক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই।

তিনি সে ভাষণে আরো বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা এজন্যও প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ছাড়া মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা কোন কালেই অর্জিত হবে না। অথচ ধর্মীয় স্বাধীনতা মুসলমানদের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ ও বুনিয়াদী বিষয়। তাছাড়া ভারত বর্ষের স্বাধীনতার সাথে মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন জড়িত। ভারত স্বাধীন হলে তারাও স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে। মূলতঃ ভারতের উপর ভিত্তি করেই তারা সে সব দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে।

এছাড়াও তিনি তার সে ভাষণে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। যা ছিল তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার উৎকৃষ্ট দলীল।

বঙ্গীয় অঞ্চলে হযরত মদনীর রাজনৈতিক তৎপরতা ঃ

১৯২১ সালের ২৫ মার্চে রংপুর জিলার রহিমগঞ্জে উলামায়ে বাঙ্গালের উদ্যোগে বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সেখানেও সভাপতিত্ব করেন। এ সম্মেলনে বাংলার বিরাট সংখ্যক আলেম উলামা উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার পর আলেম উলামাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাদেরকে স্মরণ কিরয়ে দেন। তিনি বলেন "উলামায়ে কিরামের কি দায়িত্ব ছিলনা গ্রামে গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে বুঝানো যে, এই সরকারের সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে চাকুরী করা হারাম, যদি হালাল মনে করে কেউ চাকুরী করে, আর সরকারের নির্দেশে মুসলমানদেরকে হত্যা করে তাহলে কাফির হয়ে মরবে জাহান্নামী হবে।"

অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি বঙ্গীয় কতিপয় আলেমের আপত্তি ছিল। তিনি সে সম্মেলনে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে দেন।

করাচীর খিলাফত কনফারেন্সে হযরত মদনীর ঘোষণা ঃ

১৯২১ ইং সালের ৮ই সেপ্টেম্বর করাচীতে মাও. মুহাম্মদ আলী জাওহারের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত খেলাফত কনফারেন্সের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের সিদ্ধান্তাবলী ঘোষণা করেন হযরত মদনী। তিনি প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করেন যে, 'বৃটিশ সরকারের পুলিশ ও সেনবাহিনীতে চাকুরী করা সম্পূর্ণ রূপে হারাম'। এ ফত্ওয়া ছাপিয়ে সারাদেশে প্রচার করা হয়। এ প্রস্তাবের সমর্থন করেছিলেন মাও. মুহাম্মদ আলী জওহর, মাও. শওকত আলী ও মাও. নেছার আহমদ। ফত্ওয়ায় শায়খুল ইসলামের সাথে স্বাক্ষরকারী ছিলেন মাও. নেছার আহমদ ও পীর গোলাম মুজাদ্দিদ। এ ফতওয়ায় দস্তখত কারীদের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারী করা হয়।

করাচীর সম্মেলনের আড়াই মাস পর ১৮ই সেপ্টেম্বর হযরত মদনীকে রাতের বেলায় হযরত শায়খুল হিন্দের বাড়ী থেকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে গ্রেফতার করতে গিয়ে পুলিশকে যথেষ্ট ধকল পোহাতে হয়। এমনকি জনসাধারণের হাতে কিল-থাপ্পরও বাদ যায়নি। অবশেষে সাহারানপুর থেকে রিজার্ভ ফোর্স আনিয়ে রাতের বেলায় তাঁকে অ্যারেষ্ট করে নিয়ে যাওয়া হয়। সকালে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সারা শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয়।

গ্রেফতার করে তাকে করাচী জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর করাচীর খালেক দ্বীনা হলে এই ঐতিহাসিক মামলার শুনানী শুরু হয়। হযরত মদনী সে মামলায় কোন উকিল নিযুক্ত করেননি। নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন, 'মাননীয় আদালতের সকল প্রশ্নের জবাব আমি নিজেই লিখিতভাবে পেশ করব।'

সেই নজীর বিহীন বক্তৃতায় তিনি প্রথমে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে যে ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া আছে সে কথা আদালতকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

"আমি একজন মুসলমান এবং একজন আলেমও বটে। মুসলমান হিসাবে কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি দ্বিধাহীন বিশ্বাস রাখা আমার দায়িত্ব। আর আলেম হিসাবে কুরআন ও সুন্নাহর বাণী সাধারণ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া আমার কর্তব্য"। অতঃপর এ বিষয়ে তিনি কুরআন হাদীসের বহু দলীল প্রমাণ পেশ করেন এবং বলেন যে, ইসলামী ফিকাহ বিশেষজ্ঞ মাও. আব্দুল হাই ফিরিঙ্গী মহল্লী, শাহ আব্দুল আযীয ও হযরত থানভী রাহ. প্রমূখ মনীষীগণও ইংরেজ সরকারের অধীনে সেনাবাহিনীতে চাকুরী করা হারাম বলে ফতওয়া দিয়েছেন। অতএব একথা সুস্পষ্ট যে, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের এ সিদ্ধান্ত নতুন কোন বিষয় নয়, এটা ইসলামী আকীদার চিরন্তন ফায়সালা। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে ইসলামের এ বিধানকে প্রচার করা আমি আমার ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করি। আর এর প্রচারে বাধা প্রদানকে আমি আমার ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে মনে করি। এ বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে এসে তিনি বলেন, আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নস্যাৎ করাই যদি সরকারের উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে দেওয়া হউক। তখন সাত কোটি মুসলমান চিন্তা করে দেখবে যে, তারা কি মুসলমান হিসাবে বেঁচে থাকবে না সরকারের প্রজা হিসাবে বেঁচে থাকবে? অনুরূপভাবে ২২ কোটি হিন্দুরাও চিন্তা করে দেখবে তাদের কি করা উচিৎ। কারণ ধর্মীয় স্বাধীনতা যখন হনন করা হবে তখন সব ধর্মেরই করা হবে। আর যদি লর্ড রেডংগকে এজন্যই ভারতে প্রেরণ করা হয়ে থাকে যে, সে কুরআন সুন্নাহকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে; তাহলে ইসলামের জন্য সর্ব প্রথম প্রাণ দানকারী আমিই হব।

কারাবন্দী হযরত মদনী ঃ

তিন দিনের দীর্ঘ শুনানীর পর সকল আসামীকে ২ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সাবরমতি জেলে। জেলখানায়ও তাদের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। কিন্তু এ মর্দেমুমিনকে কারার অবদ্ধ প্রাচীরও নিরস্ত করতে পারেনি। জেলখানার অভ্যন্তরে বিভিন্ন অনাচারের বিরুদ্ধেও তিনি হয়ে উঠেন আন্দোলন মুখর।

করাচীতে কারাবন্দী থাকা অবস্থায় তিনি দেওবন্দবাসীদের উদ্দেশ্যে যে দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন তার এক স্থানে তিনি লিখেন- আমাদেরকে জোরদার মুকাবিলা ক তে হবে- কুরআন ও হাদীস আমাদেরকে এ পথেই আহ্বান জানায়। সুতরাং যতদিন আমরা অভিষ্ট্য লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারব অর্থাৎ ভারত বর্ষের স্বাধীনতা, আরব বিশ্বের স্বাধীনতা ও হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা অর্জিত না হবে, পাঞ্জাবসহ সারাদেশ জুড়ে বর্বরদের জুলুম ও নির্যাতনের প্রতিশোধ নিতে সক্ষম না হব ততদিন পর্যন্ত দুর্বার গতিতে আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

সে চিঠির অন্যস্থানে তিনি লিখেন– 'কাজ যেন দ্রুত গতিতে চলতে থাকে, এ সময় পারস্পরিক মতবিরোধ থেকে আমাদেরকে উর্ধ্বে থাকতে হবে। আমা-

ভারতের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় লক্ষ্যগুলো সফলতার দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে। আল-হামদুলিল্লাহ! দেশ ও জাতি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। আমরা দুর্বল হলেও আল্লাহর সাহায্যে আমাদের সঙ্গে রয়েছে। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা ঐ ইংরেজ বেনিয়া গোষ্ঠীকে বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করে জাহান্নামের অতল গহবরে নিক্ষেপ করে ছাড়ব ইনশা-আল্লাহ।'

মুলতঃ এ সকল বক্তব্য থেকে হযরত মাদানী রাহ. এর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তিনি মুসলিম উম্মার মুক্তির জন্য ইংরেজ বিতাড়নের প্রশ্নকেই বড় করে দেখেছেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল- আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত ক্ষমতাসীন শক্তিকে বিতাড়িত করা কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের দ্বারা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সর্বভারতীয় ঐক্য। তাই এ প্রশ্নে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতীয়কে ঐকব্যবদ্ধ হয়ে একজাতির ন্যায় একই প্লাটফর্মে সমবেত হয়ে জোর তৎপরতা চালাতে হবে। ইংরেজ বিতাড়নের প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপোষহীন, শর্তহীন। যদিও তখন অনেকেই ইংরেজদের শাসনকে আপাদত মেনে নিয়ে আপোষ রফার মাধ্যমে ভারতীদের অধিকার আদায়ের চেষ্টা তদবীরে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু হযরত শায়খুল হিন্দ ও তার শিষ্য বুজুর্গানে দ্বীন অন্তরদৃষ্টি দ্বারা যেন স্পষ্টতই দেখতে পেয়েছিলেন যে, এসব প্রচেষ্টা অর্থহীন। এ পন্থায় ইংরেজদের শোষণ থেকে, তাদের সামগ্রিক আগ্রাসন থেকে মুক্তি লাভ কিছুতেই সম্ভব হবে না। বরং ওরা ভারতের শাসন ক্ষমতায় আধিষ্ঠিত থেকে গোটা মুসলিম বিশ্বের উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে, চালিয়ে যাচ্ছে শোষণ ও নির্যাতন। সুতরাং তাদেরকে ভারতের মাটি থেকে বিতাড়িত করার কোন দুসরা বিকল্প নেই। এ কারণে প্রথম দিন থেকেই জমিয়তে ওলামার দাবী ছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে এদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা, স্বায়ত্ত্ব শাসন নয়, নিঃশর্ত স্বাধীনতা। এ প্রশ্নে যে কোন ত্যাগ ও কোরবানীর জন্য তারা প্রস্তুত ছিলেন। আর একারণেই তাঁরা সর্বভারতীয় ঐক্যের প্রয়োজন অনুভব করে ছিলেন তীব্রভাবে।

১৯২৩ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে হযরত মদনী দেওবন্দে চলে আসেন। এ সময় সারা দেশে তাকে সংবর্ধনা দেওয়ার বিপুল আয়োজন শুরু হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্য লোকেরা পীড়াপীড়ি শুরু করলে তিনি রাগ হয়ে বলেন, কিসের সম্মেলন কিসের সংবর্ধনা! আমরা কি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করতে পেরেছি? তিনি কোন সম্মেলনেই যোগদান করেননি।

কুকানাডায় জমিয়তের বার্ষিক সম্মেলন ঃ

তাঁর মুক্তির কিছু দিন পর ১৯২৩ সালে ডিসেম্বর মাসে কুকানাডায় জমিয়তের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেও তিনি সভাপতি ছিলেন।

এ সময় সারাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা অনেকটা ঘোলাটে রূপ ধারণ করেছিল। খিলাফত আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়েছিল। কেননা যে চেতনার ভিত্তিতে তুর্কী খিলাফতকে সহযোগিতা করার জন্য মুসলিম বিশ্বে জাগরণের জোয়ার সৃষ্টি

হয়েছিল, কামাল আতাতুর্কের পাশ্চাত্যবাদী চিন্তাধারার ভিত্তিতে তুরস্কের প্রশাসনে যে সংস্কার করা হয় তাতে মুসলিম বিশ্বের সেই গর্জে উঠা চেতনা ম্লান হয়ে যায়। তাছাড়া বোম্বাইয়ের কুখ্যাত গভর্নর উইলিংডন ভারতের বড় লার্ট হয়ে দিল্লীতে এসে খিলাফত আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং কর্মীদের ব্যাপক ধরপাকড়, জেল, জুলুম, নির্যাতন ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন ধরনের হয়রানি করতে থাকে। ইত্যাদি কারণে ১৯২৩ সালের এদিকে খিলাফত আন্দোলন একেবারেই নির্জীব হয়ে পড়ে। তাছাড়া ইংরেজদের কূট কৌশলে সর্বভারতীয় ঐক্য ভেঙ্গে পড়ে, আর তদস্থলে জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হানাহানি। তখন সর্বত্র হতাশা ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল। দু'বৎসর পূর্বে যেখানে সারাদেশ ছিল আবেগ ও উদ্যমে চঞ্চল, সেখানে দেখা দেয় অকল্পনীয় স্থবিরতা।

তাই কুকানাড়ার সম্মেলনের ভাষণে তিনি ঝিমিয়ে পড়া জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। তিনি অত্যন্ত আবেগময়, অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেদিন। এ সম্মেলনেও তিনি করাচীর সম্মেলনের সিদ্ধান্তাবলী পুনঃব্যক্ত করেন।

সিলেটে হযরত মদনী ঃ

জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর দারুল উলূম দেওবন্দসহ বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে তাকে শিক্ষক হিসাবে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। কিন্তু আসাম অঞ্চলের ধর্মীয় শিক্ষার করুণ পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে তিনি ১৯২৪ ইং সালে তৎকালে আসামের অন্তর্ভুক্ত সিলেট শহরের নয়া সড়ক মসজিদ সংলগ্ন খিলাফত বিল্ডিংয়ে শিক্ষাদানে নিরত হন। এখানে শিক্ষকতা ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের মাঝে তাঁর কেটে যায় তিন বৎসর। এ সময় তিনি সিলেট ও আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন সভা সমাবেশে অংশগ্রহণ করে দ্বীনের হিদায়াত দান ও রাজনৈতিক স্বচেতনা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দেন।

দারুল উলূমের সদরুল মুদাররিস হিসাবে হযরত মদনী ঃ

১৯২৭ ইং সালে দেওবন্দের সহকারী মুহতামিম, তাঁর উস্তাদ হযরত মাও. হাবীবুর রহমান উসমানীর পক্ষে থেকে তার নিকট এ মর্মে একটি চিঠি আসে যে, দারুল উলূমের কর্তৃপক্ষ তাঁকে দারুল উলূম তশরীফ আনতে অনুরোধ জানিয়েছেন। উস্তাদের চিঠি পেয়ে তিনি দেওবন্দে আসেন। এসময় আভ্যন্তরীণ মত পার্থক্যের কারণে হযরত মাও. আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রাহ. সহ বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ উস্তাদ দারুল উলূম ছেড়ে ডাবেলে চলে যান। এহেন শূন্যতা পুরণার্থে তৎকালীন মুহতামিম হযরত মাও. হাফেজ আহমদ সাহেব তাঁকে সদরুল মুদাররিসীন পদ গ্রহণের আবদার জানান। উস্তাদের প্রস্তাব বিধায় তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করেননি। কিন্তু তিনি জানান যে, আপনাদের নির্দেশ পালনের ব্যাপারে আমার অসম্মতি নেই। তবে বিষয়টি আরো গভীরভাবে চিন্তা করে নিলে ভাল হয়। কেননা আমি হযরত শায়খুল হিন্দ রাহ. এর মিশনকে নিজ জীবনের লক্ষ্য

ও উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেছি। কাজেই আমি যতদিন জীবিত থাকব ততদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে নিজের চেষ্টা ও সাধনাকে সর্বোতভাবে নিয়োজিত রাখব। আমি সংকল্প করেছি যে হয়ত এ পথে জীবন উৎসর্গীত হবে, নয়ত বৃটিশ বেনিয়ারা এদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত হবে। অথচ দারুল উলূমের কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত হল, কোন শিক্ষক রাজনীতির সাথে জড়াতে পারবে না। সুতরাং এ দায়িত্ব পালন আমার পক্ষে কী করে সম্ভব?"

এ শুনে কর্তৃপক্ষ পরামর্শ করে এ ভিত্তিতে তাঁকে নিয়োগ দান করেন যে, তিনি এসকল প্রশ্নে মাদ্রাসার সকল প্রশাসনিক নীতির আওতা বহির্ভূত থাকবেন।

এ সময় দেশে ইংরেজ বিরোধী তৎপরতায় অনেকগুলো দল কাজ করে গেলেও স্থির গন্তব্য কারো ছিল না। ইংরেজদের দ্বারা এদেশের মানুষ শোষিত হচ্ছে নির্যাতিত হচ্ছে, এ নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে এ চেতনা প্রায় সকলের মাঝেই ছিল। কিন্তু এর সঠিক ও প্রকৃত সমাধান কি হবে এ ব্যাপারে কোন দলেরই নিশ্চিত কোন লক্ষ্য নির্ধারিত ছিল না। অবশ্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ জন্মলগ্ন থেকেই এ দেশের নিঃশর্ত স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে আসছিল। ১৯২৩ সালে কুকানাডায় অনুষ্ঠিত জমিয়তের বার্ষিক সম্মেলনে হযরত মদনী স্বাধীনতার কথা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন। যেহেতু জমিয়তের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গই খিলাফত আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন এ কারণে তারাও স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার ছিলেন।

নেহেরু রিপোর্ট ঃ

বৃটিশ সরকার এ দেশের প্রতিবাদমুখর মানুষকে নিরস্ত করার জন্য বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা তদবীর করতে ত্রুটি করেনি। নূন্যতম ভিত্তিতে হলেও এ দেশের উপর তাদের আধিপত্য টিকিয়ে রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টা তারা করেছে।

সে ভিত্তিতে ১৯২৮ সালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লন্ডন পার্লামেন্টে এ মর্মে একটি নির্দেশ জারী করেন যে, 'ভারত শাসনের জন্য ভারতীয়রাই একটি যুক্তিসঙ্গত নীতিমালা তৈরি করে পেশ করুক'। সে প্রেক্ষিতে মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি তাদের বিবেচনায় একটি নীতিমালা তৈরি করেছিল, যা ইতিহাসে 'নেহেরু রির্পোট' নামে পরিচিত। কিন্তু এ রিপোর্ট ছিল সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার দুষে দুষ্ট। এতে মুসলমানদের স্বার্থ মারাত্মকভাবে ক্ষুন্ন হয়েছিল। যে কারণে ইংরেজ বিতাড়নের প্রশ্নে কংগ্রেসের সাথে জমিয়তের ঐক্যমত্য থাকলেও তারা এ রিপোর্ট সমর্থন করতে পারেননি। সে বৎসর ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌতে সে রিপোর্টের উপর পর্যালোচনার জন্য একটি সর্বদলীয় অধিবেশন আহ্বান করা হলে জমিয়তের প্রতিনিধি দলের সাথে হযরত মদনী রাহ. ও তাতে অংশগ্রহণ করেন। জমিয়ত এ রিপোর্টের উপর তাদের অভিযোগসমূহ উত্থাপন করতঃ এ রিপোর্ট সমর্থন না করার কারণসমূহ লিখিতভাবে পেশ করে

অবিশেন বর্জন করে। ফলে কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন দল এ রিপোর্ট সমর্থন করেনি। এ কারণে জমিয়তে উলামা ও কংগ্রেসের সম্পর্কে একটু ফাটল সৃষ্টি হয়। এ রিপোর্ট গুরুত্বহীনভাবেই রয়ে যায়। এরপর 'সাইমন কমিশন' ভারত প্রশাসনের ক্ষেত্রে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকেই কিছু সংস্কারমূলক প্রস্তাব নিয়ে আসে। কিন্তু ভারতীয় হিন্দু মুসলিম সকলেই তা বর্জন করে।

১৯২৯ সালে কলকাতার সম্মেলনে জমিয়তের মঞ্চ থেকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তাদের পূর্ব ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করা হয় যে, "দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা না করা হলে আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।"

কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঃ

দীর্ঘদিন পরে হলেও কংগ্রেস তার আন্দোলনের নিশ্চিত গন্তব্য নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়। ইংরেজ সরকারের বিভিন্ন টালবাহানা থেকে তারাও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে যে, পূর্ণ স্বাধীনতার কোন বিকল্প নেই। সুতরাং ১৯৩০ সালে লাহোর সম্মেলনে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করে।

এই মোহনায় এসে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের রাজনৈতিক লক্ষ্যের সাথে কংগ্রেসের রাজনৈতিক লক্ষ্য এক ও অভিন্ন হয়ে যায়। এ সময় হযরত মদনী রাজনৈতিক ময়দানে আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের মাঝে যে চির ধরেছিল তা ঝালাই করে নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে তীব্রভাবে। কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল সর্ব ভারতীয়দের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া বৃটিশ বেনিয়াদের হাত থেকে এ দেশের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনা সম্ভব হবে না। সে কারণে তিনি ১৯৩০ সালের মে মাসে আমরুহায় অনুষ্ঠিত জমিয়তের সম্মেলনে হযরত মাও. হিফজুর রহমান রাহ. এর মাধ্যমে কংগ্রেসকে সমর্থন দানের প্রস্তাব পেশ করান এবং নিজে সর্ব প্রথম এ প্রস্তাবের সমর্থনে অত্যন্ত.জোরালো ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। তার আলোচনায় এ প্রস্তাবের যৌক্তিকতা উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নিকট পরিষ্কার হয়ে যায়। হযরত মাও. আতাউল্লাহ শাহ বুখারীও উক্ত প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে ৩ ঘণ্টা ব্যাপী দীর্ঘ আলোচনা পেশ করেন। এতে সকলের মনের দ্বিধা সংশয় কেটে যায়। ফলে রাজনৈতিক ময়দানে আবার নতুন চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। মাদ্রাসা, খানকা, পীর-মাশায়েখ সকলেই আযাদীর ব্যাপক সংগ্রামে এসে শরীক হয়।

কিন্তু মুসলিমলীগ সহ কিছু কিছু রাজনৈতিক দল তখন পর্যন্ত বৃটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন স্বায়ত্ব শাসনের দাবীতেই আন্দোলন রত থাকেন।

স্বাধীনতার দাবীতে কংগ্রেসের অসহযোগ ঃ

এর পর কংগ্রেস সারাদেশ ব্যাপী অসহযোগের ডাক দেয়। এ সময় ইংরেজ সরকার কেবলমাত্র কংগ্রেসী নেতাদেরকেই গ্রেফতার করতে থাকে। অবশ্য গোটি কতক মুসলিম নেতৃবৃন্দকেও সে সময় গ্রেফতার করা হয়, যাদের মাঝে মাও. ফখরুদ্দীন আহমদ মুরাদাবাদী, মাও. মুহাম্মদ মিয়া ও মাও. হিফজুর রহমানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরে বড় লার্ট ও গান্ধীর মাঝে এ বিষয়ে সমঝোতা হলে কংগ্রেসসহ অপরাপর নেতৃবন্দকে মুক্তি দেওয়া হয়। এ বিষয়ে আপোষ রফা করার জন্য বৃটিশ সরকার লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করে। সে বৈঠক ব্যর্থ হলে ১৯৩২ সালে জমিয়তে উলামা ও কংগ্রেস যৌথভাবে পুনঃ অসহযোগের ডাক দেয়। এ সময় লর্ড উইলিংডন ভারতের বড়লাট হয়ে এসেছেন। তার দমন নীতি ছিল বড়ই কঠোর। যে কারণে আশংকা করা হচ্ছি যে, অসহযোগের ডাক দেওয়ার সাথে সাথেই উভয় দলের নেতৃবৃন্দকে এক যোগে গ্রেফতার করা হবে। নেতৃবৃন্দ আটকা পড়লে আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই স্তিমিত হয়ে যাবে। এ কারণে কংগ্রেস তার ওয়াটিং কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে ডিরেক্টরশীপ চালু করে। এর অর্থ ছিল এই যে, একই সময় নেতৃত্বের অপরাধে মাত্র একজনই অপরাধী হবেন। তাকে বন্দি করলে অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হবেন। এভাবে আন্দোলন ধর-পাকড়ের মাঝ দিয়েও চলতে থাকবে। এসময় রণকৌশল হিসেবে জমিয়তও তার মজলিসে আমেলা ভেঙ্গে নিয়ে পর্যায়ক্রমে নেতৃত্বে দেওয়ার জন্য একটি গোপন অধিনায়ক তালিকা প্রস্তুত করে। যাতে এক একজন অধিনায়ক আইন অমান্যের ঘোষণা দিয়ে গ্রেফতারি বরণ করলে অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে আইন অমান্যের ঘোষণা দিয়ে যাবে। সিদ্ধান্ত হল দিল্লী থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হবে।

এ তালিকায় প্রথম ব্যক্তি ছিলেন জমিয়তের সভাপতি মুফতী কেফায়েত উল্লাহ রাহ. আর পরের অধিনায়ক ছিলেন হযরত মদনী রাহ.।

মুফতী কিফায়েত উল্লাহ সাহেব গ্রেফতার হওয়ার পর হযরত মদনী রাহ. অসুস্থ হওয়া এবং অন্যান্যদের বারণ করা সত্ত্বেও দিল্লীর উদ্দেশ্যে দেওবন্দ থেকে ট্রেনে রওয়ানা হন। পথে গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। এ কারণে তিনি তার বক্তব্য লিখে নিয়ে ছিলেন, যাতে গ্রেফতার হয়ে গেলেও তার পক্ষ থেকে এ ঘোষণা জনগণের সামনে পেশ করা সম্ভব হয়। পুলিশ আগে থেকেই তাঁকে অনুসরণ করছিল। কিন্তু দেওবন্দ স্টেশনে বিদায় জ্ঞাপনকারী জনতার যে বিরাট সমাগম হয় তাতে পুলিশ সেখানে তাকে নোটিশ দেওয়া সমীচীন মনে করেনি। ট্রেন রুহানা ষ্টেশনে পৌছলে তাঁকে গ্রেফতারীর নোটিশ দেওয়া হয। নোটিশ দেখে তিনি বলেন, আমি ইংরেজি বুঝিনা। সুতরাং পুলিশ অফিসার উর্দূ অনুবাদ করতে চাইল। কিন্তু তার কাছে কলম ছিল না, সে হযরতের কাছে কলম চাইল। তিনি বললেন, বাহ! বেশতো মজা, আমার গ্রেফাতারীর জন্য আমিই আসবাব সরবরাহ করব, আর কাজ নেই? অগত্যা পুলিশ অনুবাদ করার জন্য চলে যায়। মুজাফফর নগরে এসে পুলিশ উর্দূ অনুবাদ নিয়ে উপস্থিত হলে হযরত বলেন, এতো সাহারানপুরের জেলা কালেক্টরের দেয়া নোটিশ, অথচ আমিতো এখন মুজাফফর নগরে; তার নির্দেশ এখানে চলবে কেন? ঘটনাক্রমে মুজাফফর নগরের ডি, এম এখানে উপস্থিত ছিল। সে তাঁর পক্ষ থেকে নতুন নোটিশ দিয়ে হযরত মদনীকে গ্রেফতার করে।

হযরত মদনী জনৈক লোক মারফত তার ঘোষণাপত্রটি সংগঠনের সচিব মাও. আবুল মাহাসিন সাজ্জাদ সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দেন। মাও. রশিদ হাসান সাহেব দিল্লীর জামে মসজিদে এ ঘোষণাপত্র পাঠ করে শুনান। পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে তাকে এ্যারেস্ট না করলেও ১২ ঘণ্টার মাঝে তাকে দিল্লী ত্যাগের নির্দেশ দেয়। পরে হযরত মদানীকে মুক্তি দেওয়া হলে তিনি দেওবন্দে চলে আসেন।

১৯৩২-৩৩ সালে সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাধীনতার দাবীতে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। এ সময় হযরত মদনী রাহ. স্বাধীনতার দাবীকে সীমান্ত প্রদেশ হতে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃর্ণ গ্রাম গঞ্জ পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সারাদেশে সফর করে বেড়ান। বিভিন্ন ধর্মীয় সভা-সমিতি, ওয়াজ মাহফিল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আবেগপূর্ণ জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জমিয়তে উলামার পরিচিতি দূর দূরান্তের অঞ্চলে অবস্থিত সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। তিনি এসকল জলসায় জমিয়তে উলামার বৈশিষ্ট্য ও অবদানের কথা অত্যন্ত জোরালোভাবে তুলে ধরেন।

ইন্ডিয়ান এ্যাক্ট ও জমিয়তে উলামা ঃ

১৯৩৪ সালে পুরানো শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে মুসলিম লীগ পৃথক প্যানেল দিয়েছিল। অন্যদিকে জমিয়তে উলামা, মুসলিম ন্যাশনালিষ্ট পার্টি ও মজলিসে আহরার ইত্যাদি সংগঠন যৌথ প্যানেলে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিল। সেবার নির্বাচনে যৌথ প্যানেলের মনোনীত প্রার্থীরাই বেশি সংখ্যক জয়লাভ করেছিল।

১৯৩৫ সালে 'ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট' নামে ভারত শাসনের ক্ষেত্রে নতুন প্রক্রিয়া চালু করা হয়। এই এ্যাক্টের সার কথা ছিল যে, প্রদেশগুলোর জন্য একটি কাউন্সিল ও কেন্দ্রের জন্য একটি জাতীয় সংসদ থাকবে।

পররাষ্ট্র বিভাগ, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, পত্র-পত্রিকা, রেল, ডাক ও বিমান চলাচল সংক্রান্ত বিষয়গুলো বৃটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। এ ছাড়া অন্যান্য সকল বিভাগ প্রদেশ ও কেন্দ্রের হাতে ন্যাস্ত থাকবে। প্রাদেশিক কাউন্সিলের উপর গভর্নরের ভেটো দেওয়ার অধিকার থাকবে, অনুরূপভাবে প্রাদেশিক পরিষদের সিদ্ধান্তের উপর কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের ভেটো দেওয়ার অধিকার থাকবে। তবে কেন্দ্রীয় পরিষদ প্রধান 'বড় লার্ট' ও প্রাদেশিক পরিষদ প্রধান গভর্নর এ দু'টি পদ বৃটিশের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ভোটাধিকারের মাধ্যমে উভয় পরিষদের জন্য নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে পাঠাবে।

এ এ্যাক্টের সারমর্ম এই ছিল যে, বৃটিশের মর্জির বাইরে কিছু করার অধিকার কোন পরিষদেরই থাকবে না। এই এ্যাক্টের অধীনে নির্বাচন করা হবে কিনা এ নিয়ে কংগ্রেস সদস্যদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিলে মাও. আবুল কালাম আযাদের উপর এর মীমাংসার ভার দেওয়া হয়। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্ত দেন যে, যারা নির্বাচন করতে চায়, তাদের জন্য নির্বাচন করার অনুমতি থাকবে। তবে

কংগ্রেসের ফান্ড থেকে তাদেরকে সহযোগিতা করা হবে না। অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদেরকে দলীয়ভাবে সহযোগিতা দেওয়া হবে। আর যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না, তারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রচারণা চালানো থেকে বিরত থাকবে। এ সিদ্ধান্ত সকলেই মেনে নিয়ে নির্বাচনকারীগণ নির্বাচনী তৎপরতায় নেমে পড়েন।

পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী জমিয়তে উলামায়ে হিন্দও এ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এ নির্বাচনে সফলতা ও ব্যর্থতার সাথে জড়িত ছিল আগামী দিনের রাজনৈতিক ময়দানে মুসমানদের গুরুত্বের পর্যায় নির্ণিত হওয়ার প্রশ্ন। কেননা হিন্দুরা হিন্দু প্রার্থীদেরকেই নির্বাচিত করবে। অতএব মুসলমানদের স্বার্থে নির্বাচনী ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

মুসলিম লীগের সাথে নির্বাচনী ঐক্য ঃ

এ সময় দিল্লীতে পূর্ববর্তী বৎসরের যে যৌথ প্যানেল ছিল (যাকে ইউনিটি বোর্ড বলা হত) এই প্যানেলভুক্ত দলসমূহের মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বেই মি. জিন্না দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জমিয়তের দিল্লী প্রদেশের সম্মেলনে স্বাগ্রহে উপস্থিত হয়েছিলেন। ঐ প্রাদেশিক সম্মেলনে যে হারে গণউপস্থিতি তিনি দেখতে পান, তাতে তার বুঝতে বাকী থাকেনি যে, জমিয়তে উলামার জনসমর্থন কত ব্যাপক।

সুতরাং প্যানেলভুক্ত দলগুলোর মিটিং চলাকালে মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মি. আব্দুল মতিন জিন্নার পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব নিয়ে আসেন যে, আসন্ন নির্বাচনে মুসলিম লীগকে প্যানেলভুক্ত করে নিলে সকলের জন্যই মঙ্গলজনক হবে। এ প্রস্তাব প্যানেলভুক্ত অন্যান্য দলের নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। কারণ লীগে একচ্ছত্র প্রভাব ছিল ঐ সব নেতা ব্যক্তিদের যারা বৃটিশ শাসনব্যবস্থাকে মেনে নেওয়ার পক্ষে কাজ করে থাকেন এবং বৃটিশকে তোষণ করে চলা যাদের মেজায। অথচ প্যানেলের অন্যান্য দলগুলো বৃটিশ বিরোধী তৎপরতায় সদা সোচ্চার। কাজেই এই দুই বিপরীত মেরুর লোকদের মাঝে ঐক্যের প্রশ্নই আসে না।

মি. মতিনকে এসব বিষয় অবগত করা হলে, তিনি বলেন মি. জিন্নাহ ঐসব লোকের প্রতি নিজেও অসন্তুষ্ট, স্বাধীনতাকামী দেশ প্রেমিকদের সাথে কাজ করা তার একান্ত ইচ্ছা।

ফলে প্যানেলভুক্ত দলগুলো জিন্নার সাথে সরাসরি এসব বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেন। এ উদ্দেশ্যে আরো একটি মিটিং হয়। হযরত মদনী তখন পাঞ্জাবে সফররত ছিলেন। মিটিংয়ে অংশগ্রহণের জন্য তাকেও টেলিগ্রাম করে দিল্লীতে নিয়ে আসা হয়।

মিটিংয়ে জিন্নাহকে এ মর্মে অবহিত করা হয় যে, মুসলিম লীগে অধীনতা প্রিয় লোকের সংখ্যাই অধিক। ফলে তাদের সাথে প্যানেল তৈরি করলে সে লোকেরা সংখ্যায় ভারী থাকবে। অতএব স্বাধীনতাকামী দলগুলো তাদের উপর প্রভাব

খাটাতে সক্ষম হবে না। ফলে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে তাদের মর্জিই প্রবল হয়ে কাজ করবে। জিন্নাহ বললেন, 'পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠনের দায়িত্ব আমার উপর থাকবে। আমি বোর্ডটি এমনভাবেই গঠন করব যাতে স্বাধীনতাকামী জাতিসংগঠক দলগুলোর প্রার্থী অধিক হারে মনোনয়ন পেতে পারে'। জিন্নার এ কথায় আশ্বাস্থ হয়ে নেতৃবৃন্দ একটি অঙ্গীকারপত্র তৈরি করেন। সে অঙ্গীকারপত্রে নিম্নোক্ত ধারাগুলো উল্লেখ করা হয়ে ছিল।

(ক) এই নির্বাচনী প্যানেল মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড নামে কাজ করবে।

(খ) প্রার্থী মনোনয়ন ও বোর্ড গঠনের দায়িত্ব এককভাবে মিষ্টার জিন্নার হাতে থাকবে।

(গ) এই প্যানেল নীতিগতভাবে কমিউন্যাল আইওয়ার্ড সম্বলিত দফাগুলো ছাড়া শ্বেত পত্রের সকল দফার বিরোধীতা করবে।

(ঘ) সরকারের কঠোর দমন নীতির নিন্দা জ্ঞাপন করতঃ কঠোর শাসন নীতি রহিত করনের জোর তৎপরতা চালানো হবে। ঐ সকল বিলের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে, যা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অর্থনৈতিক স্বার্থ ও উন্নয়নের পরিপন্থী হবে।

ধর্মের সঙ্গে জড়িত বিষয়াদির ক্ষেত্রে আলেম উলামাদের সিদ্ধান্ত মুতাবিক মতামত গ্রহণ এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সংসদে উত্থাপিত কোন বিলের সমর্থন করা বা না করার নীতি মেনে চলতে হবে।

(ঙ) ভারতবর্ষের উলামায়ে কিরাম যে সকল খসড়া আইন পার্লামেন্টে পেশ করার প্রয়োজন বোধ করবে, সেগুলো পার্লামেন্টে পেশ করতঃ পাশ করিয়ে নেওয়ার জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং পার্লামেন্টে গৃহীত ধর্ম সম্পর্কীয় সিদ্ধান্তাবলী শরীয়ত সমর্থিত কিনা এ ব্যাপারে আলেম উলামারা যে সিদ্ধান্ত দিবেন, তা মেনে চলতে হবে।

সে অঙ্গীকারপত্রে একথাও ছিল যে, যদি লীগ এসকল বিষয় পালন করতে অসম্মত হয় তাহলে জমিয়তে উলামা লীগকে কোনরূপ সাহায্য সহযোগিতা করবে না।

উপরোক্ত শর্তাবলীর ভিত্তিতে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠিত হয়। নির্বাচন ছিল একেবারেই সন্নিকটে, অতএব বিলম্ব না করে সকলেই নির্বাচনী যুদ্ধে নেমে পড়লেন। অবশ্য মিঃ জিন্না প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে তার অঙ্গীকার মোটামোটি রক্ষা করেছিলেন, জমিয়তে উলামার ২০ জন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য দল থেকেও কয়েকজন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল।

নির্বাচনী প্রচারণা ও মুসলিম লীগ ঃ

আলেম-উলামাদের সারাদেশ ব্যাপী ধর্মীয় সূত্রে একটি নেটওয়ার্ক এমনতিই থাকে, যার ফলে জমিয়তে উলামার পরিচিতি সারাদেশ ব্যাপী এমনিতেই ছড়িয়ে

ছিল। মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের অধীনে নির্বাচন করতে গিয়ে মুসলিম লীগের ভাবমূর্তি ফুটিয়ে তুলতে হয় সঙ্গত কারণেই।

হযরত মদনী দারুল উলূম থেকে দুই মাসের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নির্বাচনে নিজেদের প্যানেলকে বিজয়ী করার জন্য ছুটে বেড়ান দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বিভিন্ন সভা সমিতিতে নিজে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও নিজের মুরীদ, মুতাআল্লিক, ছাত্র-শিষ্য সকলকে এবং জমিয়তের সকল শাখা সংগঠনকে এ নির্বাচনে জোর তৎপরতা চালানোর জন্য নির্দেশ দেন। হযরত মদনীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবও কম কাজ করেনি। কারণ তখন তিনি ছিলেন দারুল উলূমের সদরুল মুদাররিসীন ও শায়খুল হাদীস। তাছাড়া মসজিদে নববীতে দরস দান, মাল্টায় কারা বরণ, করাচী মামলায় বলিষ্ঠ বক্তব্য প্রদান এবং অসহযোগের অন্যতম নেতা হিসাবে, সর্বোপরি আওলাদে রাসূল হিসাবে সারা দেশের মানুষের নিকট তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাভাজন। এহেন ব্যক্তিত্ব এবং সারাদেশের আলেম উলামারা যখন মুসলিম লীগের পক্ষে কথা বলেছেন তখন জনমনে মুসলিম লীগের প্রতি সাধারণভাবেই একটি ভিন্ন ধরনের আস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সর্বদলীয় উলামায়ে কিরাম ও পীর মাশায়েখগণের মেহনতের বদৌলতে সে নির্বাচনে মোট ৫২টি আসনের ৩০টিতে মুসলিম লীগ নির্বাচনী প্যানেলের সদস্যরা বিজয়ী হয়। এতে মুসলিম লীগ রাজনৈতিক ময়দানে মুসলমানদের আশা আকাংখার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় এবং মুসলমানদের একক প্রতিনিধিত্ব কারী দল হিসাবে স্বীকৃত হয়ে পড়ে। অনেক আলেম উলামা তখন মুসলিম লীগে যোগদান করে। কেননা সাধারণ বিচারে জমিয়ত ও মুসলিম লীগ তখন একই অর্থবোধক ছিল। এভাবে এক দিনের নগর কেন্দ্রিক মুসলিম লীগ তখন গ্রাম-গঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

মুসলিম লীগ থেকে জমিয়তের সমর্থন প্রত্যাহার ঃ

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার পরই মি. জিন্না চিরাচরিত রাজনৈতিক স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন এবং পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক চিন্তাধারার আলোকে নিজের দল ভারী করা ও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কিছুই তিনি নির্বিচারে করতে শুরু করেন। যে অধীনতা প্রিয় লোকদেরকে তিনি দল থেকে ছাটাই করবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন, সেই অধীনতা প্রিয় লোকদেরকে বরং তিনি ডেকে ডেকে দলভুক্ত করতে শুরু করলেন। জিন্নার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা না গেলেও বিষয়টি যে, নির্বাচন পূর্বকালের ওয়াদা অঙ্গিকারের পরিপন্থী ছিল তা খুবই সুস্পষ্ট।

জয়লাভের পর লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত লীগের প্রথম সম্মেলনেই লীগের এহেন আচরণের কথা জিন্নাকে জানানো হয়। তিনি তখন অকপটেই বলে ফেলেন যে, "সে সব ছিল নির্বাচনী ঐক্যের শর্ত, নির্বাচন উত্তর কালে তার গুরুত্ব শেষ হয়ে গেছে।' তাছাড়া কেন্দ্রীয় এসেম্বলীতে তিনি শরীয়তী বিল পাশ হতে দেননি, কাজী প্রথা পুনঃবহাল

সংক্রান্ত বিলের বিরোধিতা করেছেন বলিষ্ঠভাবে, গর্ভপাত সংক্রান্ত আইন ও আর্মি বিল ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রেই তিনি তার পূর্ব ওয়াদা রক্ষা করেননি।

জিন্নার এসকল আচরণে হযরত মদনী রাহ. মারাত্মক আঘাত পেয়েছিলেন, কারণ তিনি তখন দলের প্রধান ব্যক্তি না হলেও তাঁর মতামতকে দলের সকলেই গুরুত্ব দিত। লীগকে সমর্থনের প্রশ্নেও তার মতামতের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। একারণেই তিনি আহত হয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। একদিকে নির্বাচনে মুসলিম লীগের সফলতা, অন্যদিকে লীগের নেতৃবৃন্দের এহেন আচরণ এবং তাদের অধীনতা প্রিয় মনোভাবের কারণে চির স্বাধীনতাকামী হযরত মদনী রাহ. এর চোখে পরাধীন ভারতবর্ষে মুসলমানদের ভবিষ্যত বড় অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে প্রতিভাত হল।

যাই হোক এসকল পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে জময়িতে উলামা মুসলিম লীগ থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। পত্র পত্রিকায় লীগ থেকে আলেমদের সমর্থন প্রত্যাহারের কারণের উপর বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করা হয়। এ ব্যাপারে বই পুস্তকও ছাপিয়ে বিতরণ করা হয়। কিন্তু ততদিনে মুসলিম লীগ রাজনীতির ময়দানে এবং জমনে এমন দৃঢ় আসন গেড়ে নিয়েছিল যে, এগুলো সাধারণ মানুষের মাঝে তেমন একটা প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। একদিন যারা আলেম উলামাদের জোর প্রচেষ্টায় লীগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে রাজনীতির ময়দানে পদার্পণ করেছিল এবং কুরবানী স্বীকার করতে লেগে গিয়েছিল, তারা অনেকেই এ পরিস্থিতি আঁচ করতে পারেনি। তাছাড়া লীগের সাথে কতিপয় দ্বীনদ্বার সরলমনা আলেম উলামাদের সংশ্লিষ্টতা বিষয়টিকে আরো নাজুক করে তুলেছিল। লীগের সাথে জমিয়তে উলামার সম্পর্কচ্ছেদের কারণে এ দুই দলের মাঝে বৈরিতা সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক ময়দানে এক দল আরেক দলের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

দিল্লীতে হযরত মদনীর বক্তৃতা ও জাতীয়তার প্রশ্নে বিভ্রান্তি ঃ

১৯৩৭ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতাকালে হযরত মদনী ইংরেজদের DIVID AND RULE (ডিভাইড এন্ড রোল)- এর পলিসির কথা আলোচনা করেন। তারা যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শ্লোগান তুলে ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ভেঙ্গে দেওয়ার পাঁয়তারা চালিয়ে যাচ্ছে এ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন, যে, 'তারা আরব ও তুরস্কের ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্য সেখানে ভৌগোলিক অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তার ধোঁয়া তুলে আরব জাতি যে ভিন্ন এক জাতি এই শ্লোগান উঠিয়েছে এবং আরবদেরকে আরব জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে তুরস্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি বৃহৎ শক্তিকে ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছে। অনুরূপভাবে ভারতে ইংরেজ বিতাড়নের প্রশ্নে সর্বভারতীয়দের সমন্বয়ে যে বৃহৎ ঐক্য গড়ে উঠেছে, ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার ধোঁয়া তুলে তা ভেঙ্গে খান খান করে দিতে চাচ্ছে। সুতরাং এ মুহূর্তে ইংরেজদের দেওয়া এই জাতীয়তার থিউরীর পিছনে না পড়ে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে, জাতি ধর্ম

নির্বিশেষে সকল ভারতীয় মিলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিৎ। তিনি আরো বলেন, বর্তমান ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে 'আমরা সকল ধর্মাবলম্বীরা ভারতবাসী'- এই ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সময়ের একান্ত দাবী। যতদিন পর্যন্ত নিখুঁত ইসলামী শাসনের পরিবেশ গড়ে না উঠে ততদিন পর্যন্ত বিদেশীদের অধীনতা মেনে নেওয়ার চাইতে স্বদেশী সকল ধর্মাবলম্বীদের সাথে মিলে মিশে সম্মিলিত শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলাই উত্তম হবে। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এহেন পদক্ষেপ শরীয়তের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য পূর্ব প্রস্তুতিমূলক অত্যাবশকীয় পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে।

কিন্তু এই বক্তৃতাকে সম্বল করে মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকা 'আল-আমান দিল্লী'-পর দিন ফাষ্ট হেডিংয়ে বড় অক্ষরে এই বিভ্রান্তিমূলক রিপোর্ট করে বসে যে, মাও. হুসাইন আহমদ মদনী বলেছেন যে, 'জাতীয়তার ভিত্তি ভৌগোলিক অঞ্চল, ধর্ম জাতীয়তার ভিত্তি নয়। আর যায় কোথায়, সারা দেশে এই রিপোর্টের ভিত্তিতে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়। মুসলিম লীগ সমর্থক পত্রিকাগুলো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসাবে এর উপর আলোচনা পর্যালোচনা এমনভাবে শুরু করে যে, এটি সময়ের সবচেয়ে মুখ্য বিষয়ে পরিণত হয়। হতে হতে বিষয়টি এই পর্যন্ত গড়ায় যে, হযরত মদনীকে কাফের বলে ফতওয়া দেওয়া হয়। এমন কি ইকবালের মত পণ্ডিত ব্যক্তিও হযরত মদনীকে ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ করে তিনটি কবিতা পর্যন্ত লিখে ফেলে। এসব প্রচারণার ফলে সারাদেশের জন-মানসে হযরত মদনীর ব্যাপারে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

হযরত মদনী পত্র-পত্রিকায় তাঁর এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা দেন। অবশ্য 'তেজ' 'আনসারী' ও 'ইহসান' প্রভৃতি পত্রিকা তাঁর বক্তব্য পূর্বেই হুবহু ছেপে প্রকাশ করে। কিন্তু প্রচারণার বদৌলতে পরিস্থিতি এতটাই নাজুক হয়ে যায় যে, হযরত মদনী জাতীয়তা সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে 'মুত্তাহাদা কাওমিয়াত আওর ইসলাম' নামে একটি পুস্তিকা লিখে তা প্রকাশ করার প্রয়োজন মনে করেন। তিনি সে পুস্তকে বলেছেন যে, রাসূল সা. মদীনায় হিজরত করার পর মদীনার হিফাজতের জন্য বিভিন্ন ধর্মাবম্বী সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে যে সম্মিলিত ঐক্য গড়ে তুলে ছিলেন আমরা সম্মিলিত জাতি বলে সে ধরনের কাঠামোকেই বুঝিয়েছি।

এছাড়াও বিভিন্ন সভা সমাবেশে তিনি তাঁর এই বক্তব্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেছেন- যাতে প্রচারণা দ্বারা মানুষ বিভ্রান্ত না হয়। জৈনপুরে অনুষ্ঠিত জমিয়তের বার্ষিক অধিবেশনেও তিনি বিষয়টিকে আরো অধিকতর ব্যাখ্যা করে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও জমিয়তে উলামার ভূমিকা ঃ

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানী সৈন্যরা পোল্যান্ড আক্রমণ করলে এরই প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। এ সময় জার্মান সৈন্যরা বৃটেন ও তার মিত্রশক্তিগুলোর বিরুদ্ধেও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে

জাপানীরাও বৃটেন এবং তার মিত্রশক্তিগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ফলে দ্বিমুখী শক্তির মোকাবেলা করতে গিয়ে বৃটেনের সৈন্য ও রসদের তীব্র ঘাটতি দেখা দেয়। অক্ষ শক্তি অর্থাৎ জার্মান তখন প্রায় অর্ধপৃথিবী নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। কিন্তু মিশর আক্রমণ করতে গিয়ে 'আলামীন রণাঙ্গনে' এবং রাশিয়ার 'লেলিন গ্রাদে' জার্মান সৈন্যরা মারাত্মকভাবে পরাজিত হওয়ার পর থেকে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং শুরু হয় তাদের পরাজয়ের পালা। ১৯৪৫ সালের ২৭ শে এপ্রিল মুসোলিনী গ্রেফতার হলে এবং ১লা মে হিটলার আত্মহত্যা করলে রণোদ্যমে ভাটা পড়ে এবং হিটলারের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এ যুদ্ধের সময়ে বৃটেন তার অনুগত ও শাসিত দেশসমূহ থেকে অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে। সে মতে ভারত থেকেও নৌবাহিনীতে লোক নিয়োগের তৎপরতা শুরু করে। ইতিপূর্বে ১৯৩৮ সালে যে আর্মি বিল পাশ করা হয়েছিল তাতে এ মর্মে ঘোষণা ছিল যে, বৃটিশ সরকার সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগের যে পদ্ধতিই গ্রহণ করবে তার বিরোধিতা অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৩৯ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বরে মিরাঠে অনুষ্ঠিত জমিয়তের সম্মেলনে এ মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, 'যেহেতু জমিয়তে উলামার লক্ষ্য হল দেশের স্বাধীনতা, আর সে লক্ষ্যে যে পথে বৃটিশ সরকার দুর্বল হয় সেটাই জমিয়তের কাম্য। সুতরাং জমিয়তে উলামার মূলনীতি অনুসারে এ যুদ্ধে বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করা মোটেও বৈধ নয়।' এ সিদ্ধান্ত ঘোষণার ফলে বৃটিশ সরকার ভীষণ ক্ষেপে যায় এবং জমিয়তের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করতে শুরু করে, যাদের মাঝে জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক মাও. মুহাম্মদ মিয়া, পাঞ্জাব শাখার সভাপতি মাও. আহমদ আলী ও মাও. মুহাম্মদ কাসেম শাহজাহানপুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসময় কংগ্রেসেরও বহু নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।

হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা ও পাকিস্তান প্রস্তাব ঃ

ইংরেজদের (DIVID AND RULE-বিভেদ বাধাও, শাসন কর) প্রোগ্রামের আওতায় মুসলিগ লীগ ও হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই দীর্ঘকাল ধরে সহঅবস্থানে অভ্যস্ত হিন্দু ও মুসলমানের মাঝে বিদ্বেষ ক্রমান্বয়ে দানা বাঁধতে থাকে। এক পর্যায়ে এসে হিন্দু মুসলিমের এ বিদ্বেষ চরম আকার ধারণ করে। যার পরিণতিতে স্থানে স্থানে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। সে দাঙ্গার ইতিহাস অনেক দীর্ঘ ও বিভৎস। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে হাজার হাজার মানুষ হয় বলির শিকার, শত শত ঘরবাড়ি হয় ভস্মীভূত। পরিবেশ ক্রমেই নাজুক থেকে নাজুকতর হতে থাকে। তখন মনে হচ্ছি যেন হিন্দু মুসলমান আর এ দেশে মিলেমিশে পূর্বের ন্যায় বসবাস করতে পারবে না।

পরিস্থিতির এই নাজুকতার মুহুর্তে ১৯৪০ সালের ২২, ২৩, ২৪ শে মার্চ লাহোরে

অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সম্মেলনে মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাস ভূমির প্রস্তাব গৃহীত হয়। অবশ্য 'মিনহাজ আলান নবুওয়্যা'-এর আঙ্গিকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলা ছিল উলামায়ে কিরামের বহুদিনের লালিত স্বপ্ন। মাও.আবদুল মজীদ দরিয়াবাদী উল্লেখ করেছেন যে, ১৯২৮ সালের জুন মাসে আমি হযরত থানভী রাহ.-এর খিদমতে হাজির হলে তিনি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন যে, নির্ভেজাল ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা ছাড়া এদেশে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার করা সম্ভব হবে না। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য মুসলমানদের একটি পৃথক আবাসভূমি ও একজন আমীরুল মু'মিনীনের প্রয়োজন। আমি সে লক্ষ্যে জনসমাবেশগুলোতে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। আপনার সামনেও বিষয়টি পেশ করলাম।

এ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত থানভী রাহ. প্রকৃত অর্থে পাকিস্তানের একজন স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে চৌধুরী রহমত আলীও মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবী জানান। ১৯৩০ সালের ২৯ শে ডিসেম্বরে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের এক জনসভায় সভাপতির ভাষণে ডা. ইকবালও মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির দাবী জানিয়ে ছিলেন। এই দাবীগুলোই ক্রমান্বয়ে ঘনীভূত হয়ে ১৯৪০ সালে এসে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে এবং লাহোর সম্মেলনে তা প্রস্তাব আকারে পেশ করা হয়।

বিবাদমান এই পরিস্থিতিতে পৃথক আবাস ভূমির এ প্রস্তাব ভবিষ্যতের বিচারে যাই হউক আপাতঃ দৃষ্টিতে ছিল খুবই আবেগময় ও শ্রুতিমধূর। যে কারণে সাধারণ মুসলমানদের কাছে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা তড়িৎ বেগে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় মাও. শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ.সহ বেশ কিছু আলেম জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ত্যাগ করে মুসলিম লীগে এসে যোগদান করেন। যেহেতু হযরত থানভী রাহ. মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। এ কারণে তাঁর মুরীদ-মুতাআল্লিকগণ মুসলিম লীগকেই সমর্থন জানায়। তাঁদের জোর প্রচেষ্টায়ই পাকিস্তান প্রস্তাব দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। সে সঙ্গে জনপ্রিয়তা লাভ করে মুসলিম লীগও।

পাকিস্তান আন্দোলন ও হযরত মদনীর দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

১৯৪০ সালের ৭, ৮, ৯ জুন জৈনপুরে জমিয়তে উলামার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে হযরত মদনী রাহ. সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে প্রথমে ভারত বর্ষের উপর ইংরেজদের আগ্রাসন ও নির্যাতনের ইতিহাসের প্রতি আলোকপাত করেন। অতঃপর বর্তমান বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ সরকারকে কেন সহযোগিতা করা হবে না এবং বৃটিশ সেনাবাহিনীতে এদেশের মানুষ কেন যোগদান করবে না এর কারণ উল্লেখ করেন। সবশেষে তিনি পাকিস্তান প্রস্তাবের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে, বর্তমানে পাকিস্তান আন্দোলনের শ্লোগান খুব জোরে সোরে শোনা যাচ্ছে। যদি নববী আদর্শের উপর ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম

করা হয় আর ইসলামী আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে তো মাশা-আল্লাহ এটি একটি মুবারক কর্মসূচী নিঃসন্দেহে। কোন মুসলমান এতে দ্বিমত পোষণ করতে পারে না। কিন্তু যদি বর্তমান পরিস্থিতিতে বৃটিশ শাসনের ছত্রছায়ায় পৃথক ইসলামী রাষ্ট্রের ঘোষণা দেওয়া হয় তাহলে এটি নিঃসন্দেহে হবে একটি প্রতারণামূলক পদক্ষেপ, যা দ্বারা মূলতঃ ইংরেজ পলিসী DIVID AND RULE-এর সার্থক প্রতিফলন ঘটবে। এ পলিসী ইংরেজরা সর্বত্র প্রয়োগ করছে। এ পলিসী প্রয়োগ করে তারা তুরস্ককে ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছে, আরব দেশগুলোকে টুকরো টুকুরো করে দিয়েছে। বর্তমানে ভারতেও তারা সেই পলিসীই চালিয়ে যাচ্ছে। গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে হয়তবা দেখা যাবে যে, পাকিস্তান আন্দোলনের এ প্রস্তাব লন্ডন, অক্সফোর্ড, কিংবা কেমব্রিজ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে। মূলতঃ এ প্রস্তাব হল ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকে রুদ্ধ করার এক হীনকৌশল মাত্র। এটা ভারতবর্ষের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এক বিরাট হুমকী, সংখ্যালঘু মুসলিম অধ্যূষিত অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য এটা মৃত্যুর পূর্ব সংবাদ। যেসব লাভের কথা এতে দেখানো হয়েছে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। আমরা এটুকু বুঝি যে, ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতার দাবীদার দু'টি শক্তির একটি শক্তি অর্থাৎ মুসলমানদেরকে হাত করার জন্য এটি একটি প্রতারণামূলক কৌশল মাত্র।

মি. ক্রীপস-এর মিশন ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সারা পৃথিবীতে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা ভারতীয়দের স্বাধীনতার দাবীর প্রতি বৃটিশ সরকারকে নমনীয় হতে বাধ্য করে। ফলে ১৯৪২ সালের ২৫শে মার্চে স্বাধীনতাকামীদের সাথে তাদের দাবী দাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য বৃটিশ সরকার স্যার ক্রীপসকে পাঠান। এসময় সকল রাজনৈতিক দল ভারতের স্বাধীনতার রূপরেখার ব্যাপারে নিজেদের দৃষ্টি ভঙ্গির কথা মি. ক্রীপস-এর সামনে তুলে ধরে। জমিয়তে উলামাও এক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয়। ইতিহাসে যা 'মাদানী ফর্মূলা' নামে পরিচিত।

জমিয়ত প্রদত্ত ফর্মূলা ঃ

জমিয়তে উলামা বার বার এ ঘোষণা দিয়ে আসছে যে, ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতাই জমিয়তের মূলদাবী। এ বিষয়ে গোটা ভারতবর্ষের মুসলমানদের ঐকমত্য রয়েছে এবং এটাকে তারা নিজেদের মুক্তির একমাত্র উপায় বলে মনে করে। জমিয়ত একথাও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, স্বদেশের স্বাধীতার এই আবর্তে মুসলমানরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন থাকবে। যে আইনের ভিত্তি এসকল বিষয়ের পূর্ণ স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না এমন কোন আইন মুসলমানরা কখখনোই মেনে নেবে না।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ভারতবর্ষের প্রদেশগুলোর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও

স্বাধীকারের পূর্ণ সমর্থক। এক্ষেত্রে অনুল্লিখিত সকল বিষয়ের পূর্ণ ক্ষমতা ও ইখতিয়ার প্রদেশগুলোর হাতেই ন্যস্ত থাকবে। আর কেন্দ্রীয় সরকার কেবল ঐ সমস্ত বিষয়েরই অধিকার লাভ করবে, যেগুলো সকল প্রদেশের ঐকমত্যের ভিত্তিতে কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত করা হবে এবং তা সকল প্রদেশের উপরই সমানভাবে কার্যকর হবে।

জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দের দৃষ্টিতে স্বাধীন প্রদেশগুলোর রাজনৈতিক ঐক্য একান্ত অপরিহার্য এবং এটা দেশের জন্য কল্যাণকরও বটে। কিন্তু তা এমন রাজনৈতিক ঐক্য ও কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা না হতে হবে যাতে নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারক নয়কোটি মুসলমানকে কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর জীবন যাপন করতে হয়। এ হেন ঐক্য এক মুহূর্তের জন্য বরদাশত করা হবে না বরং কেন্দ্রের প্রশাসনিক অবকাঠামো এমন কিছু নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যবশ্যকীয় যাতে মুসলমানরা নিজেদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে পূর্ণ আশ্বস্ত থাকতে পারে।

স্যার ক্রীপস রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনার পর এরূপ একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বৃটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে, আর অন্য সকল বিষয়ে স্বাধীনতাকামীদের দাবী দাওয়া মেনে নেওয়া হবে। তবে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে।

ঠিক এই সময়ে ২০, ২১, ২২ মার্চ-১৯৪২ ইং হযরত মদনী রাহ.-এর সভাপতিত্বে জমিয়তে উলামার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে হযরত মদনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন।

বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে তিনি বলেন, এ যুদ্ধ ভারত থেকে অনেক দূরে চলছে। কিন্তু কুচক্রী ইংরেজরা ভারতকে এ যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। অথচ এ যুদ্ধ চলাকালে বৃটিশ সরকার তার অধীনস্থ অন্যান্য সাম্রাজ্যগুলোকে আপন আপন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষকে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি 'আটলান্টিক চার্টার' চুক্তির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এই বিশ্ব পরিকল্পনার আওতায় বৃটিশ সরকারও তার অধীনস্থ অসহায়, স্বাধীনতা বঞ্চিত মানুষের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা প্রদানের চিত্তাকর্ষক অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল। ফলে ভারতবাসীও আশা করছিল যে, এই চুক্তির অঙ্গীকার মোতাবিক তারাও স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে। কিন্তু ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরে মি. চার্চিল এ কথা পরিস্কার করে দিয়েছেন যে, ভারতবাসীরা যদি এই চার্টারের অঙ্গীকার মুতাবিক তাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আশা করে থাকে তাহলে এটা তাদের জন্য নিষ্ফল আশা হবে। এ চুক্তির আওতায় ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলোকে স্বাধীনতা লাভের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে মাত্র।

হযরত বলেন এ জন্যই জমিয়ত মনে করে যে, মিস্টার ক্রীপসের সাথে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আলোচনা করতে হবে। কারণ ওরা আমাদেরকে বারবার ধোঁকা দিয়েছে। আমরা আমাদের স্বাধীনতার অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে কখনই পিছপা হতে চাই না। অত্যাচারী জালেমের সম্মুখে মাথা নত করতে আমরা কখনই প্রস্তুত নই।

দেশে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন- এটা মূলতঃ ইংরেজ পলিসিরই পরিণতি। অন্যথায় দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশে হিন্দু মুসলমান মিলেমিশে বাস করে আসছে, কখনই তাদের মাঝে এরূপ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল না।

তিনি আরো বলেন যে, যদিও এদেশে দীর্ঘদিন মুসলমানরা রাজত্ব করেছে, কিন্তু সে সময় হিন্দুরাও বড় বড় সরকারী পদে নিয়োজিত ছিল। একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষা ও সমাজ পুনর্গঠনে মুসলমানদের অবদান অনেক বেশি। এদেশে মুসলমানের সংখ্যা নয় থেকে দশ কোটি। সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক বিকাশে মুসলমানদের ভূমিকাই অগ্রগণ্য। তারা সারা দেশেই ছড়িয়ে রয়েছে। মোট ১১টি প্রদেশের মাঝে ৪টিতে তারা সংখ্যা গরিষ্ঠ। ভবিষ্যত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রদেশের সংখ্যা ১৩তে উন্নতি করা হলেও ৬টিতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টি হবে। এই পরিস্থিতিতে যদি মুসলমানদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে গণ্য করা হয় তাহলে মারাত্মক ভুল করা হবে। বৃটিশের অনুগ্রহ ছাড়া জীবন ধারণ দুষ্কর হবে- মুসলমানরা কি এখনও এই বিভ্রান্তিতে থাকবে? কখনই না, মুসলমান হয়ত নিজেদের ধর্মীয় স্বাধীনতা, আদর্শ ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা নিয়ে বেঁচে থাকবে, অন্যথায় গোলামীর জীবন অপেক্ষা মৃত্যুকেই প্রাধান্য দিবে।

স্বাধীন ভারতের রূপরেখা সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন, একদল এরূপ চিন্তাভাবনা করছে যে, স্বাধীনতার পর এদেশের ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের হাতেই থাকবে। আরেক দলের চিন্তাভাবনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা সর্বভারতীয় ঐক্যকে ভেঙ্গে দিয়ে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক ভূ-খণ্ডের দাবী উত্থাপন করছে, আর এই ভাগ বণ্টনের দায়িত্ব তারা বৃটিশ সরকারের হাতেই ন্যস্ত করতে চাচ্ছে। স্বতন্ত্র পাকিস্তানের দাবী তারা বেশ জোরেশোরেই প্রচার করছেন। কিন্তু তারা কি চিন্তা করে দেখেছেন যে, ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই রয়েছে মুসলমানদের অধিবাস, রয়েছে তাদের ধর্মীয় পবিত্র স্থান- মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ও বিস্তর ওয়াকফ সম্পত্তি। হাজার বছরে গড়ে উঠা এইসব ঐতিহ্য যা তিলে তিলে গড়ে উঠেছে— তা ছেড়ে যাওয়া কি সম্ভব? সেদিন তিনি যেন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চাক্ষুস দেখে দেখে বলছিলেন যে, 'পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের যে দৃষ্টিভঙ্গি তাতে ইসলামের দোহাই দিয়ে অর্জিত ভূ-খন্ডের শাসন ব্যবস্থা কখনই ইসলামী শাসন ব্যবস্থা হবে

না। বরং সে রাষ্ট্রের সংবিধানের মূল ভিত্তি হবে ইউরোপীয় গণতন্ত্র। যদি মুসলমানদের জন্য পৃথক ভূ-খণ্ড করা হয় তাহলে অবশিষ্ট হিন্দু অধ্যুষিত ভূ-খণ্ডে মুসলমানদের সর্বোচ্চ সংখ্যা দাঁড়াবে শতকরা চৌদ্দজন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সংখ্যা শতকরা ৫% থেকে ৬% এ নেমে আসবে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের জন্য পৃথক করা ভূ-খন্ডে অমুসলিমদের সংখ্যা হবে শতকরা ৪৫ জন। এমতাবস্থায় এই সংখ্যাভারী সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় প্রস্তাবিত মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য এক বিরাট হুমকী হয়ে দাঁড়াবে। অথচ হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থানরত প্রায় সাড়ে তিন কোটি মুসলমানকে এক করুণ পরিণতি ও অসহায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। একি কোন দূরদর্শী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হবে? এটা বরং আত্মহননেরই নামান্তর। কেননা এ প্রস্তাবে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যা গরিষ্ঠ সেখানে মুসলমানদের হিফাযত ও নিশ্চিত জীবনের ব্যবস্থা রয়েছে বটে কিন্তু যেখানে তারা সংখ্যালঘু অসহায় সেখানে তাদেরকে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার আয়োজন করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি স্বাধীন ভারতের রূপরেখা সম্পর্কে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের দৃষ্টিভঙ্গির কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অন্য একটি চিন্তা ভাবনা এরূপ যে, প্রত্যেক প্রদেশ স্বাধীন ও স্বায়ত্বশাসিত সরকার কর্তৃক পরিচালিত হবে, স্বাধীন ভারতকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট কতিপয় মৌলিক নীতিমালার আওতায় প্রত্যেক প্রদেশ থেকে সদস্য নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের স্বাধীনতার উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য নির্বাচিত সকল প্রদেশের সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে যে সব অধিকার কেন্দ্রকে প্রদান করবে কেন্দ্রীয় সরকার কেবল মাত্র সে সব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রাপ্ত হবে। প্রত্যেক সরকারই সংখ্যালঘুদের সভ্যতা সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণের প্রতি যত্নবান হতে আইনগতভাবে বাধ্য থাকবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। এ পন্থায় প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে উঠলে প্রত্যেক অঞ্চলেই সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারবে। আর যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে সুতরাং কোন অঞ্চলেই সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করতে পারবে না।

প্রিয় পাঠক, আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন যে, এ প্রস্তাবের মাঝে ভারতকে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য হিসাবে টিকিয়ে রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টা নিহিত রয়েছে। সম্ভবত এ প্রস্তাবের স্বপ্নদ্রষ্টারা আন্তবিশ্বে ভারত একটি পরাশক্তি হিসেবে টিকে থাক-এই সুদূর প্রসারী চিন্তা নিয়েই অগ্রসর হয়েছিলেন। কারণ আন্তর্জাতিক দুরাচার ও আগ্রাসন থেকে বাঁচার জন্য অত্র এলাকায় এরূপ একটি বৃহৎ শক্তির উপস্থিতি ছিল একান্ত অপরিহার্য। এ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে ভারতও আন্তবিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা যুক্তরাজ্যের ন্যায় একটি বৃহৎশক্তি হিসাবে দাপটের সাথেই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারত। আর তা যদি হত, তাহলে হয়ত পরাশক্তির চোখ

রাঙ্গানো থেকে আমরা অনায়াসেই রক্ষা পেতে পারতাম। পরাশক্তির ক্রীড়নক হয়ে আমাদেরকে হয়ত গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে হত না। সম্ভবত এ চিন্তাই তাদেরকে অবিভক্ত ভারতের স্বপ্ন দেখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

মি. ক্রীপসের প্রস্তাব ছিল একটি ভবিষ্যত অঙ্গিকার মাত্র। কারণ যুদ্ধ শেষ হলেই তা কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। সুতরাং এ প্রস্তাবে স্বাধীনতাকামী কোন দলই সম্মত হয়নি। বরং তারা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে। ফলে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। এ সময় যারা কারাবরণ করেন তাদের মাঝে মাও. আহমদ আলী (সভাপতি, জ.উ.হি.পাঞ্জাব), মাও. হিফজুর রহমান সিউহারবী, মাও. কাসেম শাহজাহানপুরী, মাও. আবুল ওয়াফা শাহজাহানপুরী, মাও. শাহেদ মিয়া এলাহাবাদী, মাও. ইসমাইল সামবুলী, মাও. আখতারুল ইসলাম মুরাদাবাদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সময় কংগ্রেসেরও অনেক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।

বিছরায়ুর সম্মেলন ও স্বাধীনতার ঘোষণা ঃ

১৯৪২ সালের ২৫ জুন মুরাদাবাদ জিলার বিছরায়ুতে জমিয়তের এক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সভাপতির ভাষণে হযরত মদনী মুসলমানদেরকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। এ বক্তৃতা দানের অভিযোগে তাঁকে দু'সপ্তাহ পর পশ্চিম পাঞ্জাবে এক সম্মেলনে যোগদানের জন্য যাওয়ার পথে সাহারানপুরে টিপরী স্টেশনে রাত বারোটার সময় গ্রেফতার করা হয় এবং সেখান থেকে তাকে মুরাদাবাদ জেলে প্রেরণ করা হয়। মুরাদাবাদ কোর্টে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। এ মুকাদ্দমায়ও তিনি কোন এডভোকেট নিযুক্ত না করে নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। সে বক্তৃতায় তিনি নিজেই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা অকপটে ব্যক্ত করেন। আদালত তাঁকে ছয় মাসের জেল প্রদান করে। প্রথমে তাঁকে মুরাদাবাদ কারাগারে পাঠানো হয়, পরে সেখান থেকে তাকে নৈনিতাল জেলে প্রেরণ করা হয়। এ সংবাদ দেওবন্দে পৌছলে সারা শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিটিং মিছিলের ঢল নামে। অবশ্য দুই বৎসর দুইমাস পরে ১৯৪৪ সনের ২৬শে আগস্ট তাকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয়।

শায়খুল ইসলাম মদনী জেলে যাওয়ার মাসখানিক পরে ৭/৮/১৯৪২ তারিখে বোম্বাইয়ে মাও. আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের নির্বাহী পরিষদের এক জরুরি মিটিংয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সিদ্ধান্তকে 'কুয়িট ইন্ডিয়া আন্দোলন' নামে অভিহিত করা হয়। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অপরাধে কংগ্রেসের নির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যকে গ্রেফতার করে অজ্ঞাত স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেই সাথে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দেরও বহু সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়।

বৃটিশের নমনীয়তা ঃ

বিশ্বযুদ্ধ চলাকালেই ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের দাবী দাওয়ার প্রেক্ষিতে অনেকটা নত হয়ে পড়ে। এ কারণে তারা ভারতীয়দের সাথে নমনীয় ভাব দেখাতে শুরু করে। ১৯৪২ সালে কট্টরপন্থী বড় লার্ট লর্ড লিনলয়পু-এর স্থলে সেনা অফিসার মি. ডেভিলকে ভারতের বড় লার্ট করে পাঠানো হয়। তিনি বড় লার্ট নিযুক্ত হওয়ার পর যে স্কীম নিয়ে ভারতে আসেন, রেডিওর মাধ্যমে তিনি তা জনগণের সামনে ব্যক্ত করেন। সেই ভাষণে তিনি বলেন, 'ভারতের জন্য একটি নয়া সংবিধান তৈরি করা হবে, সেই সংবিধান তৈরি না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয়দের দ্বারা একটি আন্তর্বর্তীকালীন কাউন্সিল গঠন করা হবে। সেনাবাহিনী ব্যতিত সকল বিভাগ উক্ত কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। ভাইসরয় উক্ত কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ভেটো প্রদানের অধিকার তার থাকবে।

এ প্রস্তাবের উপর আলোচনার জন্য সকল প্রদেশের সাবেক ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও সকল পার্টি প্রধানকে আহ্বান জানানো হয়। মি. জিন্নাহ এতে মুসলিম লীগ প্রধান হিসাবে অংশ গ্রহণ করে মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একক প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসাবে তুলে ধরেন। যদিও জিন্নাহর একগুয়েমীর কারণে বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যায়, কিন্তু বড় লার্টের নিকট মুসলিম লীগ মুসলমানদের একক প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসাবে স্বীকৃত হয়ে পড়ে।

৪৬ সালের নির্বাচন ও উলামায়ে দেওবন্দের বিভক্তি ঃ

ইতিমধ্যে বৃটিশ পার্লামেন্টের নির্বাচনে লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসে। মি. এ্যাটলী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেই তিনি মি. ডেভিলকে ডেকে পাঠান এবং অনতি বিলম্বে ভারতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন। সেমতে সারাদেশে নির্বাচনী তৎপরতা জোরদার হয়ে উঠে। এ নির্বাচন ছিল ভারতের স্বাধীনতার প্রথম সোপান। এ নির্বাচনে মুসলমানদের দলগুলোর মাঝে যারা সংখ্যাধিক্য লাভ করতে পারবে; তারাই হবে আগামী দিনে ভারতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী দল। তাদের আদর্শই বাস্তবায়ন হবে। সুতরাং প্রত্যেক দলই নিজেদের স্বপক্ষে জনমত ভারী করার কৌশল প্রয়োগে মেতে উঠে। যেহেতু সে সময় পর্যন্ত রাজনৈতিক ময়দানে উলামায়ে দেওবন্দের প্রভাব ছিল একচ্ছত্র। মুসলামনরা তখন পর্যন্ত উলামায়ে দেওবন্দকেই নিজেদের ধর্মীয় আশা আকাংখার প্রতীক মনে করত, সুতরাং তাঁদের রাজনৈতিক সমর্থন ছাড়া নির্বাচনে সফলতার সম্ভাবনা ছিল একেবারেই ক্ষীণ। তাই মুসলিম লীগ আলেম উলামাদের সমর্থন আদায়ের জোর প্রচেষ্টা চালায় এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আবেগময় আশ্বাস বাণী শুনিয়ে উলামায়ে দেওবন্দের এক বিরাট জামাতকে নিজেদের স্বপক্ষে টেনে নিতে সক্ষম হয়। যাদের মাঝে মাও. আশরাফ আলী থানভী রাহ., মাও. শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ., মাও. কারী তাইয়্যিব রাহ., মাও. মুফতী মুহা. শফী রাহ. মাও. জা'ফর আহমদ উসমানী রাহ., মাও. এহতেশামুল হক থানভী, মাও.

শামছুল হক ফরিদপুরী, মাও. আতহার আলী রাহ., শর্শিনার পীর মাও. নেসার উদ্দীন, ফুরফুরা পীর মাও. আব্দুল হাই প্রমূখ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তখন দারুল উলুমের মুফতী ছিলেন মুফতী মুহাম্মদ শফী রাহ.। তিনি কংগ্রেসে যোগদানকে হারাম ঘোষণা করেন এবং 'বিকায়াতুল মুসলেমীন মিন বিলায়াতিল মুশরেকীন' নামে একটি ফতওয়া প্রকাশ করেন। এই ফতওয়ার সমর্থনে স্বাক্ষর করেন মুফতি জামিল আহমদ, খাদেমে দারুল ইফতা, খানকায়ে আশরাফিয়া, থানাভবন ও মাও. জা'ফর আহমদ থানভী রাহ.। এ ফতওয়া সারাদেশে আনাচে কানাচে প্রচার করা হয়।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ঃ

পাকিস্তান সমর্থক উলামায়ে কিরামের উদ্যোগে ১৯৪৫ সালের ২০-২৯ শে অক্টোবরে কলকাতার মুহাম্মদ আলী পার্কে মাও. আযাদ সুবহানীর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পাকিস্তান সমর্থক আলেমদের সমন্বয়ে 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' নামে একটি ভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। ফলে উলামায়ে দেওবন্দ দু'টি বিপরীতমুখী চিন্তার ভিত্তিতে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এক দলের চিন্তা ভাবনা ছিল, মুসলমানদের জন্য বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি পৃথক আবাসভূমি একান্ত প্রয়োজন, যেখানে যাবতীয় রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম ইসলামী শরিয়তের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে এবং সেই ভূ-খন্ডকে কেন্দ্র করে ক্রমান্বয়ে গোটা ভারতবর্ষে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। আর অন্য দলের চিন্তা ভাবনা ছিল যে, মুসলামনরা সংখ্যাগরিষ্ঠ না হয়েও এদেশের ক্ষমতায় টিকে ছিল প্রায় সাতশত বৎসর। ইতিমধ্যে মুসলমানরা এদেশে তাদের আদর্শিক প্রভাব বিস্তারে যথেষ্ট অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজ বেনিয়ারাই তাদের এই ক্রমাগ্রগতির পথে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এদেরকে উৎখাত করতে পারলে মুসলমানরা আবার তাদের পূর্ব অবস্থানে ফিরে যেত সক্ষম হবে। তাঁছাড়া এই বৃহত্তর সাম্রাজ্য (যা ইংরেজরা যে কোনভাবেই গড়ে তুলেছিল) অখণ্ড থাকলে আন্তবিশ্বে ভারত একটি পরাশক্তি হয়ে টিকে থাকতে সক্ষম হবে। ফলে আন্তর্জাতিক আগ্রাসন ও বহিঃশক্তির অনুপ্রবেশ থেকে এদেশ আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে। সুতরাং ইংরেজ বিতাড়নের প্রশ্নে সমগ্র ভারতবাসীকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হতে হবে। অন্যথায় চেপে বসা এই জগদ্দল পাথরকে সরানো সম্ভব হবে না। তাই এ দল সর্বভারতীয় ঐক্যের প্রয়োজন অনুভব করেন তীব্রভাবে।

দু-দলই আপন আপন চিন্তা ধারার কথা সমাজের মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য জোর তৎপরতা শুরু করেন। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের আলেমরা মানুষকে একথা জোরেসোরে বুঝাতে থাকেন যে, গুটি কতক অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে, অবশিষ্ট অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলমানদের ভবিষ্যৎ দুদর্শা চরমে গিয়ে পৌঁছবে এবং গোটা ভারত জুড়ে দীর্ঘ দিনে গড়ে উঠা মুসলিম ঐতিহ্য

মণ্ডিত স্থানসমূহ ফেলে রেখে যেতে হবে হিন্দুদের কাছে। ফলে মুসলমানদের বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, হাজার হাজার মাদ্রাসা, মসজিদ, পীর বুজুর্গদের মাযার এসব কিছুই ধর্মবিদের হাতে ধ্বংস স্তুপে পরিণত হবে। শত শত বছরের চেষ্টা প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে গোটা ভারত জুড়ে ইসলামী তাহজীব ও তামাদ্দুনের যে সুউচ্চ সৌধ নির্মিত হয়েছে তা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। সুতরাং এসব কথা বিবেচনা করেই আগামী নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য তারা জনগণের নিকট আবেদন জানাতে থাকেন।

অপর পক্ষে যে সব আলেম-উলামা পাকিস্তান প্রস্তাবের পক্ষে মুসলিম লীগের সমর্থনে কাজ করেছিলেন তারা মূলতঃ মুসলিমলীগী নেতৃবৃন্দের মৌখিক আশ্বাসের ভিত্তিতে কল্পনার পাখায় ভর করে পাকিস্তান প্রস্তাবকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের পবিত্র প্রস্তাব বিশ্বাস করে এর বাস্তবায়নের জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। উলামায়ে কিরাম যারা ছিলেন তারা যে পাকিস্তান প্রস্তাবকে ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্নময় কাংখিত প্রস্তাব ধরে নিয়েই এর পিছনে জীবন বাজী রেখে সংগ্রাম করে গেছেন তাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। যদিও মুসলিম লীগের বড় বড় নেতাদের মাথায় পাকিস্তান অর্থ মুসলমানদের পৃথক আবাস ভূমি ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। আর মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের সাথে এ মর্মে কোন লিখিত চুক্তিও উলামায়ে কিরামের ছিল না।

অথচ হাওয়ার উপর ইসলামী রাষ্ট্রের কল্পনার প্রাসাদ নির্মাণ করেই এই আবেগময় প্রস্তাব নিয়ে তারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুটে যান। তাদের নির্বাচনী বক্তৃতাসমূহ থেকে তারা পাকিস্তান প্রস্তাবকে ইসলামী রাষ্ট্রের পবিত্র প্রস্তাব ভেবে কি আবেগময় চেতনা নিয়ে কাজ করেছেন তা সহজেই বুঝা যায়। ১৯৪৫ ইং সালের ২৬ শে অক্টোবর মাও. যফর আহমদ উসমানী রাহ. তাঁর এক নির্বাচনী বক্তৃতায় বলেন- যদিও বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষকে ইসলামী হুকুমতের আওতাধীন আনা মুশকিল, তবুও অন্তত যে সকল প্রদেশে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা রয়েছে সেগুলোতে হলেও ইসলামী শাসন চালু করা আবশ্যক। রাসূল সা. এর মক্কা থেকে হিজরতের মাঝে আমরা এর নিদর্শন খুঁজে পাই। মক্কায় ইসলামী শাসন বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়ায় রাসূল সা. হিজরত করতঃ মদীনাকে কেন্দ্র করে ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে ইসলাম কতটুকু লাভবান হয়েছিল জগতের ইতিহাস তার সাক্ষী। কাজেই এটিও অসম্ভব নয় যে পৃথক ভূ-খণ্ডে পাকিস্তানে ইসলামের পুর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধন করা সম্ভব হলে এর জ্যোতিতে গোটা ভারতবর্ষ আলোকিত হয়ে উঠবে এবং এতে ইসলামের সুস্পষ্ট বিজয় সূচিত হবে।

১৯৪৫ ইং সালের ৩রা নভেম্বর কলকাতার 'আসরে জাদীদ' পত্রিকায় মাও. শাব্বীর আহমদ উসমানীর একটি বক্তৃতা ছাপা হয়। সে বক্তৃতায় তিনি বলেন- পাকিস্তান প্রস্তাব হল কেবল একটি প্রারম্ভিক উদ্যোগ, ইসলামী হুকুমত পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া হল এর শেষ গন্তব্য।

অপর এক নির্বাচনী বক্তৃতায় তিনি বলেন- পাকিস্তান অর্জন করার জন্য যদি আমার শরীরের রক্তও দিতে হয় তাহলে এ রক্ত দেওয়াকে আমি নিজের জন্য গৌরবের বিষয় বলে মনে করব। কারণ এদেশে মুসলমানদের ধর্ম ও জাতীয়তা নিয়ে টিকে থাকা এবং ইজ্জত ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকা বস্তুতঃ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উপরই নির্ভরশীল।

এ ধরনের অসংখ্য উদ্ধৃতি দেওয়া যাবে। তবে সকল উদ্ধৃতির মাঝে একটি সত্যই চরমভাবে ফুটে উঠে যে, পাকিস্তান কেবল মাত্র মুসলমানদের একটি পৃথক আবাসভূমিই হবে না; বরং সেটি হবে একটি ইসলামী রাষ্ট্র। যার শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হবে 'মিনহাজআলান নবুয়্যাহ'-এর আঙ্গিকে। যার পরিচালকরা সাহাবীগণের প্রতিকৃতি না হলেও তার কাছাকাছি অবশ্যই হবে।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এই আবেগময় প্রেরণা নিয়ে তাঁরা সারা দেশের মানুষকে পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন করা ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার নিমিত্তে আগামী নির্বাচনে মুসলিম লীগকে ভোট দেওয়ার জন্য বুঝাতে থাকেন। তাদের এই আবেগময় বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ পাকিস্তান প্রস্তাবের পক্ষে ঝুঁকে পড়ে। দেওবন্দী আলেমদের উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু ব্যক্তি মুসলিম লীগকে সমর্থন করায় এবং তাদের সমর্থনের ফলে মুসলিম লীগ ভারতে মুসলমানদের একক প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসেবে স্বীকৃত হয়ে যাওয়ার কারণে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের জন্য নির্বাচন অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে। তাই তাঁরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমমনা ইসলামী দলসমূহের সমন্বয়ে একটি ঐক্যজোট গঠন করার নিমিত্তে 'অল-পার্টি কনফারেন্স' আহ্বান করে। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ছাড়ও 'অলইন্ডিয়া মুসলিম মজলিশ' মজলিশে আহরাব, অলইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স, ইন্ডিপেডেন্ট পার্টি বিহার, কৃষক প্রজা পাটি বাঙ্গাল, আঞ্জুমানে ওয়াতান বেলুচিস্থান, অল ইন্ডিয়া শীয়া পলিটিকেল কনফারেন্স এবং সীমান্তের খোদায়ী খেদমতগার পার্টির দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ উক্ত কনকারেন্সে অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনা পর্যালোচনার পর মুসলিম পার্লামেন্টারী বোর্ড নামে একটি ঐক্যজোট গঠন করা হয়। হযরত মদনী রাহ. কে এর সভাপতি মনোনীত করা হয়।

হযরত মদনী রাহ. তার দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দ্বারা একথা আঁচ করে নিতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তান প্রস্তাবের পিছনে মূলতঃ কাজ করছে সাম্রাজ্যবাদের দোসর, পুঁজিপতি ও বুর্জুয়া শ্রেণীর ক্ষমতা লিপ্সা ও আখের গোছানোর ফিকির। আর ইসলামী রাষ্ট্রের আবেগময় শ্লোগান দিয়ে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে উলামায়ে কিরাম ও মুসলমানদেরকে। কেননা যে নেতৃবৃন্দ ব্যক্তি জীবনে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে আগ্রহী নন, তারা কি করে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী হুকুমত কায়েম করবেন? ইসলামী হুকুমত তো আদর্শিক চেতনার চূড়ান্ত বিকাশের প্রতিফল মাত্র। অথচ শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমির প্রস্তাব বর্তমান ও

ভবিষ্যত বিচারে এদেশের অবস্থার প্রক্ষিতে কোন রাজনৈতিক বিচক্ষণতার দাবী রাখে না। এতে বরং সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলমানদের জন্য এক ভয়াবহ ও করুণ পরিণতির সুস্পষ্ট আভাস রয়েছে। একারণে তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণকে এ ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য দেশব্যাপী সফর শুরু করেন। কিন্তু ততদিনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক অদম্য আবেগ সারাদেশের মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। একারণে তাঁর কথা অনুধাবন করার জন্য কেউ চেষ্টা করেনি বরং বিভিন্ন স্থানে তাঁকে লাঞ্ছিত করা হয় চরমভাবে। পাঞ্জাব, অমৃতসর, মুলতান, রংপুর ও সৈয়দপুর, কটিহা, ভাগলপুর ইত্যাদি অঞ্চলে সফর কালে তাঁর সাথে অবমাননাকর ও লজ্জাষ্কর আচরণ করা হয়, তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়, তাঁর দাড়ি ধরে টানাহেঁচড়া করা হয়, টুপি কেড়ে নেওয়া হয়, পচা ডিম, টমেটো ইত্যাদি তাঁর দিকে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু শায়খুল ইসলাম এই অবমাননাকর ও নির্মম আচরণ অম্লান বদনে সহ্য করে যান এবং তাঁর তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। সারা দেশে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার, মিটিং, মিছিল ইত্যাদি চলতে থাকে। এ অবস্থার মাঝ দিয়েই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ফলাফল কি হবে তা পূর্ব থেকেই অনুমান করা যাচ্ছিল। মুসলিম লীগ শতকরা ৮৫টি আসন লাভ করে। পক্ষান্তরে মুসলিম পার্লামেন্টারী বোর্ড পায় মাত্র ১৫টি আসন। এ নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবীকে আরো বলিষ্ঠ করে তোলে। ফলে অবিভক্ত ভারতের চিন্তা ম্লান হয়ে যায়।

মন্ত্রী মিশনের সুপারিশ ও মুসলিম লীগের ঘোষণা ঃ

নির্বাচন চলাকালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. এ্যাটলী ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্ত রের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনার জন্য তিনজন বৃটিশ মন্ত্রীর সমন্বয়ে একটি মিশন ভারতে প্রেরণ করে। ইতিহাসে এ মিশনকে 'মন্ত্রী মিশন' বলা হয়। মন্ত্রী মিশন সকল রাজনৈতিক দলের সাথে মত বিনিময় করে। মিশন মুসলিম লীগের দেশ বিভক্তির প্রস্তাব মেনে নিতে সম্মত না হলে মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবীতে জিহাদের ডাক দেয় এবং ২৯ শে জুন ১৯৪৬ ইং বোম্বাই থেকে প্রত্যক্ষ আক্রমণের ঘোষণা দেয়। ফলে সারাদেশে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। কলকাতা, নোয়াখালী, বিহার, পাঞ্জাব ইত্যাদি অঞ্চলে এ দাঙ্গা চরম আকার ধারণ করে। হাজার হাজার মুসলমান হিন্দুদের হাতে আর হাজার হাজার হিন্দু মুসলমানদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়। সারাদেশে মানুষের রক্তে হোলিখেলা শুরু হয়, হাজার হাজার ঘরবাড়ি ভষ্মিভূত হয়, অগণিত নারী নরপৈশাচিকতার শিকার হয়। গান্ধীসহ অনেক নেতাই এ দাঙ্গা বন্ধের জন্য সারাদেশে ছুটে বেড়ান। অবশেষে গান্ধী দাঙ্গা বন্ধ না হলে আমরণ অনশনের ঘোষণা দেন। মন্ত্রী মিশন, এদেশীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনার পর তাদের সুপারিশ পেশ করেন। সে ভিত্তিতে ২রা সেপ্টেম্বর ৪৬ইং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমন্বয়ে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করে ভারতীয়দের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা

হয়। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এক বৎসর স্থায়ী হয়। কিন্তু মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস আপন আপন দাবীতে অনড় থাকে। যে কারণে সারাদেশে খণ্ড খণ্ড দাঙ্গাও চলতে থাকে।

দেশের এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে বৃটেন সরকার সমস্যার দ্রুত নিরসনের জন্য তড়িৎকর্মা বলে খ্যাত লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেনকে ভারতের বড়লাট করে পাঠায়। মাউন্ট ব্যাটেন ভারতে এসেই সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে পৃথক পৃথক আলোচনায় বসেন। ভারত বিভক্তির প্রস্তাবটি তিনিও মেনে নিতে পারেননি। মাউন্ট ব্যাটেনও অখন্ড ভারতের প্রস্তাবের পক্ষে নেতৃবৃন্দকে ঐক্যমতে আনার যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু লীগনেতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ তার বিভক্তির প্রস্তাব থেকে সামান্যও নড়তে রাজী হননি। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন মাউন্ট ব্যাটেন পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরিস্থিতির চাপে ১৪ই জুন কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী পরিষদ থেকেও লীগের প্রস্তাবের সমর্থন ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার অল্প কয়দিন পর ১৪ ও ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ ইং সালে যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।

স্বাধীনতার শুভলগ্নে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে প্রথম পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেন মাও. শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ., আর পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেন জমিয়তের অন্যতম নেতা হযরত মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী রাহ.। মূলতঃ উলামায়ে দেওবন্দের দু'টি দলই ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে কাজ করে গেছেন। এজন্য উভয় দলই তাদের রাজনৈতিক বক্তৃতায় সেই কাঙ্খিত উদ্দেশ্যের কথা জনগণের সামনে অকপটে ব্যক্ত করছেন। তবে একদল মনে করতেন, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের স্বাধীনতার এই মুহুর্তে মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি ভূ-খণ্ড ইসলামী রাষ্ট্রের নামে বরাদ্দ করা নাহলে পরবর্তীতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপে এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত নাও হতে পারে। পরে হিন্দুদের চাণক্য চাল কাটিয়ে উঠা মুসলমানদের জন্য সম্ভব হবে কিনা তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। একারণেই তারা পাকিস্তান প্রস্তাবে জান বাজী রেখে সংগ্রাম করে গেছেন। চলমান হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা গুলো তাদের এই চিন্তার পিছনে যুক্তি হয়ে কাজ করেছে।

আর অন্যদল মনে করেছেন, গোটা ভারতই মুসলমানদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। ইংরেজরা মাঝখানে বাঁধা না হলে অদ্যাবধি মুসলিম আধিপত্যই বহাল থাকত। তাই ছোট একটি ভূ-খন্ড নয় গোটা ভারতবর্ষকেই ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা করা সম্ভব হবে যদি ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করা যায়। তাদের এই চিন্তার সম্ভাব্যতার পিছনে যুক্তি হয়ে কাজ করেছে অতীতের ইতিহাস। কেননা একদিন এদেশে মুসলমানরা গুটিকতক এসে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুসলমান বানিয়ে তাদের ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দিয়েছে। সংখ্যালঘু থেকেও সাম্রাজ্য শাসন

করেছে। অতএব ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তাদের কাছে ছিল খুবই সুস্পষ্ট। তাছাড়া ইংরেজ বিতাড়নের জন্য যে বৃহৎ ঐক্য গড়ে উঠেছে তা ভেঙ্গে গেলে ইংরেজ বিতাড়নের প্রশ্নই সুদূর পরাহত হয়ে পড়তে পারে। তাহলে ভবিষ্যত হবে আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন। অপর পক্ষে বিভক্তির পর পাকিস্তানের বাইরে যে সব মুসলমান থেকে যাবে তাদের করুণ পরিণতির চিন্তাও তাদেরকে অখন্ড ভারত প্রস্তাবের পক্ষে সংগ্রাম করার প্রেরণা যুগিয়েছে। দু'পক্ষেরই নেতৃত্ব দিয়েছেন শায়খুল হিন্দ রাহ.-এর দুই দিকপাল শিষ্য। এক দিকে হুসাইন আহমদ মদনী রাহ., অন্যদিকে শিব্বির আহমদ উসমানী রাহ.।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর উলামায়ে দেওবন্দের রাজনৈতিক তৎপরতা ঃ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি শায়খুল ইসলাম মাও. হুসাইন আহমদ মদনী পাকিস্তানে বসবাসকারী তাঁর অনুসারীদের পাকিস্তানের উন্নতি, স্থায়িত্ব ও কুরআন-সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। অপর দিকে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি মাওলানা আতহার আলী জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পাকিস্তানে বসবাসকারী নেতৃবৃন্দকে পাকিস্তানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকারের তালবাহানা ও গড়িমশির কারণে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়নি। অবশেষে মাও. শাব্বীর আহমদ উসমানীর অনেক প্রচেষ্টার ফলে ১৯৪৯ সালের জাতীয় পরিষদে শাসনতন্ত্রের আদর্শ প্রস্তাবের পক্ষে (কারারদাদে মাকাছেদ) পাশ হয়। যাকে মাও. শাব্বীর আহমদ উসমানী নিজেই ঢিলা-ঢালা প্রস্তাব বলে আখ্যায়িত করেন।

১৯৫০ সালের ১৮-২০ শে ফেব্রুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মাছিহাতায় অনুষ্ঠিত জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের এক সম্মেলনে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি নির্বাচিত হন শর্ষীণার পীর মাওঃ নেসার উদ্দীন রাহ.। তার বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে মাওলানা আতাহার আলী প্রথমে কার্যকরী সভাপতি হিসাবে ও পরে সভাপতি হিসাবে জমিয়তের নেতৃত্ব দেন। মুসলিম লীগ শাসকদের ইসলামী শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে উদাসীনতা জমিয়ত নেতৃবৃন্দের মাঝে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার করে। ফলে এই সম্মেলনে মুসলিম লীগ থেকে জমিয়তের সমর্থন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সারা দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবীতে আন্দোলন গড়ে তোলারও সিদ্ধান্ত হয়। এসিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তারা নেজামে ইসলাম বা ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবীতে সারা দেশে আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং আন্দোলনের শ্লোগান হিসাবে বেছে নেন 'নেজামে ইসলাম দিতে হবে'– 'আমরা চাই নেজামে ইসলাম'।

১৯৫১ সালে ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবীতে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের

উদ্যোগে সিলেটে এক ঐতিহাসিক উলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন আল্লামা সাইয়্যিদ সুলায়মান নদভী। সম্মেলনে ইসলামী শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া পেশ করা হয়। অতঃপর ১৯৫১ সালে করাচীতে আল্লামা সাইয়্যিদ সুলায়মান নদভীর সভাপতিত্বে সকল দলমতের উলামায়ে কেরামের এক ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ঐতিহাসিক ২২ দফা মূলনীতি প্রণীত ও অনুমোদিত হয়। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের হাতে তা অর্পণ করা হয় এবং সারা দেশে ইসলামী শাসনতন্ত্রের আন্দোলন জোরদার করা হয়। ১৯৫২ সালের ১৮,১৯,২০ শে মার্চ কিশোরগঞ্জের হায়বত নগরে জমিয়তের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে দেশবরেণ্য উলামায়ে কিরাম উপস্থিত ছিলেন। এ সম্মেলনে এমর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, সরকার সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিলে জমিয়তে উলামা সে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে, এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দেওয়ার জন্য জমিয়তের একটি পৃথক রাজনৈতিক সেল থাকবে, আর যেহেতু জমিয়তে উলামার রাজনৈতিক তৎপরতার মূল উদ্দেশ্য হবে নেযামে ইসলাম তথা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, অতএব এই সেলের নাম হবে 'নেযামে ইসলাম পার্টি'। মাওঃ আতাহার আলীকে উক্ত নেযামে ইসলাম পার্টির সভাপতি; মাও. মুসলেহ উদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক ও মাও. আশরাফ আলী (ধর্মমণ্ডলী) কে সহ-সম্পাদক মনোনীত করা হয়।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জমিয়ত নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে ১৯৫৩ সালে ঢাকার পল্টন ময়দানে নেযামে ইসলাম বা ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবিতে ২ দিন ব্যাপী এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জমিয়ত সভাপতি মাও. আতহার আলীর আহ্বানে পালিত হয় নেযামে ইসলাম দিবস।

একদিকে ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবী অপরদিকে মুসলিম লীগ সরকারের এ ব্যাপারে অনীহা ও জাতির সঙ্গে প্রদত্ত ওয়াদা খেলাফীর এই দ্বিমুখী পরিস্থিতির ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ ৯ বৎসরেও মুসলিম লীগ সরকার কোন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ব্যর্থ হয়। অথচ ভারত সরকার মাত্র ১ বৎসরের মধ্যেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে ফেলে। এতে দেশবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। দেশে নির্বাচনের দাবী উঠে। ১৯৫৪ সালে সরকার তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। মুসলিম লীগের ইসলামী শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে জাতির নিকট প্রদত্ত ওয়াদা খেলাফীল কারণে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগ থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে মাওলানা ভাসানীর আওয়ামী মুসলিম লীগ ও শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পাটির সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। যুক্তফ্রন্ট গঠনকালে কৃষক প্রজা পার্টি ও আওয়ামী মুসলিম লীগের সাথে নেযামে ইসলাম পার্টি নাম ব্যবহার করা হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয় ও হক-ভাসানী-আতাহার আলী যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়। যার মধ্যে এমন কিছু ইসলামী ধারা সন্নিবেশিত হয়েছিল যা নিয়ে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না।

পক্ষান্তরে ইসলাম বিরোধী অনেক আইন তাতে সন্নিবেশিত করা হয়। ফলে ওটাকে ইসলামী শাসনতন্ত্র আখ্যা দেয়া যায়নি।

মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানীর ইন্তেকালের পর ডিসেম্বর ১৯৫২ সালে মুলতানে জমিয়তের কনভেনশনে মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী সভাপতি ও মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের জমিয়ত নেতৃবৃন্দ খতমে নবুওয়ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বোখারী, মাওলানা গোলাম গাউছ হাজারভী প্রমুখ জমিয়ত নেতৃবৃন্দের আহ্বানে লক্ষ লক্ষ মুসলমান কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবীতে লাহোরে বিক্ষোভ মিছিল করে। বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। দশ হাজারের অধিক মুসলমান লাহোরের রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে শাহাদত বরণ করে। বিচারের নামে প্রহসনের মাধ্যমে জমিয়ত নেতা মাওলানা বুখারী ও মাওলানা হাজারভী মাও: আব্দুস সাত্তার নিযামী ও জামাতে ইসলামের আমীর মওদুদী সাহেবের ফাঁসির হুকুম হয়। এ সময় জননেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজ খরচে লাহোর গিয়ে জমিয়ত নেতৃবৃন্দের পক্ষে ওকালতি করেন। মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের চাপের মুখে পাকিস্তান সরকার জমিয়ত নেতৃবৃন্দকে ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হলে তাঁরা কারামুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে জমিয়তের নির্বাহী কমিটি পুনঃগঠন করা হয়। মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ হাসান সভাপতি নির্বাচিত হন। অতপর ১৯৫৬ সালে জমিয়তের কনভেনশনে মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী সভাপতি ও মাওলানা গোলাম গাউছ হাজারভী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

কিন্তু ঘটনাক্রমে ১৯৫৬ সালের এই নির্বাচনে জমিয়তে উলামার নেতৃত্ব চলে যায় সাবেক জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সমর্থক ব্যক্তিবর্গের হাতে। এতে পাকিস্তান সমর্থক আলেম উলামারা রাজনৈতিকভাবে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের আলেমগণের মাঝে এ প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কর্মতৎপরতা আবর্তিত হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে যারা জমিয়তে উলামাযে হিন্দের সাথে অখণ্ড ভারতের দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন তাদের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে জমিয়তে উলামার নেতৃত্ব ছিল পাকিস্তান সমর্থক আলেমদের হাতে মাওঃ আতাহার আলীর নেতৃত্বে-যারা পূর্ব পাকিস্তানে নেযামে ইসলাম নামে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখেন। পাকিস্তানের দুই ভূখণ্ডে দুই দর্শনে বিশ্বাসী দুই দল আলেমের নেতৃত্বে একই নামে জমিয়তে উলামার রাজনৈতিক ও অন্যান্য কার্যক্রম চলতে থাকে।

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়। যার মাঝে এমন কিছু ইসলামী ধারা সন্নিবেশিত হয়েছিল যা নিয়ে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না।

পক্ষান্তরে ইসলাম বিরোধী অনেক আইন তাতে সন্নিবেশিত থেকে যায়। ফলে ওটাকে ইসলামী শাসনতন্ত্র আখ্যা দেয়া যায়নি।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা সারা দেশে সামরিক শাসন জারী করেন এবং ১৯৫৮ সালের ২৭ শে অক্টোবর জেনারেল আইউব খান ক্ষমতা দখল করেন। দেশে সামরিক আইন থাকায় জমিয়ত নেতৃবৃন্দ ' নেযামুল উলামা' নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন কায়েম করে কাজ চালিয়ে যান। এ সময় তারা আইউব খান কর্তৃক জারীকৃত শরীয়ত বিরোধী মুসলিম পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ইতিমধ্যে মাওঃ আহমদ আলী লাহোরী ইন্তেকাল করেন এবং হাফেজে হাদীস মাওলানা আব্দুল্লাহ সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে আইউব খান সামরিক আইন তুলে নিলে জমিয়ত পুনরায় তৎপরতা শুরু করে এবং মাওঃ আব্দুল্লাহ দরখাস্তীকে সভাপতি ও মাওঃ গোলাম গাউছ হাজারভীকে সাধারণ সম্পাদক করে জমিয়তের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। আইউব খানের একনায়কতন্ত্র ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন শুরু করেন।

১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সরকার সারাদেশে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করে। এ সময় আইউব খান 'ন্যাশনাল মুসলীম লীগ' নামে একটি নতুন দল গঠন করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। অপর পক্ষে মূল মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে মুহম্মদ আলী জিন্নার বোন ফাতেমা জিন্নাহকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করানো হয়। পশ্চিম পাকিস্তান জমিয়তে উলামার নেতৃবৃন্দ আসন্ন নির্বাচনে আইউব খান কিংবা ফাতেমা জিন্নাহ কাউকেই ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনযোগ্য নয় মনে করে নিজেদের পক্ষ থেকে একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মনোনীত করার সিদ্ধান্ত করেন। এ বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানের আলেম উলামাদের সাথে মত বিনিময়ের জন্য মুফতী মাহমুদ ও গোলাম গাউস হাজারভী পূর্ব পাকিস্তানে সফরে আসেন। যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের আলেম উলামারা তখন মাও. আতহার আলীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন, এ কারনে তাঁরা মাওঃ আতহার আলীর সাথে মত বিনিময় করেন এবং তাঁকেই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুরোধ করেন। যে কারনেই হোক মাও. আতহার আলী এতে অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং তিনি বলেন যে, এই বিবাদমান পরিস্থিতিতে আমি আর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করব না। অগত্যা চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জনাব রেজাউল করীম এম এ কে জমিয়তের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। রেজাউল করীম সাহেব ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার ও দ্বীনদার মানুষ এবং জমিয়তের সাথে দীর্ঘদিন থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। একটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের প্রতীক হিসাবেই জমিয়ত তাকে মনোনয়ন দান করেছিল। নির্বাচনে পাশের সম্ভাবনা পূর্ব থেকেই তেমন একটা

ছিল না। শুধুমাত্র দলীয় আদর্শের প্রতীক হিসাবে একজন প্রার্থী দেওয়াই নির্বাচনে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল। নির্বাচনে যেভাবেই হোক আইউব খান বিজয়ী হয়েছিলেন।

নির্বাচনের পর জমিয়তে উলামার কেন্দ্রীয় কমিটি পূর্ব পাকিস্তানে তাদের সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদার করেন। যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের আলেম উলামাদের অধিকাংশই তখন নেযামে ইসলাম পার্টির নামে কাজ করে যাচ্ছিলেন, এবং নেযামে ইসলাম একটি পৃথক দলের রূপ গ্রহণ করে ফেলেছিল, একারণে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম নামে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন করে সংগঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। যেহেতু মাও. আতহার আলী তখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেকটা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছিলেন; একারণে নেযামে ইসলাম তখন মাও. মুসলেহ উদ্দিন, খতীবে আযম মাও. সিদ্দিক আহমাদ, চৌধুরী মুহাম্মদ আলী ও এডভোকেট ফরিদ আহমদের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল। ১৯৬৩ সালে নেযামে ইসলামের যে দলীয় নির্বাচন হয় তাতে চৌধুরী মুহাম্মদ আলী সভাপতি ও এডভোকেট ফরীদ আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এতে নেযামে ইসলামে উলামায়ে কিরামের নেতৃত্ব বলতে গেলে অবশিষ্ট থাকেনি। অপর দিকে আব্দুল্লাহ দরখাস্তী ও গোলাম গাউস হাজারভীর নেতৃত্বে জমিয়তে উলামা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠে। তারা পূর্ব পাকিস্তানে জমিয়তে উলামার সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদার করার উদ্যোগ নেয়। ফলে ১৯৬৬ সালের ১৬ই মার্চ ঢাকার নবাব বাড়ীতে পূর্ব পাকিস্তানের উলামায়ে কিরামের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। উক্ত সম্মেলনে মাও. আব্দুল করিম শায়খে কৌড়িয়াকে সভাপতি ও মাওঃ শামসুদ্দীন কাসেমী কে সাধারণ সম্পাদক করে জমিয়তে উলামার নতুন কমিটি গঠন করা হয়। তারা নব উদ্যমে কাজ কর্ম শুরু করেন। এর ফলে উভয় পাকিস্তানেই জমিয়তে উলামার নেতৃত্ব চলে যায় সাবেক জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সমর্থক আলেমদের হাতে। বিষয়টি পাকিস্তান সমর্থক আলেমগণ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। ফলে তাঁরা তাদের দলকে পুনঃসচল করার চেষ্টা করেন। মাওঃ আতহার আলী তখন পাকিস্তান সফরে যান এবং পাকিস্তান সমর্থক আলেম উলামাদের নেতৃত্বে জমিয়তে উলামাকে পুনরায় তৎপর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুফতী শফী, মাওঃ জাফর আহমদ উসমানী, মাওঃ এহতেশামুল হক থানভী প্রমুখ উলামায়ে কিরামের সমন্বয়ে নতুনভাবে সাংগনিক তৎপরতা শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু জমিয়তে উলামা নামে কাজ করা তাদের জন্য অসুবিধা জনক হয়ে পড়ে। কেননা এই নামে পূর্ব থেকেই যে দল কাজ করে যাচ্ছিল তারা তখন যথেষ্ট গতিশীল ছিল। ফলে ১৯৬৭ ইং সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে পার্টির উভয় পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সম্মতিতে নামের ক্ষেত্রে ভিন্নতা সৃষ্টির প্রয়োজনে নিজেদের দলের নাম মারকাযী জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেযামে ইসলাম পার্টি রাখার সিদ্ধান্ত হয় এবং এও সিদ্ধান্ত

হয় যে সংক্ষেপে এদলকে 'নেযামে ইসলাম পার্টি' নামেও অভিহিত করা যাবে। ১৯৬৯ সালে নেযামে ইসলাম পার্টির যে নির্বাচন হয় তাতে মাও. মুফতী শফী কে প্রধান উপদেষ্টা মাও. জাফর আহম্মদ উসমানীকে সভাপতি মাও. আতহার আলীকে কার্যকরী সভাপতি মনোনীত করা হয়। ফলে উলামায়ে দেওবন্দ নেযামে ইসলাম ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এই দুই নামে দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দু'দলই উভয় পাকিস্তানে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান যথেষ্ট সুদৃঢ় করে ফেলে এবং ১৯৭০ এর নির্বাচনে দু'দলই অত্যন্ত তৎপরতার সাথে অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং বলা যায় যে ১৯৬৭ সালেই উলামায়ে দেওবন্দ দু'টি পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। বিভক্তির পর উভয় দলের পৃথক পৃথক তৎপরতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নে পেশ করা গেল।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের তৎপরতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট ঃ

বিভাজন সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর জমিয়তে উলামার আহ্বানে ৩, ৪, ৫ মে ১৯৬৮ সালে লাহোরে মুচী দরওয়াজায় পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের প্রায় ৫ হাজার উলামায়ে কেরামের এক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সের প্রথম দিনে কাউন্সিল অধিবেশন হয়। হাফেজে হাদীস মাওলানা আব্দুল্লাহ দরখাস্তী জমিয়তের সভাপতি ও মুফতি মাহমুদ সাহেব সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

জমিয়ত উদ্যমের সাথে কাজ শুরু করে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেও শামসুদ্দীন কাসেমী ও শায়খে কৌড়িয়ার নেতৃত্বে জমিয়তে উলামা বেশ গতিশীল হয়ে উঠে। অতঃপর ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৬৯ সালে ঢাকার ইডেন হোটেলের সম্মুখস্থ মাঠে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তের কাউন্সিল অধিবেশনে পীর মোহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়াকে সভাপতি ও মাওঃ শামসুদ্দীন কাসেমীকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে পীর সাহেব সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং জমিয়তের পৃষ্ঠপোষক আঃ করিম কৌড়িয়াকে সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

আইউব খানের পতনের পর ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া খান সাধারণ নির্বাচন দেন। জমিয়ত উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। উক্ত নির্বাচনে ইসলামী দলগুলোর মাঝে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে অধিক সংখ্যক আসন লাভ করে। জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক মুফতি মাহমুদ রাহ. সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর জেনারেল ইয়াহইয়া ও ভুট্টোর হটকারী সিদ্ধান্তের কারণে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার অনিবার্য পরিণতিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। দীর্ঘ ৯ মাস সংগ্রামের পর বাংলাদেশ মুক্ত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হলেও

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম নিষিদ্ধ হয় নি। স্বাধীনতার পর বন্ধ হয়ে যাওয়া মাদ্রাসাগুলো খুলে দেয়ার ব্যাপারে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম জানুয়ারী ১৯৭৪ সনে যাত্রাবাড়ী দারুল উলূম মাদানিয়ায় অনুষ্ঠিত এক উলামা সম্মেলনে মাও. শায়েখ তাজাম্মুল আলী জালালাবাদীকে সভাপতি ও মুফতী আহরারুজ্জামান হবিগঞ্জীকে সাধারণ সম্পাদক করে 'জমিয়তে উলামা বাংলাদেশ' গঠন করা হয়।

অতঃপর ২৯ শে অক্টোবর ১৯৭৪ সালে যাত্রাবাড়ী দারুল উলূম মাদানিয়ায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মাও. আব্দুল করিম শায়খে কৌড়িয়াকে সভাপতি ও মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট জমিয়তের মজলিসে আলেমা গঠন করা হয়। ২৫, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭৬ সালে পাটুয়াটুলি জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মাও. আজিজুল হককে সভাপতি এবং মাও. মুহিউদ্দিন খানকে সাধারণ সম্পাদক করে 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ' পুনগঠন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহকে একটি বোর্ডের আওতায় আনার জন্য মাও. রেজাউল করীম ইসলামাবাদীকে আহ্বায়ক করে একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়। সেমতে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ১৯৮৭ সালে লালবাগের শায়েস্তা খান হলে সকল কওমী মাদ্রাসাসমূহের এক সম্মেলন আহ্বান করে। উক্ত সম্মেলনে 'বেফাকুল মাদারিসিল কওমিয়্যাহ্ আল আরাবিয়্যাহ বাংলাদেশ" নামে কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড গঠিত হয়। ১৯৭৮ সালে মাও. মুহিউদ্দিন খান সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করার পর পাটুয়াটুলী জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত মজলিসে শুরার সভায় মাও. শামসুদ্দীন কাসেমীকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

২৫ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ সালে ঢাকার ফরাশগঞ্জস্থ লালকুঠি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জমিয়তের কাউন্সিল অধিবেশনে মাও. আজিজুল হক সভাপতি হিসাবে ও মাওঃ শামসুদ্দিন কাসেমী সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পুনরায় নির্বাচিত হন। উক্ত কাউন্সিল অধিবেশনে জমিয়তের গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হয় এবং ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৮০ ইং মজলিশে শুরার অধিবেশনে তা অনুমোদিত হয়।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর জমিয়ত নেতৃবৃন্দের সক্রিয় সহযোগিতায় হযরত হাফেজ্জী হুজুর নভেম্বর ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। হাফেজ্জী হুজুরের আহ্বানে জমিয়ত সাময়িকভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থগিত রেখে হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলনের ব্যানারে রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু খেলাফত নেতৃবৃন্দের ইরান সফরকে কেন্দ্র করে মতানৈক্য দেখা দিলে, এবং ইরানের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করার কারণে ১৯৮৪ সালে জমিয়তের এক সম্মেলনে খেলাফত আন্দোলন থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করা হয় ও মাও. আব্দুল করীম শায়খে কৌড়িয়াকে সভাপতি ও মাওলানা শামসুদ্দিন কাসেমীকে সাধারণ সম্পাদক করে রাজনৈতিক কর্মকান্ড

পুনরায় শুরু করা হয়। ২৮শে মার্চ ১৯৮৮ সালে জামেয়া হোসাইনিয়া আরজাবাদ মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত জমিয়তের কাউন্সিল অধিবেশনে মাও. আব্দুল করীম শায়খে কৌড়িয়া সভাপতি মাও. শামসুদ্দীন কাসেমী সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পুনরায় নির্বাচিত হন। বিগত ১১, ১২, ১৩ ডিসেম্বর '৯১ সালে জামেয়া হোসাইনিয়া আরজাবাদ মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত জমিয়তের কাউন্সিল অধিবেশনে আব্দুল করীম শায়খে কৌড়িয়াকে সভাপতি ও সাবেক ধর্মপ্রতিমন্ত্রী মুফতি মুহা. ওয়াক্কাসকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। জমিয়ত তার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসে কুরআন ও সুন্নার আইন প্রতিষ্ঠা, খ্রীষ্টান শিমনারী, কাদিয়ানী ও বাহাইদের মোকাবেলা এবং শিয়া ও মওদুদী ইত্যাদি ফেৎনার প্রতিরোধে বলিষ্ঠ ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভীর চিন্তাধারার অনুসারী এ কাফেলা উপমহাদেশের মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানের হেফাজত ও রাজনৈতিক সংকট মোকাবেলায় যে অনন্য অবদান রেখেছে ইতিহাসে তা চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

নেযামে ইসলামের তৎপরতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট ঃ

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে ১৯৫২ সালে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের রাজনৈতিক সেল হিসাবে নেযামে ইসলামের প্রথম অস্তিত্ব। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এভিত্তিতেই নেযামে ইসলাম ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে রাজনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখে। কিন্তু ১৯৬৭ সালে 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেযামে ইসলাম' সংক্ষেপে 'নেযামে ইসলাম' নামে একটি পৃথক দল হিসাবে এর কর্মতৎপরতা শুরু করে। ১৯৬৯ সালে নেযামে ইসলামের কেন্দ্রীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে মুফতী মুহা. শফী কে প্রধান উপদেষ্টা, মাও. জফর আহমদ উসমানীকে সভাপতি, মাও. আতহার আলীকে কার্যকরী সভাপতি, মাও. আব্দুল ওয়াহহাব ও মাও. মুস্তফা আল-মদনীকে সহ-সভাপতি, মাও. এহতেশামুল হক থানভীকে প্রধান কায়েদ বা নেতা ও খতীব আযম মাও. সিদ্দিক আহমদ কে সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে নেযামে ইসলাম পার্টি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী-দাওয়া আদায়ের সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। এ পর্যায়ে তারা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজধানী ঢাকায় ও নৌবাহিনীর সদর দফতর চট্টগ্রামে স্থানান্তরের জোর দাবী জানায়।

১৯৭০ এর নির্বাচনে নেযামে ইসলাম অংশ গ্রহণ করে। তবে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে তারা জামাতে ইসলামের সাথে এ মর্মে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, নেযামে ইসলাম যেখানে তাদের প্রার্থীকে মনোনয়ন দিবে সেখানে জামাত প্রার্থী দিবে না, আর যেখানে জামাতে ইসলাম কোন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিবে সেখানে নেযামে ইসলাম প্রার্থী দিবে না। এই নির্বাচনে আলেম উলামাদের দু'টি বলিষ্ঠ দল নেযামে ইসলাম ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পরস্পর বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ফলে উভয় পাকিস্তানে উলামায়ে কিরামের রাজনৈতিক ফিল্ড যথেষ্ঠ

ভাল থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনের ফলাফল শুভ হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর পিপলস পার্টি এককভাবে বিজয়ী হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। ফলে সাংবিধানিকভাবে তারা সরকার গঠনের ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন ইয়াহইয়া খানের সরকার এ ব্যাপারে তালবাহানা শুরু করলে পূর্ব পাকিস্তানে অধিকার হননের এত দিনের চাপাক্ষোভ গর্জে উঠে এবং স্বাধীনতার দাবী ক্রমান্বয়ে জোরদার হতে থাকে। বলতে গেলে পাকিস্তান সরকারের এহেন হঠধর্মীতাই স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের পিছনে মৌলিক কারণ হয়ে কাজ করেছে।

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আলেম উলামাদের রাজনীতিতে একটি নিরব অধ্যায় অতিবাহিত হয়। এ সময় নেযামে ইসলামের কর্মতৎপরতাও বন্ধ থাকে। ১৯৮১ সালে খতীবে আযম হযরত মাও. ছিদ্দিক আহমদ সাহেবের আহ্বানে এদলটি আবার সংগঠিত হয়। মাও. ছিদ্দিক আহমদকে সভাপতি, এডভোকেট মঞ্জুরুল আহসানকে সেক্রেটারী ও মাও. আশরাফ আলীকে সহকারী সেক্রেটারী এবং মাও. সরওয়ার কামাল আজিজীকে প্রচার ও জনকল্যাণ সম্পাদক করে দলের নতুন অবকাঠামো ঘোষণা করা হয়।

১৯৮৪ সালে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচনে মাও. সিদ্দিক আহমদকে উপদেষ্টা, মাও. আব্দুল মালেক হালিমকে সভাপতি, মাও. আতাউর রহমান ও মাও.সরওয়ার কামালকে সহ-সভাপতি মাও.আশরাফ আলীকে সাধারণ সম্পাদক ও মাও. নুরুল হক আরমানকে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়। এ সময় দলটিতে আরেক বার নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। তখন দলটি বেশ কিছু সমাজ সেবামূলক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

১৯৮৮ সালের দলীয় নির্বাচনে মাও. আশরাফ আলীকে সভাপতি ও এডভোকেট আব্দুর রকীবকে সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। ১৯৮৯ সালে মাও. আশরাফ আলী সভাপতি ও মাও. নুরুল হক আরমান সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। ১৯৯৩ সালে দলীয় নির্বাচনে মাও. আশরাফ আলী পুনঃসভাপতি মনোনীত হন, এবং এডভোকেট আব্দুর রকীবকে পুনরায় সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনীত করা হয়। ১৯৯৭ এর নির্বাচনে এডভোকেট আব্দুর রকীবকে সভাপতি ও সাংবাদিক জনাব আব্দুল লতীফ নেযামীকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়।

বর্তমানের মারদাঙ্গার রাজনীতিতে ইসলামী দলগুলোর রাজনৈতিক ভূমিকা অনেকখানি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। তবে একথা সত্য যে এক সময় নেযামে ইসলাম দেশ ও জাতির কল্যাণে বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা আঞ্জাম দিয়েছে। তাঁদের এই অবদান ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে। বিশেষ করে রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্ম বিরোধী আইন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে যেমন মুসলিম পারিবারিক আইনের সংশোধনের নামে যেসব ইসলাম বিরোধী ধারার সংযোজন করা হয়েছিল তার

বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও নেজামে ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মীয় দলগুলোর বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। তাছাড়া ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে এদেশে যখন ধর্মহীনতার জোর তৎপরতা শুরু হয় এর প্রতিরোধেও উলামায়ে কিরাম বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন ধর্মদ্রোহী ও ধর্ম বিদ্বেষী ব্যক্তি কর্তৃক ইসলামের উপর যে আক্রমণ চালানো হয় যেমন দাউদ হায়দার, সালমান রুশদী আহমদ শরীফ, তাসলীমা নাসরিন সহ অন্যান্য ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ধর্ম বিরোধী যে তৎপরতা চালানো হয় তার বিরুদ্ধে জমিয়তে উলামা ও নেযামে ইসলামের আলেমগণ আন্দোলন গড়ে তুলেন। এভাবে এদেশে দ্বীন ও শরীয়তের হিফাজতের জন্য তাদের উদ্যোগ ও অবদান অপরিসীম।

উল্লেখ্য যে, ১৯৮১, সালে হাফেজ্জী হুজুরের ডাকে খিলাফত আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হলে সকল ইসলামী দল তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে রাজনৈতিক ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরে খিলাফত আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ অনৈক্যের কারণে দলটিতে ক্রমেই ভাঙন দেখা দেয় এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ও খিলাফত মজলিশ নামের দু'টি দল অস্তিত্ব লাভ করে। বর্তমানে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, নেযামে ইসলাম, খিলাফত আন্দোলন, খিলাফত মজলিশ ও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ইত্যাদি বেশ কয়টি দলই উলামায়ে হক্কের রাজনৈতিক দল হিসাবে মাঠে কর্মরত রয়েছে। তবে বর্তমানে রাজনীতি যে ভয়াবহ মারদাঙ্গার রূপ ধারণ করেছে তাতে উলামায়ে হক্কানীর ন্যায়নীতির রাজনীতি অনেকটা অচল হয়ে পড়েছে। তাছাড়া বর্তমানে রাজনীতির জন্য যে বিরাট অর্থনৈতিক যোগানের প্রয়োজন, তার যোগান দেওয়া আলেম উলামাদের জন্য অসম্ভব বটে। যে কারণে একান্ত সদিচ্ছা থাকা সত্বেও উলামায়ে কিরামের রাজনীতি এদেশে স্বচল হয়ে উঠছে না। রাজনীতির ধারার পরিবর্তন কিংবা অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জন করতে না পারলে চলমান রাজনীতির সাথে পাল্লা দিয়ে অগ্রসর হওয়া আলেমদের জন্য বাহ্যদৃষ্টিতে সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ একটি বৃহত্তর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এই অচলবাস্থা কাটিয়ে উঠার একটি মাত্র পথ খোলা আছে। সেই পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাদের নতুন প্রজন্মকে নব উদ্যামে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আমাদের রাজনৈতিক মুক্তির বাহ্যতঃ কোন সম্ভাবনা নেই।

৪. উলামায়ে দেওবন্দের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবদান ঃ

একটি সুস্থ সমাজের জন্য পূর্বশর্ত হল সুস্থ চিন্তার অধিকারী আদর্শবান নাগরিক। কারণ নাগরিকরাই হল সমাজের সদস্য। তাই সৎ ও আদর্শবান নাগরিক ছাড়া একটি সুস্থ সমাজের কল্পনা করা যায় না। আর সুস্থ নাগরিক তৈরির জন্য অপরিহার্য হল আদর্শ শিক্ষা এবং সৎ ও পরিমার্জিত জীবনের প্রশিক্ষণ।

প্রতিটি নাগরিকের মাঝে আদর্শ সচেতনতা, নৈতিকতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহমর্মিতা পরিমার্জিত জীবন বোধ ও সৎব্যবহারের মহৎ গুণগুলো সৃষ্টি করতে

পারলে এবং অসদাচার, অনৈতিকতা, হিংসা, বিদ্বেষ, জিঘাংসা, পরনিন্দা ও পরশ্রীকাতরতা থেকে বেঁচে থাকার মত আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করতে পারলে একটি সুস্থ সমাজের বিকাশের পথ সহজেই বিকশিত হয়। এধরনের মহৎ গুণের অধিকারী মানুষের সংখ্যা সমাজে যত বৃদ্ধি পাবে সমাজ ততই সুন্দর ও সুশীল হয়ে উঠবে। এ ধরনের ব্যক্তির প্রাচুর্য সমাজে ঘটলে নাগরিক সুযোগ সুবিধা যত কমই হউক এবং অর্থ সম্পদ ও জীবনোপকরণ যত অপ্রতুলই হউক তথাপি একটি সুস্থ সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গড়ে উঠতে বাধ্য। একারণেই আমরা দেখতে পাই যে, খেজুরপাতার চাটাইয়ে শয়ন করেছে যারা, অর্ধাহারে অনাহারে জীবন কেটেছে যাদের, লজ্জা নিবারণের জন্য একখণ্ড বস্ত্র জুটেনি যাদের সেই সাহাবায়ে কিরামই কাল-কালান্তরের মানুষের জন্য আদর্শ সমাজের প্রতীক রূপে অম্লান হয়ে আছেন। ইসলাম মূলতঃ একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি নিয়েই এসেছে পৃথিবীতে। কুরআন সুন্নার শিক্ষার মাধ্যমে মূলতঃ সেই পয়গামই তুলে ধরেছে মানুষের কাছে। ইসলামই প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে অর্থনৈতিক চরম দৈন্যের মাঝেও আদর্শ প্রশিক্ষণ ও তারবিয়্যতের মাধ্যমে একটি আদর্শ সমাজের বিকাশ সম্ভব।

বর্ণভেদ পীড়িত ও শ্রেণী বৈষম্যের যাতাকলে পিষ্ট, অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত সেকালের ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার কি করুণ চিত্র ছিল, ইতিহাসের পাঠক মাত্রই তা জানে। বলতে গেলে ইসলামই সর্বপ্রথম এদেশের নিপীড়িত সমাজের মানুষকে সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও ইনসাফ পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার পয়গাম শুনিয়েছে।

উলামায়ে দেওবন্দ তাদের শিক্ষাধারায় নিছক ধর্মীয় আদর্শকে শিক্ষার মৌলিক ও কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং কুরআন সুন্নায় যে সমাজ গঠনের পয়গাম শুনানো হয়েছে, মানুষকে অহর্নিশ তারই তা'লীম দেওয়া হয় শিক্ষার্থীদেরকে। তা'লীম হাসিলের সাথে সাথে শিক্ষালব্ধ বিষয়াশয়ের কতটুকু প্রতিফলন ঘটছে শিক্ষার্থীর ব্যক্তি জীবনে তার প্রতিও তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয় এ শিক্ষা ধারায়। এ শিক্ষাধারায় তা'লীমের প্রতি যতটা গুরুত্বারোপ করা হয, তার চেয়ে বেশী গুরুত্বারোপ করা হয় তারবিয়্যত ও আমলী প্রশিক্ষণের উপর। একজন শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় যত ভালই হউক কিন্তু যদি সে আমলীভাবে গড়ে না উঠে তাহলে তার শিক্ষার স্বীকৃতি দেওয়া হয় না এধারার প্রতিষ্ঠানসমূহে। যে ছাত্র লেখাপড়ায়ও ভাল আবার নৈতিক ও আমলী দিক বিচারেও ভাল তাকেই কেবল ভাল ছাত্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের নৈতিক পরিবেশকে এভাবেই গড়ে তোলা হয় যে, একজন ছাত্র নৈতিকতা বিরোধী কোন কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া তো দূরের কথা এমন কি আমলী ক্ষেত্রে সামান্য কুতাহী করলে সে নিজেই নিজেকে অপরাধী ভাবতে শুরু করে। লজ্জায় মুখ দেখানো তার জন্য দুষ্কর হয়ে পড়ে। সহপাঠীরা তাকে ধিক্কার দেয়, শিক্ষকরা তিরস্কার করে। ফলে মানশায়ে শরীয়ত মুতাবেক নিজেকে গড়ে তোলা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। এভাবে একজন শিক্ষার্থীকে ব্যক্তি জীবনে কুরআন ও সুন্নার পূর্ণ অনুসারীরূপে গড়ে তোলা

হয় তিলে তিলে। সুতরাং চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, সৎ ও পরিমার্জিত জীবন বোধ নিয়ে বেরিয়ে যায় একজন শিক্ষার্থী। এরা যে শুধু তাদের কর্মময় জীবনে আদর্শ নাগরিক হিসাবে জীবন যাপন করে তাই নয় বরং যারা তাদের সংস্পর্শে আসে তাদেরকেও সৎ ও পরিমার্জিত জীবন বোধের প্রতি অনুপ্রাণিত করে আদর্শবান মানুষ রূপে গড়ে তুলে।

তাছাড়া এশিক্ষা ধারায় শিক্ষার্থীকে শিক্ষা জীবনের শুরুতেই এই অনুভূতি সৃষ্টি করে দেওয়া হয় যে, তোমার শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য নিজেকে সৎ ও আদর্শবান মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা এবং যথাসম্ভব অন্যকে সৎ ও আদর্শবান মানুষ রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করা। ফলে শিক্ষার্থী ঐ মানসিকতা নিয়েই তার শিক্ষা জীবন শুরু করে। তাই শিক্ষার্জনের সাথে সাথে নিজেকে আদর্শিকভাবে বিকশিত করাও তার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। আখেরাতের জবাবদিহিতার চেতনা তার মাঝে এভাবে বদ্ধমূল করে দেওয়া হয় যে, সে নিজেই নিজেকে আমলীভাবে গড়ে তোলার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে। হককুল্লাহ ও হুকুকুল ইবাদের চেতনায় এমনিতেই পরিশুদ্ধ হয়ে আসে তার আমল ও ব্যবহারিক জীবনের সকল কাজ কর্ম। খাওফে ইলাহীর তাড়নায় সদা এমন ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকে যে, তার চেহারায় ফুটে উঠে তারই আভা। ফলে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে তারা যেখানেই গিয়ে বসে না কেন সেখানেই তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে একটি আদর্শিক ও নৈতিক পরিমণ্ডল। তার সান্নিধ্য লাভ করে বহু মানুষ অনুপ্রাণিত হয় তার নিজের জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে।

এভাবে সমাজের উপর তাদের এক ধরনের নৈতিক প্রভাব গড়ে উঠে। সামাজিক জীবনের নীতিনির্ধারণী প্রশ্নে এমনকি সামাজিক বিচারাচারেও তাদের এই প্রভাবের প্রতিফলন ঘটে থাকে। এককালে আলেম উলামারা এদেশে সরকারী ব্যবস্থাপনার বাইরে তাদের তত্ত্বাবধানে একটি পৃথক সামাজিক বিচারব্যবস্থাও গড়ে তুলেছিলেন। যেখান থেকে কুরআন সুন্নাহর ইনসাফপূর্ণ আইনের ভিত্তিতে সামাজিক বিচারকার্য সম্পন্ন করা হত। অবশ্য বর্তমানে একটি চিহ্নিত মহল এই সামাজিক বিচারব্যবস্থার ভীত ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে। তারা তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এসব বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এদের মূল উদ্দেশ্য সমাজের নৈতিক ও আদর্শিক ভিত ভেঙ্গে দিয়ে একটি বাধাবন্ধনহীন স্বেচ্ছাচারী সমাজ ব্যবস্থার পথে অগ্রসর হওয়া বৈ কিছু নয়।

তাছাড়া এ ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নৈতিক ও আদর্শিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সমাজের মানস পটে এমন একটি চিত্র অংকন করে দিয়েছে যে, এধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করা কোন শিক্ষার্থী আমলী দিক থেকে সামান্য কুতাহী করলে, সুন্নতের সামান্য খেলাপ চললে যারা নিজেরা সৎজীবন যাপন করে না তারাও এটাকে সুনজরে দেখেনা। এমনকি কোন নবাগত শিক্ষার্থীর মাঝে সামান্য কুতাহী দেখলেও সমাজ এর সমালোচনা করে। এর অর্থ এই যে,

সমাজ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নিয়েছে যে, এধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে কোন শিক্ষার্থী উন্নত নৈতিকতা ও আদর্শের প্রতীক হয়ে থাকে।

সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, উলামায়ে দেওবন্দ তাঁদের শিক্ষা ধারার মাধ্যমে উন্নত সমাজ গঠনের জন্য নৈতিকতায় মানোত্তীর্ণ যে নাগরিকের প্রয়োজন তাই তারা করে যাচ্ছেন।

তাছাড়া ওয়াজ নসীহত, সহী পীর-মুরিদী, আদর্শ মানুষ তৈরির লক্ষ্যে লিখিত অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমে তারা আদর্শ নাগরিক তৈরির যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে আমাদের সামাজিক জীবনে গড়ে উঠেছে এক নিবিড় সম্প্রীতির বন্ধন; যা পাশ্চাত্যের দেশসমূহে বড়ই দুর্লভ।

অর্থনৈতিক অবদান ঃ

অর্থ মানুষের জীবনে যেমন স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করে তেমনি অর্থ মানুষের জীবনে অনর্থও সৃষ্টি করে প্রচুর। সম্পদের মোহ মানুষকে অন্ধ করে ছাড়ে, অর্থের লালসা মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে আনে। জীবন চলার জন্য অর্থের প্রয়োজনকে যেমন অস্বীকার করা যায় না তেমনি অর্থ সম্পদের প্রতি অন্ধ মোহজনিত অনিষ্টতাকেও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তাই শরীয়তে ইসলামী অর্থের মোহ ও সম্পদের লালসাকে কোনক্রমেই অনুমোদন করেনি। বরং অর্থ সম্পদের আসক্তি থেকে উম্মতকে নিরুৎসাহিত করেছে বিভিন্ন উপায়ে। ইরশাদ হয়েছে– নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফিতনার উপকরণ। রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, 'দুনিয়া হল মৃত প্রাণীর ন্যায় আর তার অন্ধ-অনুসন্ধানকারীরা হল কুকুরের ন্যায়'। আবার বলা হয়েছে হালাল জীবিকার অনুসন্ধান করা আল্লাহর নির্দেশ পালনের পর অন্যতম দায়িত্ব। সুতরাং বুঝাই যায় যে জীবন জীবিকার প্রয়োজনে সম্পদ অপহরণকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেনা। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের লিপ্সাকে শরীয়ত অনুমোদন করেনা। উলামায়ে দেওবন্দ অর্থনেতিক ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই অগ্রসর হয়েছেন। তাই অল্পে তুষ্টি, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও পরিশ্রমী জীবনকে এ শিক্ষা ধারার অন্যতম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ কারণে খুব অল্প সম্পদ দিয়ে বিশাল খিদমাত আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হয়েছে তাদের।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, বৃটিশ শাসনামলে তাদের ষড়যন্ত্রের ফলে আলেম উলামারা চরম অর্থনেতিক দৈন্যের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বৃটিশ বিতাড়নের পর আমরা দুই দুই বার স্বাধীনতা লাভ করলেও তাদের প্রবর্তিত নীতির নিগড় থেকে এদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও শাসননীতি কোনটাই বেরিয়ে আসতে পারেনি। ফলে পাকিস্তানের ২৪ বৎসর ও বাংলাদেশের ২৭ বৎসরেও আলেম উলামাদের অর্থনৈতিক জীবনে কোন পরিবর্তন সূচিত

হয়নি। বরং চরম দৈন্যের মাঝে খেয়ে না খেয়ে কেটে যাচ্ছে তাঁদের জীবন। কিন্তু নিজেরা অর্থনৈতিক নিগ্রহের শিকার হয়েও এদেশের বিরাট অর্থনৈতিক খিদমাত তারা আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। বলতে গেলে অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশ ও সামগ্রিক সমৃদ্ধি অর্জনের পথে বড় বড় অন্তরায়গুলো দূরিভূত করে সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধ অর্থ ব্যবস্থা গড়ে উঠার পথকে সুগম করতে আলেম উলামারাই এককভাবে ভূমিকা রাখছেন। আমরা নিম্নে তার কতিপয় তুলে ধরলাম।

১. অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশের পূর্বশর্ত হল সম্পদের নিরাপত্তা। সম্পদ যতই উপার্জন করা হউক, কিন্তু যদি তার নিরাপত্তা না থাকে, অন্য কর্তৃক অন্যায়ভাবে আত্মসাতের আশঙ্কা থেকে যদি তা মুক্ত না হয় তাহলে শত উপার্জনের পরও একজন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবে না। এমনকি অন্যায়ভাবে আত্মসাতের আশঙ্কা অবাধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্থ ও ব্যাহত করবে মারাত্মকভাবে।

অন্যায় আত্মসাতের পথ রুদ্ধ করার জন্য ইসলাম হুকুকুল ইবাদের যে গুরুত্ব তুলে ধরেছে; উলামায়ে কিরাম সমাজের সামনে তা তুলে ধরেছেন। অন্যের হক্ব নষ্ট করলে তার পরকালীন পরিণতির কথা তুলে ধরে তারা মানুষকে আখেরাতে জবাবদিহির চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। ফলে অন্যের হক্ব আত্মসাৎ করাকে মানুষ পাপ জ্ঞান করে নিজেই তা থেকে বিরত থাকার আত্মচেতনা লাভ করেছে।

২. অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশের আরেক অন্যতম বিষয় হল চাহিদার নিয়ন্ত্রণ। কারন বল্গাহীন চাহিদা বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক দুরাচারের জন্ম দেয়। ফলে সুষ্ঠু অর্থনীতির বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। কেননা সম্পদের যতই প্রাচুর্য ঘটুক কিন্তু চাহিদা যদি নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহলে অভাব অনটন কখনই শেষ হবে না, মানুষের চাহিদা হয়ে উঠবে বল্গাহীন। ফলে এক অসীম চাহিদা মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে তাড়া করবে মারাত্মকভাবে। এই বল্গাহীন চাহিদা মানুষকে অর্থনৈতিক দুরাচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। ফলে সমাজে দুর্নীতি, আত্মসাৎ, কালোবাজারী, রাহাজানি, খাদ্যে ভেজাল, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি ব্যাধি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। উলামায়ে কিরাম চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন বিভিন্ন উপায়ে। কুরআন সুন্নায় সম্পদের প্রতি যে ঘৃণাবোধ জন্মনোর চেষ্টা করা হয়েছে, তা তাঁরা ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন, আখেরাতে সম্পদ সঞ্চয়ের পরিণতি কি হবে তাও তুলে ধরেছেন। নিজেরা যেমন অল্পেতুষ্টির জীবনকে বেছে নিয়েছেন, সমাজকেও এ পথে অহর্নিশ আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন। তারা নিজেরা যেমন অর্থনৈতিক দুরাচার থেকে কঠোরভাবে বেঁচে থাকার জন্য সদা চেষ্টা করেন, সমাজকেও এসকল জটিল ব্যাধি থেকে বেঁচে থাকার জন্য সদা উপদেশ দান করে থাকেন। ওয়াজ নসীহত, পত্র পত্রিকা ও বই-পুস্তকের মাধ্যমে তারা দুর্নীতি, আত্মসাৎ, কালোবাজারী, রাহাজানি, খাদ্যে ভেজাল দেওয়া, সুদ ঘুষ খাওয়ার দুনিয়াবী ক্ষতি ও পরকালীন

শান্তির কথা মানুষের সামনে বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন। তাদের এই তৎপরতার ফলে সমাজের বহু মানুষ স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে এই সব দুর্নীতি থেকে নিজেকে সযতনে দূরে সরিয়ে রাখে। যদিও বর্তমানের বস্তুবাদী প্রচারণার ফলে সৃষ্ট মানসিকতার কারণে মানুষের মাঝে অর্থসর্বস্ব মানসিতা মারাত্মকভাবে ঝেকে বসেছে এবং এর ফলে মানুষ সম্পদ আহরণের জন্য যে কোন জঘন্য বৃত্তির অনুসরণ করছে এবং যে কোন অন্যায় ও অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতে মোটেই পিছপা হচ্ছে না। কিন্তু এতকিছু করেও বল্গাহীন চাহিদার কারণে মানুষের অভাব কিছুতেই ফুরাচ্ছেনা, বরং যে যত উপার্জন করছে তার চাহিদা ততবেশী বেড়েই যাচ্ছে।

এঅবস্থার মাঝেও সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ যে অর্থনৈতিক সততা রক্ষা করে চলেছে এটা উলামায়ে কিরামের প্রচারণার বদৌলতেই। যদি সমাজের সকল সদস্য তাদের কথা মেনে চলত তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশ ও সমৃদ্ধি কতটা ত্বরান্বিত হত তা বোধ হয় ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন নেই।

৩. সম্পদ যতই অর্জন করা হোক কিন্তু ব্যায়ের ক্ষেত্রে যদি কেউ মিতাচারী না হয় তাহলে তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। কোটি কোটি টাকা কামিয়েও একজন চরম অভাবী-ই থেকে যাবে। একারণে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে হলে অপচয় রোধ করা ও ব্যায়ের ক্ষেত্রে মিতাচারী হওয়া একান্ত অপরিহার্য। ইসলাম অপচয় রোধ করার ও মিতাচারী হওয়ার যে বিধান দিয়েছে তা সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন উলামায়ে কিরাম। তাঁরা নিজেরা যেমন মিতাচারী জীবন অবলম্বন করেছেন ও অপব্যয় ও অপচয় বিবর্জিত জীবনকে বেছে নিয়েছেন সমাজকেও সে পথে আহ্বান জানিয়েছেন।

৪. অর্থ যদি ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে পড়ে তাহলে অর্থ সম্পদের আবর্তন বাধাগ্রস্ত হবে এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। এতে সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ ফুলে ফেঁপে উঠলেও সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হবে চরম দারিদ্রের শিকার। ফলে অর্থ ব্যবস্থা একটি জটিল রূপ ধারণ করে। সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী গুটি কতক মানুষের নিকট অর্থনৈতিকভাবে জিম্মি হয়ে পড়ে।

ইসলাম অর্থনৈতিক আবর্তনকে স্বাভাবিক রাখার জন্য এবং সম্পদ যাতে কারো হাতে বন্দী না হয়ে পড়ে সে জন্য যে সব বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে উলামায়ে কিরাম তা সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। কৃপণতার পরিণাম সম্পর্কে, দান খায়রাতের ফজিলত সম্পর্কে এবং যাকাত ফিৎরার বিধান সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা নিজেরা যেমন কৃপণতা ও অর্থ সঞ্চয় করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার প্রবণতাকে কঠোরভাবে পরিহার করে চলেছেন, সমাজকেও এর জন্য অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছেন। ফলে অর্থনীতিতে একটি স্বাভাবিক আবর্তন অব্যাহত রয়েছে।

৫. প্রতারণা, শোষণ এবং মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্মও সুষ্ঠু অর্থনীতির বিকাশের পথে বড় অন্তরায় এসকল প্রবণতা রোধ করার জন্য ইসলাম যে বিধান দিয়েছে

তা বড়ই অভিনব। যাবতীয় প্রতারণা ও মধ্যসত্ত্বভোগী লেনদেনকে ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করেছে এবং শোষণের যাবতীয় পথ রোধ করার জন্য ইসলাম সর্ব প্রকার সুদী লেনদেনকে হারাম করেছে। উলামায়ে কিরাম ইসলামের এই শ্বাশত বিধান সমাজের সামনে তুলে ধরে তাদেরকে সতর্ক করে চলেছেন। নিজেরা যেমন যাবতীয় সুদী লেনদেন থেকে কঠোরভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেন সমাজকেও বেঁচে থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করেন।

এভাবে আলেম উলামারা সুষ্ঠু অর্থনীতির বিকাশের পথে সকল অন্তরায়কে দূরীভূত করে একটি সুষ্ঠু অর্থনীতি বিকাশের পথকে প্রশস্ত করে তুলছেন । তাদের এই ভূমিকাকে খাটো করে দেখার মত নয়।

তাছাড়া নিজেরা চরম দৈন্যের মাঝ দিয়ে জীবন অতিবাহিত করা সত্ত্বেও তারা সমাজের যে বিরাট অর্থনৈতিক খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন, তার নজির মিলা দুষ্কর। বিশেষ করে উলামায়ে দেওবন্দ প্রতিটি দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে একটি করে এতিম খানা খুলে সমাজের অগণিত এতিম, অসহায় ও দুস্থ মানুষকে থাকা খাওয়া এবং সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে শিক্ষা দ্বীক্ষা দান করে তাদেরকে সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। কোন রূপ সরকারী সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই সমাজের অগণিত মানুষকে আদর্শ মানুষ হিসাবে পুর্ণবাসনের এই যে বিরাট খিদমাত তারা আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন, তা সত্যিই তুলনাহীন। এটা যে তাদের কত বড় অর্থনৈতিক অবদান তা বোধ হয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন নেই। সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে তাদের সিকি ভাগ মানুষকেও পুনর্বাসন করতে পারছে না। অথচ সমাজের মানুষ থেকে যৎসামান্য অনুদান নিয়ে উলামায়ে দেওবন্দ যে বৃহৎ খিদমাত আঞ্জাম দিতে পারছেন এটা তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছতা ও মিতাচারী দৃষ্টিভঙ্গি ও আমানতদারীর কারণেই সম্ভব হচ্ছে।

তাছাড়া তাদের প্রচেষ্টার বলেই গড়ে উঠেছে হাজার হাজার মসজিদ ও মাদ্রাসা। যার পিছনে সরকারের কোন রূপ সহযোগিতা নেই। সমাজের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তারা এসকল খাতে বিশাল বিশাল খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাদের এই খিদমাতকে ব্যাপক ভিত্তিতে কবুল করুন।

৫. ইসলামের প্রচার প্রসারে তাঁদের অবদান ঃ

দ্বীনের প্রচার প্রসারের জন্য তাঁদের সর্ববৃহৎ অবদান হল শিক্ষা সম্প্রসারণের আন্দোলন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা যে অবদান রেখেছেন তা বিস্ময়কর।

১. ভারতবর্ষের সর্বত্র এমনকি উপমহাদেশের বাইরেও উচ্চ পর্যায়ের বহু দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁরা গড়ে তুলেছেন- যেখান থেকে প্রতি বৎসর শত শত আলেম দ্বীনি শিক্ষা সমাপন করে দ্বীনের খিদমাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে।

২. কুরআনে কারীমের হিফজের জন্য তারা অগণিত হিফজ খানা স্থাপন

করেছেন। যেখান থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্র হাফিজ হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে ও দ্বীনের খিদমতে আত্মনিয়োগ করছে।

৩. কুরআনের বিশুদ্ধ ও সুললিত তিলাওয়াত শিক্ষার জন্য বহু কেরাতিয়া মাদ্রাসা তাঁরা স্থাপন করেছেন।

৪. দেশের প্রতিটি গ্রামে- গ্রামে, মহল্লায়- মহল্লায়, মসজিদে-মসজিদে অসংখ্য মক্তব গড়ে তুলেছেন- যেখানে শিশুদেরকে দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বুনিয়াদী বিষয়ের শিক্ষাদান করা হচ্ছে। এর ফলে শিশুকাল থেকেই দেশের নাগরিকদেরকে যতটুকুই হউক ইসলাম মুখী করে গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। এ ভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাক্ষরতা দূরীকরণ ও দ্বীনের প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করা হচ্ছে।

ওয়াজ ও নসীহত ঃ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিলের আয়োজনের যে ব্যবস্থাপনা তাঁরা করেছেন; এ দ্বারাও দ্বীনের প্রচার প্রসারের বিরাট কাজ আঞ্জাম পাচ্ছে। বহু মানুষ এ দ্বারা হিদায়াত লাভ করছে এবং দ্বীনি অনুপ্রেরণা অর্জন করছে।

রচনা ও সংকলনের মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার প্রসার ঃ মাতৃভাষাসহ বিভিন্ন ভাষায় উলামায়ে দেওবন্দ বহু গ্রন্থ সংকলন ও রচনা করে তারা প্রচার করেছেন। দ্বীনের এমন কোন দিক নেই যে বিষয়ে তাদের রচিত পর্যাপ্ত গ্রন্থাবলী বিদ্যমান নেই। বর্তমানে উপমহাদেশের নিজস্ব ভাষাসমূহে ইসলামী ভাবধারায় রচিত গ্রন্থাবলীর এতটাই সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে যে, অন্য ভাষার সহযোগিতা না নিয়েও এক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণতা সৃষ্টি হয়েছে। তাদের রচিত বই পুস্তক এখন পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়াও এদেশে প্রচলিত মাতৃভাষাসমূহে অসংখ্য পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, যেগুলো মানুষের হিদায়াত ও দ্বীনের প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও দ্বীনের বিরাট খিদমাত আঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে।

দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার ঃ দাওয়াত ও তাবলীগের যে মেহনত বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চলছে সেটা উলামায়ে দেওবন্দের একক প্রচেষ্টারই ফসল। হযরত ইলিয়াস রাহ. প্রবর্বিত এই সংস্কার মূলক প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষ পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াত পৌছার এক অভিনব পথ বেরিয়ে এসেছে, যার বদৌলতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান ইসলামের সাথে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে এবং নিজেদের ব্যক্তি-জীবনকে ইসলামী আদর্শের আদলে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে ও অসংখ্য অমুসলিম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় ইসলাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর আনাচে কানাচে। ইউরোপ আমেরিকায়ও বহু মানুষ এই দাওয়াতের ফলে ইসলাম গ্রহণ করছে।

পীর-মুরিদীর মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ঃ পীর-মুরিদীর মাধ্যমে ইসলামের প্রচার এবং মানুষের আত্মশুদ্ধি করণেও উলামায়ে দেওবন্দের অবদান অপরিসীম। এ পন্থায় তাঁরা যে কেবল মানুষের হিদায়াতের কাজ করেছেন তাই নয় বরং পীরবেশী অসংখ্য ভণ্ড প্রতারকদের খপ্পর থেকে মানুষকে রক্ষা করে বিশুদ্ধ পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রেও তাঁরা অনন্য ভূমিকা পালন করছেন। সার কথা ইসলামের প্রচারের জন্য সম্ভাব্য সকল পন্থায়ই তাঁরা তাঁদের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন।

৬. বাতিল ও কুসংস্কার প্রতিরোধে তাঁদের অবদান ঃ

হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এক চিরন্তন বিষয়। আদম ও শয়তানের সংঘাত থেকে শুরু করে প্রতি যুগেই হক ও বাতিলের সংঘাত চলে আসছে। ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। বাতিলের বিরুদ্ধে এদেশে উলামায়ে দেওবন্দের তৎপরতার ইতিহাস অতি দীর্ঘ ও বিস্তৃত। তবে এই ক্ষেত্রে আমরা ভারতবর্ষের এমন কতিপয় বাতিল ও তার প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের অবদানের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করব– যেগুলো ইসলামের অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন কিছু ফিতনা কালে কালে ভারতের মাটিতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল যার দ্বারা ইসলাম হয়ত চিরতরে এদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেত কিংবা ইসলাম তার স্বকীয় রূপ হারিয়ে নতুন কোন ভ্রান্ত রূপ নিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌছত। এধরনের বাতিল ফিৎনাগুলোর মাঝে নিম্নোক্তগুলো অন্যতম।

ক. শিয়াদের ফিৎন।
খ. খ্রীস্টান মিশনারীর ফিৎনা।
গ. হিন্দু আর্যসমাজীদের ফিৎনা।
ঘ. ইনকারে হাদীসের ফিৎনা।
ঙ. কাদিয়ানী ফিৎনা।
চ. বিদ'আতীদের ফিৎনা।
ছ. প্রাচ্যবিদদের প্রভাবে প্রভাবিত শ্রেণীর বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ফিৎনা।

উলামায়ে দেওবন্দ এসকল ফিৎনার সফল মুকাবেলা করে দ্বীনের সঠিক ও প্রকৃত রূপকে সংরক্ষণ করেছেন এবং আল্লাহর দ্বীনকে 'মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' এর আঙ্গিকে, আকাবিরে দ্বীনের তাশরীহাতের আলোকে বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণসহ তুলে ধরেছেন। মুসলিম উম্মাহকে এ সকল ফিৎনার বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা এবং সঠিক দ্বীনের সাথে মানুষকে পরিচিত করে তোলার সুমহান দায়িত্বও তাঁরা অত্যন্ত সুচারু রূপে আঞ্জাম দিয়েছেন। আমরা নিম্নে এ সকল বাতিল ফিৎ-নার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং এদের মুকাবেলায় উলামায়ে দেওবন্দের তৎপরতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করছি।

ক. শিয়াদের ফিৎনা ও তার মুকাবেলা ঃ

শিয়াদের উদ্ভব ও ভারতবর্ষে তাদের পদচারণা ঃ হযরত উসমান রা. এর খিলাফতের শেষকালে ইয়াহুদী বংশোদ্ভূত ষড়যন্ত্রের নায়ক আব্দুল্লাহ বিন সাবার নেতৃত্বে একদল লোক এ দাবী উত্থাপন করে যে, হযরত আলী রা. যেহেতু রাসূল সা. এর নিকটাত্মীয় ও জামাতা সুতরাং খিলাফতের প্রথম উত্তরাধীকারী তিনিই। এ দাবীর ভিত্তিতে তারা আলী রা. এর সমর্থনে জনমত তৈরি করতে থাকে। ৩৭ হিজরী সনে সিফফীনে হযরত আলী রা. ও হযরত মুয়াবিয়া রা.এর মাঝে যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, সে ছিল ইতিহাসের এক মারাত্মক ট্রাজেডি। হযরত আলী রা. এর সমর্থনকারী পূর্বোক্ত লোকগুলো জোরপূর্বক হযরত আলী রা. কে এই যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। কিন্তু যুদ্ধে হযরত আলী রা. এর বাহিনী যখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত প্রায় তখন হযরত মুয়াবিয়া রা. এর দলের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করা হয় এবং তারা বর্শার আগায় কুরআনে কারীম বেঁধে উর্ধ্বে উত্তোলন করে এমর্মে ইঙ্গিত প্রদর্শন করে যে, কুরআনের বিধানের ভিত্তিতে যে ফায়সালা হবে আমরা তাই মেনে যাব। হযরত আলী রা. তখন যুদ্ধ বন্ধ করতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু সেই লোকগুলোই হযরত আলী রা. কে এ মর্মে বল প্রয়োগ করে যে, যেখানে বিপরীত পক্ষ কুরআনের বিধানের ভিত্তিতে মিমাংসা চাচ্ছে সেখানে আপনার সন্ধির প্রস্তাবে রাজী না হওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে? অবশেষে তাদের একগুঁয়েমীর কারণে হযরত আলী রা. সন্ধির আলোচনায় বসতে রাজী হলেন। তবে তিনি প্রস্তাব করলেন যে, আমাদের মাঝে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বিচক্ষণ ব্যক্তি সুতরাং তাঁকেই আমাদের পক্ষ থেকে সন্ধির আলোচনার জন্য প্রতিনিধি করে পাঠানো হউক। কিন্তু সেই চিহ্নিত মহলটি এ প্রস্তাবের বিরোধীতা করে এ বলে যে, সে আপনার পরিবারের লোক সুতরাং তাঁর প্রতিনিধিত্বে আলোচনায় নিরপেক্ষতা রক্ষা পাবে না। সুতরাং তারা আবু মূসা আশ'আরী রা.-কে প্রতিনিধি করে পাঠাতে প্রস্তাব দেয়। হযরত আলী রা. বললেন, আবু মূসা রা. আল্লাহ ওয়ালা হলেও কূটনৈতিক বিষয়ে দক্ষ নয়, অথচ আমাদের পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রতিনিধি যে চুক্তি করে আসবে তা মেনে নেওয়ার জন্য আমরা বাধ্য। অবশেষে তাদের একগুঁয়েমীর কারণে হযরত আবু মূসা আশ'আরী রা. কে প্রতিনিধি করে পাঠানো হল। তিনি যে ফয়সালা নিয়ে ফিরলেন, হযরত আলী রা. তা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকলেও সেই লোকগুলো বলল 'মু'আবিয়ার ইমামতই যদি মেনে নিতে হয় তাহলে এতসব যুদ্ধ বিগ্রহের প্রয়োজন কি ছিল'? হযরত আলী রা. তখন তাদেরকে প্রতিনিধির ফয়সালা মেনে নেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন, ফলে তারা হযরত আলী রা. এর দল থেকে বেরিয়ে যায়। এবং لا حكم الا لله 'আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম মানিনা' এই শ্লোগান দিতে থাকে (অর্থাৎ আলী কিংবা মু'আবিয়াহ কারো হুকুম মানিনা)। অতঃপর তারা হারুরায় গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনুল কাওয়াকে ইমাম ও শীছ ইবনে রিবহকে সিপাহসালার নিযুক্ত করে পৃথক একটি সাম্রাজ্যের ঘোষণা দেয়। তাদের বিরুদ্ধে

হযরত আলী রা. যুদ্ধ ঘোষণা করলে তারা নাহরাওয়ানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। ইতিহাসে এরাই খারেজী সম্প্রদায় নামে অভিহিত।

এদের বিরোধীতায় একদল লোক হযরত আলী রা. এর পক্ষ সমর্থন করতঃ হযরত মুয়াবিয়া রা. এর বিরোধিতা ও কুৎসা বর্ণনায় অতি বাড়াবাড়ি শুরু করে এবং নিজেদেরকে 'শিয়ানে আলী' شيعان علي বা আলীর দল বলে পরিচয় দিতে থাকে। এই দল রাসূল সা. এর পরিবার পরিজনের প্রতি অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে হযরত আলী রা. এর বিপক্ষীয় সকল সাহাবী ও ব্যক্তিবর্গকে কাফের ও মুরতাদ বলে সর্বসাধারণ্যে প্রচার করতে থাকে। হযরত আলী রা. তাদের এহেন বাড়াবাড়িকে মোটেই প্রশ্রয় দেননি বরং তাদেরকে এহেন আচরণের জন্য কঠোর ভর্ৎসনা করেন, ফলে তারা আফ্রিকার কিয়দঞ্চল নিয়ে 'খিলাফতে বনী ফাতেমী' নামে আরেকটি পৃথক রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়। কালে তাদের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ইতিহাসে এরাই শিয়া নামে পরিচিত। এদের বহু দল-উপদল রয়েছে, কারো কারো মতে এদের উপদলের সংখ্যা ২২টি, আবার কারো কারো মতে ৩২টি।

শিয়াদের বিভ্রান্তিকর আক্বীদাহসমূহ ঃ

(১) আক্বীদায়ে ইমামত ও ইছনা আশারিয়া ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমতের অপরিহার্য তাগিদে নবুয়্যত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা জারী করেছেন। রাসূল সা. হলেন এ ধারার সর্বশেষ নবী বা রাসূল। তাঁর পর অন্য কোন নবী বা রাসূলের প্রয়োজনীয়তা নেই। রাসূলগণ হলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। অন্য কোন মানুষ যত আল্লাহ্ ওয়ালাই হউক নবীগণের সমকক্ষ হতে পারবে না। এটাই হল আহলে হকের আক্বীদা বিশ্বাস।

কিন্তু শিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূল সা.-এর ওয়াফাতের পর উম্মতের পথ প্রদর্শনের জন্য ইমামতের সিলসিলা জারী করে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য বার জন ইমাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। দ্বাদশতম ইমামের পর পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হবে। এই বার জন ইমাম পয়গাম্বরগণের মতই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত। তারা পয়গাম্বরদের মতই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হুজ্জত, নিষ্পাপ ও আনুগত্যশীল। তারা মর্তবায় রাসূলুল্লাহ সা. এর সমান এবং অন্যান্য পয়গাম্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উর্ধ্বে। এই ইমামগণের ইমামত স্বীকার করা এবং তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা নাজাতের জন্য পূর্ব শর্ত, যেমন পয়গাম্বরগণের নবুয়্যত ও রিসালাত স্বীকার করা এবং তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা নাজাতের শর্ত। এই সকল ইমামগণ মু'জিযা সম্পন্ন ছিলেন। তাঁদের নিকট পয়গাম্বরদের মতই ফেরেশতা আসা-যাওয়া করত। তাঁদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কিতাবও অবতীর্ণ হত। তাঁদের মে'রাজও হত। তাঁরা অতীত ভ[illegible] সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাদের যে কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম করার অধিকার ছিল। তাঁদের প্রত্যেকেই আপন মৃত্যুর সময় সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং তাঁদের মৃত্যু স্বয়ং তাঁদের ক্ষমতাধীন ছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

(২) আক্বীদায়ে তাহরীফে কুরআন ঃ আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ঐশী গ্রন্থ। এ গ্রন্থ যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে আজ পর্যন্ত সেভাবেই অক্ষুণ্ন রয়েছে। থাকবেও কিয়ামত পর্যন্ত। এতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কোন ক্ষমতা কারো নেই। যুগ যুগ ধরে আহলে হক অন্তরে এ আক্বীদা বিশ্বাস পোষণ করে আসছে।

কিন্তু শিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হল যে, বর্তমানে বিদ্যমান কুরআন সেই অবিকৃত কুরআন নয় যা রাসূল সা. এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। বরং এতে যথেষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. এর পরে যারা জোর জবরে খেলাফত বা হুকুমত দখল করে নিয়েছিল তারা কুরআন থেকে ঐ সব শব্দ ও বাক্য ছাঁটাই করে ফেলে দেয়, যেগুলোতে হযরত আলী ও পরবর্তী ইমামগণের ইমামতের কথা বর্ণনা করা ছিল। এমনকি তথায় সেই ইমামদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছিল। রাসূল সা. -এর কাছে যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল এবং হযরত আলী রা. যা লিপিবদ্ধ করেছিলেন সে কুরআন তাদের দ্বাদশতম ইমামের নিকট রয়েছে- যিনি প্রায় ১১৫০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করে চার পাঁচ বছর বয়সে লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়ে কোন গুহায় আত্মগোপন করে আছেন। কিয়ামতের পূর্বে কোন এক সময় সেই অবিকৃত কুরআন নিয়ে তিনি জনসমাজে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। কুরআন পরিবর্তন সম্পর্কে শিয়া ইমামগণের কিছু উক্তি নিম্নে তুলে ধরা হল।

সুরায়ে আহযাবের শেষ রুকুর আয়াত-

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

এ আয়াত সম্পর্কে উসূলে কাফীতে আবু বছীরের বর্ণনায় ইমাম জাফর ছাদেক বলেন ঃ এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল

ومن يطع الله ورسوله في ولاية على والائمة بعده فقد فاز فوزا عظيما

এর পরের পৃষ্ঠাতেই ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত আছে-

عن ابى جعفر عليه السلام قال نزل جبرئيل بهذه الاية على محمد صلى الله عليه وسلم بئسما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله فى على بغيا

তাছাড়াও শীয়াদের নিকট যে কুরআন রয়েছে সে কুরআনে সূরায়ে বেলায়েত নামক একটি নতুন সূরাও তারা সংযোজন করেছে যা প্রকৃত পক্ষে কুরআনের কোন অংশ নয়।

ভারতের মকবুল হোসেন নামক জনৈক শিয়া মতাবলম্বী শিয়াদের ধারণানুসারে কোন কোন আয়াতে কি কি তাহরীফ বর্তমান কুরআনে বিদ্যমান আছে কেবল তা উল্লেখ করার জন্য বিস্তর টিকা সংযোজন করে কুরআনের একটি উর্দূ তরজমা ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। তার বিবরণ অনুযায়ী প্রায় প্রতি আয়াতেই কিছুনা কিছু

তাহরীফ হয়েছে– যা মেনে নিলে বর্তমান কুরআনের অস্তিত্বই থাকে না।

(৩) আক্বীদায়ে রুজ'আত ঃ রুজ'আতের আক্বীদাও শিয়াদের অন্যতম বিশেষ আক্বীদা। এর অর্থ হল এই যে, তাদের দ্বাদশতম ইমাম যখন গুহা হতে আত্মপ্রকাশ করবেন তখন রাসূলুল্লাহ সা., আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রা., সাইয়্যেদা ফাতেমা, হযরত হাসান ও হুসাইন এবং অন্যান্য ইমামগণ জীবিত হয়ে কবর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবেন এবং এদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সা. এবং আলী রা. ও অন্যান্যরা সেই ইমামের কাছে বায়'আত গ্রহণ করবেন।

তাঁদের সাথে আবু বকর, উমর, উসমান এবং অন্যান্য কাফের মুনাফেকরাও উত্থিত হবে। অতঃপর উক্ত ইমাম তাদের সবাইকে শাস্তি দিবেন। তাদের মতে রুজ'আতের আক্বীদার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। (হক্কুল ইয়াকীন)।

(৪) আক্বীদায়ে ইরতেদাদে শায়খাইন ঃ আহলে হক উলামায়ে কেরাম যুগ যুগ ধরে এ বিশ্বাস পোষণ করে আসছেন যে, সকল সাহাবায়ে কেরামই সত্যের মাপকাঠি ও অনুসরণযোগ্য। তারা সত্যের উপর পূর্বাপর সবসময়ই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

কিন্তু শিয়া সম্প্রদায়ের আক্বীদা হল যে, মাত্র তিন চারজন সাহাবী ছাড়া বাকী সকল সাহাবীই রাসূল সা. এর ইন্তিকালের পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। (নাউযুবিল্লাহ)। বিশেষ করে শায়খাইন তথা হযরত আবু বকর রা. ও হযরত উমর রা. এ দু'জন আলী রা.-এর খিলাফতকে অস্বীকার করে রাসূল সা. এর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে মুরতাদ হয়ে গেছে। রাসূল সা. এর মৃত্যুর পূর্বে তাদের সামনে হযরত আলী রা. কে তাঁর পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করে শায়খাইন থেকে হযরত আলী রা.-এর খিলাফতের বায়'আত নিয়েছিলেন। কিন্তু তারা রাসূল সা. এর সাথে কৃত অঙ্গীকারের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ফলে তারা মুরতাদ হয়ে গেছে (নাউযুবিল্লাহ)। এ ব্যাপারে তারা কুরআনের একটি আয়াত পেশ করে থাকে।

ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم

শিয়াদের কিতাব উসূলে কাফীতে ইমাম জা'ফর ছাদেক এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, এ আয়াতটি হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা তিন জনই শুরুতে রাসূল সা. এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। এরপর তাদের সামনে হযরত আলীর ইমামত পেশ করা হলে তারা তা অস্বীকার করে কাফের হয়ে যায়। অতঃপর তারা রাসূল সা. এর কথায় আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রা. এর ইমামতের বায়'আত করে পুনরায় ঈমান আনে। কিন্তু রাসূলের মৃত্যুর পর পুনরায় তারা আলী রা.-এর ইমামতকে অস্বীকার করে কাফের হয়ে যায় এবং তাদের কুফরি আরো বাড়তে থাকে (নাউযুবিল্লাহ)। এগুলো হল শিয়াদের মূল আক্বীদা যার কারণে আহলে হক উলামায়ে কিরাম তাদেরকে কাফের বলে ফতওয়া প্রদান করেছেন।

ভারতবর্ষে শিয়াদের প্রভাব ঃ

বিচ্ছিন্নভাবে ভারতবর্ষে শিয়াদের অনুপ্রবেশ অনেক পূর্বে ঘটলেও রাজকীয়ভাবে তারা প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায় মোঘল সম্রাট হুমায়ূনের শাসনামলে। শেরশাহের সাথে ১৫৪০ খ্রীঃ কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ূন ইরানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পারস্যের শিয়া সম্রাট তাহমান নিম্নোক্ত শর্তে তাদেরকে সাহায্য করতে সম্মত হন। ১. হুমায়ূনকে শিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে, ২. ভারতে শিয়া মতবাদ প্রচারের সুযোগ দিতে হবে, ৩. কান্দাহার অঞ্চল তাকে দিয়ে দিতে হবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও হুমায়ূন এই সব শর্ত মেনে নেন এবং সম্রাট তাহমানের সহযোগিতায় তিনি তার হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই শিয়ারা হুমায়ূনের দরবারে যথেষ্ট মর্যাদার আসন লাভ করে। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তারা এদেশে শিয়া মতাদর্শ প্রচারের তৎপরতায় যথেষ্ট অগ্রসর হয়ে যায় এবং বহু লোককে তারা শিয়া মতাদর্শে দীক্ষিত করে ফেলে। মীর জাফর, মীর সাদেক, সুজাউদ্দৌলা, নজফ খান প্রমুখ উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গও দুর্ভাগ্যক্রমে শিয়ামতাবলম্বী ছিল–যারা ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল। তাছাড়া সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যও তারা অভিনব কায়দায় প্রচারণা চালায়। এতে ইসলাম সম্পর্কে বহু বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস, অনাচার ও কুপ্রথা সমাজে রেওয়াজ পায়। বাদশাহ হুমায়ূনের আমল থেকে রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এক সময় তারা যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠে। এমনকি এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায়ও তারা যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়।

শিয়াদের প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের তৎপরতা ঃ

শিয়াদের প্রতিরোধে এদেশের উলামায়ে হক সর্বদাই তাঁদের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন। তবে শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ.-এর যুগ থেকেই শিয়াদের জোরদার মুকাবেলা শুরু হয়। শিয়াদের বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের বিভ্রান্তি উন্মোচন করতঃ সঠিক ইসলামী আক্বীদাহ বিশ্বাস সমাজের সামনে তুলে ধরার জন্য হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ 'ইযালাতুল খিফা' ও 'কুররাতুল আইনাইন' নামক দু'টি বলিষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করেন। পরে তদীয় পুত্র শাহ আব্দুল আযীয রাহ. শিয়াদের যুক্তি প্রমাণ খণ্ডন করে 'তুহফায়ে ইসনা আশারিয়্যাহ' রচনা করেন। এ গ্রন্থ রচনার কারণে শিয়া মতাবলম্বী আমীর নজফ খান তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দিল্লী থেকে তাঁকে বহিষ্কার করে দেয়। হযরত ইসমাঈল শহীদও শিয়াদের রদ্দে 'মানসাবে ইমামত' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ সকল মনীষীদের রচনা, প্রচারণা, ওয়াজ ও বক্তৃতা দ্বারা এ দেশের বহু মানুষ শিয়া মতাদর্শ বর্জন করে পুনরায় সহীহ দ্বীনের দিকে ফিরে আসে। আলীগড়ের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ব্যক্তি নবাব মুহসীনুল মুলুক শিয়া মতাদর্শ বর্জন করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 'আয়াতে বাইয়্যিনাত' নামক তিন খণ্ডের বিশাল পুস্তক রচনা করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতাদর্শের হক্কানিয়্যাতকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তুলে ধরেন। দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতা হযরত নানুতুবী রাহ. 'হাদিয়াতুশ্ শী'আ'

নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, হযরত গাঙ্গুহী রাহ. শিয়া মতাদর্শের স্বরূপ তুলে ধরে 'হিদায়াতুশ শিয়া' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। শী'আদের সম্পর্কে হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী রাহ.-ও একাধিক পুস্তক রচনা করেছিলেন। তাছাড়া 'শিয়াইয়্যাত কিয়া হ্যাঁয়' 'ইরানী ইনকিলাব আওর ইমাম খোমেনী' ইত্যাদি বহু গ্রন্থ এ বিষয়ে প্রণীত হয়েছে।

শিয়াদের তৎপরতা রোধ করার জন্য তাঁরা বহু সংগঠনও গড়ে তুলেছিলেন। এক সময় লক্ষ্মৌতে শিয়াদের দৌরাত্ম্য এতদুর বেড়ে যায় যে, সেখানে সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসায় কোন আলোচনা করতে গেলেই তারা গোলযোগ বাঁধিয়ে দিয়ে মারামারি ও নানা ধরনের হাঙ্গামা সৃষ্টি করত। ফলে ১৯৫৪ সালে ইংরেজ সরকারের স্থানীয় প্রশাসন শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অজুহাতে সেখানে সাহাবীদের প্রশংসায় কোন সভা-সমিতি করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এহেন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে উলামায়ে দেওবন্দ মাওলানা আব্দুশ শুকুরের নেতৃত্বে আন্দোলনমূখর হয়ে উঠে এবং হযরত মদনী রাহ., মাওলানা হাবীবুর রহমান ও মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারীর পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে 'মজলিশে তাহাফফুজে নামুসে সাহাবা' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এভাবে বিভিন্ন মুখী প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁরা শিয়াদের অপতৎপরতা বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং শিয়াদের বিভ্রান্তি কর ধর্মবিশ্বাস থেকে উপমহাদেশের মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করেন। অবশ্য অদ্যাবধি শিয়াদের কিছু কিছু রুসুম ও রেওয়াজ এদেশের মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে এবং কোন কোন অঞ্চলে তাদের অস্তিত্ব টিকে আছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় 'হোসেনী দালান' নামে তাদের একটি কেন্দ্র রয়েছে। আশুরা ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ দিনে সেখানে তারা শিয়া মতাদর্শের অনুসরণে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা পালন করে থাকে।

ইরানে খোমেনীর বিপ্লব সফল হওয়ার পর থেকে ইরানী দূতাবাসের উদ্যোগে এ দেশীয় কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী আলেম নামধারী ব্যক্তির মাধ্যমে এদেশে শিয়া মতাদর্শের প্রচার প্রসারের জোর তৎপরতা চালানো হচ্ছে। অবশ্য উলামায়ে দেওবন্দ এ ব্যাপারে দেশবাসীকে সতর্ক করে যাচ্ছেন। তবে আমাদেরকে এ ব্যাপারে আরো সতর্ক হতে হবে। আরো কঠোর ও বলিষ্ঠ নীতি অবলম্বন করতে হবে।

খ. খ্রীষ্টান মিশনারী ফিৎনা ও তার মুকাবেলা ঃ

ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান মিশনারী তৎপরতার সূচনা ঃ ব্যবসায়ী তাকিদে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপীয়ান বণিক সম্প্রদায়ের ভারতবর্ষে আনাগোনা দীর্ঘকাল থেকে অব্যাহত থাকলেও এদেশের মানুষকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার কিংবা এদেশে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার প্রসারের তেমন কোন উদ্যোগ তারা গ্রহণ করেছিল বলে ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে বৃটেনিয়ান ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজের নিকট থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার পর থেকে একদিকে যেমন তারা রাজ্য সম্প্রসারণের অপচেষ্টায় মেতে উঠে, তেমনি এদেশের মানুষের ধর্ম ও

সংস্কৃতির উপরও তারা জঘন্য হামলা শুরু করে। সম্ভবত এদেশের মানুষকে ধর্ম ও কৃষ্টিকালচারের দিক থেকে খ্রীষ্টবাদের অনুসারী বানানোর এই হীন চেষ্টার পিছনেও ক্ষমতার মসনদকে সুসংহত করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। কারণ বিজাতীর প্রতি স্বভাবজাত ঘৃণাবোধের কারণে এদেশের মানুষ বিশেষ করে মুসলমানরা তাদেরকে কখনই সুনজরে দেখতো না। কৃষ্টিসভ্যতা ও ধর্মাদর্শের ঐক্য সৃষ্টি করতে পারলে হয়তোবা এই বিদ্বেষ অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং স্বধর্মাবলম্বীদের প্রতি স্বভাবজাত সহানুভূতির কারণে হয়ত এদেশের মানুষ তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠবে– এহেন বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই সম্ভবত তারা এদেশের মানুষকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য সকল সম্ভাব্য দিক থেকে জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। তাদের এ উদ্যোগগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. এদেশের সম্পদ শোষণ করে নিয়ে দেশের মানুষকে নিঃস্ব ও সহায়-সম্বলহীন করার পর দরিদ্র জনগণকে অর্থনৈতিক প্রলোভন ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য প্রকারান্তরে বাধ্য করা হয়। কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাগুলোতে এ প্রক্রিয়া যথেষ্ট বলিষ্ঠভাবে প্রয়োগ করা হয়।

২. খ্রীষ্টবাদী ধ্যান-ধারণার উপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে শিক্ষার্থীদেরকে একাডেমিক প্রক্রিয়ায় ক্রমান্বয়ে খ্রীষ্টবাদের প্রতি অনুরক্ত করে তোলার চেষ্টা করা হয়। ১৮৩১ সালে বৃটিশ সরকার কোম্পানীকে ভারতবর্ষে তাদের প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি চালু করার জন্য অর্থ বরাদ্দদান করলে এদেশে ব্যাপক হারে মিশনারী স্কুল খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তারা স্থানে স্থানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য মিশনারী সেন্টার স্থাপন করে এবং স্বদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ পাদ্রীদেরকে আমদানী করে এসকল সেন্টার থেকে খ্রীষ্টবাদ প্রচারের জোরদার তৎপরতা শুরু করে। এছাড়াও দরিদ্র জনগণকে ফ্রী চিকিৎসা ও ঔষধ সরবরাহ করে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি অণুপ্রাণিত করার মানসে স্থানে স্থানে মিশনারী হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা বিভিন্ন স্থানে বাইবেল সোসাইটি গড়ে তোলে। এসকল সোসাইটি থেকে খ্রীষ্টধর্মের পক্ষে বহু বই-পুস্তক ছাপিয়ে বিতরণ করে।

১৮২৬ সালে খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরু, মিশনারী তৎপরতার প্রধান নেতা মিঃ আর্চ বিশপ হেবার ভারতে এসে কোম্পানীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মিশনারী তৎপরতাকে সুসংগঠিতভাবে জোরদার করার যাবতীয় ব্যবস্থা করে যায়। ফলে পুলিশের তত্ত্বাবধানে মিশনারী প্রচার কর্মীরা গ্রামে-গঞ্জে, হাট-বাজারে গিয়ে মানুষকে ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

১৮৩৪ সালে খ্রীষ্টধর্মের প্রসিদ্ধ প্রচারক, আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত মিঃ সি. জি, স্ক্যান্ডেল ভারতবর্ষে এসে ইসলাম ধর্মের অসারতা প্রমাণ করার জোর তৎপরতায় লিপ্ত হয়। সে "মীযানুল হক" নামে একটি বই লিখে ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে। এ পুস্তকে সে ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার প্রয়াস পায়। তাছাড়া ইসলাম

ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বিভিন্ন স্থানে মুনাযারায় (বিতর্ক অনুষ্ঠানে) লিপ্ত হয়। তার উপস্থিত যুক্তি ছিল অত্যন্ত ধারালো ও আক্রমণাত্মক, যে কারণে কেউ তার সঙ্গে সহজে তর্কে পেরে উঠত না। এটা ছিল মুসলমানদের জন্য এক নাজুক পরিস্থিতি।

৩. ১৮৩৭ সালে সারা দেশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়; এ সুযোগে তারা বহু অসহায় দরিদ্র মানুষকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার সুযোগ গ্রহণ করে। চাকুরী-বাকুরী, বিভিন্ন অনুদান ও ভাতা প্রদানের ঘোষণা দিয়ে তারা দরিদ্র মানুষকে আকৃষ্ট করত। আর এসব সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য যে ইন্টারভিউ নেওয়া হত তাতে প্রশ্নাবলীর উত্তর যারা খ্রীষ্টধর্মের অনুকূলে প্রদান করত তাদেরকেই সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হত। এভাবে তারা খ্রীষ্টধর্মের প্রতি মানুষের সমর্থন আদায় করার অমানবিক কৌশল অবলম্বন করেছিল।

৪. এ ছাড়াও সরকারী কর্মচারীদেরকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার জন্য বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করা হত। ১৮৫৫ সালে পাদ্রী এ, এডম্যান্ড কলকাতার অফিস থেকে সরকারের অধীনস্থ সকল কর্মচারীদের প্রতি এ মর্মে একটি চিঠি প্রদান করে যে, আমাদের সরকারের ইচ্ছা যে, ভারতবর্ষ যেভাবে একটি ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, অনুরূপভাবে দেশের নাগরিকদের ধর্ম-বিশ্বাসের বিভিন্নতা দূরীভূত করে সকলকেই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী বানিয়ে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও একটি বৃহৎ ঐক্য গড়ে তোলা। সুতরাং এ ব্যাপারে সকল কর্মচারীকে মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদেরকে বুঝিয়ে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য জোর তৎপরতা চালাতে হবে।

অবস্থার এই বিবরণ থেকে মিশনারী তৎপরতার মাধ্যমে এদেশের মানুষকে খ্রীষ্টান বানানোর জন্য কি বলিষ্ঠ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

খ্রীষ্ট ধর্মের মৌলিক বিভ্রান্তি ঃ

মূলতঃ হযরত ঈসা আ. ছিলেন সীমিত কালের ও সীমিত অঞ্চলের নবী। আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. এর আবির্ভাবের সাথে সাথে তার নুবুয়্যাতের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু খ্রীষ্টান পাদ্রীরা নিজেদের কায়েমী স্বার্থকে টিকিয়ে রাখার জন্য হযরত ঈসা আ. কে সর্বজনীন ও সর্বকালীন নবী বলে চালিয়ে দিতে প্রচেষ্টা শুরু করে। স্বয়ং বাইবেলে বর্ণনা ছিল এ দাবীর পরিপন্থী, যে কারণে তারা বাইবেলেও পরিবর্তনের প্রয়াস পায়।

যেহেতু বাইবেলের বিধান ছিল সীমিতকালের মানুষের জন্য প্রদত্ত, সে কারণে পরবর্তীকালের ক্রমবর্ধমান যুগ চাহিদার সাথে বাইবেলের বিধান পাল্লা দিতে স্বাভাবিক কারণেই সক্ষম হয়নি। এই সমস্যা নিরসনের জন্য পাদ্রীদেরকে বাইবেলে পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। এছাড়াও বস্তুবাদী সভ্যতার প্রভাবে ভোগবাদী মানসিকতা দ্বারা খোদ পাদ্রীরাও প্রভাবিত হয়ে পড়ে, অথচ এই অবাধ ভোগবাদী মানসিকতার সমর্থন কোন ঐশী বিধানই করেনা বিধায় বাইবেলের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা তাদের মন-মানসিকতার পরিপন্থী প্রমাণিত হয়,

একারণেও তারা বাইবেলের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা ধারায় পরিবর্তন করতে প্রয়াসী হয়। যদিও হযরত ঈসা আ.এর দ্বীন রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে তা অনুসরণের কোন বৈধতা বিদ্যমান নেই, তথাপি হযরত ঈসা আ. এর উপর অবতীর্ণ ঐশী বিধান তথা প্রকৃত বাইবেল অবিকৃত অবস্থায় থাকলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু পাদ্রীদের স্বেচ্ছাচারীতার কারণে তাও অবিকৃত থাকেনি। সুতরাং সে দ্বীনের অনুসরণের মাঝে অবাধ ভোগবাদীতার অনুসরণ ছাড়া কল্যাণের কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি।

বাইবেলের অনুসারীরা হযরত ঈসা আ. প্রদত্ত ব্যাখ্যা ধরে রাখেনি। যে কারণে পরবর্তী চর্চাকারীদের জন্য দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে বাইবেলের চর্চা করতে গিয়ে অভিধানের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। আর এ কথা তো একেবারেই সুস্পষ্ট যে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থ যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে বদলায়। এককালে এক শব্দ দ্বারা এক অর্থ বুঝানো হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই শব্দই অন্য অর্থে প্রয়োগ করা হয়। যেমন বাংলা ভাষায় মাস্তান শব্দটি এককালে আল্লাহর প্রেমে মত্ত বা পাগলপারা ব্যক্তিদেরকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হত, কিন্তু বর্তমানে নেশাখুরী, মদ্যপান ও উশৃংখলতায় যারা মত্ত ও মস্ত তাদেরকে বুঝানোর জন্য মাস্তান শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অথচ এদুই অর্থের মাঝে কি বিস্তর ফারাক।

অনুরূপভাবে বাইবেল যখন অবতীর্ণ হয় তখন হিব্রু ভাষায় (ابن)'ইবনুন্' শব্দটি ছিল (عبد) আবদুন অর্থাৎ বান্দা বা গোলামের সমার্থক। যে কারণে বাইবেলে হযরত ঈসা আ. কে (ابن الله) ইবনুল্লাহ শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে, সে কালে যার অর্থ ছিল "আল্লাহর বান্দা।' কিন্তু পরবর্তীতে (ابن) ইবনুন শব্দটি ছেলে বা সন্তানের অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। ঠিক এই সময়ের গবেষকরা বাইবেলের চর্চা করতে গিয়ে অভিধানের আশ্রয় গ্রহণ করে (ابن الله) ইবনুল্লাহ এর অর্থ করে আল্লাহর সন্তান। এই অর্থের কারণে পাঠকদের মাঝে হযরত ঈসা আ. আল্লাহর সন্তান এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। আর প্রজননগত ধারার স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে পিতা ও পুত্র একই শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে। সুতরাং হযরত ঈসা আ. যদি আল্লাহর পুত্র হয়ে থাকেন তাহলে তিনিও ঈশ্বরের শ্রেণীভুক্ত হবেন নিঃসন্দেহে। অপরদিকে প্রজননের জন্য সমশ্রেণীর মিলন অপরিহার্য্য। হযরত ঈসা আ. এর মাতা যে মরিয়ম তাতো সকলেরই জানা, এমতাবস্থায় আল্লাহকে যদি ঈসার পিতা ধরা হয় তাহলে এ কথাও মেনে নিতে হয় যে, মরিয়মও ছিলেন ঈশ্বরের শ্রেণীভুক্ত। এই ব্যাখ্যার গোলক ধাঁধায় পড়ে তাদেরকে তিন ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনে নিতে হয়; অথচ ইঞ্জিলে ঈশ্বর যে একজন একথা সুস্পষ্টভাবে স্থানে স্থানেই উল্লেখ রয়েছে। এই জটিলতা নিরসনের জন্যই তাদের এরূপএকটি গোঁজামিল ধরনের ব্যাখ্যা দিতে হয় যে, এই তিন সত্ত্বা মিলেই এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব। কিন্তু এই ব্যাখ্যা একদিকে যেমন তাওহীদের পরিপন্থী তেমনি গণিত শাস্ত্রের বিধানানুসারেও এটি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। কেননা তিন মিলে কখনই এক হয় না (১ + ১ + ১ = ৩ হয় কিন্তু ১ + ১ + ১= ১ নয়)। ফলে

খ্রীষ্টবাদ সম্পর্কে খোদ তার অনুসারীদের মাঝেই দ্বিধা সংশয় সৃষ্টি হয়– যার কোন সদুত্তর পাদ্রীরা দিতে পারেনি। ফলে মানুষ ধর্ম সম্পর্কেই বিরাগভাজন হতে শুরু করে।

এছাড়াও খ্রীষ্টান পাদ্রীদের প্রতি অতিভক্তির পরিণতি থেকে এরূপ একটি অপবিশ্বাসও গড়ে উঠে যে, পাদ্রীগণ মানুষের পাপ মোচনের অধিকার রাখেন। ফলে পাপীরা নির্দ্বিধায় পাপ করে গীর্জায় গিয়ে পাদ্রীদেরকে খুশী করে পাপ মোচন করে আসতে পারত। এ কারণে খ্রীষ্ট সমাজে পাপ প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মানুষ ভোগবাদী জীবন প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়। অথচ রহিতকৃত এই ভাগবাদী আদর্শই ভারতবাসী মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছিল পাদ্রীরা।

মিশনারী তৎপরতা প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দ ঃ

মিশনারীর প্রচারকর্মীরা যখন তাদের প্রচারভিযানকে জোরদার করতে উঠেপড়ে লেগে যায় এবং বিভিন্ন স্থানে আসর জমিয়ে ইসলাম ও নবী মুহাম্মদ সা.-এর কুৎসা রটনায় লিপ্ত হয় এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে শুরু করে তখন উলামায়ে দেওবন্দ তাদের মুকাবেলায় অবতীর্ণ হন এবং তাদের বক্তব্যের প্রতিবাদে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে শুরু করেন। বিশেষ করে সি, জি স্ক্যান্ডেলের ভারতে আগমনের পর থেকে মুনাযারা ও তর্ক যুদ্ধের এ প্রক্রিয়া ব্যাপকতা লাভ করে। তর্ক যুদ্ধে উলামায়ে দেওবন্দও কম যেতেন না। প্রথম দিকে এ সকল বির্তক অনুষ্ঠানে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত নানুতুবী রাহ. নিজে না গিয়ে স্বীয় শিষ্য ও শাগরেদদেরকে প্রেরণ করতেন। কিন্তু পরিস্থিতির নাজুকতার কথা চিন্তা করে ১৮৭৫ সালে পাদ্রী তারা চাঁদের মোকাবেলায় তিনি নিজেই মুনাযারায় অবতীর্ণ হন। সেই বিতর্কে তিনি পাদ্রীকে দারুণভাবে পরাস্ত ও নাজেহাল করে ছাড়েন। এবৎসরই শাজহানপুর জেলার চাঁদপুরে ভণ্ড পিয়ারা লালের উদ্যোগে ‘মেলায়ে খোদা শেনাসী” বা আল্লাহর পরিচয়ের সমাবেশ নামে একটি মুনাযারার আয়োজন করা হয়। পিয়ারা লাল মূলতঃ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু সে এ বিতর্কে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের থেকেও সহযোগিতা নেয়। হযরত নানুতুবী রাহ. অত্যন্ত সুকৌশলে উভয় ধর্মের লোকদেরকে পরাস্ত করে তাওহীদি জনতার পক্ষে বিজয় শিরোপা ছিনিয়ে আনেন। এই শোচনীয় পরাজয়ের পর পাদ্রীরা আর মুনাযারায় অবতীর্ণ হতে সাহস করেনি।

হযরত গঙ্গুহী রাহ.-এর অন্যতম শাগরিদ মাওলানা শরফুল হক দেহলভীও পাদ্রীদের সঙ্গে বহু মুনাযারা করেন। এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য তিনি খ্রীষ্টবাদ সম্পর্কে গভীর পড়াশুনা করেন এবং এ জন্য তিনি বিভিন্ন ভাষাও আয়ত্ব করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি খ্রীষ্টবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে তিনি মুনাযারা করতেন। ফলে পাদ্রীরা তাঁকে অস্বাভাবিক রকম ভয় করতো। তাছাড়া মাওলানা কেফায়েত উল্লাহ, মাওলানা আবুল মনসুর দেহলভী, মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী, মাওলানা হিফজুর রহমান প্রমুখ দেওবন্দী আলেম

উলামা খ্রীষ্টবাদ ও পাদ্রীদের মুকাবেলায় জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তাদের অব্যাহত তৎপরতার ফলেই সারাদেশে মিশনারী তৎপরতার বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে এবং ইংরেজ বিরোধী তৎপরতা চরম আকার ধারণ করে।

খ্রীষ্টবাদের মুকাবেলায় তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলী ঃ

পাদ্রীরা যখন খ্রীষ্টবাদের সমর্থনে ইসলাম ও নবী মুহাম্মদ সা. এর কুৎসা রচনা করে বই পুস্তক লিখে সারাদেশে বিতরণ করতে থাকে তখন তাদের মুকাবেলায় উলামায়ে দেওবন্দও অসংখ্য বইপুস্তক রচনা করে তা প্রকাশ করেন।

মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানবী রচিত 'ইযহারে হক্ব' এ বিষয়ে একটি অনবদ্য গ্রন্থ। এ বইটি বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। হযরত নানুতুবী রাহ.-এর মুনাযারার যুক্তিসমূহ সংকলিত করে "হুজ্জাতুল ইসলাম" নামে প্রকাশ করা হয়, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীও এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার মাঝে "তাকাবুলে সালাসাহ', 'ইসলাম আওর ঈসাইয়্যাত', 'তাওহীদ ওয়াত তাসলীস' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাওলানা শরফুল হক দেহলভী এ বিষয়ে প্রায় ১০টি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মাওলানা আবুল মনসুর দেহলভীও খ্রীষ্টানদের মুকাবেলায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ব্যাপারে উলামায়ে দেওবন্দের রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা শতাধিক হবে বলে মনে করা হয়। তাঁদের অক্লান্ত মেহনত ও অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলেই খ্রীষ্টান পাদ্রীদের আক্রমণ থেকে ইসলামের চিরন্তন আক্বীদাহ বিশ্বাস অক্ষুণ্ন থাকে এবং রক্ষা পায় এদেশীয় মুসলিম উম্মার ঈমান আক্বীদাহ।

বর্তমানে ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলাদেশে মিশনারী তৎপরতা আবার ব্যাপকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বিভিন্ন শিরোনামের এনজিও এর মাধ্যমে তারা তাদের হীন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। বন্যা, খরা ও দারিদ্র্য-পীড়িত অঞ্চলে জনসেবার ছদ্মাবরণে তারা মানুষকে ধর্মান্তরিত করার জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক শোষণের জাল বিস্তার করে হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা। ক্রমান্বয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে তারা ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর ন্যায় একচেটিয়া দখল সৃষ্টি করে নিচ্ছে। অফিস প্রতিষ্ঠার নামে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তারা হাজার হাজার কুঠি গড়ে তুলছে। তাদের এই তৎপরতা অব্যাহতভাবে চলতে থাকলে আমাদেরকে বোধ হয় আরেকটি পলাশীর মুখোমুখী হতে হবে। এ ব্যাপারে দেশের জনগণ ও সরকারকে পূর্ব থেকেই সচেতন ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।

গ. হিন্দু আর্য সমাজীদের ফিতনা ঃ

ইংরেজদের প্ররোচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দু সমাজের কতিপয় লোকও সে সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লাগে। তারা হিন্দু মুসলিম দাঙ্গাকে চাঙ্গা করার জন্য মুনলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। ইসলামের অসারতা প্রমাণ করার জন্য ইংরেজদের ন্যায় তারাও মাঠে-ময়দানে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত

হওয়ার চ্যালেঞ্জ দিতে থাকে। ১৮৭২ সালে স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী নামে জনৈক হিন্দু পণ্ডিত 'স্বতীর্থ' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করে বাজারে ছাড়ে। এ গ্রন্থে সে মুসলমানদের আক্বীদাহ, বিশ্বাস, রাসূল ও কুরআনের উপর নানাবিধ অহেতুক আক্রমণাত্মক অভিযোগ উত্থাপন করে। তার এই চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠিত করা ও মুসলমানদেরকে নাজেহাল করে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করার মানসে 'আর্য সমাজী' নামে সে একটি সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করে। অপর একজন পণ্ডিত স্বামী লালানন্দ লালও ইসলামের আকীদাহ বিশ্বাসের উপর আক্রমণ করে একটি বই লিখে বাজারে ছেড়েছিল। ১৯২৩ সালের এ দিকে এসে এ ফিতনা ব্যাপক আকার ধারণ করে। তাদের প্রচারাভিযানে বিভ্রান্ত হয়ে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানহীন অজ্ঞ পর্যায়ের কিছু কিছু লোক হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করেছিল। এ ছিল মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য এক ভীষণ হুমকি। ইতিহাসে হিন্দুদের এ আন্দোলনকে 'শুদ্ধি আন্দোলন' নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।*

আর্যসমাজী তথা শুদ্ধিদের দ্বারা সৃষ্ট এই ফিতনার মুকাবেলা করার জন্য উলামায়ে দেওবন্দ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আর্য সমাজীরা ইসলামের অসারতা প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন স্থানে জনসমাবেশ আহ্বান করে এবং তাদের বক্তব্যের অকাট্যতার চ্যালেঞ্জ করে উলামা সমাজকে মুনাযারায় (তর্ক যুদ্ধে) অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে থাকে। দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতা হযরত নানুতুবী রাহ. তাদের এই চ্যালেঞ্জের মুকাবেলা করার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হন। আর্য সমাজীদের দুই জাঁদরেল পণ্ডিত স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী ও স্বামী লালানন্দ লালের সাথে তাঁর বেশ কয়েক বার তর্ক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এসকল বিতর্কে হযরত নানুতুবী রাহ. অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণ দ্বারা তাদের আপত্তিসমূহ খণ্ডন-করেন এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে সুপ্রমাণিতভাবে তুলে ধরেন। বিতর্কে তাঁর উপস্থাপিত যুক্তি প্রমাণগুলো পরে বিন্যস্ত করে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' ও 'কিবলা নুমা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়।

আর্য সমাজীরা ইসলামের আকীদাহ বিশ্বাসের উপর আক্রমণ করে যে সব পুস্তক রচনা করেছিল, তার মুকাবেলায় হযরত নানুতুবী রাহ. "জওয়াবে তুরকী বতুরকী" নামক একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তাদের উপস্থাপিত যুক্তি প্রমাণের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হয় এবং পাল্টা যুক্তির মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরা হয়।

১৯২৩ সালে আগ্রার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে তাদের তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলে মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাসের হিফাযতের জন্য এবং আর্যসমাজীদের মুকাবেলার জন্য দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ৫০ জন মুবাল্লিগ সে অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। অবস্থার এই নাজুকতার মুহূর্তে দেওবন্দের কৃতী সন্তান হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়েতুল্লাহ রাহ. তাঁর দাওয়াতী মিশন নিয়ে সশরীরে সেখানে উপস্থিত হন। তাঁদের প্রচেষ্টায় সেখানে একটি দাওয়াতী কেন্দ্র ও বেশ কিছু মক্তব মাদরাসা গড়ে উঠে।

এভাবে উলামায়ে দেওবন্দের অব্যাহত চেষ্টার ফলে এই ফিতনা ক্রমান্বয়ে স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং মুসলমানরা তাদের ঈমান্ আক্বীদাহ হিফাযত করতে সক্ষম হয়। যেহেতু এই ফিতনার মূলে ইন্ধন যুগিয়েছিল ইংরেজ বেনিয়ারা সুতরাং তাদের চলে যাওয়ার পর এ ফিতনা এমনিতেই স্তিমিত হয়ে যায়।

ঘ. ইনকারে হাদীসের ফিতনা ও তার মুকাবেলা ঃ

ইনকারে হাদীসের ফিতনা মূলতঃ খারেজী সম্প্রদায় কর্তৃক সূচীত হয়েছে। জঙ্গে সিফফীনের সালিশের ফয়সালা না মেনে যারা–'আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম মানি না"–এই শ্লোগান দিয়ে হযরত আলী রা. এর দল ত্যাগ করে, তারাই মূলতঃ হাদীস অস্বীকারের প্রবণতার সূচনা করে। তবে তাদের হাদীস অস্বীকারের ধারা ছিল ভিন্ন। কারন তাদের ধারণা ছিল যে, যারা এই সালিশের ফায়সালাকে মেনে নিয়েছে তারা মূলতঃ কুরআনের বিধানকে লঙ্ঘণ করে কাফির হয়ে গেছে। তাদের বর্ণিত হাদীসগুলো নির্ভরযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। অতএব সেগুলো গ্রহণীয় হতে পারে না। বস্তুতঃ তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে এহেন বিভ্রান্তিকর চিন্তার শিকার হয়েছিল এবং সালিশ মান্যকারী সাহাবীগণের বর্ণিত হাদীসসমূহকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছিল।

ইনকারে হাদীসের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, যুগে যুগে প্রবৃত্তির পূঁজারীরাই হাদীস অস্বীকারের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার না থাকলে প্রত্যেকের জন্যই নিজস্ব খেয়াল-খুশী অনুসারে কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অবকাশ ছিল। কিন্তু হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারই তাদের তথাকথিত মুক্ত চিন্তা বিকাশের পথে মূল অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই প্রবৃত্তির পূঁজারীরা নানা ধরনের খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে হাদীস অস্বীকারের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। যে কারনে যার যতটুকু প্রয়োজন হয়েছে হাদীসের ভাণ্ডার থেকে সে সেই পরিমাণই অস্বীকার করেছে। তাই হাদীস অস্বীকারকারীদের সকলের দাবী এবং দাবীর পক্ষে প্রদত্ত যুক্তি এক নয়। তবে তাদের দাবীগুলোকে বিশ্লেষণ করলে মোটামুটিভাবে ৫টি মৌলিক দাবী বের হয়ে আসে। যথা ঃ

১. নবী সা. ছিলেন কুরআনের মুবাল্লিগ তথা বার্তাবাহক মাত্র। তাই তাঁর আনীত কুরআন অবশ্য অনুসরণীয় বটে, তবে বার্তাবাহক হিসাবে তাঁর নিজের কথার কোন গুরুত্ব নেই, সুতরাং তা আমাদের জন্য অনুসরণীয় নয়।

২. নবীর কথা অনুসরণের অপরিহার্যতা তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত সময়ের জন্য সীমিত ছিল, কেননা তিনি ছিলেন সেই সময়ের শাসন ক্ষমতার মালিক। সাহাবীদের জন্য তা অবশ্য পালনীয় ছিল বটে, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর উম্মতের জন্য তা পালনীয় নয়।

৩. যেহেতু কুরআন পৌঁছানো ও তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে উম্মতকে বুঝিয়ে দেওয়া নবীর দায়িত্ব ছিল সুতরাং কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কীয় তাঁর সকল কথা উম্মতের জন্য অনুসরণীয় বটে কিন্তু অন্যান্য হাদীসগুলো অনুসরণীয় নয়।

৪. হাদীস অবশ্য অনুসরণীয় ছিল বটে, কিন্তু তা যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি বলে (কেননা হিজরী তৃতীয় শতকে সেগুলো সংকলিত হয়েছে) সেগুলোর নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে। তাই বর্তমানে এগুলো অবশ্য অনুসরণীয় হওয়ার মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে।

৫. আর একদল প্রবৃত্তির পূঁজারী হাদীসকে শরীয়তের প্রামাণিক ভিত্তি মনে করে বটে তবে শরীয়তের বিধি-বিধানের ব্যাপারে তাদের নিজস্ব কিছু থিউরী থাকে। এদের অধিকাংশই শরীয়ত সম্পর্কে গভীরজ্ঞান রাখেনা। যৎসামান্য লেখাপড়া করেই শরীয়তের বিধি-বিধানের ব্যাপারে নিজেকে মুজতাহিদ ভাবতে শুরু করে। ফলে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত স্বীয় মস্তিস্ক প্রসূত চিন্তাগুলোকেই তারা শরীয়তের প্রমাণপুষ্ট করার অপচেষ্টা করে। যদি কোন হাদীস তার এই চিন্ত াগুলোকে নাকচ করে দেয় তখন সেই হাদীসটিকে যেকোন খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে প্রামাণিকতার অযোগ্য বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। কেউবা উম্মতের নিকট সহীহ বলে স্বীকৃত হাদীসকে যয়ীফ বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে, কেউবা স্থান-কালের প্রশ্ন উঠিয়ে বর্তমানে এই হাদীস প্রযোজ্য হতে পারে না বলে দাবী করে, আবার কেউবা হাদীসের ভাবার্থের স্বীকৃত ব্যাখ্যা বর্জন করে নতুন করে নিজের মনগড়া কোন ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে দেয়। এদের অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত এবং পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার কাছে মানসিকভাবে পরাজিত শ্রেণীর লোক। এরা পাশ্চাত্যের চিন্তা ধারাকে স্বীকৃত ও বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের নামে দেওয়া থিউরীগুলোকে অলঙ্ঘনীয় ধরে নিয়েই তাদের চিন্তার বুনিয়াদ রচনা করে। ফলে তাদের চিন্তাগুলো সে আলোকেই গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষে যারা হাদীস অস্বীকার করেছে তাঁদের অধিকাংশই এ ব্যাধিতে আক্রান্ত।

গবেষকগণ মনে করেন যে, ভারত উপমহাদেশে হাদীস অস্বীকারের প্রথম সূচনা করে স্যার সৈয়দ ও তদীয় সঙ্গী মওলভী চেরাগ আলী। এরা মূলতঃ পাশ্চাত্যের চিন্তা ধারায় মারাত্মকভাবে প্রভাবিত ছিল। যে কারনে ইসলামের বহু বিষয়কে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে গিয়ে সর্বজন স্বীকৃত ব্যাখ্যা বর্জন করে তারা নতুন ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। স্বকপোলকল্পিত এ সকল ব্যাখ্যা কোন হাদীসের পরিপন্থী হতে দেখলে সে সকল হাদীসের বিশুদ্ধতাকে তারা অস্বীকার করেছে। কিংবা হাদীসটি বর্তমানকালের জন্য প্রযোজ্য নয় বলে মন্তব্য করে দিয়েছে। কিছুকাল পরে এদের সমর্থকগোষ্ঠী আব্দুল্লাহ চক্রালভীর নেতৃত্বে "আহলে কুরআন' নামে একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করে। নিজেদেরকে 'আহলে কুরআন' বা কুরআনের অনুসারী বলে দাবী করে প্রকারান্তরে তারা একথাই বুঝাতে চেয়েছে যে, আমরা কুরআনকে মানি, অন্য কিছু মানিনা। এর উদ্দেশ্য ছিল, যে সব হাদীস তাদের দৃষ্টিতে কুরআনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে তাদের কাছে মনে হয়েছে সেগুলোকে অস্বীকার করা। (কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে সঙ্গতিপূর্ণ না হলেই প্রকৃত পক্ষেও যে তা সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন কথাতো বলা যায় না)।

এভাবে দীর্ঘ চৌদ্দশ বৎসর যাবৎ উম্মত যে সব হাদীসে কোনরূপ অসঙ্গতি খুঁজে পায়নি, এমন বহু হাদীসকে তারা কুরআনের বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। এদেরই একজন অন্যতম নেতা আসলাম জয়লাসপুরী 'আহলে কুরআন" দের দল ত্যাগ করে স্বতন্ত্র আরেকটি দল গঠন করে। এ দল সরাসরি হাদীস অস্বীকার করার দুঃসাহস প্রদর্শন করে। পরে গোলাম আহমদ পারভেজের নেতৃত্বে হাদীস অস্বীকারের এই প্রবণতা পরিপূর্ণতা লাভ করে। পারভেজ বিষয়টিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের চেষ্টা করে, এবং পত্র-পত্রিকা ও বই পুস্তকের মাধ্যমে এর ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। পারভেজের আমলেই এ ফিৎনা সবচেয়ে বেশী বিস্তার লাভ করে। বস্তুতঃ পারভেজ ছিল স্যার সৈয়দের চিন্তাধারার একজন বলিষ্ঠ সমর্থক। পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকুরীরত এই লোকটি দেশের জনগণকে আইন-শৃঙ্খলার অনুসারী বানানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। ধর্মের প্রতি মানুষের দুর্বলতার বিষয়টিকে এক্ষেত্রে কাজে লাগানোর মানসে সে এরূপ একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে যে, রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলার অর্থই হল ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা। যেহেতু তার দেওয়া এই থিউরী বহু হাদীসের পরিপন্থী ছিল সে কারণে সে হাদীস অস্বীকারের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। সে তার চিন্তাধারার আলোকে কুরআনের একটি নয়া তাফসীরও রচনা করে। উক্ত তাফসীরে সে ইসলামের শ্বাশত ও স্বীকৃত বহু বিষয়ের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছে। পারভেজ তার তাফসীরে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে যে, কুরআনে 'আল্লাহ' ও 'রাসূল' শব্দ ব্যবহার করে মূলতঃ একটি কেন্দ্রীয় ক্ষমতাশীল শক্তিকে বুঝানো হয়েছে। পারভেজ তার তাফসীরে একথাও উল্লেখ করেছে যে, রাসূল সা. এর দায়িত্ব কেবল এতটুকুই ছিল যে, তিনি আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধানকে মানুষ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবেন, সুতরাং কোন মানুষকে তাঁর অনুসরণের নির্দেশ দেওয়ার অধিকার তাঁর ছিলনা। সে আরো দাবী করেছে যে, কুরআনে বর্ণিত অর্থনৈতিক বিধানাবলী তথা উত্তরাধিকার আইন, লেনদেন, করজে হাসানা, ঋণদানের বিধান, যাকাত ও সাদকা খায়রাতের বিধানসমূহ প্রথম যুগের সাথেই সীমাবদ্ধ ছিল।

কেননা তখন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল নিতান্ত করুণ! তাই তাদের মাঝে অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টির লক্ষ্যে এসব বিধান দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রীয় পরিষদ সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করে কোন আইন কতটুকু কার্যকর করা হবে তা নির্ধারণ করবে। তার এ দাবীর প্রকারান্তরে অর্থ দাঁড়ায় এই যে, কেন্দ্রীয় পরিষদ ইবাদতের বিধিবিধানকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারবে। হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সে বলে যে, 'এগুলো মূলতঃ অনারবীয়দের ষড়যন্ত্র ও মিথ্যার ঝুলি। তার মতে আখেরাত বলতে ভিন্ন কোন জগতকে বুঝায় না বরং এর অর্থ হল অনন্ত ভবিষ্যত, আর জান্নাত জাহান্নাম দ্বারা মূলতঃ মানুষের সুখ ও দুঃখের অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। আদম বলতে নির্ধারিত কোন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়নি, মিরাজ ছিল নবী সা. এর একটি স্বপ্ন মাত্র। নামাযের বর্তমান রূপও ইসলামের নিজস্ব রূপ নয় বরং এ

রূপটি অগ্নি পুজকদের থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, নবীর যুগে নামায কেবলই দুই ওয়াক্ত ছিল, যাকাত বলতে মুসলিম সরকারের প্রাপ্য ট্যাক্সকে বুঝানো হয়েছে, শরীয়ত কর্তৃক এর কোন নির্ধারিত নেসাব নেই, প্রথম যুগের খলিফাগণ তাদের সুবিধামত তা নির্ধারণ করেছিলেন। তার মতে হজ্জ কোন ইবাদত নয়, এটি মুসলিম মিল্লাতের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে আগত লোকদের আহার্যের যোগান দেওয়ার জন্যই সেখানে কুরবানীর বিধান দেওয়া হয়েছে, অতএব অন্যত্র কুরবানী করার প্রয়োজন নেই। ইত্যাদি অসংখ্য বিভ্রান্তিকর চিন্তার উদগাতা ছিল গোলাম পারভেজ। এ সকল বিভ্রান্ত চিন্তা সমাজে প্রচার করার জন্য সে বহু বই-পুস্তক রচনা করে এবং পরবর্তী কালে সরকারী চাকুরী থেকে ইসতিফা দিয়ে "তুলূয়ে ইসলাম" নামক একটি পত্রিকা প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করে।

ইনকারে হাদীসের প্রতিরোধে ওলামায়ে দেওবন্দ ঃ

এই ফিতনার মুকাবেলার জন্য উলামায়ে দেওবন্দ হাদীসের গুরুত্ব ও তার প্রামাণিক ভিত্তি হওয়ার বিষয়টি কুরআন সুন্নার আলোকে সমাজের সামনে বিভি-ন্ন পন্থায় তুলে ধরেন এবং হাদীস অস্বীকারকারীদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে সমাজকে তাদের বিভ্রান্তিকর প্রচারণার হাত থেকে রক্ষা করেন। তাছাড়া যে সব যুক্তির আলোকে তারা হাদীস অস্বীকার করেছিল, সেসব যুক্তি যে ভিত্তিহীন ও কুরআন সুন্নার পরিপন্থি তা তারা কুরআন সুন্নার আলোকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও যুক্তিযুক্তভাবে তুলে ধরেন। তাদের এসকল বিভ্রান্তির দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেওয়ার জন্য তাঁরা বহু পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে প্রকাশ করেন। মুফতী মুহাম্মদ শফী রাহ. ও মাওঃ ইউসুফ বিন্নৌরী রাহ. পারভেজের বিভ্রান্তিকর বক্তব্যসমূহ উদ্ধৃত করে 'ফতওয়ায়ে পারভেজ' নামক পুস্তক রচনা করেন। মুফতী ওয়ালী হাসান টুংকী রচিত 'ফেৎনায়ে ইনকারে হাদীস' এ বিষয়ে একটি সুবিদিত গ্রন্থ। মুফতী রশীদ আহমদ রাহ. আহসানুল ফতওয়ায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাছাড়া ওলামায়ে দেওবন্দ হাদীসের দরস দান করতে গিয়ে ক্লাশে এ বিষয়ের উপর প্রমাণপুষ্ট বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পান। এভাবে ইনকারে হাদীসের এই হীন তৎপরতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং হাদীস শরীয়তের প্রামাণিক ভিত্তি হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের দ্বিধা-সংশয় কেটে যায়।

ঙ. মাহদী দাবীদারদের ফিৎনার মুকাবেলা ঃ

হাদীসে আখেরী যামানায় ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের কথা বর্ণিত আছে। সে সব বর্ণনায় ইমাম মাহদীর মর্যাদা ও শান-শওকতের কথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এসব বর্ণনা পাঠ করে কতিপয় সম্মান ও মর্যাদার প্রত্যাশী ব্যক্তি নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবী করে। ভারতবর্ষে মাহদী দাবীদারদের মাঝে সাইয়্যিদ মীরান শাহ্ জৈনপুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমদিকে সাইয়্যিদ মীরান শাহ একজন ধর্ম প্রচারক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তার ভক্তবৃন্দের সংখ্যা ছিল

অনেক। ৮৮৭ হিজরী থেকে মীরান শাহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর শুরু করে। হিজরী ৯০০ সালের দিকে সে আহমদ নগরে পৌঁছে এবং সেখানে তার একটি আস্তানা গড়ে তোলে। ৯০১ সালে হজ্জ করতে মক্কায় গিয়ে রুকনে ইয়ামানী ও মাকামে ইব্রাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে ইমাম মাহদী বলে ঘোষণা করে। পরে দেশে ফিরে সে শরীয়তের বহু বিধানকে বিকৃত করে।

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও প্রথম দিকে একজন ধর্ম প্রচারক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু পরবর্তীকালে ভক্তবৃন্দের আধিক্য তাকে অভিভূত করে এবং সে নিজেকে মুজাদ্দিদ বলে দাবী করে। ভক্তবৃন্দ এ দাবীও মেনে নিয়েছে দেখে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় এবং এক পর্যায়ে সে নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবী করে। অবশ্য শেষে সে নিজেকে নবী বলেও দাবী করেছিল; যার বিস্তারিত বিবরণ পরে আসছে।

*মিথ্যা মাহদী দাবীদারদের প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দ ঃ

এসকল মিথ্যা মাহদী দাবীদারদের মুখোশ উন্মোচনের জন্য উলামায়ে দেওবন্দ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। তাঁরা তাঁদের আত্মশক্তি দ্বারা অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, এসকল মাহদী দাবীদারদের কেউই প্রতিশ্রুত মাহদী নয়। সুতরাং তারা হাদীসে প্রতিশ্রুত মাহদীর যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং তাঁর আগমনের কাল সম্পর্কে এবং তাঁর আগমনের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসকল ঘটনাবলীর বিবরণ রয়েছে সেগুলোকে একত্রিত করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করে একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, হাদীসে বর্ণিত প্রতিশ্রুত মাহদীর সাথে দাবীদার মাহদীদের কোন মিল নেই। সুতরাং তারা যে মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তাছাড়া এসকল মিথ্যা মাহদী দাবীদাররা শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে যেসব আজগুবী ও বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা প্রদান করেছিল উলামায়ে দেওবন্দ তার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেন এবং সমাজের সামনে এসকল বিষয়ে শরীয়তের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা তুলে ধরেন এবং এসকল মিথ্যা মাহদী দাবীদারদেরকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট বলে ফতওয়া প্রদান করেন। বিস্তারিত জানার জন্য আহসানুল ফতওয়া ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

চ. কাদিয়ানী ফিৎনা ও তার মুকাবেলা

ইংরেজদের পরোক্ষ মদদে এদেশের ধর্মীয় অঙ্গনে যে সব ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, কাদিয়ানী ফিৎনা হল তার মাঝে অন্যতম। কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ঘোষণা যে, নবী মুহাম্মদ সা. ই সর্বশেষ নবী। তাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবে না। দলমত নির্বিশেষে বিগত চৌদ্দ শত বৎসর যাবৎ মুসলিম উম্মাহ এই আকীদাহ বিশ্বাসই পোষণ করে আসছে। মর্যাদা লোভী কেউ কেউ মিথ্যা নবুয়তের দাবী করলেও উম্মত সর্বসম্মতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ভারতের মাটিতে ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও নবুয়্যত দাবীর এই ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে।

গোলাম কাদিয়ানী ১২৫২ হিঃ মুতাবেক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে এবং ১৯০৯ সালে মারা যায়। পূর্ব থেকেই তার পরিবার ইংরেজদের তল্পীবহনের জন্য বিখ্যাত ছিল। গোলাম কাদিয়ানী ছিল অত্যন্ত মেধাবী ও প্রতিভাবান। লেখাপড়া সমাপ্ত করে সে পাঞ্জাবের এক অফিসে কেরানীর চাকুরী গ্রহণ করে। চাকুরী জীবনের প্রথম দিকে সে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে খ্যাত ছিল।

দেশে তখন ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে। আলেম উলামারা ইংরেজ বিরোধী এই আন্দোলনকে জিহাদ বলে ফতওয়া দিয়েছেন। ফলে সারা দেশের মানুষ ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনকে জিহাদের পবিত্র দায়িত্ব জ্ঞান করে মারমুখো হয়ে উঠে। ইংরেজেরা মুসলামনদেরকে অবদমিত করার জন্য যত পদক্ষেপই ইতিপূর্বে গ্রহণ করেছিল জিহাদের ফতওয়ার ফলে সবই ভেস্তে যেতে শুরু করল। আলেম উলামাদের এ ফতওয়াই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যদি কোন কৌশলে এ জিহাদী চেতনাকে দমন করা যেত তাহলে হয়ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হত- এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা এর জন্য কৌশল খুঁজতে থাকে। মুসলমানদের মাঝ থেকে কোন একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে যদি জিহাদ বিরোধী প্রচারণায় লাগিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে এই অদম্য আবেগ হয়ত কিছুটা স্তিমিত হয়ে যাবে, কমপক্ষে এ বিষয় নিয়ে তাদের মাঝে আত্মকলহ অবশ্যই বেঁধে যাবে। এতটুকু হলেও তাদের দৃষ্টি সেই আত্মকলহে নিবদ্ধ হয়ে পড়বে, আর ইংরেজরা তাদের রোষানল থেকে আপাততঃ রক্ষা পেয়ে যাবে- এই পরিকল্পনার আওতায় তারা লোক খুঁজতে থাকে। পাঞ্জাবের অফিস কেরানী গোলাম আহমদ ততদিনে ধর্মপ্রচারক হিসাবে মোটামুটি সুখ্যাতি কুড়াতে সক্ষম হয়েছিল। যেহেতু তার পরিবার পূর্ব থেকেই ইংরেজদের তাবেদার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, সুতরাং তাকেই তারা একাজের জন্য সমধিক উপযুক্ত বলে মনে করে। বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ইংরেজরা তাকে পূর্ণ মাত্রায় তাদের তাঁবেদারীতে নিয়োগ করে।

শরীয়তের স্বীকৃত কোন বিধান রহিত করার কোন অধিকার কারো নেই। সুতরাং জিহাদের এ বিধান রহিত করতে হলে কমপক্ষে সংস্কারের লেবেল লাগানো ছাড়া কোন উপায় নেই কিংবা নতুন নবীর আবির্ভাবের প্রয়োজন। সুতরাং গোলাম আহমদকে একজন সংস্কারক হিসাবে পরিচিত করে তোলার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা ইংরেজরা করে দিল। অজস্র বই-পুস্তক রচনা করে তার নামে ছাপিয়ে তাকে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত করে তোলার যাবতীয় প্রয়াস গ্রহণ করা হল। প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে বহু লোক তার ভক্তবৃন্দের কাতারে এসে শামিল হল। এক পর্যায়ে সে ইংরেজ শাসনকে ভারতীয়দের জন্যে নিয়ামত বলে প্রচারণা চালাতে থাকে। কিছু লোকজনকে তার এসব অপকর্মের সমর্থক হিসাবে দেখতে পেয়ে সে তার দাবীকে আরেকটু অগ্রসর করে নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবী করে। ভক্তবৃন্দের কাছে এসব দাবী গ্রহণীয় হচ্ছে দেখে সে আরেকটু বেড়ে

নিজেকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ বলে দাবী করে। প্রত্যেক নতুন দাবীর প্রেক্ষিতেই তাকে উলামায়ে হক্কের পক্ষ থেকে অজস্র প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। উলামায়ে হক তার দাবীর অসঙ্গতির বিষয়টি যুক্তি প্রমাণ দ্বারা তুলে ধরলে সে এসব প্রশ্ন এড়ানোর জন্য তার পূর্ব দাবী থেকে সরে গিয়ে আরেকটি নতুন দাবী করেছে। প্রতিশ্রুত মসীহ আসমান থেকে আগমন করবেন অথচ গোলাম কাদিয়ানী এসেছে মায়ের জঠর থেকে সুতরাং এটি কি করে সম্ভব হবে–এ প্রশ্ন এড়ানোর জন্যই সে এক পর্যায়ে নিজেকে ঝিল্লী নবী বা ছায়া নবী (অর্থাৎ নবীর ছায়া হিসেবে আবির্ভূত) বলে দাবী করে। কিন্তু এরূপ ঝিল্লী নবীর আবির্ভাবের কোন বর্ণনা কুরআন সুন্নায় নেই, সুতরাং এ প্রশ্ন এড়ানোর জন্য শেষ পর্যন্ত ১৯০১ সালে সে নিজেকে পূর্ণ নবী বলে দাবী করে এবং কুরআনের কতিপয় আয়াতের অর্থ বিকৃত করে তার আগমনের কথা কুরআনে উল্লেখ রয়েছে বলে দাবী করে। যেমন সুরায়ে আছ-ছাফ-এর-৬ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে "স্মরণ কর, সেই সময়ের কথা যখন মারিয়াম তনয় ঈসা আ. বললেন, হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের নিকট রাসূল হিসাবে আবির্ভূত হয়েছি। আমার পূর্বে যে তাওরাত গ্রন্থ রয়েছে আমি তার স্বীকৃতি প্রদানকারী, এবং আমি সুসংবাদ প্রদানকারী এমন একজন রাসূলের আবির্ভাব সম্পর্কে যে আমার পরে আসবে, যার নাম হবে আহমদ।' এই আয়াতে মূলতঃ ঈসা আ. এর ভাষ্যে নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. এর আগমনের সুসংবাদ বিবৃত হয়েছে। কেননা নবী সা. যমীনে যেমন মুহাম্মদ নামে পরিচিত ছিলেন তেমনি আসমানে তিনি আহমদ নামে পরিচিত। কিন্তু গোলাম আহমদ কাদিয়ানী দাবী করেছে যে, এই আয়াতে তার আগমনের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে যে সব আয়াত ও হাদীসে নবী সা. কে 'খাতামুন নাবিয়্যীন' বা সর্বশেষ নবী বলা হয়েছে সে সব আয়াত ও হাদীসে উল্লেখিত 'খাতাম' শব্দের অর্থ বিকৃত করে এ দ্বারা মোহরাংকিত নবী বা শ্রেষ্ঠ নবী বুঝানো হয়েছে বলে সে উল্লেখ করেছে। সে দাবী করেছে যে, তার নিকট বিভিন্ন ভাষায় ওয়াহী আসে এবং সে সব ওয়াহীতে জিহাদ রহিত করণসহ অন্যান্য বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য শামসুদ্দীন কাসেমী রাহ. প্রণীত 'কাদিয়ানী ধর্মমত' দ্রষ্টব্য) এছাড়াও দ্বীন ও শরীয়ত সম্পর্কে বহু মিথ্যা, আজগুবী ও উদ্ভট মন্তব্য সে করেছে।

*গোলাম আহমদের প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দ ঃ

বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রাহ., হযরত শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী রাহ., হযরত কাসেম নানুতুবী রাহ. প্রমুখ মনীষীগণ এধরনের একটি ফিৎনা যে আত্মপ্রকাশ করবে তা ইলহামের মাধ্যমে পূর্ব থেকেই অবগত হতে পেরেছিলেন।

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর আত্মপ্রকাশের পর তার বাড়াবাড়ি সম্পর্কে সর্ব প্রথম লুধিয়ানার আলেম উলামাদের দৃষ্টি পড়ে। তাঁরা তার লেখা বই পুস্তক ও বক্তব্য

বিচার বিশ্লেষণ করে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাকে কাফের বলে ফতওয়া দেয়। তার সম্পর্কে দারুল উলূম দেওবন্দে ফতওয়া তলব করা হলে দারুল উলূম থেকে এমর্মে ফতওয়া প্রদান করা হয় যে, যেহেতু বিষয়টি ব্যক্তি বিশেষকে কুফরীর ফতওয়া প্রদান সম্পর্কীয়, অতএব এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিত না হয়ে তাড়াহুড়া করা ঠিক হবে না। তাই প্রথম পর্যায়ে তাকে বদদ্বীন বলে আখ্যায়িত করা হয়। অতঃপর গোলাম আহমদ সম্পর্কে তাঁরা গভীর অনুসন্ধান চালাতে থাকেন। এক পর্যায়ে ১৩৩১ হিজরী সালে হযরত শায়খুল হিন্দ রাহ. এবং তদীয় শিষ্য আল্লামা কাশমিরী রাহ. সহ অন্যান্য আলেমগণ তাকে 'দ্বীনের গণ্ডি বহির্ভূত' বলে মতামত ব্যক্ত করেন। কিন্তু পরবর্তীতে গভীর তথ্যানুসন্ধানের পর তার ভণ্ডামী সম্পর্কে দেওবন্দের আলেমগণ সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিত হন এবং ১৩৩৬ হিঃ সালে দারুল উলূমের ইফতা বিভাগ থেকে সুনিশ্চিত মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, সে কাফের। দারুল উলূমের এ ফতওয়ার ফলে মানুষ সচেতন হয় এবং গোলাম কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন সারাদেশ ব্যাপী ছড়িয়ে পরে এবং মিথ্যা নবুয়্যতের দাবীদার গোলাম কাদিয়ানীর জঘন্য মিথ্যা ও প্রতারণা থেকে উম্মতকে সতর্ক করার জন্য জোর তৎপরতা চালানো হয়। কাদিয়ানী মতবাদের প্রচারকরা এটিকে মাযহাবী মতবিরোধের ন্যায় একটি বিরোধ বলে অপপ্রচার চালাতে থাকলে উলামায়ে দেওবন্দ গোলাম আহমদ রচিত পুস্তকাদির উদ্ধৃতিসহ অসংখ্য বই পুস্তক রচনা করে জাতির সামনে তার গোমরাহী ও মিথ্যাচারকে সুস্পষ্ট করে তুলেন। গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মিথ্যাচার, বিভ্রান্তি, মিথ্যা নবুয়্যতের দাবী ও খতমে নবুয়্যত বিষয়ে উলামায়ে দেওবন্দ রচিত পুস্তকাদির সংখ্যা প্রায় দু'শতের কাছাকাছি হবে। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত মাসিক আর-রশিদ পত্রিকায় আল্লামা লুধয়ানবী এ ধরনের প্রায় দেড়শত পুস্তকের নাম ও পরিচিতি তুলে ধরেন। ১৯২৫ সালে মির্জা বশীর নামে জনৈক কাদিয়ানী গোলাম আহমদের নবুয়্যতের সমর্থনে 'আল-ফযল' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করলে মাও. মুরতাজা হাসান দেওবন্দী তার জবাবে 'কাদিয়ানকে কিয়ামত খিজ্ ভূচাল' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করে তার দাবীর দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান করেন। হযরত মাও.আনওয়ার শাহ কাশমিরী রাহ. ও গোলাম কাদিয়ানীর কুফরী ও খতমে নবুয়্যতের উপর বহু আমূল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

মূলতঃ হযরত শায়খুল হিন্দ রাহ. সময়ের স্বল্পতার কারণে এবিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে না পারলেও তিনি তাঁর একনিষ্ঠ শিষ্যদেরকে এ ফিতনার মুকাবেলার জন্য বিশেষভাবে তাকিদ করে যান। তার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণীত হয়ে আল্লামা কাশমিরী, আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী, মুফতী কেফায়েত উল্লাহ, মাওঃ মুরতাযা হাসান প্রমুখ মনীষী এই জিহাদে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এসকল ব্যক্তিবর্গের মাঝে হযরত আনওয়ার শাহ কাশমীরী রাহ. কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনকে নিজ জীবনের অন্যতম সাধনা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নবী সা.-এর শাফা'আতের প্রত্যাশা

রাখে, সে যেন ভণ্ড কাদিয়ানী দ্বারা লাঞ্ছিত ইসলামের চিরন্তন বিশ্বাস আকীদায়ে খতমে নবুওয়াত-এর সংরক্ষণের কাজে এগিয়ে আসে। তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ শাগরেদদের মাঝে মাও. বদরে আলম মিরাঠী, মাও. মুরতাজা হাসান চাঁদপুরী, মাও. মানাজির আহসান গিলানী, মুফতী শফী, মাও. ইদ্রিস কান্ধলভী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে একাজে বিশেষভাবে নিয়োগ করে ছিলেন। তিনি তাঁর বিশিষ্ট শাগরেদ মাও. আতাউল্লাহ শাহ বোখারী ও তার প্রতিষ্ঠিত সংগঠন 'মজলিশে আহরার'কেও খতমে নবুওয়াতের কাজে নিয়োগ করেছিলেন এবং আতাউল্লাহ শাহকে এ আন্দোলনের জন্য আমীরে শরীয়ত নিযুক্ত করেছিলেন। তার নেতৃত্বে এ আন্দোলন যথেষ্ট গতিশীল হয়ে উঠে। এক পর্যায়ে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে শাহ বুখারী তাঁর কর্মীবৃন্দ থেকে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করতে শুরু করলে হযরত কাশমিরী নিজেও শাহ বুখারীর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে তাঁর নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেন। এভাবে সারাদেশে কাদিয়ানী বিরোধী তৎপরতা অব্যাহত থাকে। হযরত কাশমিরী রাহ. এর মৃত্যুর পর যথাক্রমে এ আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেন হযরত থানভী রাহ., আব্দুল কাদের রায়পুরী রাহ., হযরত ইউসুফ বিন্নৌরী রাহ. ও আব্দুল্লাহ দরখাস্তী রাহ.।

বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের অপতৎপরতা ও তাদের প্রচার কৌশল ঃ

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় গুটি কতক কাদিয়ানী ছিল মাত্র। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে দায়িত্বরত কতিপয় কাদিয়ানী কর্মকর্তার পৃষ্ঠপোষকতায় তারা যথেষ্ট আগে বেড়ে যায়। আইয়ূব খানের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দৌহিত্র জনাব এম.এম আহমদের মাধ্যমে তারা পঞ্চগড়ে প্রায় দু'শ একর জমি বরাদ্দ লাভ করে এবং সেখানে তাদের একটি বৃহৎ কেন্দ্র গড়ে তোলে। অপর একজন কর্মকর্তার সহযোগিতায় চুয়াডাঙ্গায়ও তারা বিশাল এলাকা নিয়ে বিরাট কেন্দ্র গড়ে তুলে। বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চেয়েও সেখানে কাদিয়ানীদের তৎপরতা বলিষ্ঠ। রাজধানীতে বকশী বাজার ছাড়াও তাদের বেশ কয়েকটি কেন্দ্র রয়েছে। মীরপুর দুই নম্বর ও ছয় নম্বর সেকশানে, কল্যাণপুরে ও বাড্ডায় তাদের আস্তানা রয়েছে। এছাড়াও বেশ কয়েকটি স্থানে তাদের কেন্দ্র ও বসতি গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে তাদের পরিকল্পনা হল প্রতিটি জিলা, উপজিলা ও বড় বড় বাণিজ্যিক কেন্দ্রস্থলে জমি ক্রয় করে একটি করে কেন্দ্র গড়ে তোলা। ইতিমধ্যেই তাদের এই পরিকল্পনা অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে। তাদের প্রকাশিত আহমদী শত বার্ষিকীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সারা বাংলাদেশে তাদের মোট ৯৩টি কেন্দ্র রয়েছে, ১৯৯০ সালের মে মাসের এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, সে সময় পর্যন্ত তাদের কেন্দ্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১১০টিতে পৌঁছে গেছে। বর্তমান পর্যন্ত হয়তবা তাদের কেন্দ্র দেড় শত ছাড়িয়ে গেছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হলে তারা লন্ডনে গিয়ে তাদের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করে। ইসলাম বিরোধী সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো

তাদের মদদ দিয়ে যাচ্ছে। তাদের পিছনে সাম্রাজ্যবাদীরা ব্যয় করছে কোটি কোটি ডলার।

বর্তমানে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করে তাদের সকল তৎপরতা বন্ধ করে দেওয়া হলে বাংলাদেশকেই তারা তাদের প্রচারাভিযানের উর্বর ক্ষেত্র হিসাবে ধরে নিয়েছে। দারিদ্র পীড়িত এদেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করে বিভ্রান্ত করার জন্য বিদেশী প্রভুদের থেকে আনা কোটি কোটি ডলার তারা ব্যয় করে যাচ্ছে। বন্যা, খরা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকা সমূহে এসব অর্থ ব্যয় করে ধর্মচ্যুত করছে হাজার হাজার মানুষকে। চাকুরী ও ব্যবসায়িক সুযোগ সুবিধার প্রলোভন দিয়েও কিনে নিচ্ছে বহু মানুষের ঈমান।

বাংলাদেশের মানুষ এমনিতে ধর্মপ্রাণ হলেও ধর্ম সম্পর্কে তাদের জানাশুনা খুবই কম। অধিকাংশ আধুনিক শিক্ষিতরা ধর্ম সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানটুকুও রাখে না। এধরনের আধুনিক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষকেই তারা বিভ্রান্ত করছে বেশী।

মুসলমানের ছদ্মাবরণে তারা প্রথমে মানুষের কাছে যায়, এবং নিজেদেরকে আহমদী জামাতের মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। আর আহমদী জামাতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তারা বলে, আধ্যাত্ম ধারায় যেমন মতভিন্নতা রয়েছে – কাদরিয়্যাহ, চিশতিয়্যাহ্, মুজাদ্দেদিয়্যাহ ও নকশবন্দিয়্যাহ ইত্যাদি, তেমনি আহমদী জামাতও একটি ভিন্ন আধ্যাত্মিক তরীকাহ্। এভাবে তাদের বই পুস্তক ও প্রচারপত্র বিতরণ করে এবং কথার ফুলঝুড়ি উড়িয়ে মানুষকে মনস্তাত্বিকভাবে প্রভাবিত করে ফেলে। প্রাথমিক পর্যায়ে তারা গোলাম আহমদের সেই যুগের লেখা বই পুস্তক সরবরাহ করে যা সে মুজাদ্দিদ দাবী করার কালে প্রকাশ করেছিল এবং গোলাম আহমদকে একজন মুজাদ্দিদ হিসাবে সেই ব্যক্তির নিকট পরিচিত করে তোলে। এভাবে যখন সেই ব্যক্তি প্রভাবিত হয়ে আহমদী জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তখন ক্রমান্বয়ে তার সামনে নবী হিসাবে গোলাম আহমদকে তুলে ধরে। মানসিকভাবে প্রভাবিত সে লোকটির যেহেতু ধর্মীয় আকীদাহ–বিশ্বাস সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকে না, অতএব তারা ক্রমান্বয়ে যেভাবে তাকে বুঝাতে থাকে সেভাবেই সে বুঝতে থাকে। এভাবে শ্লোপয়জনিংয়ের প্রক্রিয়ায় তারা হাজার হাজার মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। মানুষ যাতে তাদের এই বিভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হতে না পারে সেজন্য তারা তাদের বই পুস্তকের গায়ে বড় হরফে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' লিখে রাখে, এমনকি তারা তাদের কেন্দ্রে ব্যবহৃত সাইন বোর্ডের গায়েও 'আহমদী মুসলিম জামাত' লিখে রাখে। যাতে মানুষ তাদের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে বুঝতে না পারে। বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাদের বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে।

১. **মজলিশে আনসারুল্লাহ্ ঃ** চল্লিশোর্ধ বয়সের ব্যক্তিরা এর সদস্য হয়ে থাকে। ব্যাবসায়ী, চাকুরীজীবি, শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও উচ্চ

পর্যায়ের আমলাদের পিছনে কাজ করে এই সংগঠন।

২. মজলিশে খুদ্দামে আহমদী ঃ ১৬ থেকে নিয়ে ৪০ বৎসর বয়সের ব্যক্তিরা এর সদস্য হয়। যুব সমাজ ও বেকার যুবকদের পিছনে কাজ করে থাকে এই দল। চাকুরী দান, বিদেশে প্রেরণ, ছাত্রদেরকে শিক্ষার জন্য অনুদান ইত্যাদির প্রলোভন দিয়ে কার্য সিদ্ধি করা হল এদের মূল কাজ।

৩. মজলিশে আতফালে আহমদী ঃ ১৫ বৎসরের নিচের বয়সের শিশু–কিশোরদের মাঝে এ সংগঠন কাজ করে থাকে।

৪. লাজনাতু আমাইল্লাহ ঃ ১৫ বৎসরের উর্ধ্ব বয়সের মহিলাদের মাঝে কাজ করে এ সংগঠন।

৫. নাসেরাত ঃ ১৫ বৎসরের কম বয়সের মেয়েরা এর সদস্য হয়। শিশু ও কিশোরীদের মাঝে কাজ করে এ সংগঠন।

এভাবে বাংলাদেশে তারা অত্যন্ত সংগঠিত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের প্রচারণার শিকার হয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। যেখানে ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে কাদিয়ানীর সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগন্য। সেখানে বর্তমানে তাদের সংখ্যা লক্ষাধিক প্রায়। এই সংখ্যাধিক্য উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এক মারাত্মক অশনি সংকেত নিঃসন্দেহে। বাংলাদেশে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা না করার সুযোগ নিয়ে তারা ব্যাপক হারে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ঈমান হারা করছে। এ দায়ভার কে বহন করবে?

বাংলাদেশে কাদিয়ানী বিরোধী তৎপরতা ঃ

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, পশ্চিম পাকিস্তানে যখন কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেও এর প্রভাব পড়ে। ভারত, পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানে কাদিয়ানী বিরোধী তৎপরতা সমানভাবে চলতে থাকে।

সত্তুরের নির্বাচনে আওয়ামীলীগ নির্বাচিত হলে জমিয়ত নেতা মুফতী মাহমুদ ও গোলাম গাউছ হাজারভী শেখ মুজিবের সাথে মত বিনিময় করতে ঢাকায় আসেন। এক প্রসঙ্গে কাদিয়ানীদের সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেছিলেন, "এ ব্যাপারে আমি পূর্ণ সজাগ রয়েছি, এক্ষেত্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ারদী আমাদের জন্য যে আদর্শ রেখে গেছেন তা আমি কখনও ভুলব না। সে আন্দোলনে আমরাও আপনাদের সঙ্গে শরীক ছিলাম বলে মনে করতে পারেন"।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীনতা উত্তর নাজুক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে এ আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম অরাজনৈতিক কর্মতৎপরতার আওতায় কাদিয়ানী বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতৃত্বে কাদিয়ানী বিরোধী তৎপরতা অব্যাহত ভাবে চলতে ছিল। যদিও দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল ধর্মপ্রাণ মানুষই এ আন্দোলনের সমর্থনে কাজ করেছে। কিন্তু জমিয়ত যখন

থেকে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা শুরু করে তখন থেকে খতমে নবুয়্যত আন্দোলন দলগত প্রশ্নের শিকার হয়।

একারনে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ এই পবিত্র আন্দোলনকে দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে রেখে এটিকে একটি জাতীয় আন্দোলন হিসাবে দুর্বার ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালের ২রা ও ৩রা মার্চ আরজাবাদ মাদ্রাসায় হযরত মাও. শামসুদ্দীন কাসেমীর সভাপতিত্বে দুইদিন ব্যাপী খতমে নবুয়্যত মহা সম্মেলন আহবান করে। এই সম্মেলনে দেশের সকল রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠন ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দকে আহবান জানানো হয়। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিত্বকারী সহস্রাধিক উলামায়ে কিরাম ও সুধীবৃন্দের উপস্থিতিতে এমর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, খতমে নবুয়্যত আন্দোলনকে গণমুখী করার লক্ষ্যে এ কাজের জন্য একটি পৃথক অরাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা হউক। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ১৯৮৯ইং সালের ২৬শে অক্টোবর দেশের গণ্যমান্য উলামায়ে কিরাম ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে "খতমে নবুওয়্যাত আন্দোলন পরিষদ বাংলাদেশ" নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয় এবং মাওঃ শামসুদ্দিন কাসেমী রাহ. কে সভাপতি ও মুফতী নূরুল্লাহ রাহ. কে সাধারণ সম্পাদক করে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। এরপর থেকে আবার নবউদ্যমে সারাদেশে আন্দোলনী তৎপরতা শুরু হয়ে যায় এবং মাত্র চার মাসের ব্যবধানে দেশের প্রায় ৫০টি জিলায় এ আন্দোলনের জিলা সংগঠন গড়ে উঠে। উলামাগণ এ ব্যাপারে স্বতস্ফূর্ত সাড়া দেন। ফলে সারা দেশে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে গণজোয়ার সৃষ্টি হতে থাকে এবং মানুষের মাঝে কাদিয়ানীদের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্যাপক হারে মিটিং মিছিল চলতে থাকে এবং এ সংগঠনের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় জলসার নামে কাদিয়ানীদের অপতৎপরতা সম্পর্কে গণ সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। অদ্যবধি এ তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। গত বি.এন.পি সরকারের আমলে এ আন্দোলন গণজোয়ারে পরিণত হয়। সর্বদলীয় আলেম উলামাদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত মানিক মিয়া এভিনিউয়ের বিশাল জনসমাবেশ থেকে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার জোর দাবী জানানো হয়। কিন্তু জানিনা কোন অজানা কারণে পৃথিবীর সব মুসলিম দেশে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা সত্ত্বেও বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন শক্তি কেন কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার ব্যাপারে গরিমসি করছে। মনে হয় আমাদেরকে তৎপরতা আরো বলিষ্ঠ করতে হবে এবং প্রয়োজনে ১৯৫৩ সালের ন্যায় শাহাদতের রক্ত দিয়ে আন্দোলনকে সফল করার জন্য একটি চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সারওয়ারে কায়েনাতের খতমে নবুয়্যতের আকীদার হিফাযতের জন্য শাহাদতের অমীয় সূধা পানের নিমিত্তে মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। রাসূল সা. এর উম্মত হিসাবে এদেশের তাওহিদী জনতা এ আন্দোলন সফল করার জন্য যে কোন ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত রয়েছে। সরকার যদি চায় যে, দেশ একটি চরম মারমুখী পরিস্থিতির দিকে চলে যাক, তাহলে আমাদের করার কিছুই থাকবে না। কারণ আমাদের কাছে ঈমানের দাবীর মূল্য সব কিছুর চেয়ে বড়। আল্লাহ আমাদের আন্দোলনকে সফল করুন।

ছ. বিদ'আতীদের ফিতনা ও তার প্রতিরোধ

বিদ'আত কি ঃ আল্লামা শাতবী উল্লেখ করেছেন যে, বিদ'আত হল, সাওয়াবের প্রত্যাশায় ইবাদত কিংবা ইবাদতের পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে নবী কারীম সা., সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও আইম্মায়ে মুজতাহেদীনের পরবর্তী যুগে এসে এমন নতুন কিছুর উদ্ভাবন করা, যার কোন প্রমাণ কুরআন, সুন্নায় কিংবা সাহাবীগণের কথায়, কাজে, ইশারায়, ইঙ্গিতে সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন ভাবেই বিদ্যমান নেই, অথচ সেই বিষয়গুলো এমন যার কার্যকারণ ও প্রয়োজন সে-যুগেও বর্তমানের ন্যায় বিদ্যমান ছিল।

এই সংজ্ঞা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইবাদত সংক্রান্ত নয় এবং সাওয়াবের প্রত্যাশায় করা হয় না এমন সব নবসৃষ্ট বিষয়কে বিদ'আত বলা হবে না। সুতরাং জীবনের স্বাচ্ছন্দ লাভের জন্য কিংবা জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ যে সকল নতুন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে তা বিদ'আত বলে আখ্যায়িত হবে না। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা উদ্ভাবিত এসকল বস্তুর ব্যবহার বৈধ হবে কিনা তা নির্ভর করবে তার ব্যবহার পদ্ধতি ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যের উপর। পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য যদি শরীয়তের পরিপন্থী হয় তবে তার ব্যবহার বৈধ হবে না, অন্যথায় তার ব্যবহারে কোন অসুবিধা নেই।

অনুরূপভাবে নবসৃষ্ট বিষয়ের কোন প্রমাণ কুরআন-সুন্নায় কিংবা সাহাবীগণের কথায়, কাজে কিংবা অনুমোদনে, সুস্পষ্ট ভাবে অথবা ইশারায় ইঙ্গিতেও যদি বিদ্যমান থাকে তাহলেও তা বিদ'আত বলে গণ্য হবে না।

আর যে সব বিষয়ের প্রয়োজন নবী ও সাহাবীগণের যুগে ছিল না, পরবর্তীকালে অবস্থার প্রেক্ষিতে তার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং সেই প্রয়োজন পূরণার্থে যে সব বিষয় উদ্ভাবন করা হয়েছে সেগুলোও বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

বিদ'আত কেন ও কিভাবে সৃষ্টি হয় ঃ বিদ'আত সমাজদেহে প্রবেশ করে অতি সঙ্গোপনে এবং পবিত্রতার সূক্ষ্মাবরণে। বিদ'আত সৃষ্টির পিছনে মৌলিকভাবে কাজ করে শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা। শরীয়ত সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান নেই এ ধরনের ব্যক্তিদের অতিআবেগ থেকেই অধিকাংশ বিদ'আতের সূচনা হতে দেখা যায়। ইমাম মালিক বড় সুন্দর বলেছেন যে, "যারা ইলম অর্জন করে অথচ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভে ব্রতী হয় না তারা সাধারণত যিনদীক হয়ে থাকে, আর যারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করে অথচ তাদের ইলম থাকে না তারাই মূলতঃ বিদ'আতের জন্ম দিয়ে থাকে"। আবার জ্ঞান স্বল্পতার কারণে শরীয়তের ভুল ব্যাখ্যা থেকেও অনেক সময় বিদ'আতের সূচনা হয়। মূলতঃ এর পিছনেও কাজ করে শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অসচেতনতা। অনেক সময় ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অতিভক্তি ও অন্ধ ভালবাসার কারণে তার ব্যক্তিগত আচার আচরণকে ভক্তরা শরীয়ত মনে করে গ্রহণ করে, ফলে এ থেকেও বিদ'আত সৃষ্টি হয়। আবার অনেক সময় প্রবৃত্তির পূজারী ব্যক্তিরা নতুন কিছুর প্রবর্তণ করে

সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ সুনাম সুখ্যাতি ও অর্থ-সম্পদ উপার্জনের প্রত্যাশায়ও বিদ'আতের জন্ম দিয়ে থাকে।

বিদ'আত যে ভাবেই সৃষ্টি হউক না কেন তা দ্বীনের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। কেননা বিদ'আত মানেই নতুন কিছু, আর নতুনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ অনেকটা স্বভাবজাত। একারণে নবসৃষ্ট বিষয়সমূহের প্রতি মানুষ দারুনভাবে ঝুঁকে পড়ে এবং অতি উৎসাহের সঙ্গে তা গ্রহণ করে। নতুনকে গ্রহণ করতে গিয়ে অবচেতন মনেই পুরাতন কে বর্জন করে। নতুনের চাপ যত বাড়ে পুরাতন তত বেশী বর্জিত হয়। এই গ্রহণ বর্জনের ক্ষেত্রে যা বর্জন করা হল তার গুরুত্ব কতটুকু ছিল, আর যা গ্রহণ করা হয় তার গুরুত্ব কতটুকু তা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার যোগ্যতা ও অবকাশ সকলের থাকে না বা থাকলেও নতুনের প্রতি মনের টানের কারনে বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজনই মনে করে না। এর ফলে দ্বীনের বহু মৌলিক বিষয়াশয় বর্জিত হয়, আর নবউদ্ভূত ভিত্তিহীন অহেতুক বিষয়গুলো তার স্থান দখল করে নেয়। ক্রমে দ্বীন তার প্রকৃত রূপ থেকে সরে এসে এই সব ভিত্তিহীন বিষয়ের উপর ভিত্তিশীল হয়ে পড়ে- যা মূলত দ্বীন নয়। এই বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করেই ইমাম মালিক রা. বলেছেন, "যখনই যেথায় কোন বিদ'আতের প্রচলন ঘটে তখনই সেখান থেকে একটি সুন্নত মিটে যায়"। সম্ভবত একারণেই রাসূল সা. অনুকরণ প্রিয়তাকে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন, তিনি বলেছেন - যে অন্য সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে সে সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

বিদ'আত বাহ্যত যত সুন্দরই হউকনা কেন তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। কারণ বিদ'আতের কারণে মানুষ মৌলিক দ্বীন থেকে সরে যায়। এ কারণেই রাসূল সা. নবসৃষ্ট সকল বিষয় থেকেই উম্মতকে সতর্ক করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, সকল নবসৃষ্ট বিষয়ই বিদ'আত, আর প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা. আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতার পরিণতি হল জাহান্নাম।

অনেকেই মনে করেন যে, সব বিদ'আতই দোষণীয় নয়। অনেক বিদ'আত উত্তম ও কল্যাণকর হয়ে থাকে। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসের আলোকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে বিদ'আত যে রূপই হউক না কেন এবং বাহ্যত যত সুন্দরই মনে হউক না কেন এর পরিণাম পথভ্রষ্টতা।

বিদ'আত সৃষ্টির যে কারণগুলো আমরা উল্লেখ করেছি তা প্রত্যেক যুগেই বিদ্যমান থাকে; তাই প্রতি যুগেই নতুন নতুন বিদ'আতের জন্ম হতে থাকে। যে কারণে সর্ব যুগের উলামায়ে কিরামকে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়। তারপরও কালক্রমে দ্বীনের মধ্যে যে সব বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটে যায়, যুগে যুগে মুজাদ্দিদগণ এসে মূল দ্বীনে অনুপ্রবিষ্ট এই সব বিদ'আতসমূহকে সংস্কার করে দ্বীনের মূল রূপ আবার উম্মতের সামনে তুলে ধরেন।

ভারত বর্ষে বিদ'আত ঃ

ইসলাম আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে পৌত্তলিক ধর্ম ও তাদের রীতি-নীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তাবেয়ীনদের যুগে ইসলাম যখন পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে তখন ভারতেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে। কিন্তু ইসলামী দাওয়াতের সাথে সাথে ইলমে নববী তথা ইসলামী শরীয়তের যথাযথ জ্ঞানের সম্প্রসারণ না ঘটার কারণে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলেও দ্বীনের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি লাভ করতে পারেনি। ফলে পূর্ব-ধর্মের রুসুম ও রেওয়াজ থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হয়নি সমাজ। তাই মুসলমানদের জীবন ধারায় পূর্ব ধর্মের রুসুমাতের প্রভাব বিদ্যমান থেকে যায়। এভাবে ইসলামের সঙ্গে প্রাচীন কুসংস্কারসমূহ একাকার হয়ে চলতে থাকে। পর্যাপ্ত ইলমের অভাবে সাধারণ মানুষ কোনটি ইসলাম আর কোনটি কুসংস্কার তার মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম ছিল না। অবস্থা এমন নাজুক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, যে সকল পীর বুজুর্গরা মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করে শিরক ও কুফুরের অন্ধকার থেকে এবং অর্থহীন কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার জন্য আমরণ চেষ্টা ও সাধনা ব্যয় করে গেছেন, তাদের কবরকে কেন্দ্র করে পুরাতন সুপ্ত শিরক ও বিদ'আতের চেতনাগুলো নুতন রূপে বিকশিত হতে শুরু করে। মূর্তী পূজার পরিবর্তে এবার শুরু হয় কবর পূজা ও পীর পূজার নতুন ধারা। মূর্তীকে সিজদা করার ন্যায় সিজদা করা হয় পীর মাশায়েখদের কবরকে। মূর্তীর কছে সাহায্য চাওয়া ও সমস্যা দূরীকরনের প্রার্থনার ন্যায় শুরু হয় মাযারে গিয়ে সাহায্য চাওয়া ও কবরের কাছে সমস্যা দূরীকরণের প্রার্থনা। এভাবে ইসলামের নামে এই উপমহাদেশে শুরু হয় নতুন ধাঁচের এক শিরকী প্রথা ও নানা ধরনের বিদ'আত ও কুসংস্কার। সাধারণ মানুষ থেকে নিয়ে রাজদরবার পর্যন্ত এই সব শিরকী প্রথা ও কুসংস্কার ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কথিত আছে যে, মোঘল সম্রাটদের দরবারে সাম্রাটকে সিজদা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই সব শিরকী প্রথা ও কুসংস্কার সমাজের মানুষের মনে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, এসব প্রথাকে মানুষ ইসলাম সমর্থিত বলে মনে করত এবং এর বিরোধীতাকে ইসলামের বিরোধীতা বলে মনে করা হত। তদানিন্তন কালের ভারতের অবস্থা ব্যক্ত করতে গিয়ে মুজাদ্দিদে আলফে সানী উল্লেখ করেছেন যে, গোটা সাম্রাজ্য তখন বিদ'আতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। বিদ'আতের বিরুদ্ধে কথা বলার মত তখন কোন সাহসী পুরুষ বিদ্যমান ছিল না। আলেম যারা ছিলেন তাদের অধিকাংশ ছিলেন ভীত সন্ত্রস্ত, আর অনেকেই ছিলেন এ সকল বিদ'আতের প্রবর্তক ও প্রচারক কিংবা সমর্থক।

তখন ইসলামের মৌলিক বিধান–নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির প্রতি মানুষের উদাসীনতা ছিল সীমাহীন। অপর পক্ষে মাযারে গমনাগমন, ওরশে অংশগ্রহণ, মাযারে সিজদা করা, মাযারের নামে মান্নত মানসিক করা, নজর–নেওয়াজ পেশ করা, কাওয়ালী ও শ্যামা সংগীত গাওয়া ও এর আয়োজন করাকে ইসলাম বলে মনে করা হত। মানুষের এই অজ্ঞতার সুযোগকে কাজে

লাগিয়ে এক শ্রেণী অর্থ লিপ্সু মানুষ পীর বজুর্গদের মাযার নিয়ে ধর্ম ব্যবসায় মেতে উঠে এবং ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে মানুষের ঈমান–আক্বীদাহ ও অর্থ সম্পদ লুট করতে প্রবৃত্ত হয়। এরাই মূলতঃ বিদ'আত ও কুসংস্কারকে লালন করে এবং নবতর পন্থায় মানুষের টাকা কড়ি হাতিয়ে নেয়ার জন্য নতুন নতুন কুসংস্কারের জন্ম দেয়। কোন ব্যক্তি মারা গেলে তৃতীয় তারিখে ও দশম তারিখে কুরআন খানী, ফাতেহা খানী, চল্লিশা পালন ইত্যাদি কুসংস্কার মূলতঃ এসকল মাযার ব্যবসায়ী ও তাবীজ কবজের পেশাদারী বেশরা পীর ফকিরদের হাতেই জন্ম লাভ করে।

হক্কানী আলেম উলামারা সব সময়ই এসকল কুসংস্কার ও রুসুমাতের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। যে কারণে এ সকল ধর্ম ব্যবসায়ীরা সবসময় হক্কানী আলেম উলামাদের বিরুদ্ধে ভীষণ ক্ষেপা ছিল।

আহমদ রেজাখানের তৎপরতা ঃ

উলামায়ে হক্কানী যখন ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে আপোষহীন সংগ্রামে রত, তখন সাম্রাজ্যবাদীরা এই বিদ'আতী শ্রেণীকে তাদের স্বপক্ষে টেনে নেয়। তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে উলামায়ে হক্কানীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় ধন্য এদেশীয় ব্যক্তিবর্গের মাঝে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পর বিদ'আতীদের বিশিষ্ট নেতা মাওঃ আহমদ রেজাখান ছিল অন্যতম।

বহু বিদ'আতের উদ্ভাবনকারী এই লোকটি রায়বেরলীতে জন্মগ্রহণ করে। এদেশের গণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়া ইংরেজ বিরোধী জিহাদী চেতনাকে অবদমিত করার জন্য ইংরেজরা যেসব ব্যক্তিবর্গকে জিহাদের বিধান রহিত বলে অপপ্রচার চালানোর জন্য ভাড়াটে হিসাবে নিয়োগ করেছিল, আহমদ রেজা খান ছিল তাদের অন্যতম। তবে সে গোলাম আহমদের মত জিহাদের বিধান রহিত করার জন্য নিজেকে নবী হিসাবে দাবী না করে অন্যপন্থা অবলম্বন করেছিল। প্রথম দিকে সে একজন আশেকে রাসূল এবং আধ্যাত্মিক রাহবার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে এবং আশেকে রাসূল হিসাবে নিজেকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করার জন্য মিলাদ ও কিয়ামের বিশেষ প্রথার প্রচলন করে। নবী প্রেমের কিছু কবিতা ও না'ত সে রচনা করে সাধারণ্যে প্রচার করতে থাকে। ইংরেজরা তাদের স্বার্থেই এ ভণ্ড লোকটিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভি-ন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকে। ফলে সেই নিমক হালালীর জন্য ইংরেজদের জন্য সহায়ক এমন কোন অপকর্ম নেই যা সে আঞ্জাম দেয়নি।

উলামায়ে হক যখন ইংরেজ বিতাড়নের সংগ্রামকে জিহাদ বলে ফতওয়া দিয়ে ভারতকে 'দারুল হরব' ঘোষণা দিয়েছেন তখন এই লোকটি ইংরেজদের নিমক হালালীর জন্য সর্ববাদী উলামায়ে কিরামের বিপরীতে এদেশকে "দারুল ইসলাম" বলে ফতওয়া দেয় এবং সে জোর গলায় প্রচার করতে থাকে যে, ইংরেজ শাস-নাধীন অঞ্চলে মুসলমানদের ধর্মকর্ম পালনে যেহেতু কোন বাধা নেই, অতএব এই প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সম্পূর্ণ রূপে হারাম। উপরন্তু সে তার

স্বরচিত ফতওয়ায় কুরআন হাদীসের কতিপয় উদ্ধৃতি (তার নিজস্ব ব্যখ্যার আলোকে) পেশ করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে যে, ইংরেজ শাসনাধীন এলাকাকে যারা "দারুল হরব" বলে ঘোষণা করে জনগণকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে তাদের ফতওয়া শুদ্ধ নয়। তার এই ফতওয়া "এ লামুল আনাম" নামে পুস্তকাকারে ছাপিয়ে সারাদেশে বিতরণ করা হয়। কিন্তু দেশের স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী আলেম সমাজ ও মুক্তিপাগল জনসাধারণ তার এ ফতওয়ার প্রতি মোটেই কর্ণপাত করেনি। তুরুপের তাশ ফসকে গেল দেখে সে অন্য পন্থা অবলম্বন করে। স্বাধীনতাকামী মানুষের পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন যেসব সংগ্রামী আলেম উলামাগণ, তাদেরকে গণ-মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা এবং তাদের প্রতি মানুষের আস্থাকে বিনষ্ট করে দিয়ে জিহাদের এই পাগলপারা আবেগকে দমন করার নয়া অস্ত্র প্রয়োগ করে। রাসূল-প্রেমের নামে নতুন নতুন বিদ'আত প্রবর্তন করে মুসলমানদেরকে তাতে লিপ্ত রেখে জিহাদ থেকে বিমুখ করে রাখার হীন উদ্যোগ গ্রহণ করে। আর যারাই তার এসব বিদ'আতের অনুসরণ করেনি তাদেরকেই কাফের বলে প্রচারণা চালাতে থাকে। উলামায়ে হক্কানী যেহেতু কুসংস্কারের বেড়া জাল থেকে মুক্ত করে প্রকৃত ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই সংগ্রাম করেছিলেন সুতরাং তাদের এসকল বিদ'আতকে সমর্থন করার প্রশ্নই আসে না। তারা বরং এসব কুসংস্কারের মুকাবেলা করেন বলিষ্ঠভাবে।

অতএব সে এইসব সংগ্রামী আলেমদেরকে কাফের বলে ফতওয়া প্রদান করে। কিন্তু তার যে ব্যক্তিত্ব ছিল তাতে মানুষ যে তার ফতওয়া গ্রহণ করবে না তা সে ভালভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। অতএব নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তির দ্বারা ফতওয়া দেওয়াতে পারলে তা সহজেই মানুষ গ্রহণ করবে এ চিন্তার ভিত্তিতেই সে মক্কা মদীনার ইমাম তথাকার আলেম উলামাদের দ্বারা এদেরকে কাফির বলে ফতওয়া দেওয়ানোর চেষ্টা তদবীরের জন্য সেথায় গমন করে এবং এসকল সংগ্রামী আলেম উলামাদের কতিপয় বক্তব্যকে কাট ছাঁট করে পরিবর্তন করে তাদের নাম ধাম উল্লেখ না করে সেখানকার আলেম উলামাদের কাছে তা পেশ করে। মক্কা মদীনার আলেমগণ তার পেশকৃত বক্তব্যের আলোকে এহেন বক্তব্য প্রদানকারীকে কাফের বলে ফতওয়া প্রদান করেন। হযরত হোসাইন আহমদ মদনী রাহ. তখন মদীনায় অবস্থান করতেন। তিনি আহমদ রেজা খানের এহেন ধূর্তামোর কথা জানতে পেরে তথাকার আলেম উলামাদের সামনে প্রকৃত বিষয়টি তুলে ধরলে তারা আহমদ রেজা খানের প্রতারণার কথা বুঝতে পারেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে সেখান থেকে পালিয়ে আসে। সুতরাং তাঁরা আহমদ রেজা খানের ধূর্তামোর বিষয়টি তুলে ধরার জন্য 'গায়াতুল মামুল' নামক একটি পুস্তক প্রকাশ করে এ বিভ্রান্তির অপনোদন করতঃ আহমদ রেজা খানের প্রতারণার কথা প্রকাশ করে দেন।

কিন্তু আহমদ রেজা খান এই ফতওয়া নিয়ে ভারতবর্ষে এসে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করে সংগ্রামী উলামায়ে কিরামের প্রভাব ক্ষুন্ন করতঃ স্বাধীনতা আন্দোলনকে

নস্যাৎ করার চেষ্টা করে। তাঁর অনুসারীরা এক্ষেত্রে এতটাই বেড়ে যায় যে, তাদের কুসংস্কারের সমর্থক গোষ্ঠী ছাড়া অন্য সব আলেম উলামা ও তাদের অনুসারীদেরকে ঢালাও ভাবে কাফের ও রাসূল বিদ্বেষী বলে অপপ্রচার করতে সামান্য কুণ্ঠাবোধও করে না। এখনও এ ফিতনা আমাদের দেশে বিদ্যমান রয়েছে। মিলাদ কিয়াম ইত্যাদির মাধ্যমে নবী প্রেমের সস্তা বুলি আওড়িয়ে সাধারণ মানুষকে তারা বিভ্রান্ত করে চলেছে। এদলটি বর্তমানে বহু জঘন্য বিশ্বাসে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এরা রাসূল গায়েব জানেন এবং আল্লাহ যেমন সর্বত্র বিরাজ করেন রাসূলও তেমনি সর্বত্র বিরাজ করেন বলে বিশ্বাস করে। তাছাড়া এরা রাসূলকে মানুষ বলে মনে করে না বরং নূরানী এক সত্তা বলে বিশ্বাস করে, এবং সে নূর আল্লাহর খণ্ডিত নূর বলে দাবী করে। এদের কেউ কেউ আল্লাহ ও রাসূলকে এক ও অভিন্ন সত্তা বলেও বিশ্বাস করে।

সংগ্রামী আলেম উলামাদের প্রভাবকে ক্ষুন্ন করার জন্য এদলটি ইংরেজদের প্ররোচনায় তাদের শিখানো বুলি হিসাবে সংগ্রামী উলামায়ে কিরামকে ওয়াহাবী হওয়ার মিথ্যা অপবাদও আরোপ করেন।

ওয়াহাবী অপবাদের নেপথ্য কাহিনী ঃ

ওয়াহাবী শব্দটি মূলতঃ ইংরেজ ঐতিহাসিকদের উদ্ভাবিত একটি শব্দ। এ শব্দটি দ্বারা তারা মূলতঃ আঠার শতকের মধ্যভাগে জাজিরাতুল আরবে সৃষ্ট একটি আন্দোলনের অনুসারীদেরকে বুঝিয়ে থাকে যে আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব।

'১৭০৩ সালে নজদের অন্তর্গত উয়ায়না অঞ্চলে এই সংগ্রামী সংস্কারক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আরব উপদ্বীপ তখন নানা ধরনের কুসংস্কারে ছেয়ে গিয়েছিল। শিরক বিদ'আত বিভিন্ন ধরনের অনৈসলামিক রুসুমাত, কবর পূজা, পীরকে সিজদা করা, কবর ও মাযারের নামে মান্নত-মানসিক করা ইত্যাদি নানা ধরনের কুসংস্কার ধর্মের নামে প্রচলিত ছিল সে অঞ্চলে।

কুরআন সুন্নাহর প্রকৃষ্ট জ্ঞান আহরণের সাধনায় মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব তাঁর জীবনের প্রাথমিক অধ্যায় ব্যয় করেন। লেখাপড়া সমাপ্ত করার পর কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট আদর্শ ও গতিপথ সম্পর্কে তিনি যে চেতনা লাভ করেছিলেন তারই আলোকে তিনি সমাজ বিনির্মাণের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। বিশুদ্ধ সমাজের পূর্বশর্ত হল কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে মুক্ত হওয়া। এজন্য তিনি সে অঞ্চলে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখতে শুরু করেন এবং প্রকৃত ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতি মানুষকে আহবান জানাতে থাকেন। তবে তাঁর এই আন্দোলন নিজস্ব এলাকায় তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেনি বিধায় তিনি সে অঞ্চল ত্যাগ করে দারিয়া অঞ্চলে হিজরত করেন এবং সেখানে একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করে সে মসজিদকে কেন্দ্র করে তাঁর মিশনের কাজ শুরু করেন। দারিয়া অঞ্চলের এক প্রভাবশালী গোত্রপতি ও জমিদার ছিলেন মুহাম্মদ আস-সউদ। মুহাম্মদ আস-সউদ এই সংস্কারমূলক আন্দোলন ও কর্মসূচীতে মুগ্ধ হয়ে মুহাম্মদ

ইবনে আঃ ওয়াহ্হাবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ সূত্র ধরেই সউদ পরিবারের সাথে তিনি বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। মহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব এর আদর্শিক চেতনায় সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠী মুহাম্মদ আস-সউদের নেতৃত্বে একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে বিকশিত হয় এবং এটি একটি গতিশীল আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। তারা খণ্ড খণ্ড যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করে নজদ ও তার আশপাশের গোত্র শাসিত অঞ্চলগুলো দখল করে নেয়। সুদীর্ঘ ২৮ বৎসর পর্যন্ত তাদের এই যুদ্ধাভিযান অব্যাহত থাকে এবং এক বিশাল ভূ-খণ্ড তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। বিজিত অঞ্চলসমূহে এই আদর্শিক চেতনার প্রতিফলন ঘটানো হয় এবং কুরআন সুন্নাহর আলোকে প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়। সর্বত্র মজবুত দুর্গ নির্মাণ করা হয় এবং শরয়ী প্রথায় কাজী ও মুফতী নিয়োগ করা হয়। ১৭৭৩ সালে এই বাহিনী একটি চূড়ান্ত যুদ্ধে রিয়াদের শাসক শায়খ দাহ্হামকে পরাজিত করে সেথায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৮৭ সালে এই মহান সংস্কারক ইহধাম ত্যাগ করেন।

মক্কা মদীনা তখন তুরস্কের বিশাল উসমানী সাম্রাজ্যের শাসনাধীন ছিল। তুরস্কের উচ্চ পরিষদের পক্ষ থেকে এদেরকে অবদমিত করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয় এবং হজ্জ পালনের জন্য তাদেরকে মক্কায় আগমন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে ইরাক ও পারস্য অঞ্চল থেকে আগত হাজীদের উপর চড়াও হয়ে তারা তাদের মাল সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যেত এবং তাদেরকে নানাভাবে হয়রানী করত। এহেন কারনে ১৭৮৫ সালে এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ক্রমেই এ দলটি আরব্য অঞ্চলে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। ১৮০২ সালে তাঁরা আক্রমণ চালিয়ে কারবাল, নজদ ও বালাদুল হুসাইন ইত্যাদি অঞ্চল দখল করে নেয় এবং যুদ্ধ ঘোষিত অঞ্চলকে দারুল হরব ও লুণ্ঠিত সম্পদকে গনীমতের সম্পদ বিশ্বাসে তাঁরা দখলকৃত এলাকায় ব্যাপক হত্যা ও লুণ্ঠন চালায় এবং জনগণের উপর ব্যাপক অত্যাচার করে। ১৮০৩ সালে তাদের অন্যতম নেতা শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে সউদ জনৈক শিয়া গুপ্ত ঘাতক কর্তৃক নিহত হলে তার পুত্র ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এসময় ইরাকের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে একটি আক্রমণ পরিচালনা করা হলে ইবনে সউদ তা ব্যর্থ করে দেয়। ১৮০৪ সালে তারা মদীনা ও ১৮০৬ সালে তারা মক্কা নগরীর উপর আক্রমণ করে তা দখল করে নেয় এবং এখানেও ব্যাপক লুণ্ঠন চালায়। তারা বিদ'আত উচ্ছেদের নামে এসকল অঞ্চলে বিদ্যমান সাহাবী ও মনীষীগণের মাযারসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তাদের এসকল আচরণে বিশ্ব মুসলিমের অন্তরে তাদের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে বালাদুল হুসাইনে সংঘটিত লুণ্ঠন তৎপরতা ও সাহাবীগণের মাযার ধ্বংসের কারণে শিয়ারা তদের প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়।

অবশ্য তুর্কী সরকার মিশরের গভর্নর মুহাম্মদ আলী পাশাকে মক্কা মদীনা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করে। ১৮১২ সালে সে মক্কা এবং ১৮১৩ সালে মদীনা ওয়াহাবীদের হাত থেকে পুনঃ দখল করে নেয়। পরে মুহাম্মদ আলী পাশার পুত্র ইব্রাহীম পাশাকে ওয়াহাবীদের নির্মূল করার জন্য প্রেরণ করা হলে সে প্রথম দিকে

কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হলেও ১৮১৮ সালে এক চূড়ান্ত যুদ্ধে ওয়াহাবীদেরকে পরাস্ত করে তাদের রাজধানী দারিয়া দখল করে নেয়। এভাবে ওয়াহহাবীদের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু ইব্রাহীম পাশা মিশরে চলে গেলে ওয়াহাবীরা নজদ অঞ্চলে পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ে সচেষ্ট হয়। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে সউদী রাজ পরিবার পুনরায় রিয়াদে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

১৯০৯ সালে রাসূল খিমা নামক দুর্গে বৃটিশের সাথে তাদের এক চূড়ান্ত সংঘর্ষ হয়। বৃটিশরা দুর্গটি দখল করে নিয়ে যায় এবং দুর্গটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তা ভস্মীভূত করে ফেলে। ঠিক এসময় ইংরেজ সাংবাদিকরা এই আন্দোলনকে 'ওয়াহাবী আন্দোলন' হিসাবে আখ্যায়িত করে। এ থেকেই পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকরা এটিকে ওয়াহাবী আন্দোলন হিসাবে উল্লেখ করে আসছে।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হলে ইংরেজরা তুরস্কের শক্তিকে খর্ব করার জন্য আরব জাতীয়তার ধুঁয়াতুলে আরবদেরকে তুরস্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, এবং শরীফ হুসাইনকে ক্ষমতার প্রলোভন দিয়ে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উস্কানী দেয়। শরীফ ক্ষমতার লোভে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে মক্কা মদীনা শরীফের অধীনে চলে আসে। আর রিয়াদসহ দক্ষিণ অঞ্চল ইবনে সউদের নিয়ন্ত্রণেই রয়ে যায়। ইংরেজরা ইবনে সউদকেও প্রলোভন দিয়েছিল। কিন্তু সে এই প্রলোভনের শিকার হয়নি। বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হলে শরীফ ইংরেজদের অনুগত হিসাবে দেশ শাসন করতে থাকে। এভাবে চলে যায় বেশ কয়েক বৎসর। ইবনে সউদ শরীফের এই ইংরেজ তোষণ নীতি পছন্দ করতেন না। ফলে শরীফের সাথে তার বিরোধ লেগেই ছিল। ১৯২৬ সালে ইবনে সউদ হিজাযের একচ্ছত্র শাসক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং অধিকৃত অঞ্চলকে "সৌদী আরব" নামে নামকরণ করে। বর্তমান রাজ পরিবার তাদেরই বংশধর।

ভারতে যখন হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে তখন এ আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ইংরেজরা যে সব চাল চালে তার মাঝে এ আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্টদের ওয়াহাবী বলে আখ্যায়িত করার চালটি অন্যতম। ১৮২২ সালে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ হজ্জ থেকে ফিরে এসে প্রকাশ্যে জিহাদী তৎপরতা শুরু করলে ইংরেজরা তাদের প্রচার মাধ্যমগুলোতে তাঁকে ওয়াহাবী আন্দোলনের অন্যতম নেতা বলে অপপ্রচার চালাতে থাকে। যেহেতু এদেশের মানুষ আগে থেকেই ওয়াহাবীদের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন ছিল সুতরাং তাদের এই প্রচারণায় যথেষ্ট সুফল ফলে। এমনকি ইংরেজ ঐতিহাসিক মিঃ হান্টারতো এই উভয় আন্দোলনকে এক ও অভিন্ন বলেই মন্তব্য করেছেন এবং প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে, হজ্জ করতে গিয়ে সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের শিষ্যত্ব বরণ করে স্বদেশে ফিরে আসেন এবং ভারতবর্ষে ওয়াহাবী আন্দোলনের সূচনা করেন। এর পিছনে যুক্তি হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন যে, হজ্জে যাওয়ার আগে সে একজন পীর ছিল মাত্র, হজ্জ থেকে ফিরেই সে ওয়াহাবীদের অনুকরণে জিহাদী

তৎপরতা শুরু করে। ওয়াহাবীরাও কবর ও মাযার পূজার বিরোধীতা করে সাইয়্যিদ আহমদও তাই করে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর এই মুজাহিদদেরকে ওয়াহাবী বলে প্রচার করার জন্য ইংরেজরা আহমদ রেজা খানকে টাকার বিনিময়ে ক্রয় করে নেয়। সে তার দল বল নিয়ে আল্লাহর রাহে নিবেদিত স্বাধীনতা কামী মুজাহিদদেরকে ওয়াহাবী বলে সাধারণ মানুষের মাঝে জোড় প্রচারণা চালাতে থাকে, এবং এদেরকে কাফের ও রাসূল বিদ্বেষী বলে ফতওয়া দিয়ে বেড়াতে থাকে। সাধারণ মানুষের মাঝে যারা এ আন্দোলন সম্পর্কে পূর্ব থেকে ওয়াকিফহাল ছিলেন তারাতো ইংজেরদের এই ষড়যন্ত্র সহজেই ধরে ফেলতে পারলেন, কিন্তু যারা এ আন্দোলনের সাথে পূর্ব থেকে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না বা মুজাহিদদের তৎপরতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না তারাই এ প্রচারণা দ্বারা বিভ্রান্ত হলেন বেশী। সাধারণ মানুষ ইতিহাসের সুক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ জানেনা বিধায় তারা একথা তলিয়ে দেখেনি যে, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব ১৭৮৭ সালে মারা গেলেন সুতরাং সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. ১৮২২ সালে হজ্জ করতে গিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করবেন কি রূপে?

ইংরেজদের ষড়যন্ত্র এবং আহমদ রেজা খান ও তার ভক্তদের এ প্রচারণায় সাধারণ মানুষের মাঝে স্বাধীনতাকামী মুজাহীদদের সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এই প্রচারণা যথেষ্ট সুফল বয়ে আনে। এতে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম শক্তি দু'টি বিপরীতমুখী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল ইংরেজ তোষণকারী অথচ নিজেদেরকে রাসূল প্রেমিক বলে দাবী করে, আর স্বাধীনতার পক্ষশক্তি মুজাহিদদের দলকে কাফির ও রাসূল বিদ্বেষী বলে ফতওয়া দিতে থাকে। এর পরিণতিতে দু'দলের মাঝে আত্মকলহের সূত্রপাত ঘটে। একদল অন্যদলের বিপরীতে অবস্থান নেয়। আজও আমাদের দেশ থেকে এই বিরোধের রেশ কাটেনি। এখনও রেজা খানীরা উলামায়ে দেওবন্দকে কাফের মনে করে এবং তাদেরকে ওয়াহাবী বলে আখ্যায়িত করে। অথচ ওয়াহাবী আন্দোলনের সাথে স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের আন্দোলনের বিস্ত র ফারাক রয়েছে এবং এই উভয় আন্দোলনের মাঝে কোন যোগসূত্র ছিল, ঐতিহাসিক সূত্রে এটা কোন ভাবেই প্রমাণ করা যায় না। এটা ছিল মুজাহিদদেরকে অবদমিত করা এবং জনগণকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার একটি সাম্রাজ্যবাদী চাল মাত্র। তবে আহমদ রেজা খানের বদৌলতে ইংরেজরা এ চালে যথেষ্ট সফল হয়েছিল নিঃসন্দেহে।

বিদ'আতীদের প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দ ঃ

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, বিদ'আতের মৌলিক কারণ হল অজ্ঞতা কিংবা স্বার্থন্বেষীদের শঠতা ও স্বেচ্ছারিতা। সুতরাং অজ্ঞতার নিরসন হলে বিদ'আত এমনিতেই নির্মুল হয়ে যায়। কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃষ্ট জ্ঞান এবং দ্বীন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিই বিদ'আত নির্মূলের এক মাত্র উপায়। এ কারণে উলামায়ে

দেওবন্দ দ্বীনকে ইলমীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে বলিষ্ঠ প্রয়াস গ্রহণ করেন। এজন্য স্থানে স্থানে দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এসকল দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের সাথে সাধারণ মানুষকে ব্যাপকহারে সংশ্লিষ্ট করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এতে সাধারণ মানুষের মাঝে দ্বীন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ক্রমান্বয়ে আলেম উলামার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তাদের সংস্পর্শে এসে সমাজ বিশুদ্ধ চিন্তা চেতনা লাভ করে। এভাবে অতি সহজেই বিদ'আত উচ্ছেদের আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়।

উপমহাদেশে শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী রাহ.। বাতিলপন্থী স্বার্থান্বেষীরা বিদ'আতকে হাসানা এবং সাইয়্যিয়াহ এই দুই ভাগে বিভক্ত করে নিজেদের মনগড়া ও নবউদ্ভাবিত বিষয়কে বিদ'আতে হাসানা বলে আখ্যায়িত করে সমাজে তা ছড়িযে দিত। তাদের নব উদ্ভাবিত এসকল বিদ'আতের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলেই তারা সেটাকে বিদ'আতে হাসানা বলে আস্ফালন করত। এই পথেই সমাজদেহে বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল সবচেয়ে বেশি। মুজাদ্দিদে আলফেসানী রা. ইলমীভাবে এ তথ্য পরিবেশন করেন যে, বিদ'আতে হাসানা বলতে কিছু নেই। হাদীসে নবী রা. সকল বিদ'আতকেই বিভ্রান্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং বিদ'আত বাহ্যত যত সুন্দরই মনে হোক এর পরিণাম বিভ্রান্তি। তাঁর এই আন্দোলনের ফলে বিদ'আতে হাসানার নামে কুসংস্কারের অনুপ্রবেশের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। হিন্দু ধর্মের প্রভাবে যে সব কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ সমাজে ঘটেছিল তা নিমূর্ল করার জন্য ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে নববী সুন্নত ও আদর্শ কি, তা তিনি ব্যাপকভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করতেন। তিনি বিদ'আতের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করে সকল ক্ষেত্রে সুন্নতে নববীর প্রচলন দানের আন্দোলন করেছেন ব্যাপক ভিত্তিতে, তাঁর এ আন্দোলন যথেষ্ট ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

হাকীমুল উম্মাহ হযরত কারী তাইয়্যিব রাহ. বলেছেন যে, শিরক ও বিদ'আত নির্মূলের জন্য আকাবির উলামায়ে কিরামের তৎপরতা শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. এর যুগে ইলমী সচেতনতা সৃষ্টির আকারে শুরু হয়েছে, হযরত শাহ আব্দুল আযীয রাহ. এটিকে সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, অত:পর হযরত ইসমাইল শহীদ ও সাইয়্যিদ আহমদ রাহ. এর মাধ্যমে বিদ'আত বিরোধী এই চেতনা ব্যাপকভাবে গণমানুষ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় এবং এটি একটি সামাজিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। হযরত নানুতুবী রাহ. এই চেতনাকে উচ্চতর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দৃঢ়তা দান করেন, হযরত গাঙ্গুহী রাহ. এটিকে ফিকাহ শাস্ত্রের যুক্তি প্রমাণের আলোকে বিশ্লেষণ করেন। অতপর হযরত থানভী রাহ. ও হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. বিদ'আত বর্জনের আন্দোলনকে সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এভাবে বিদ'আত বিরোধী

আন্দোলন অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। ফলে 'উপমহাদেশ পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বিদ'আত মুক্ত হয়। বর্তমানেও এ আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। দ্বীনি শিক্ষার আলো বিবর্জিত কিছু কিছু অঞ্চল, অজ্ঞ পর্যায়ের কিছু কিছু সাধারণ মানুষ এবং অসৎ ও স্বার্থান্বেষী আলেমরা ব্যতীত প্রায় সর্বত্রই সুন্নতে নববীর উপলব্ধি আজ অনেকাংশেই সুস্পষ্ট।

ইলমীভাবে বিদ'আত সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ওলামায়ে দেওবন্দ কর্তৃক বিদ'আতের স্বরূপ, উৎপত্তি, বিকাশ ও তার পরিণাম সম্পর্কে বহু বই পুস্তকও রচিত হয়। শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহ. রচিত আলবালাগুল মুবীন এ বিষয়ে একটি অনবদ্য গ্রন্থ। হযরত ইসমাইল শহীদ রাহ. সীরাতুল মুসতাকীম নামক গ্রন্থে তৎকালে প্রচলিত বিদ'আতের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। হযরত থানভী রাহ. ভারতবর্ষের প্রচলিত বিদ'আতের উচ্ছেদ কল্পে বহু বই পুস্তক প্রণয়ন করেন, হিফযুল ইলাম ও আশরাফুল জাওয়াব বিদ'আত সম্পর্কে রচিত তাঁর বিশেষগ্রন্থ। তাছাড়া হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী রচিত আল মুহান্নাদ আলাল মুফাননাদ, আল বারাহিনুল কাতেআহ, হযরত মাদানী রচিত আশশিহাবুস সাকিব, মাও: মনজুর নুমানী কৃত ফয়সালাকুন মুনাজারা, মুফতী সারফরাজ খান রচিত রাহে সুন্নাত, মুফতী আহমদ শফী রচিত 'আসসুন্নাহ ওয়াল বিদআহ' মাও: আবুল হাসান নদভী রচিত শিরক্ ও বিদ'আত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

তাছাড়াও উলামায়ে দেওবন্দ তাদের ওয়াজ নসীহত বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে সর্বদাই উম্মতকে বিদ'আত ও কুসংস্কার সম্পর্কে সচেতন করে আসছেন। প্রয়োজনে বিদ'আতীদের সাথে বহস ও মুনাযারাও তারা সব সময় করে আসছেন। এ জন্য তাদেরকে বহুক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তারা বিদ'আত ও কুসংস্কারের সাথে আপোষ করেননি। বলতে গেলে বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম উলামায়ে দেওবন্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

জ. পাশ্চাত্যের চিন্তাধারায় প্রভাবিতদের বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার মুকাবেলা ঃ

আল কুরআন হল দুনিয়ার মানুষের জন্য ঐশী দিক নির্দেশনা। এরই নির্দেশিত আদর্শের আলোকে পরিচালিত হবে মানুষের জীবন এটাই স্রষ্টার কাম্য। এর প্রতিটি বাক্যের বাচন ভঙ্গিতে রয়েছে ঐশী ব্যাপকতার মহামু'জিযা। এ ব্যাপকতার মাঝেও নিহিত রয়েছে মানুষের জন্য প্রভূত কল্যাণ। এর ভাষা অত্যন্ত সংক্ষেপ; তাই ভাবার্থ উদ্ধার ও স্রষ্টার অভিপ্রেত ও কাঙ্খিত উদ্দেশ্য নির্ণয় সাধারণ মানুষের কাজ নয়। এতে ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে সমূহ। অনেক ক্ষেত্রে একটি নির্দেশ দেয়া রয়েছে কিন্তু তার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়নি। সে সকল ক্ষেত্রে সেই নির্দেশের মর্মার্থ পর্যন্ত পৌঁছা মানুষের জন্য অসম্ভব বটে। এজন্যই মহান আল্লাহ তা'আলা এগ্রন্থ প্রেরণের সাথে সাথে এর মূল আদর্শ ও কাঙ্খিত ভাব ব্যাখ্যা করে দুনিয়ার মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এ গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার

হিসাবে একজন নবীও প্রেরণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

আমি আপনার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আপনি তাদেরকে ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করে দেন। (সূরা নহল: ৪৪) সুতরাং নবী সেই ঐশী বিধানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন তাঁর বর্ণনায়, ব্যাখায়, কর্মে ও অনুমোদনে সাহাবীগণের সম্মুখে। সাহাবীগণ নবীর সাহচর্য ও সান্নিধ্য লাভ করে এবং তাঁর কর্মময় জীবনের সমগ্র বিষয় অবলোকন করে দ্বীন সম্পর্কে যে উপলব্ধি লাভ করেছিলেন, তাই তারা ব্যক্ত করে গেছেন তাবেঈনদের কাছে। সাহাবীগণের সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করে এবং তাদের কর্মময় জীবন অবলোকন করে তাবেঈনগণ দ্বীন সম্পর্কে যে উপলব্ধি লাভ করেছিলেন তা তারা ব্যক্ত করে গেছেন তাবই-তাবেঈনদের কাছে। এভাবে দ্বীন সাহচর্য ও উপলব্ধির ক্রম পরস্পরায় এসে পৌঁছেছে আমাদের পর্যন্ত। এখানে অভিধানের অর্থগত দিকটির চেয়ে ক্রমপরস্পরায় দ্বীনের যে ব্যাখ্যা ও আদর্শিক রূপ বর্তমান পর্যন্ত পৌঁছেছে সেটিই মূল ও প্রকৃত রূপ হিসাবে পরিগণিত হবে। সাহাবীগণের যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত যে শব্দ যে অর্থে প্রয়োগ হয়ে আসছে সে অর্থই গ্রহণীয় হবে। সাহাবায়ে কিরাম নবী সা. এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে দ্বীনের যেরূপ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, পরবর্তীদের লাগামহীন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কারণে সেই মূল রূপ যাতে হারিয়ে না যায় কিংবা বিকৃত না হয় সে জন্য পূর্ববর্তী আইম্মায়ে মুজতাহেদীন ও উলামায়ে মুহাক্কেকীন অত্যন্ত চিন্তাভাবনা ও গবেষণার মাধ্যমে দ্বীনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এমন কতিপয় নীতিমালা প্রণয়ন করে গেছেন যা অনুসরণ করে চললে দ্বীনের সেই রূপ সংরক্ষিত থাকবে- সাহাবায়ে কিরাম যা নবী কারীম সা. থেকে উপলব্ধি করেছিলেন। দ্বীনের ব্যাখ্যার নামে কেউ তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা অভিপ্রায়ের প্রতিফলন ঘটানোর পথ যাতে চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়, সে জন্য তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। এক্ষেত্রে তারা এত ব্যাপক খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন যে, কুরআন সুন্নায় ব্যবহৃত প্রতিটি মৌলিক শব্দের সংজ্ঞা পর্যন্ত তারা দিয়ে গেছেন। যাতে পরবর্তীকালে শুধুমাত্র অভিধান নির্ভর কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করে দ্বীনের মৌলিক রূপ পরিবর্তনের কোন অবকাশ না থাকে। এমনকি যদি মানুষের ব্যবহৃত ভাষায় কালক্রমে শব্দের অর্থগত দিকের কোন পরিবর্তনও সাধিত হয় তথাপি যেন দ্বীনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এর কোন প্রভাব না পড়ে।

বস্তুতঃ কুরআন সুন্নায় ব্যবহৃত মৌলিক শব্দেসমূহের তৎকালে প্রচলিত ভাষায় বিভিন্নার্থে প্রয়োগ থাকলেও কুরআন ও হাদীসে সেগুলোকে একটি নির্দিষ্ট অর্থের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে, যে অর্থের ব্যাখ্যা স্বয়ং নবী সা. দিয়ে গেছেন এবং সাহাবায়ে কিরাম বর্ণনা করে গেছেন। ফলে কুরআন সুন্নায় ব্যবহৃত প্রতিটি মৌলিক শব্দের ভাষায় প্রচলিত সাধারণ অর্থের বাইরে শরীয়ত প্রদত্ত একটি অর্থের পরিমণ্ডল তৈরি হয়ে গেছে এবং ঐ সকল শব্দের একটি শরয়ী পরিভাষাও

গড়ে উঠেছে। তাই বর্তমানে "সালাত" শব্দটি প্রয়োগ করলে কেউ আর প্রাচীন ভাষা সাহিত্যে শব্দটি যে সব অর্থে প্রয়োগ হয়েছে তার কোন একটি অর্থের কথাও চিন্তা করেনা, বরং শরীয়তে "সালাত" শব্দটি যে অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে সে অর্থটিই বুঝে থাকে। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অঙ্গিকার মুতাবিক এ দ্বীনকে অর্থগত ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জনিত বিভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত করে ফেলেছেন।

কিন্তু যুগে যুগেই জ্ঞানপাপী প্রবৃত্তির পূজারীরা নিজেদের প্রবৃত্তিজাত চিন্তা ভাবনাকে ইসলামের নতুন ব্যাখ্যার নামে চালিয়ে দেওয়ার হীন প্রবণতা প্রদর্শন করেছে। যদিও পূর্ব নির্ধারিত নীতিমালা ও শব্দের সর্বজনবিধিত শরয়ী পভিাষার কারনে এবং হাদীসের সুরক্ষিত ভাণ্ডারের কারনে তাদের সেই অপচেষ্টা সফল হয়নি, উম্মতের কাছে তা স্বীকৃতি পায়নি, বরং উম্মত সঙ্গত কারণেই তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

উম্মতের মাঝে এ ধরনের প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম মু'তাযিলা সম্প্রদায় থেকে প্রকাশ পায়। তারা তাদের মনগড়া মতবাদকে কুরআন সুন্নার সমর্থন পুষ্ট করার জন্য সর্বজন স্বীকৃত ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করে নিজেদের মনমত কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যার প্রয়াস পায়। পরবর্তীতে বাতেনীয়ারা কুরআনের বাতেনী অর্থ উদ্ঘাটনের নামে এ ধরনের অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়। তাদের দাবীছিল, কুরআনের যেমন একটি জাহেরী অর্থ রয়েছে, অনুরূপভাবে তার একটি বাতেনী অর্থও রয়েছে। মূলতঃ সেটিই কুরআনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। আর জাহেরী অর্থের সাথে বাতেনী অর্থের সম্পর্ক হল চামড়া ও অভ্যন্তরের সার বস্তুর ন্যায়। এভাবে তারা কুরআন সুন্নার স্বীকৃত অর্থের বিপরীতে নতুন ব্যাখ্যার এক বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তুলে। বাতেনীয়াদের উদ্ভাবিত এই পন্থা পরবর্তীকালে বিকৃত ব্যাখ্যার দ্বার উন্মোক্ত করে দেয় এবং স্বার্থান্বেষী ও সুখ্যাতির প্রত্যাশী ব্যক্তিরা কুরআন সুন্নার সর্বজন স্বীকৃত প্রকৃত রূপও অবকাঠামোর বিপরীত নিজেদের মনগড়া মতবাদকে ইসলামের নতুন ব্যাখ্যার নামে প্রচার করে উম্মতের চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার জন্য এই অপকৌশলকেই কাজে লাগায়। এটি ইসলামকে বিকৃত করার এমন সূক্ষ্ম এক কৌশল যা অনুধাবন করা সকলের জন্য সম্ভব নয়, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের প্রকৃত মেজায সম্পর্কে বসীরত ও প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং যারা রূহানী শক্তি বলে বলিয়ান কেবল তারাই এই বিভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। কারন এ ধরনের ব্যক্তিরা তাদের মতবাদকে সুপ্রমাণিত করার জন্য কুরআন সুন্নার দলিল প্রমাণেরই আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। তবে তারা স্বীকৃত অর্থকে সামান্য বিকৃত করে পেশ করেন এই যা। ফলে বিষয়টি বুঝা অনেকের জন্য দুরুহ হয়ে পড়ে।

ভারতীয় উপমহাদেশে এহেন জঘন্যতা সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় স্যার সৈয়দ থেকে। তিনি মূলতঃ পাশ্চাত্যের জীবনধারা ও আদর্শের দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তার ধারণা ছিল মুসলমানরা যত দিন প্রাশ্চাত্যের সভ্যতা রপ্ত করতে

না পারবে ততদিন তারা পশ্চাৎমুখীতা ক্বাটিয়ে উঠতে পারবেনা এবং তারা সভ্যজাতি হিসাবে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেনা। একারণে তিনি পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শের আলোকে ভারতীয় মুসলিম মানসের পুণঃগঠনের আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মনে হয় স্যার সৈয়দ তার এই বিশ্বাসে অত্যন্ত মুখলিস ছিলেন। যদিও তার এই বিশ্বাসটি ছিল মারাত্মক ধরনের একটি ভ্রম। কেননা মুসলমানের উন্নতি ও অগ্রগতি কুরআন সুন্নার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাঝেই সন্নিহীত। এই বিশ্বাসের কারণেই স্যার সৈয়দ ইংরেজ শাসনকে এদেশের মানুষের জন্য ক্ষতিকর মনে করতেন না। বরং তাদের সংস্পর্শে এদেশের মানুষ ক্রমান্বয়ে সভ্য হয়ে উঠবে এই বিশ্বাসে তিনি ইংরেজদের সাথে এদেশের মানুষের সম্প্রীতি গড়ে তোলার তৎপরতায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৮৫৭ সালে এদেশে সিপাহী জনতা যখন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখনও তিনি ইংরেজ সরকারের সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিপ্লবোত্তরকালে তিনি 'অসবাবে বাগাওয়াতে হিন্দ' নামক একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন। এ পুস্তকে তিনি স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদেরকে মারাত্মকভাবে তিরস্কার করেন এবং এই আন্দোলনকে কিভাবে প্রতিহত করা যাবে এ জন্য ইংরেজ সরকারকে বেশ কিছু মূল্যবান পরমর্শও দেন। বইটির মুদ্রিত কপি বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের জন্য উপহার হিসাবে পাঠানো হয়েছিল। রাজানুগত মুসলিম সম্প্রদায় নামে তিনি একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৬১ সালে 'তাবয়ীনুল কালাম' নামে তিনি বাইবেলের একটি ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করে বৃটিশদের কাছ থেকে যথেষ্ট প্রশংসা কুড়াতে সমক্ষম হয়েছিলেন। একই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৬৬ সালে 'বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এর মাধ্যমে বৃটিশ ও ভারতীয়দের মাঝে সম্প্রীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এছাড়াও তিনি তৎকালে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ইংরেজ বৈরিতা পরিহার করে তাদের সাথে সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাতে থাকেন। ১৮৬৫ সালে আলীগড়ে এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ (যা পরবীতে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়) প্রতিষ্ঠার পিছনে ঐ একই উদ্দেশ্য কাজ করেছে। ইংরেজ সরকারও তার এহেন তৎপরতাকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথেই মূল্যায়ন করেছে।

১৮৬৯ সালে তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিশেষ আমন্ত্রণে লন্ডন যান। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি খ্রীষ্টধর্মের সাথে ইসলামের সম্প্রীতি গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তখন প্রচার করতে থাকেন যে, কাফির ও আহলে কিতাবদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা যাবে না বলে যে বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে তা ঠিক নয়! ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বিকৃত হয়েগেছে বলে যে ধারণা পোষণ করা হয় তাও ভুল। তাছাড়া হযরত ঈসা আ. মৃত্যু বরণ করেন নি, তাঁকে আসমানে তুলে নেওয়া হয়েছে, তিনি পিতা বিহীন জন্মগ্রহণ করেছেন- এসকল ধারণা

সম্পূর্ণ রূপে মিথ্যা ও জালিয়াত'। এমন কি তিনি খ্রীষ্টানদের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে ইসলামের সম্প্রীতি স্থাপনের এ উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করার জন্য মদ ও শুকুরকে হারাম মনে করা ও কুকুরকে অপবিত্র জ্ঞান করা যুক্তি বিবার্জিত বলেও মন্তব্য করেন। এভাবে ইসলামের চিরন্তন আক্বীদাহ বিশ্বাসের বিপরীতে দাঁড়িয়ে ইংরেজদের মনোতুষ্টির জন্য তিনি উঠেপড়ে লেগে যান। ১৮৭৬ সালে সরকারী চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণকালে তার আনুগত্য ও বিশ্বস্থতার প্রতিদান স্বরূপ ইংরেজ সরকার তাকে "স্যার" উপাধিতে ভুষিত করে। ১৮৮৮ সালে ইংরেজরা তাকে কে, সি, আই, এস উপাধিতেও ভূষিত করেছিল।

মূলতঃ স্যার সৈয়দ ওরিয়েন্টালিষ্টদের (অর্থাৎ প্রাচ্যদেশীয় ধর্ম-দর্শন নিয়ে গবেষণাকারী ইউরুপিয়ান চিন্তাবিদদের) চিন্তা চেতনা দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত ছিলেন। অথচ ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের গবেষণায় যে বস্তুনিষ্টতা রক্ষা পাবে না, এবং তারা যে ইসলামকে তাদের ধ্যান-ধারণার ছাঁচেই পেশ করবে, আর ইসলামকে বিকলাঙ্গ করার জন্য তাদের এই পরিকল্পিত গবেষণায় তারা যে ইসলামের চিরন্তন আক্বীদাহ বিশ্বাসকে বিকৃত করে পেশ করে ইসলামের চিরন্তনতার মূলে কুঠারাঘাত করবেই এই সাধারণ বিষয়টি স্যার সৈয়দ হয়ত অনুধাবন করতে পারেননি। ফলে ঐসব প্রাকৃতিবাদী গবেষকরা তাদের চশমায় ইসলামকে যেভাবে অবলোকন করেছেন, স্যার সৈয়দ সেটাকেই প্রকৃত ইসলাম ধরে নিয়ে সর্বজন স্বীকৃত ইসলামী মূল্যবোধের বিপরীতে পাশ্চাত্যের মানস প্রসূত ইসলামকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। একারণেই তার চিন্তাধারা সনাতন ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাসের সাথে বহু ক্ষেত্রেই সাংঘর্ষিক প্রতিপন্ন হয়েছে।

স্যার সৈয়দ মূলতঃ ছিলেন ন্যাচারিয়াল বা প্রাকৃতিকবাদে বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম ও প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি পূর্ণ এক জীবনাদর্শ। সুতরাং ইসলামের সকল বিধি-বিধান মানুষের স্বভাবজাত চাহিদার অনুকূল ও প্রকৃতির বিধানের সাথে সঙ্গতি পূর্ণ হতে হবে। একথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু বিকৃত স্বাভাবকে যদি কেউ মানবীয় স্বভাব বলে ধরে নেয় আর প্রাকৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের দেওয়া আপেক্ষিক ও ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্তকে কিংবা বিজ্ঞানীদের অনুমান প্রসূত মন্তব্যগুলোকে যদি কেউ প্রকৃতির অলঙ্গনীয় বিধান বলে ধরে নেয় তাহলে তার সাথে যে ইসলাম বা কুরআনের সঙ্গতি থাকবে না এ কথাত স্বাভাবিকভাবেই বোধগম্য। স্যার সৈয়দ যেহেতু পাশ্চাত্যের জীবন ধারাকে মানবীয় স্বভাবের প্রতিকৃতি মনে করেছেন এবং বিজ্ঞানীদের সূত্রগুলোকে অকাট্য বলে মনে করেছেন (যে সম্পর্কে খোদ বিজ্ঞানীরাও অকাট্য হওয়ার ধারণা পোষণ করে না)। একারণে কুরআন সুন্নার সর্বজন স্বীকৃত বহু বিষয় তার কাছে অবৈজ্ঞানিক, অপ্রাকৃতিক ও স্বভাব বিরোধী মনে হয়েছে। সুতরাং তিনি তার চিন্ত ার আলোকে ইসলামকে যুক্তিপূর্ণ, বিজ্ঞান সম্মত ও স্বভাবানুকূলে করার চেষ্টা করে ছেন।

যেহেতু বিজ্ঞান অদৃশ্য কোন বস্তু বা বিষয়ের অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেয় না অতএব কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সকল অদৃশ্য বিষয়াশয়কেই তিনি অস্বীকার করেছেন। যেমন জান্নাত, জাহান্নাম, ওয়াহী, ফিরিশতা, জ্বীন, শয়তান, হুর, গিলমান, মিরাজ, মু'জিযা কারামত ইত্যাদি। স্বীকৃত এসব বিষয়কে অস্বীকার করে কুরআনে ব্যবহৃত এসকল শব্দের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি।

তাছাড়া তিনি শুকর, কুকুরকে পবিত্র মনে করতেন, বাণিজ্যিক সুদ, মৃত জানোয়ারকে হালাল মনে করতেন, এবং নারী পুরুষের অবাধ মেলা মেশা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টিকে তিনি অযৌক্তিক মনে করতেন। এ ক্ষেত্রে তার একটি মাত্রই যুক্তি ছিল যে এগুলো প্রকৃতি ও স্বভাবের দাবী, সুতরাং স্বভাব ধর্ম ইসলাম তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারে না।

তবে তার এসকল উদ্ভট ব্যাখ্যার সবচেয়ে বড় অন্তরায় ছিল রাসূল সা. এর হাদীসের ভাণ্ডার ও আকাবিরে উম্মার তাশরিহাত ও ব্যাখ্যা। যে কারণে তিনি হাদীসের নির্ভরযোগ্যতাকে অস্বীকার করেছেন এবং পূর্ববতীদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে তাচ্ছিল্যের সাথে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন যে, ইসলাম বুঝার জন্য পূর্ববর্তীদের কিতাবে উল্লেখিত ব্যাখ্যা কিংবা আলেম উলামাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণের কোনই প্রয়োজন নেই। আল্লাহ স্বয়ং কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'আমি কুরআনকে সহজ সরল করে অবতীর্ণ করেছি, কেউকি আছে উপদেশ গ্রহণকারী'। অতএব কুরআন বুঝার জন্য পূর্ববর্তী আলেমদের ব্যাখ্যার পিছনে পড়ার প্রয়োজন নেই। যে কোন ব্যক্তিরই কুরআন ব্যাখ্যা করার অধিকার রয়েছে। তিনি আরো মন্তব্য করেছেন যে, দ্বীন এমন দুর্বোধ্য কোন বিষয় নয় যে, তা অনুধাবনের জন্য আবু হানিফা বা গাজালীর অনুসরণ করতে হবে। এমনকি দ্বীন সম্পর্কে সাহাবীগণের উপলব্ধিকেও তিনি নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, "এই উটের রাখালরা দ্বীনের প্রকৃত হাক্বীকত বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও পূর্ববর্তী সকল মনীষী একে অপরের সান্নিধ্যে এসে দ্বীনের যে উপলব্ধি অর্জন করেছিলেন তাকে নাকচ করে দিয়ে স্যার সৈয়দ নিজে থেকে যে দর্শন পেশ করেছিলেন তাকে ইসলামের সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্গতি পূর্ণ পৃথক একটি ধর্ম -দর্শন আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, তবে তাকে ইসলাম বলা যায় না। ইসলামত সেই উপলব্ধিরই নাম যা সাহাবায়ে কিরাম রাসূল সা. থেকে সরাসরি অর্জন করে ছিলেন এবং সান্নিধ্য পরস্পরায় যে উপলব্ধি আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে।

কিন্তু স্যার সৈয়দ তার এই বিভ্রান্তিকর দর্শনের উপর ভিত্তি করে দ্বীন সম্পর্কে স্বেচ্ছাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং যেখানে তার মন যে রূপ চেয়েছে সে রূপ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তার এই সব বক্তব্য যেহেতু কুরআনের সর্বস্বীকৃত ব্যাখ্যার অনুকূল ছিলনা একারণে তিনি স্ব-মতের অনুকূলে 'তাফসীরে আহমদী'

নামে কুরআনের একটি পৃথক তাফসীরও রচনা করেছিলেন। যার অসংখ্য স্থানে মূল অর্থ ও ভাবার্থের তাহরীফ করা হয়েছে। তার নিজস্ব দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কুরআনে ব্যবহৃত বহু শব্দের পারিভার্ষিক অর্থ বর্জন করে তাকে মনগড়া অর্থ দাঁড় করাতে হয়েছে।

কুরআন হাদীস ও দ্বীনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ যে স্বেচ্ছাচারীতার দর্শন দিয়ে গিয়েছিলেন সে পথ অনুসরণ করে পরবর্তীতে অনেক আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিই কুরআন হাদীস সম্পর্কে যৎসামান্য লেখাপড়া করে নিজেকে মুজাদ্দিদের ভূমিকায় দাঁড় করানোর প্রয়াস পেয়েছেন। স্বঘোষিত এসকল মুজাদ্দিদ ও সংস্কারকদের হাতে পড়ে ইসলামের সেই অবস্থাই হয়েছে, হাতুড়ে ডাক্তারের হাতে পড়লে রুগীর যা হয়। কোন মূলনীতির ধার না ধেরে তারা আপন খেয়াল খুশী অনুযায়ী দ্বীনের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছে। কুরআন সুন্নার মিজায্ ও পরিভাষা, মূলদর্শন ও নীতি সম্পর্কে যাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই এ ধরনের আধুনিক শিক্ষিত ইসলামী চিন্তাবিদদের দ্বারা ভারত উপমহাদেশে ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবচে বেশি।

স্যার সৈয়দের এই স্বেচ্ছাচারী ব্যাখ্যানীতি অবলম্বন করেই পরিবর্তীতে আব্দুল্লাহ চকরালভী, গোলাম পারভেজ, গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, আবুল আ'লা মওদুদী সহ অনেক বিভ্রান্তির নায়করা আবির্ভূত হয়েছে। যাদের প্রত্যেকেই আপন আপন অভিরুচির আলোকে ইসলামকে আধুনিকায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফলে ইসলামের চিরন্তন আক্বীদাহ বিশ্বাস ও বিধি-বিধানসমূহের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নতুন নতুন কিছু বিভ্রান্তির সংযোজন করেছে।

বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার প্রতিরোধে উলামায়ে দেওবন্দের ভূমিকা ঃ

দ্বীনকে সকল প্রকার কুসংস্কার ও বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার বেড়াজাল থেকে রক্ষা করার জন্য উলামায়ে দেওবন্দ সব সময় অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় কাজ করে গেছেন। তারা দ্বীনের যে কোন ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লার নিক্তিতে মেপে মেপে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ তারা কুরআন ও সুন্নাহকে গ্রহণ করেছেন রিজালুল্লাহ তথা সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তাবই তাবেঈন, আইম্মাই মুজতাহিদীন, ফুকাহা ও সুলাহায়ে উম্মত তথা আকাবিরে দ্বীনের তাশরিহাত ও তাদের কর্মময় জীবনের আলোকে। তাই কোন ব্যক্তি যদি কুরআন ও সুন্নার এমন কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করে যার কোন সমর্থন সাহাবাই কিরাম, তাবেয়ীন, তাবই-তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন তথা আকাবিরে দ্বীনের তাশরীহাত, কিংবা তাদের কর্মময় জীবনের কোথায়ও পাওয়া যায় না তাহলে তা তারা নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা যারা সান্নিধ্য পরস্পরায় নবী করীম সা. থেকে দ্বীনের উপলব্ধি অর্জন করেছেন সেই উপলব্ধির পরিপন্থী কোন ব্যাখ্যা কখনই দ্বীন হতে পারেনা। অপর পক্ষে তারা রিজালূল্লাহ বা দ্বীনী ব্যক্তিত্বকে গ্রহণ করেছেন কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন সুন্নাহর নিক্তিতে মেপে মেপে। সুতরাং কোন ব্যক্তি-তিনি যতবড় ব্যক্তিত্বের অধিকারীই হোক না কেন- যতক্ষণ তার চিন্তা চেতনা কাজ-কর্ম কুরআন সুন্নার আদর্শের অনুকুল প্রমাণিত হয়েছে ততক্ষণ তাঁরা তার অনুসরণ করেছেন প্রশ্নাতীত ভাবে। কিন্তু যখনই তাথেকে কুরআন সুন্নার

পরিপন্থী কোন কিছু প্রতীয়মান হয়েছে তখনই তারা তাকে ত্যাগ করেছেন দ্বিধাহীনভাবে। অনুরূপভাবে তারা কুরআন সুন্নাহকে বুঝার চেষ্টা করেছেন যুক্তির আলোকে, আবার যুক্তিকে গ্রহণ করেছেন কুরআন সুন্নাহর আলোকে অর্থাৎ তারা কুরআন সুন্নাহকে যুক্তিগ্রাহ্য করে বুঝার ও উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন, যাতে দ্বীন নিছক অন্ধ অনুকরণের বিষয়ে পরিণত না হয়, কিন্তু নিজের মেধা উৎসারিত যুক্তিকেই মুল ধরে কুরআন হাদিসীকে সে আলোকে মুল্যায়ন করার হঠধর্মী নীতিকে তারা কখনই গ্রহণ করেননি।

অনুরূপভাবে তারা দ্বীনকে গ্রহণ করেছেন আকল ও নকলের সমন্বয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ তারা দ্বীনি ব্যপারে কোন কিছু যুক্তিযুক্ত মনে হলেই তা গ্রহণ করেননি। যতক্ষণ না কুরআন সুন্নাহ ও আকাবিরের তাশরীহাত ও জীবনাদর্শ থেকে এর সমর্থন প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে না পাওয়া যায়। অপর পক্ষে নির্ভারযোগ্য সূত্রে দ্বীন সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া গেলেই তার যথেচ্ছা প্রয়োগের চেষ্টা করেন নি, বরং শরীয়তের পূর্ণ মেজাযকে সামনে রেখে সেই বর্ণনার একটি যুক্তিসঙ্গত ও মানানসই প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন- যাতে শরীয়তের স্বীকৃত কোন মূলনীতির সাথে কোন রূপ সংঘাত সৃষ্টি না হয়।

অনুরূপভাবে তারা কুরআন সুন্নাহকে গ্রহণ করেছেন ইশক ও মুহাব্বতের সাথে, আর ইশক ও আবেগকে মূল্যায়ন করেছেন কুরআন সুন্নার ভিত্তিতে। ফলে কুরআন সুন্নার আদর্শের প্রতি আবেগ ও অনুরক্তি নেই এবং নিজ জীবনে তা বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নেই এমন ব্যক্তিকে যেমন তারা মূল্যায়ন করেননি, গ্রহণ করেননি তার দেওয়া থিউরীসমূহ, তেমনি যারা আবেগের আতিশয্যে শরীয়তের সীমালঙ্ঘন করে ফেলেছে তাদেরকেও তারা স্বীকৃতি দেননি।

উলামায়ে দেওবন্দ রাসূল সা. আনীত দ্বীনের যে উপলব্ধি সাহাবায়ে কিরাম লাভ করেছিলেন হুবহু সেই রূপটি অবিকল ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন এবং ধরে আছেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আধুনিক পৃথিবী ও তার সমস্যা নিয়ে তারা ভাবেননি। বরং তারা আধুনিক পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান কল্পে সদা তৎপর থেকেছেন। তবে এই সমাধান যাতে সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তাবই-তাবেয়ঈন ও আইম্মায়ে মুজাদ্দেদীনের উপলব্ধির গণ্ডির আওতার ভিতরে থেকে হয়। নিজের মন গড়া এমন কোন সমাধান যাতে না হয় যা দ্বীনের মূল মেজায ও উপলব্ধি থেকে ভিন্নতর কিছু- এ ব্যাপারে তারা সদা সতর্ক থেকেছেন।

এই মূলনীতি গুলোকে সামনে রেখেই তারা সব সময় অগ্রসর হয়েছেন। ফলে যে কেউ ইসলাম সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করা মাত্রই তাঁরা এই মূলনীতিগুলোর আলোকে তা পরখ করে দেখেছেন। যদি এই মূলনীতির বিচার বিশ্লেষণে তা উতরে গেছে বলে মনে হয়েছে, তাহলে তা তারা গ্রহণ করেছেন, আর যদি এইসব বিচার বিশ্লেষণে তা না টিকে তাহলে তারা তা বর্জন করেছেন।

স্যার সৈয়দসহ প্রকৃতিবাদী ও আধুনিকতাবাদী চিন্তাবিদদের থেকে দ্বীন সম্পর্কে যে তাশরীহাত ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পাওয়া গেছে, উলামায়ে দেওবন্দ সেগুলোকে এই নিক্তিতে মেপেই গ্রহণ অথবা বর্জন করেছেন।

ইসলামের নামে দেওয়া এই সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বিভ্রান্তি উদ্ঘাটন খুবই দুরুহ ও কষ্ট সাধ্য ব্যাপার বটে। দ্বীনের হিফাযতের তাকিদে তারা এই দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে। তাই দ্বীন সম্পর্কে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর তৎপরতার কথা জানতে পারলেই তাদের সম্পর্কে তারা অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। কোথায়ও কোন অসুবিধা পরিদৃষ্ট হলে তারা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে গভীরভাবে তা পরখ করে দেখেছেন। কারো বিভ্রান্তি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলে জনগণকে সে সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন। এবং বিভ্রান্তিগুলো কি তা চিহ্নিত করে দিয়ে তা নির্মূল করার জন্য নিজেদের সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন এবং এক্ষেত্রে দ্বীনের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি হবে তাও তুলে ধরেছেন। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ওয়াজ-নসীহত, বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে যেমন তারা এসকল বিভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা করেছেন অনুরূপভাবে বই পুস্তক রচনা করেও তা সাধারণ্যে বিতরণ করেছেন। স্যার সৈয়দের বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারার জবাবে হযরত নানুতুবী রাহ. তাসফিয়াতুল আকাইদ নামক একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে স্যার সৈয়দ বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিলে, এ পুস্তকে সেই দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর বিভ্রান্তিকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। তৎকালে প্রকাশিত "আল-বুরহান" পত্রিকার সম্পাদক মাওঃ মুহাম্মদ আলী বিছরামনী স্যার সৈয়দ রচিত তাফসীরে দুই শতাধিক স্থানে বিভ্রান্তিকর ব্যাখা রয়েছে বলে উল্লেখ করে তা চিহ্নিত করত প্রত্যেকটির জবাব প্রদান করেন। তাছাড়া এমদাদুল ফতওয়ার ৬ষ্ঠ খণ্ডে, হযরত ইউসুফ বিন্নৌরী রচিত ইয়াতিমাতুল বয়ান গ্রন্থে, মাও: আব্দুল হক হক্কানী রচিত আল বয়ান ফি উলূমিল কুরআন গ্রন্থে, তকী উসমানী রচিত উলূমুল কুরআন গ্রন্থে এ সকল আধুনিকাতাবাদী ও প্রকৃতিবাদীদের বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

উলামায়ে দেওবন্দের অব্যাহত তৎপরতার ফলে স্যার সৈয়দ ও তার অনুগামীদের বিভ্রান্তি থেকে সমাজের বহু মানুষ রক্ষা পায়। এমনকি খোদ স্যার সৈয়দ প্রতিষ্ঠিত আলীগড়ে লেখাপড়া করেও বহু ব্যক্তি স্যার সৈয়দের মানসিকতাকে গ্রহণ না করে উলামায়ে দেওবন্দের চিন্তা চেতনাকে নিজেদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। মাও. আবুল কালাম আযাদ, হাকীম আজমল খান, ডা. আনসারী, ডা. যাকির হোসাইন, মাও. মুহাম্মাদ আলী জাওহার, মাও. সুলায়মান নদভী সহ অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিই উলামায়ে দেওবন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন। যদিও স্যার সৈয়দ বিশ্বাসী ছিলেন আপোষনীতিতে। পরবর্তীতে স্যার সৈয়দের খোলে দেওয়া পথে অনেক বিভ্রান্তির হোতারা আবির্ভূত হয়েছেন। সকলের ক্ষেত্রেই উলামাযে দেওবন্দ একই নীতি অবলম্বন করেছেন এবং তাদের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন। আজো সেই তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

সমাপ্ত
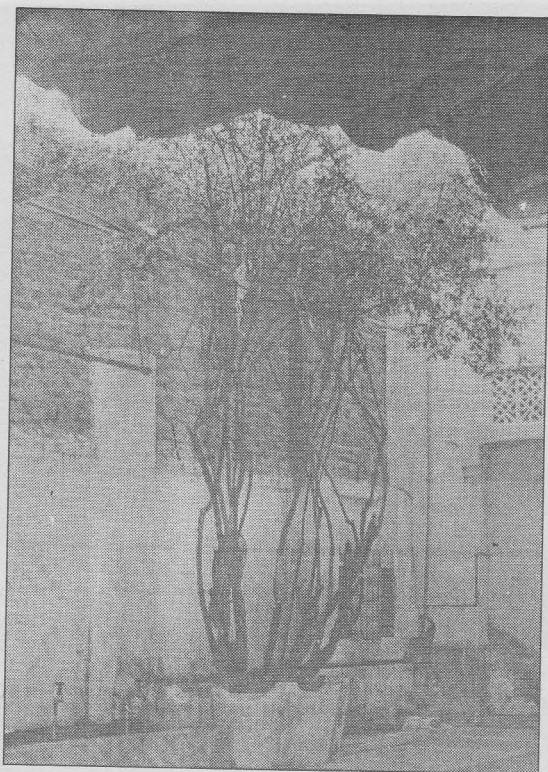
এই সেই ঐতিহাসিক ডালিম গাছ যার নীচে বসে সূচনা হয় দেওবন্দ মাদরাসার
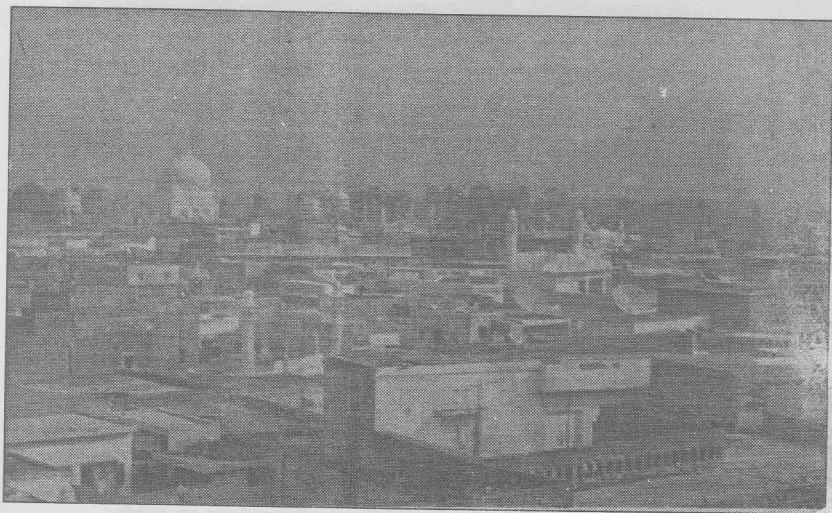
এক নজরে দেওবন্দ নগরী
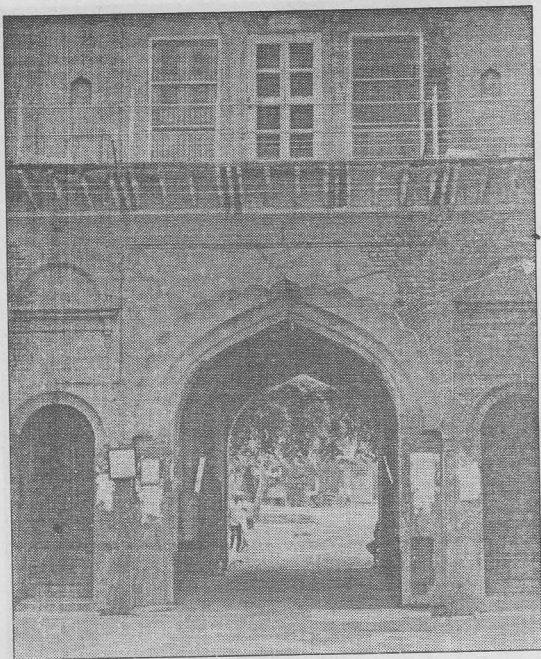
মদনী গেইট-হযরত মদনী যে গেইট দিয়ে আসা যাওয়া করতেন
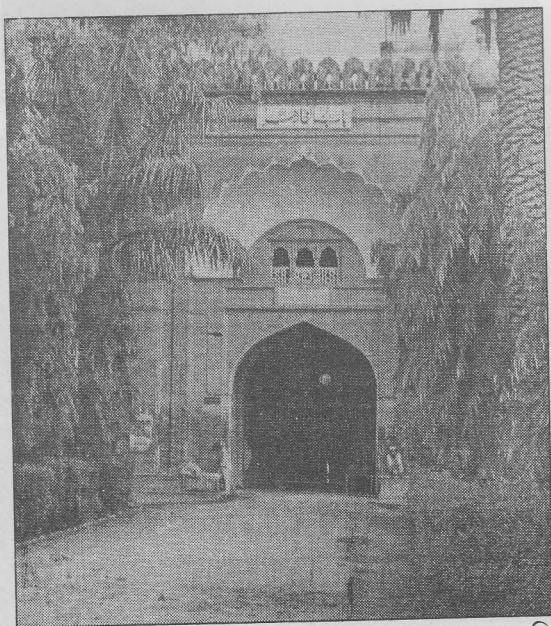
বাবুজ জাহের-আফগান শাসক জাহের শাহের অনুদানে যা নির্মিত
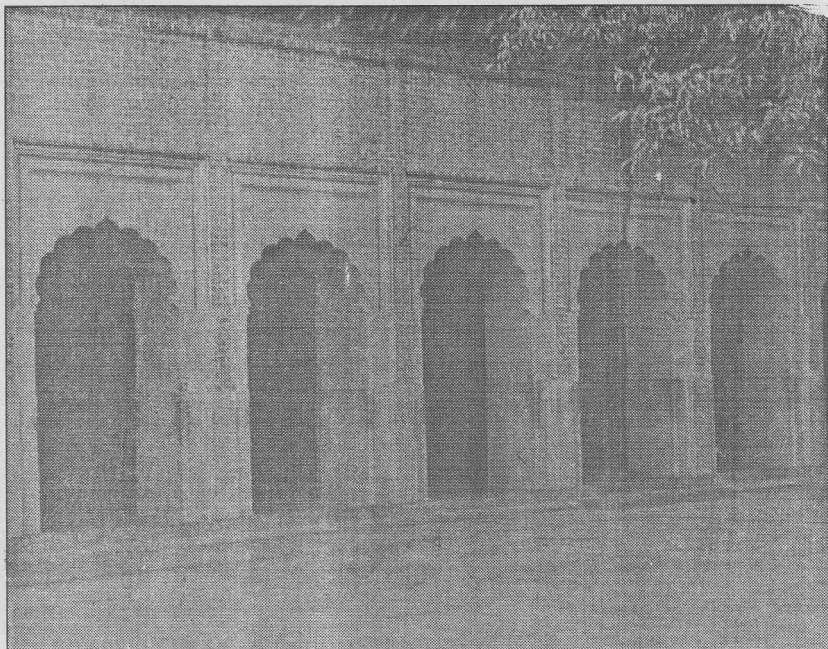
নওদরা-রাসূল (সাঃ) স্বপ্নযোগে যার স্থান চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন
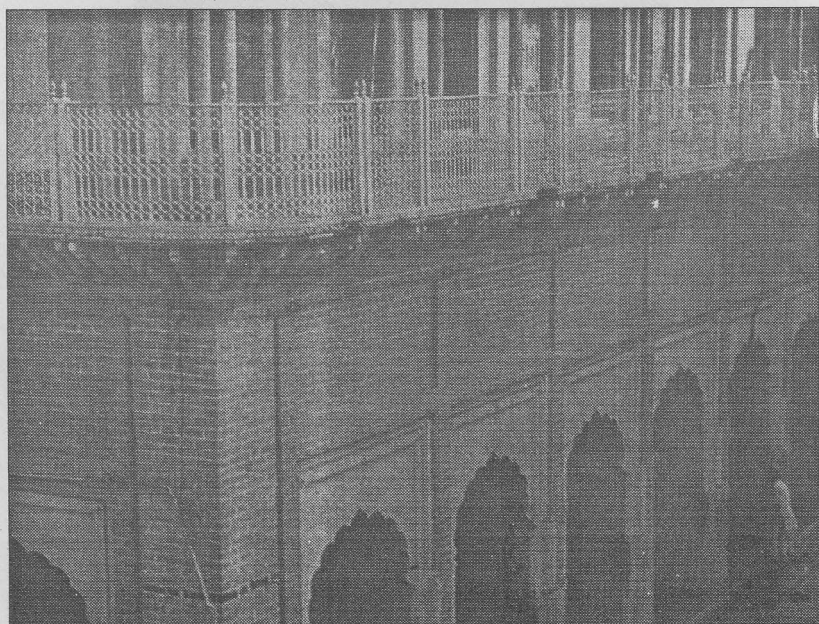
দারুল হাদীস ফাউকানী
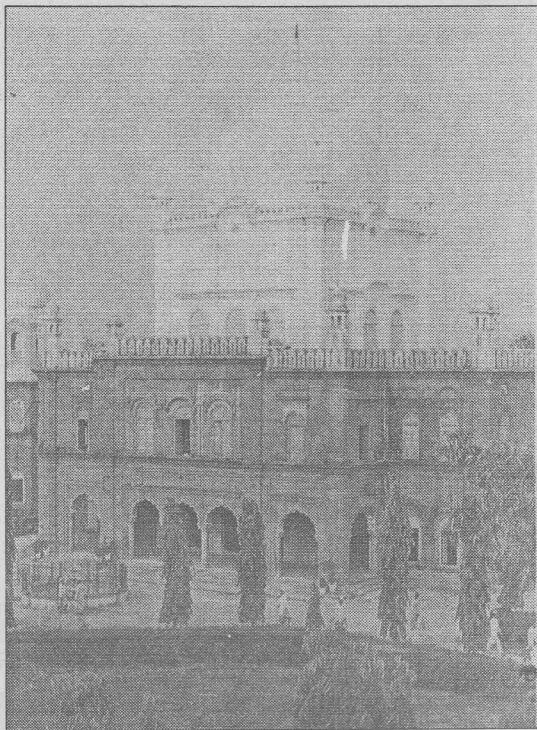
দারুত তাফসীর
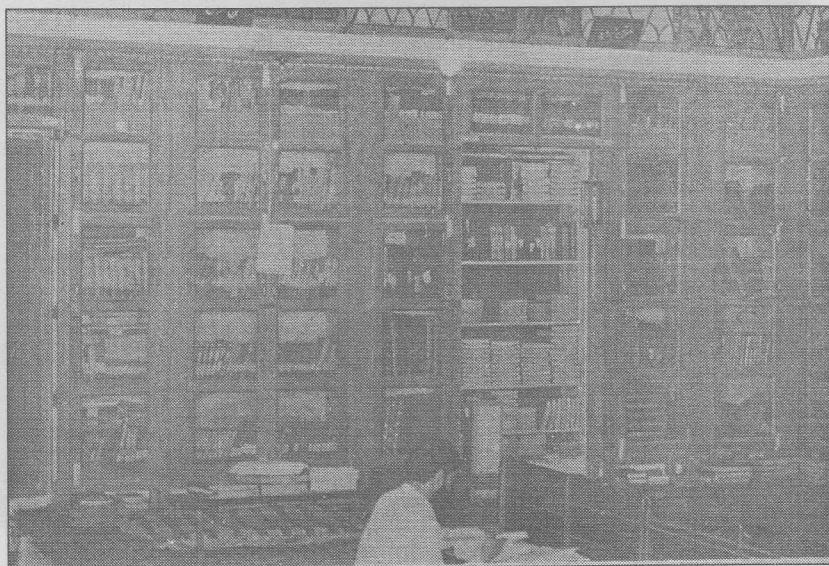
কুতুবখানার একাংশ
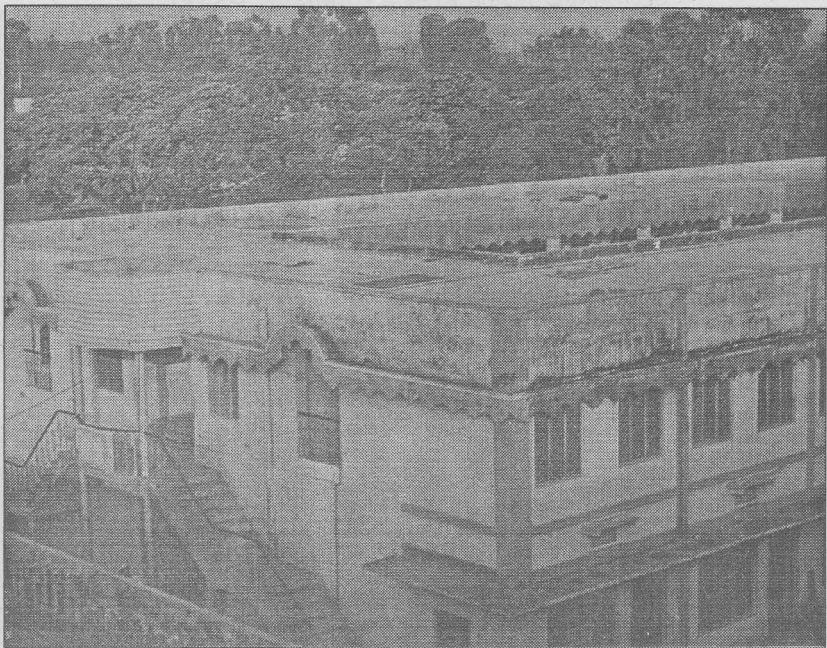
ছাত্রাবাসের একাংশ

আফ্রিকী মঞ্জিল
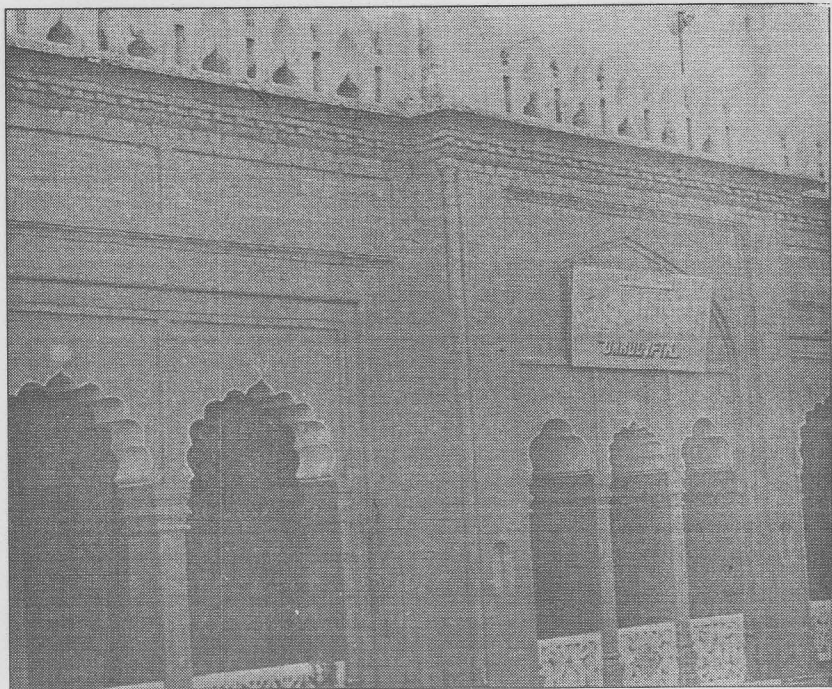
দারুল ইফ্‌তা

নব নির্মিত জামে মসজিদ

গ্রন্থপঞ্জী

১। ভারতবর্ষের ইতিহাস	প্রগতি প্রকাশনী, মস্কো
২। ভারতবর্ষে মুসলমানদের ইতিহাস	কে. আলী
৩। আবে কাউসার	শায়খ মুহাম্মদ আকরাম
৪। মওজে কাউসার	শায়খ মুহাম্মদ আকরাম
৫। রোদে কাউসার	শায়খ মুহাম্মদ আকরাম
৬। তারীখে ফেরেশতা	আবুল কাশেম ফেরেশতা
৭। হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস	মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী
৮। তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ	মাওলানা সাইয়্যিদ মাহবুব রেজভী
৯। তারীখে দাওয়াত ও আযীমত	মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী
১০। সীরাতে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ	মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী
১১। তাহ্‌কীক আওর ইনসাফ কী আদালত মে এক মজলূম মুসলেহ কা মুকাদ্দমা	মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী
১২। মুজাহিদ বাহিনীর ইতিবৃত্ত	গোলাম রসুল মিহর
১৩। আসীরে মাল্টা	শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী
১৪। নকশে হায়াত	শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী
১৫। উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাঝি	মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া
১৬। উলামায়ে হক্ক	মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া
১৭। তাহরীকে শায়খুল হিন্দ	মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া
১৮। আসীরানে মাল্টা	মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া
১৯। সাওয়ানেহে কাসেমী	সাইয়্যিদ মানাজের আহসান গিলানী
২০। মুসলমানু কা নেয়ামে তা'লীম	সাইয়্যিদ মানাজের আহসান গিলানী
২১। আদ দ্বীনুর কাইয়্রিম	সাইয়্যিদ মানাজের আহসান গিলানী
২২। দিলওয়ানে আকবরী	মোল্লা বাদায়ূনী
২৩। শাহ ওয়ালীউল্লার রাজনৈতিক চিন্তাধারা	মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী
২৪। শাহ ওয়ালীউল্লাহ ও সমকালীন রাজনীতি	সাইয়্যিদ আতহার আব্বাস রিজভী
২৫। আযাদী আন্দোলন ১৮৫৭	মাওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী
২৬। টিপু সুলতান	মুহিববুল হাসান
২৭। কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি	এম. আর আক্তার মুকুল
২৮। মকতুবাতে মুজাদ্দিদে আলফে সানী	
২৯। মুজাদ্দিদে আলফেসানীর সংস্কার আন্দোলন	রুহুল আমীন
৩০। আত্মদর্শনে সত্য দর্শন	এ.টি.এম. খলিল
৩১। হিন্দুস্তানী মুসলমান	মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী
৩২। মাআছিরে শায়খুল ইসলাম	মাওলানা আছীর আদরবী
৩৩। শায়খুল ইসলাম হযরত মদনী জীবন ও সংগ্রাম	ফরীদ উদ্দিন মাসউদ সম্পাদিত

৩৪। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী কর্ম ও সাধনা	ডঃ আবদুল্লাহ
৩৫। ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান	ডঃ এছহাক
৩৬। হিন্দুস্তান আহদে রিসালাতমে	
৩৭। ইখতেলাফে উম্মত আওর সীরাতে মুস্তাকীম	ইউসুফ লুধিয়ানভী
৩৮। বানীয়ে দারুল উলূম দেবন্দ	ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়্যব
৩৯। মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দ	ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়্যব
৪০। বীস বড়ে মুসলমান	মাওলানা রশীদ আহমদ সাইফী
৪১। আকাবীরে দেওবন্দ	শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া
৪২। তারীখে মাশায়েখে চিশত	শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া
৪৩। আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস	মাওলানা আব্দুস সাত্তার
৪৪। দেওবন্দ আন্দোলন একটি জিহাদ	এ এম এম আব্দুল জলীল
৪৫। তাহরীকে দেওবন্দ	মাওলানা মুস্তাক আহমদ
৪৬। উলামা ও মাশায়েখে হিন্দ	মুবারকপুরী
৪৭। আকাবিরে দেওবন্দ কিয়া থে	মাওলানা তকী উসমানী
৪৮। হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্	শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ
৪৯। সারাতীনে দেহলীকে মাজাহাবী রুজাহানাত	খালেক আহমদ নেযামী
৫০। ইরানী ইনকিলাব ইমাম খোমেনী ও শিয়া মতবাদ	মাওলানা মনযুর নোমানী
৫১। ইজহারে হক্ক	মাওলানা রহমত উল্লাহ কিরানভী
৫২। বাওয়াদেরুন নাওয়াদের	মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ.

লেখক পরিচিতি

মাওঃ আবুল ফাতাহ্ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক, গবেষক, প্রবন্ধকার, সফল অনুবাদক ও লেখক। তিনি ১৯৫৪ইং সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী মোমেনশাহী জেলার তারাকান্দা থানাধীন মালিডাঙ্গা গ্রামের ফরায়েযী বংশের এক ঐতিহ্যবাহী আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণ শিক্ষা বিজ্ঞানসহ দশম শ্রেণী পর্যন্ত। ১৯৭৯-৮০ইং শিক্ষাবর্ষে বেফাকের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় মুতাওয়াসসিতা-১ (বর্তমান সানবিয়্যাহ-১) জামাতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান এবং ১৯৮২-৮৩ ইং শিক্ষাবর্ষে দাওরায়ে হাদীস জামায়াতে প্রথম বিভাগে ৪র্থ স্থান অধিকার করে সুনামের সাথে উত্তীর্ণ হন। বর্তমানে তিনি জামিয়া শার্‌ইয়্যাহ্ মালিবাগে সিনিয়র মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন। একই সঙ্গে তিনি কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সহকারী মহাসচিবের দায়িত্বও পালন করে যাচ্ছেন দীর্ঘ দিন ধরে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বুখারী শরীফ (আংশিক)-এর অনুবাদসহ বহু মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। দারুল উলূম দেওবন্দ ইতিহাস ঐতিহ্য ও অবদান, (ফযীলত ২য় বর্ষের পাঠ্য) ইসলামী অর্থনীতির অধুনিক রূপায়ন (ফযীলত ২য় বর্ষে পাঠ্য) আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইসলাম, স্রষ্টা ও তাঁর স্বরূপ সন্ধানে, হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি, ইসলাদের দৃষ্টিতে পীর মুরিদী, মুজাহাদা ফী-সাবীলিল্লাহ ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

বলতে গেলে তার সবগুলো গ্রন্থই গবেষণাধর্মী ও তথ্যবহুল। তার রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা পঞ্চাশোর্ধ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ও সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধের সংখ্যা শতাধিক। জাতীয় পর্যায়ের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে তার সরব পদচারণা বিদ্যমান। ধর্মীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রায় তার অবদান অসামান্য। বিগত সত্তুরের দশকে এদেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহে বাংলা ভাষার প্রতি সচেতনতা তৈরীর যে নীরব আন্দোলন সূচীত হয়েছে, তিনি ছিলেন তার পুরোধা। ব্যক্তি হিসেবে তিনি অমায়িক, সাদাচারী, স্পষ্টভাষী, উদার, নির্মোহ, নিষ্টাবান, আত্মত্যাগী, দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় নিবেদিত প্রাণ ও সৎসাহসী।

ধর্মীয় শিক্ষার উন্নয়নে তার কর্মতৎপরতা ও ভাবনাগুলো সুস্পষ্ট ও পথনির্দেশক। আল্লাহ্ তাকে দীর্ঘজীবী করুন। -আমীন।

শরীফ মুহাম্মদ
সহকারী সম্পাদক
দৈনিক আমার দেশ

আল-আমীন রিসার্চ একাডেমী
৩১৪-সি, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯